প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

২৮তম পুনর্মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পাঠসংকলন প্রণীত হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ-উপকরণ অবলম্বনে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মূল সংকলনের লেখক, সম্পাদক, পরিকল্পনাকার প্রত্যেকের অবদান আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

পাঠসংকলনের বর্তমান আকার দিতে বিশেষভাবে যাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন :

পাঠক্রম : পর্যায় : F.S.T - 1

অনুসৃজন :
অধ্যাপিকা মিতা চৌধুরী

সম্পাদনা :
অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী

পাঠক্রম : পর্যায় : F.S.T - 2

অনুসৃজন :
অধ্যাপক কুমারেশ মিত্র
অধ্যাপিকা মণিমালা দাস
অধ্যাপিকা আরতি রায়চৌধুরী

সম্পাদনা :
অধ্যাপিকা নন্দিতা দত্ত
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ
অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী

পাঠক্রম : পর্যায় : F.S.T - 3

অনুসৃজন :
অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ

সম্পাদনা :
অধ্যাপক সুব্রত দত্ত
অধ্যাপক দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ

পাঠক্রম : পর্যায় : F.S.T - 4

অনুসৃজন :
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ
অধ্যাপক শক্তিব্রত ভৌমিক
অধ্যাপক মমতা দেশাই
অধ্যাপক এস. এন. গোস্বামী

সম্পাদনা :
অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ
অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী
অধ্যাপক দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক :
অধ্যাপক প্রতীপ কুমার চৌধুরী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

F.S.T. : 1 - 4

মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান প্রারম্ভিক পাঠক্রম

পর্যায়

1

বিজ্ঞানের ইতিহাস

একক 1 ❑ বিজ্ঞান মানুষের কীর্তি **11**

একক 2 ❑ প্রাচীন পৃথিবীতে বিজ্ঞান **33**

একক 3 ❑ লৌহযুগ **75**

একক 4 ❑ ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ **107**

পর্যায়

2

আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব **138**

একক 5 ❑ মধ্যযুগে বিজ্ঞান **139**

একক 6 ❑ নবজাগরণ (রেনেসাঁস) এবং তারপর **167**

একক 7 ❑ ঔপনিবেশিক ও আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান **197**

একক 8 ❑ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকৃতি **218**

পর্যায়

3

মহাবিশ্ব ও প্রাণের সূচনা 257

একক 9 ❑ মহাবিশ্ব এক বস্তুতন্ত্র 258

একক 10 ❑ মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন 283

একক 11 ❑ সৌরজগৎ 307

একক 12 ❑ প্রাণের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি 334

একক 13 ❑ মানুষের অভিব্যক্তি 353

পর্যায়

4

পরিবেশ ও সম্পদ 375

একক 14 ❑ ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র 379

একক 15 ❑ পরিবেশের উপাদান 402

একক 16 ❑ পরিবর্তনশীল পরিবেশ 427

একক 17 ❑ প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ 460

একক 18 ❑ সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা 482

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বুনিয়াদি পাঠক্রম

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্নাতকস্তরের ছাত্রছাত্রীর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বুনিয়াদি পাঠক্রম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটা আপনার আশ্চর্য লাগতে পারে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাবিদ্‌দের অনুসরণ করেই এই বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শ গ্রহণ করেছে। এখানে মনে করা হয়েছে একজন স্নাতকের শিক্ষা সবসময়ই ব্যাপক এবং বিস্তারিত হওয়া উচিত। এই আদর্শ মাথায় রেখেই এই পাঠক্রম গঠন করা হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে কোন বিশেষ বিষয়ে অধ্যয়ন করার সময় আপনি বিষয়টি অধিকতর বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিচার করবার ক্ষমতা অর্জন করবেন। বিভিন্ন বিশেষ শাখার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেতে আর সেইসব ক্ষেত্রের গভীরে প্রবেশ করতে এই পাঠ আপনাকে সাহায্য করবে। আবার স্নাতক স্তরের পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ না করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞান আপনার নানারকম প্রয়োজন মেটাবে।

এটা আপনি অবশ্যই জানেন, বাস্তবে কোন বিষয়ই বিজ্ঞান ছাড়া অচল। তাই আজকের জগতে বিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরিবহণ, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিনোদন সমস্ত কিছুই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এবং প্রযুক্তি হিসেবে তার প্রয়োগের ফসল। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও দ্রুতগতিতে বিকশিত এবং অগ্রসর হচ্ছে। অজানাকে জানবার অনুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসাভিত্তিক এক সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের এই বিশেষ পদ্ধতি শুধু যে আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রসার ঘটিয়েছে তাই নয়, সমাজবিজ্ঞানেরও অনেক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছে। এমনকি কখনও কখনও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানেও এই পদ্ধতি সহায়ক হয়। তাই, একজন স্নাতকের তো বটেই, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই সমাজে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আপনি এ যুক্তিতর্কে যেতে পারেন যে, বিজ্ঞান তো সবসময় আশীর্বাদ নয়। কখনও, কখনও, যেমন পারমাণবিক ও রাসায়নিক যুদ্ধে, বিজ্ঞান অভিশাপ। কারণ তখন বিজ্ঞানের ব্যবহার হয় মনুষ্য নিধনে। তাছাড়া আরও একটা বিপজ্জনক দিক আছে। বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে অন্যান্য দরিদ্র দেশ ও জাতিকে শোষণ করে মুনাফা অর্জন করে। তবে ভেবে দেখবার, এ ত্রুটি কি বিজ্ঞানের না আমাদের সামাজিক গঠনের! যেমন ধরুন ধর্ম। ধর্মের তো নিজস্ব কোন ত্রুটি নেই, তবু ধর্মকে উপলক্ষ্য করে কতই না হানাহানি, ধ্বংস ও শোষণের ইতিহাস। তাই সমাজ ও জনগণকেই সচেতন হতে হবে। বিজ্ঞান যাতে সম্পূর্ণরূপে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের কথা উঠলেই বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রশ্ন উঠে আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজের প্রগতি ও মানবকল্যাণ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিজ্ঞানের ভূমিকা এবং বিজ্ঞানের বিকাশের নিজস্ব ধারা সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা। এই বুনিয়াদি পাঠক্রমে তারই অবতারণা। বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি। কারণ, কোন বিশেষ শাখা, যেমন গণিত অথবা জীবনবিজ্ঞান, আপনি তো ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে পারবেন। পরিবর্তে এই পাঠক্রমে আপনি উপলব্ধি করবেন, জীবনপ্রবাহ এক পরস্পর নির্ভরশীল তন্তু।

এখানে আপনি মানবমন, তার আচরণ, খাদ্য ও কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা, শিল্প ও বিজ্ঞান এরকম আরও অনেক প্রশ্নে কিভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ তা অনুসরণ করতে পারবেন। এই পাঠক্রম যথাসম্ভব আধুনিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানে সাফল্য ও বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়নে তার ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল উদ্দেশ্য :

পূর্বপৃষ্ঠার বক্তব্য নীচে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সারসংক্ষেপ করা যাক। এই পাঠক্রম আপনাকে যে সব কাজ করার ক্ষমতা দেবে তা হল—

- ✶ সমগ্রভাবে সামাজিক এবং বিশেষভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে অনুধাবন করা।
- ✶ অতীতে কী ঘটেছে শুধু তাই নয়, বর্তমানে কি ঘটছে এবং ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া।
- ✶ বিজ্ঞানের পদ্ধতি উপলব্ধি এবং জীবনের সমস্যা সমাধানে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ করা।
- ✶ এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা অর্থাৎ জিজ্ঞাসার অভ্যাস ও বাস্তবসম্মত চিন্তাপদ্ধতি গ্রহণ করা এবং জীবনে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করা।
- ✶ সভ্যতার ঊষাকাল থেকে যে সমস্ত ব্যাপারে নানা প্রশ্ন মানুষকে তাড়িত করেছে সেগুলি হ'ল, মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর বুকে প্রাণের সৃষ্টি রহস্য, মানবমনের ক্রিয়া ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে বিজ্ঞান কিভাবে সাহায্য করতে পারে সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া।
- ✶ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতার সদ্ব্যবহর করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যরক্ষা করা, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বহুবিধ মানবিক সমস্যার সমাধান করা।
- ✶ সর্বসাধারণের কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবার মত উপযুক্ত সামাজিক গঠন সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।
- ✶ সমালোচকের মন নিয়ে আমাদের দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশ্নে সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ, এ বিষয়ে রেডিও ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলি এই খণ্ডের বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিষয়গুলির আলোক যুক্তিপূর্ণ মন নিয়ে অনুধাবন করা।
- ✶ বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিভিন্ন ধারণা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দেশের ভবিষ্যতের কিছু জরুরী প্রশ্নে নিজস্ব মতামত গঠন করা।
- ✶ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে সহজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

পর্যায় ১ : বিজ্ঞানের ইতিহাস

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাথমিক পাঠের প্রথম খণ্ডে আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করব। এখানে আমরা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেব। এ বিষয়ে অনেক বই পাওয়া যায়। আপনি গ্রন্থপঞ্জীতে সেগুলির উল্লেখও দেখবেন। তবে কোন বিস্তারিত ইতিহাসের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের প্রয়োজন এবং কৌতূহলের ওপর নির্ভর করে কেমন করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গড়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যেমন সূর্য হ'ল তাপ ও আলোকের বিশাল উৎস। পৃথিবী সেই শক্তি গ্রহণ করে। আমাদের এ ব্যাপারে কৌতূহল খুব স্বাভাবিক, কেমন করে এই বিশাল শক্তি অফুরান থাকে আর কেমন করেইবা তা পৃথিবীতে পৌঁছায়। আমরা আবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে, যেমন, জল ফোটান, রান্না করা, যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখা ইত্যাদিতে এই শক্তি ব্যবহার করি। জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং বিশ্লেষণ করে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের তাগিদ কেমনভাবে আসে, এই সহজ উদাহরণ থেকে তা বোঝা যায়।

সামজ বিকাশর বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের চাহিদার প্রকারভেদ হয়েছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান উন্মেষিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। গ্রামভিত্তিক সমাজে মানুষের ব্যস্ততাহীন জীবন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঋতুচক্রের আবর্তনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে একধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল। তখন টেলিফোন, রেলগাড়ি অথবা মোটরগাড়ির প্রয়োজন হ'ত না। অন্যদিকে, আজকের শিল্পনির্ভর সমাজে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সপরিবহণের প্রয়োজন সর্বদা অনুভূত হয়। তার ফলেই দ্রুতগতিসম্পন্ন সুপারসনিক বিমান এবং উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উদ্ভাবিত হয়েছে।

অন্যদিকে আবার, বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগের ফলে সমাজে বহু পরিবর্তন হয়। যেমন, যে সমাজে বই, রেডিও, টেলিভিশনের মত বিজ্ঞানের উদ্ভাবন অনুপস্থিত, তা আমাদের পরিচিত সমাজ অপেক্ষা ভিন্নতর হবে। আমরা এটাও দেখব, কোন সময় বিজ্ঞানের প্রগতি ও প্রয়োগের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল থাকে কখনও বা থাকে প্রতিকূল। আদিম সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের ক্রিয়াবিক্রিয়া ও ঘাতপ্রতিঘাতের আলোচনাই এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিকাশ দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখা হবে। আমরা আশা করি এই পর্যায়ের পাঠ শেষে আপনি নীচের কাজগুলি করতে সমর্থ হবেন।

- নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে মানুষের কীর্তির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে, প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর পদ্ধতির উন্নতি ও স্বাভাবিক কৌতূহল নিরসনের কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ অনুসরণ করা।

- বিজ্ঞান ও সমাজের পরস্পর নির্ভরতাকে উপলব্ধি করা অর্থাৎ কেমন করে কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সমাজের প্রগতির সঞ্চালকরূপে কাজ করে আর তার ফলে আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়তা অনুভব করা।

* বিজ্ঞানের ইতিহাস ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক প্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক জ্ঞান অর্জন করা।
* বিজ্ঞানের বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করা এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিজ্ঞানের বিবর্তনকে লক্ষ্য করা। কেমন করে সমাজের প্রয়োজন এবং নতুন তত্ত্বকে গ্রহণ ও ব্যবহার করার ক্ষমতা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশকে সাহায্য করে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।
* প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতির মাত্রা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা।

পাঠ সহায়িকা :

এই পর্যায়ে পাঠের আগে এই পাঠের সবচাইতে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা আপনাকে কিছু পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। এই পর্যায়ের প্রথম এককে বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও মতামত দেওয়া হয়েছে। হয়তো এই ধারণার কথা আপনি এই প্রথমবার শুনছেন। পরবর্তী পর্যায়গুলি পাঠ না করা পর্যন্ত হয়তো আপনার কাছে ধারণাগুলি অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত মনে হবে। তবে একাধিকবার পাঠের প্রয়োজন হলেও আপনি ধারণাগুলি হৃদয়ঙ্গম করে নেবার চেষ্টা করবেন। সম্পূর্ণ পর্যায়টির পাঠ শেষ করে প্রথম এককটি পুনরায় পাঠ করবেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ এককে বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের অনুবর্তন করতে গিয়ে আমরা এই ধারণা ও মতামতগুলির বিশদ পর্যালোচনা করেছি। এই পর্বগুলিতে আমরা বহু মানচিত্র, চিত্র ও মন্তব্যের উপস্থাপনা করেছি।

আমরা প্রচুর অনুশীলনীও দিয়েছি। প্রত্যেক এককের পরিশেষেও প্রশ্নাবলী আছে। প্রত্যেক এককের পরিশেষ এই অনুশীলনী ও প্রশাবলীর উত্তরমালাও দেওয়া আছে। তবে আমরা আপনাদের প্রথমেই উত্তরমালা দেখে না নেওয়ার পরামর্শ দেব। নিজেরা প্রশ্নগুলি প্রথমে সমাধান করবার চেষ্টা করবেন, তাতে ধারণাগুলি স্বচ্ছভাবে ও স্পষ্টভাবে গৃহীত হবে। ধারণা ও মতামতগুলি মুখস্থ করানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল আপনারা সমস্ত বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করুন।

একক ১ □ বিজ্ঞান মানুষের কীর্তি

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
১.২ অতীত ও বর্তমানের সংযুক্তি
১.২.১ অতীতের অনুসন্ধান প্রয়োজন কেন
১.২.২ বিজ্ঞানের ইতিহাস কী
১.৩ বিজ্ঞানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য
১.৩.১ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজ্ঞান
১.৩.২ বিজ্ঞানের পদ্ধতি
১.৩.৩ বিজ্ঞানের ঐতিহ্য
১.৩.৪ বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা
১.৪ সারাংশ
১.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১.৬ উত্তরমালা

১.১ প্রস্তাবনা

মানুষের উদ্যম আর প্রয়াসই বিজ্ঞানের জন্মদাতা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে সীমাহীন বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে। নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নিবিড় পর্যবেক্ষণ আর উপলব্ধির। প্রকৃতিকে বোঝার এই চেষ্টা থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনমত তাকে ব্যবহার করতে শিখেছে। এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। খুলে গেছে অনুসন্ধানের নতুন দিগন্ত। জ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা পড়েছে আরও নতুন তথ্য, সমৃদ্ধ হয়েছে প্রয়োগের পদ্ধতি। এর ফলস্বরূপ আবার উন্নত হয়েছে বিভিন্ন প্রকৌশল।

প্রকৃতিকে এই জানবার আর তাকে প্রয়োগ করার বিবিধ ধারা থেকেই জন্ম বিজ্ঞানের। এই প্রক্রিয়ায় উত্থান-পতন বিস্তর। সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের এই গল্প খুবই চিত্তাকর্ষক। আমরা আগেই বলেছি, এই পর্যায়ে আমরা

এই গল্পেরই অবতারণা করব। তবে এতক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন কতটুকু? তাছাড়া আপনি এ প্রশ্নও করতে পারেন 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' বলতেই বা কী বোঝায়? তাহলে কী বেশকিছু সাল, তারিখ আর নাম মুখস্থ করতে হবে? আমরা প্রথম এককে আপনার এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দেবার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আজ আমরা জানি যে, আদিম মানুষের জীবনধারাতেই বিজ্ঞানের মূল নিহিত। তাই পরবর্তী পর্বে এককে একেবারে গোড়া থেকে, অর্থাৎ সভ্যতার ঊষাকাল থেকে বিজ্ঞানের কাহিনী শুরু করব। আমরা দেখব, কেমন করে আদিম সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজে উত্তরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্ম হল আর কেমন করেই বা প্রাচীন পৃথিবীতে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটল।

উদ্দেশ্য :

এই একক পাঠ শেষে আপনি যা অনায়াসে করতে পারবেন :

★ কেন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করা।

★ বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করা।

★ আজকের যুগে বিজ্ঞানের কতকগুলি দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা।

১.২ অতীত ও বর্তমানের সংযুক্তি

মানবসভ্যতার ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে, বিজ্ঞানের প্রগতি কখনও নিরন্তর নয়। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে গণিতশাস্ত্রে, আর প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দু'হাজার বছরে কোনো তুলনীয় অগ্রগতি ঘটল না। ভারতবর্ষে যখন সূক্ষ্ম গণনাদি এবং পর্যবেক্ষণ চলছিল তখন ইউরোপ প্রায় আদিম অবস্থাতেই ছিল। অন্যদিকে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হচ্ছিল তখন ইউরোপে শিল্পবিপ্লব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। সমাজ ও বিজ্ঞানের প্রগতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দুই-এর সম্পর্ক জটিল সন্দেহ নেই, তবে তা যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আর এদের মেলবন্ধনেই যে সভ্যতার উন্মেষ এবং বিকাশ তা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

আজ আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত বেশকিছু প্রশ্ন আমাদের উদ্বিগ্ন করে। যেমন,

(ক) এ কেমন করে হয় যে, আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাগ্যে পরিশুদ্ধ পানীয় জল, সাধারণ চিকিৎসা আর প্রাথমিক শিক্ষা জোটে না? কেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছেই বিজ্ঞানের সুযোগসুবিধা পৌঁছয়? অতি সামান্য অংশের জনগণের কাছে অত্যাধুনিক শল্যচিকিৎসাও সহজলভ্য অথচ বিশাল সাধারণ জনগণ কেন অতি সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত? অত্যাবশ্যকীয় ঔষধাদি কেন এমন দুর্মূল্য?

(খ) এটাই বা কেমন করে হল যে পাশ্চাত্য দেশ অথবা সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায় আমাদের দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চাৎপদ? হাজার বছর আগের গৌরবময় সূচনা সত্ত্বেও কেন আমরা এত অনগ্রসর?

(গ) পশ্চিমের কতকগুলি দেশে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর জীবনযাত্রার মান এত সমৃদ্ধ আর আমাদের অবস্থা এমন হতদরিদ্র কেন?

(ঘ) একথা কী ঠিক যে, আমাদের দেশেই কেউ কেউ যা বলেন এবং কিছু ঔপনিবেশিক ভাবধারার বাহক আগে যা বলতেন অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই? এঁরা মনে করেন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মবাদী। বিজ্ঞান দুঃখ আনে, অধ্যাত্মবাদ শান্তি আনে। তাই আমাদের ধর্মগ্রন্থেই নিবিষ্ট থাকা উচিত, বীক্ষণাগারে নয়। এই সমস্ত ধারণা কী বাস্তবসম্মত? বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রেখে কী অগ্রগতি সম্ভব?

(ঙ) বিজ্ঞান মানুষের প্রভূত উপকারে এসেছে। তবে বিজ্ঞানকে ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধে মানবসভ্যতার বিলুপ্তির সর্বনাশা পরিণতি থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সেটাই আজ আমাদের কাছে বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেমন করে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করে এক শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব?

এরকম আরও অনেক প্রশ্ন আপনারাও ভাবতে পারেন। সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে আমরা সকলেই আজ বিজ্ঞানকে আমাদের জীবনের অংশ বলে মেনে নিয়েছি। আমরা এ আকাঙ্ক্ষাও মনে মনে পোষণ করি যে বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রাকে জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করে তুলবে। আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও কখনও কখনও বিজ্ঞানের সঠিক উদ্দেশ্য বিকৃত হয়, বিজ্ঞানের সুফল উপভোগ করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ।

১.২.১ অতীতের অনুসন্ধান প্রয়োজন কেন

আমাদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা কেমন করে দিতে পারি? *"ইতিহাস একেবারেই বাজে মাল"*।

একটা দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা যায় হেনরী ফোর্ডের বিখ্যাত উক্তি থেকে। ইতিহাস এভাবে দেখলে বলা যায়, পূর্ববর্তী জ্ঞানের যা কিছু কাজের তা সব বর্তমানে চালু জ্ঞানের মধ্যেই আছে। আর যা নেই তা ভুলে ভর্তি, তার প্রয়োজনও নেই। এই মতের অনুবর্তী হলে কিন্তু মূল প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে পূর্ববর্তী অংশের শেষের প্রশ্নটি নিয়েই ভাবা যাক। বিজ্ঞানকে যে আরও মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার জন্য আমরা কোনোভাবেই প্রতিরক্ষা গবেষণায় রত বিজ্ঞানীদের দায়ী করতে পারি না। বরং আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখা উচিত, কেমন করে সমাজের প্রভাবশালী

হেনরি ফোর্ড ছিলেন একজন বিখ্যাত আমেরিকান উদ্ভাবক ও শিল্পপতি। মোটরগাড়ি নির্মাণের বড় মাপের শিল্পস্থাপনে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

গোষ্ঠী নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে এসেছে। গোষ্ঠীজীবনেই হোক, কৃষিনির্ভর সমাজেই হোক অথবা শিল্পোন্নত দেশেই হোক, চিরকালই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ হয়েছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার একদিকে যেমন বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যদিকে আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে, বাজার দখল করতে, প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এ সবই কতকগুলি দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের উপকারে লেগেছে।

এই একই পদ্ধতিতে ওপরের সব প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে যাব। সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এইসব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস আলোচনা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানের পূর্ণ উপযোগিতা পাওয়ার জন্য বিজ্ঞান কীভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত তা ভালোভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের প্রভাবেই আমাদের সমগ্র সভ্যতার দ্রুতগতিতে রূপান্তর ঘটেছে। অতীতে বিজ্ঞানের প্রগতি ঘটত প্রতিনিয়ত, অগোচরে। আর এখন যে অতি দ্রুতলয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে তা সর্বজন পরিলক্ষিত। আমাদের জীবৎকালেই আমরা আমাদের সভ্যতার বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করছি আর বছরে বছরে তা আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের সভ্যতার বুননই যাচ্ছে পরিবর্তিত হয়ে, পরিবর্তিত হচ্ছে জীবনধারণের ধারণাও। এই পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য বিজ্ঞানের বর্তমান রূপ জানাই যথেষ্ট নয়। যুগে যুগে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে বিজ্ঞান কী পরিবর্তন সাধন করে আজকের অবস্থায় উন্নীত হল তাও জানতে হবে। তাহলেই একমাত্র বর্তমানকে বোঝা আর ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এক কথায় আমাদের বিজ্ঞানের ইতিহাস জানতে হবে। বিজ্ঞানের ইতিহাস কী সে প্রশ্নের উত্তর আমরা এবার দেব। তার আগে আপনি পরবর্তী অনুশীলনীটির জবাব খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন।

অনুশীলনী ১

১. নীচের বাক্যগুলি সত্য হলে তার পাশে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লিখুন।

(ক) বর্তমানে আমরা যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হই সেগুলির উত্তর খোঁজার সঠিক পদ্ধতি হ’ল অতীতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা। ☐

(খ) বিজ্ঞান ও আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বিষয়গুলি ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য আমাদের বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে। ☐

(গ) বিজ্ঞান ও সমাজ-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগের কোনো প্রয়োজন নেই। ☐

(ঘ) বিজ্ঞান সমাজের রূপান্তরে কীভাবে সাহায্য করছে তা বোঝার জন্য অতীতে সমাজ ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটেছে তার জ্ঞান প্রয়োজন। ☐

(ঙ) বর্তমানকে উপলব্ধি করা আর সর্বজনের কল্যাণে ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অতীতের অনুসন্ধান করতেই হবে। ☐

১.২.২ বিজ্ঞানের ইতিহাস কী

বিজ্ঞানের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সময়ানুক্রমিক নীরস বর্ণনা নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস হল সমাজ ও বিজ্ঞানের অবিরাম ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গল্প। এর উন্মেষ সভ্যতার প্রাক্কালে, তারপর যুগে যুগে সমাজ-রূপান্তরের বিভিন্ন ধাপে আজকের যুগ পর্যন্ত এর প্রসার ঘটেছে। (চিত্র ১.১)

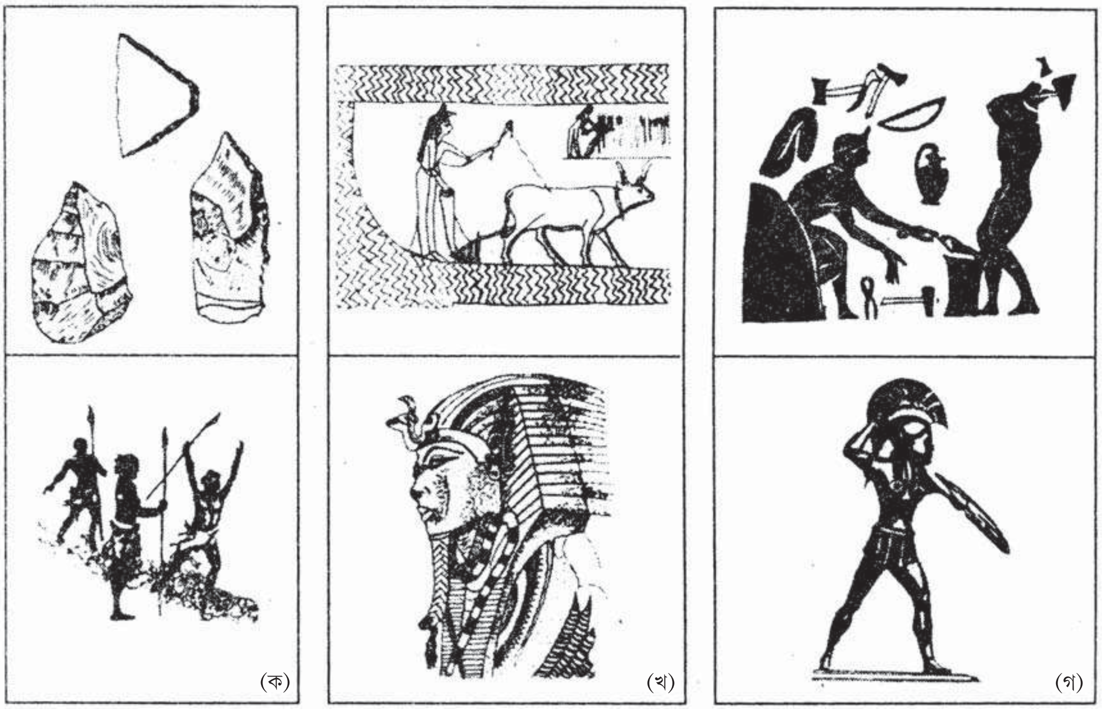

চিত্র ১.১ : তিন যুগের তিন বিভিন্ন সমাজ : প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগ।
(ক) আদিম মানুষ জীবনধারণের জন্য খাদ্য আহরণ ও শিকারের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তারা প্রধানত প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার ব্যবহার করত। কিছু প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার, আদিম মানুষ। (খ) ব্রোঞ্জযুগ কৃষিকর্ম ও ব্রোঞ্জনির্মিত হাতিয়ার দ্বারা চিহ্নিত। বলদ-চালিত লাঙল দ্বারা শস্য বোনা এবং কাস্তে দ্বারা শস্য কর্তন। একজন মিশরীয় ফারাও, তুতানখামেন, খ্রিস্টপূর্বাব্দ চতুর্দশ শতাব্দী। (গ) লৌহযুগ লোহার আবিষ্কার ও লৌহনির্মিত হাতিয়ার তৈরির জন্য উল্লেখযোগ্য। এ যুগ অবিরাম গোষ্ঠীযুদ্ধের জন্যও উল্লেখ্য। একজন দাস এক কর্মকারের বিপণিতে কর্মরত। গ্রীকরাষ্ট্রের এক যুদ্ধরত নাগরিক।

কোন্ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে, কোন্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে, কোন্ আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্ম হয়, এ তারই কাহিনী। এই সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের প্রভাব আরও সুস্থিত করার জন্য ব্যবহার করেছে। সমাজে একধরনের বদ্ধ অবস্থা এসেছে যখন সামাজিক প্রগতির গতিরুদ্ধ হয়েছে।

এই সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন ধারণার উন্মেষ হয়। কিন্তু সেগুলি সামাজিক পরিস্থিতির তুলনায় হয়তো বড় বেশি আধুনিক তাই সে পরিস্থিতি এইসব নতুন ধারণা গ্রহণ করার অনুকূলে থাকে না। পরবর্তী কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবার নতুন সামাজিক গোষ্ঠী ও শক্তির উদ্ভব হয়। অধিকাংশ সময়ে সমাজের নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীই এই নতুন গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। এই নতুন গোষ্ঠী নতুন ধারণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এই চাহিদার ফলে নতুন প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিয়ে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া নিরন্তর একই চক্রে ঘোরা নয়। সব সময়েই বিজ্ঞান নতুন সমাজকে গুণগতভাবে পূর্ববর্তী সমাজ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছে। তবে প্রতিটি নতুন স্তরে সৃষ্টি হয়েছে আরও জটিল সমস্যা ও সামাজিক সম্পর্কের, বিজ্ঞানের সামনে সমাধান করবার জন্য তুলে ধরেছে নতুন সমস্যা। এইভাবেই বয়ে চলেছে প্রগতির অন্তহীন প্রবাহ। সাধারণভাবে ওপরের আলোচনা সঠিক হলেও বাস্তবিক অবস্থায় এর প্রকারভেদ আছে। কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে বা সমাজে সাময়িকভাবে প্রগতির গতিরোধ কিন্তু সেই একই অঞ্চলে বা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে না। ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাবনা ও ধারণার আদানপ্রদান ক্রমাগত হয়েই চলে। অন্য অঞ্চলে হয়তো সেই সময়ে নতুন ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনের ভূমি প্রস্তুত থাকে। আবার কোনো সমাজে নির্দিষ্ট কোনো যুগে হয়তো পরিবর্তন আসে অতি ধীরে। আপনারা হয়তো ভাবছেন কেন এমন হয়? তা বুঝতে গেলে সেই নির্দিষ্ট সময়ে সেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে জানতে হবে। আবার সামগ্রিকভাবে সেই সময়ে বিশ্বপরিস্থিতিও পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়।

এইরকম এক পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাঠ নিতে চলেছি। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের বিজ্ঞান শুধুই কিছু প্রতিভাবান মানুষের বিচ্ছিন্ন সত্যানুসন্ধান নয়। এটা একটার পর একটা ইট সাজিয়ে

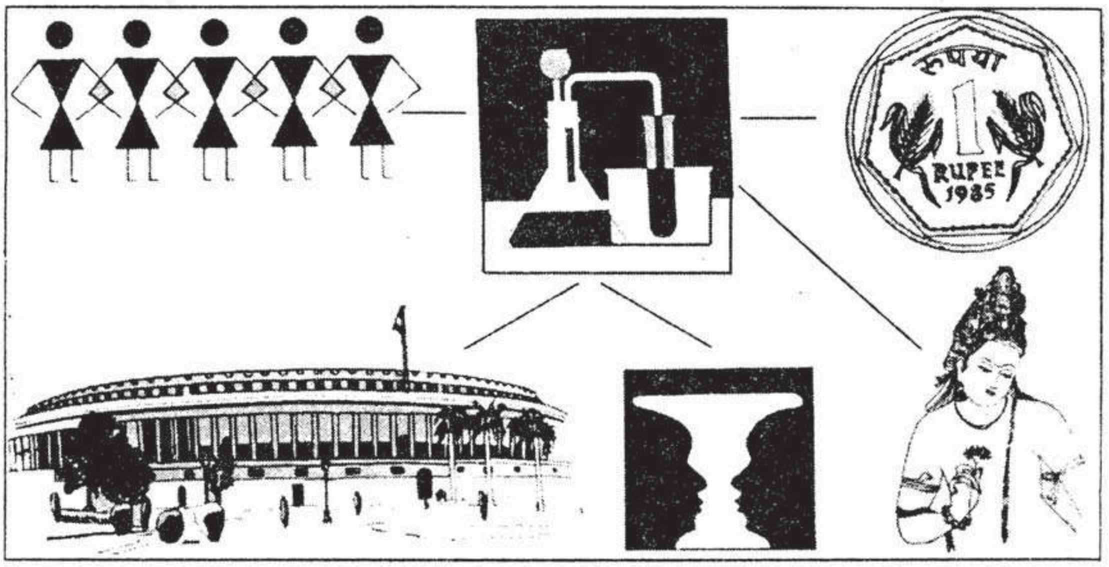

চিত্র ১.২ : বিজ্ঞান রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে।

তৈরি করা জমকালো কোনো স্মৃতিস্তম্ভও নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস মানবজীবনের ইতিহাস; মানব-সমাজের সমস্ত প্রচেষ্টা, সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস। তা সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো সবরকম শক্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ার কাহিনী (চিত্র ১.২)। অতীতের বিশ্লেষণেই একমাত্র বর্তমানকে বোঝা আর মানবজাতির কল্যাণে ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। (চিত্র ১.২ দ্রষ্টব্য)

অনুশীলনী ২

নীচের বক্তব্যগুলি বিজ্ঞান ও সমাজে কীভাবে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে তা বর্ণনা করে নীচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) 'প্রয়োজনই আবিষ্কারের জনক' বলতে বোঝায় কোনো সমাজে .... প্রয়োজনেই বৈজ্ঞানিক .... ঘটে।

(খ) প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী নিজেদের .... বজায় রাখতে ও .... করতে আবিষ্কারকে ব্যবহার করে।

(গ) প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্থায়ী এবং .... অবস্থা সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ করে এবং বিজ্ঞানও .... হয়।

(ঘ) .... ধারণা কখনও কখনও সামাজিক প্রয়োজনের অনেক পূর্বে আসে, তাই ব্যবহৃত হয় না, অথবা তাদের ব্যবহারের জন্য আর্থসামাজিক অবস্থার ....প্রয়োজন হয়।

আবিষ্কার, প্রভাব, শক্তিশালী, আর্থসামাজিক, গতিরুদ্ধ, নতুন, নিরাপদ, পরিবর্তন।

১.৩ বিজ্ঞানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য

আজ বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় বিজ্ঞান কিছু বিশেষজ্ঞ মানুষের সংগঠিত ক্রিয়াকর্ম। বিজ্ঞানের এই চরিত্র কিন্তু তিনশো বছরের বেশি পুরনো নয়। তার আগে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক করা যেত না। তা সাধারণ জ্ঞানচর্চারই অংশ ছিল। প্রাচীনকালে একজন দার্শনিক, শিল্পী, পুরোহিত অথবা যাদুকর একই সঙ্গে বিজ্ঞানীও হতে পারতেন। আজ অবশ্য বিজ্ঞান এক বহুমুখী কর্মকাণ্ড, এর নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার, সংগঠন, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানের নিজস্ব কর্মসূচী ও পদ্ধতিও রয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোচনায় প্রবেশের আগে আমাদের এই দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১.৩.১ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজ্ঞান

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান বহুশত নারী-পুরুষের সম্মিলিত, সংগঠিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। তাঁরা এমন সব সরঞ্জাম সহযোগে কর্মকাণ্ডে লিপ্ত যে সাধারণ মানুষের কাছে তা শুধু অবোধ্য নয় রহস্যময়ও বটে। তাঁরা জটিল সব গাণিতিক

সমস্যা সমাধান করেন আর এমন ভাষা ব্যবহার করেন যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। বিজ্ঞানীদের সাধারণভাবে সমাজের মধ্যে একটা আলাদা দল মনে করা হয়। বিজ্ঞানের এই সুসংগঠিত, বিশাল ও বিশেষ কর্মযজ্ঞ একে এক প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র দিয়েছে। চিত্র ১.৩-এ আমরা বিজ্ঞানীদের কাজকর্মের কিছু পরিচয় দেব।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হলেও বিজ্ঞান আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আরও বেশি করে নিজেদের সংকীর্ণ বিশেষীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই বিশেষীকরণ এত সীমাবদ্ধ যে এক ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীকুল অন্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদের বোঝার ক্ষমতাই রাখেন না। যেমন এমনও হয় কীট-পতঙ্গ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা সাপ, বানর অথবা কৃমির ওপর গবেষণার খবর রাখেন না।

বিজ্ঞানে বিশেষীকরণের অর্থ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কোনো বিষয়ে গভীর গবেষণা। কোনো কোনো বিশেষ সমস্যার তাই দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়। তবে এই অতি সংকীর্ণ বিশেষীকরণ ব্যাপক বৈজ্ঞানিক বোধের পরিপন্থী। এই বিশেষীকরণ কোনো বিজ্ঞানীকে এক ক্ষেত্রের প্রশ্নের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের সম্পর্ক নির্ধারণ করার মতো যথেষ্ট প্রজ্ঞা দেয় না। এভাবে জ্ঞানের প্রসার ব্যাহত হয়। এই ধরনের বিশেষীকরণ বিশেষ কতকগুলি শব্দ বা বাক্‌ধারার প্রবর্তন করে। এগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তাই সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারে বাধা পায়। এতে আবার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড গতিরুদ্ধ হয়ে কখনও আবার বিনাশের পথেও এগিয়ে যায়।

আমরা যদি বিজ্ঞানকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখি তাতে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও সামাজিক হওয়া উচিত। সমাজের সাধারণ অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থান ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র নির্ণয় করে। আবার বিশেষ সামাজিক ক্ষেত্র যেমন বাণিজ্য, অথবা বাজার, শিল্পবিকাশ, কৃষির উন্নতি, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নির্দিষ্ট সমস্যার যোগান দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সামরিক কার্যকলাপ সমস্ত ইতিহাস জুড়েই বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। এই লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ করে না, বরং বিজ্ঞানের ক্রিয়াকর্মের বিকৃতি ঘটায়। আধুনিক কালের বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের এই বিকৃত প্রয়োগের বিরোধিতা করছেন। সাম্প্রতিককালে মহাশূন্যে মারাত্মক অস্ত্র সংস্থাপনের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের বিরোধিতা এর এক উদাহরণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান হিসাবে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করে। বিজ্ঞানের পরিশ্রমের ফসল মানুষের কল্যাণেও কাজে লাগতে পারে অথবা তার অপব্যবহারও হতে পারে। এটা ইতিহাসের সেই বিশেষ সময় আর সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থের ওপর নির্ভর করে। যেমন, ব্যক্তিগত মুনাফা-নির্ভর সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদিত না হয়ে যেসব পণ্য থেকে মুনাফা আসবে সেগুলিই উৎপাদিত হয়। তাই এই সমাজে যদি যুদ্ধাস্ত্র বেশি লাভজনক হয় তাহলে রোগীর

প্রয়োজনীয় ঔষধাদি উৎপাদিত না হয়ে যুদ্ধাস্ত্রই নির্মিত হবে। আমাদের সকলেরই এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন।

চিত্র ১.৩ : বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সমাজ-সমস্যা সমাধানেও ব্যবহৃত হয় আবার ব্যক্তির কৌতূহল নিরসনেও সহায়ক হয়।
(ক) ASLV (Augmented Satellite Launch Vehicle) রকেটের উৎক্ষেপণ, (খ) ASLV উৎক্ষেপণের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ; (গ) একজন কৃষিবিজ্ঞানী কৃষকদের নতুন গমের উপযোগিতা বোঝাচ্ছেন; (ঘ) ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার পূর্বতন প্রধান প্রয়াত বিক্রম সারাভাই সহযোগী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিকল্পনা পর্যালোচনা করছেন; (ঙ) মুম্বাই-এর ট্রম্বেতে ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে বিজ্ঞানীরা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছেন; (চ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ একত্রে সংযোজিত হচ্ছে।

তাহলে শেষ বিশ্লেষণে আমরা সাধারণ মানুষেরাই বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন ও অর্থ নিরূপণ করার সর্বোচ্চ বিচারক। তাই বিজ্ঞান মুষ্টিমেয়র হাতে রহস্যাবৃত অবস্থায় থাকা উচিত নয়। বিজ্ঞানের পরিসর এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার কার্যকলাপ সকলকেই বুঝতে হবে। তখনই আমরা এই দাবিতে সোচ্চার হতে পারব যে, বিজ্ঞান সবার প্রয়োজনে এবং সকল মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হোক।

অনুশীলনী ৩

নীচের বক্তব্যগুলির সঠিকগুলিতে '✓' চিহ্ন দিন এবং ভ্রান্তগুলিতে '×' চিহ্ন দিন।

(ক) বিজ্ঞান একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায় :

(১) সারা পৃথিবীব্যাপী অনেক বিশাল বিশাল অট্টালিকায় বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। ☐

(২) অনেক মানুষ একসঙ্গে সম্মিলিতভাবে এবং সংগঠিতভাবে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। ☐

(খ) বিজ্ঞানে সংকীর্ণ বিশেষীকরণ বলতে বোঝায় :

(১) কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার গভীর অনুসন্ধান। ☐

(২) বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনেক পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানলাভ করতে পারেন। ☐

(৩) বৈজ্ঞানিক ধারণা সহজে প্রকাশ করার জন্য বোধগম্য ভাষার ব্যবহার। ☐

(৪) সাধারণ মানুষ নিজেদের উন্নতির প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুধাবন করতে এবং ব্যবহার করতে অক্ষম। ☐

১.৩.২ বিজ্ঞানের পদ্ধতি

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বিজ্ঞান এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর সারা পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষ সংগঠিতভাবে তাতে যুক্ত রয়েছেন। তাঁরা জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার মতো কিছু সামাজিক কর্তব্য করে যাচ্ছেন। এই কাজ করার জন্য তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাকেই ব্যাপক অর্থে **বিজ্ঞানের পদ্ধতি** বলা যায়। বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের এক জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকশিত এবং উন্নত হওয়ার পদ্ধতি ক্রমাগত উদ্ভাবিত হয়। বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র এক মননশীল চরিত্র দেওয়া যায় না। কারণ বাস্তবজীবনের ধূলিমলিনতা থেকে দূরে সরিয়ে, তাকে কায়িক বা শারীরিক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে শেষ পর্যন্ত তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনেকগুলি সংগঠনের সমষ্টি—কিছু কায়িক, কিছু মানসিক। **পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা** বিজ্ঞানের অপরিহার্য অংশ। সাধারণ মানুষ বা বিজ্ঞানী, প্রত্যেকেই আমরা নানা বস্তু ও ঘটনার পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে কী পর্যবেক্ষণ করা হবে বা কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে তা করা হবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিজ্ঞানীকে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত থাকতে হবে যে, তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজের মতামত বা ইচ্ছার ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক।

তবে কেবলমাত্র সুনিয়মিত পর্যবেক্ষণই ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। 'কেন' প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী জ্ঞান প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধানের একটি আনুমানিক **প্রকল্প** তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন পরীক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয় এই প্রকল্পের বাস্তব প্রমাণের অথবা এই প্রকল্প কোন্ কোন্ শর্তে কার্যকরী তা অনুসন্ধানের জন্য। এইভাবে আরও নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং তত্ত্বের উদ্ভাবন হয়। অবশ্যই সেই সূত্র বা তত্ত্বও অপরিবর্তনীয় নয়। নির্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে কিছু শর্তসাপেক্ষেই তা সত্য। এইসব সূত্রের বাস্তব প্রয়োগই তাদের সীমাবদ্ধতাকে দেখিয়ে দেয়। ফলে আবার নতুন প্রকল্পের জন্ম হয়। নতুন পরীক্ষার উদ্ভাবন ঘটে, তৈরি হয় নতুন সূত্র। বিজ্ঞানের এই ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বিজ্ঞানের এক সার্বজনীন পদ্ধতি।

বিজ্ঞানের কৌশল

এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের উপায় হিসাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহারের কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় কীভাবে? কেনই বা তার সমাধান করা প্রয়োজন? ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনই সমস্যা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, কোনো বিশেষ জলবায়ু বা মৃত্তিকায় সমস্ত মানুষের চাহিদা পূর্ণ করার মতো ফসল ফলানো, এইসব সমস্যার কথা বলা যায়। আবার ধনতান্ত্রিক সমাজে কোনো পণ্যের বাজার সৃষ্টি করার ইচ্ছাও এক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। অবশ্য ব্যক্তি- বিজ্ঞানীর সমস্যা হল তাঁর পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীর ক্রিয়াকর্মের স্বাভাবিক ও যুক্তিপূর্ণ প্রসারণ। আবার এটাও মনে রাখতে হবে কিছু কৌতূহলী মননশীল চিন্তাবিদের বিশ্বজগতের রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে। অতীতের কিছু মহান কালজয়ী বিজ্ঞানী যেমন নিউটন, ডারউইন এবং আইনস্টাইন এই শ্রেণীতে পড়েন।

অনুশীলনী ৪

(ক) প্রদত্ত শব্দগুলি দ্বারা নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করার জন্য সমস্যার উদ্ভব হয় সাধারণ সামাজিক এবং ....প্রয়োজনে। আমাদের কালে এ ধরনের কিছু সমস্যা হল .... অথবা .... যোগান। .... সম্বন্ধে ব্যক্তিগত .... থেকেও সমস্যার উদ্ভব হয়। কোনো .... বিজ্ঞানীর সমস্যা সমাধানের প্রয়াস অনেক সময়ই তাঁর .... বিজ্ঞানীদের ক্রিয়াকর্মের প্রসারণ।

(আবাসনের, বিশ্বজগৎ, পূর্ববর্তী, একক, পানীয় জল, অর্থনৈতিক, কৌতূহল।)

(খ) চিত্র ১.৪-এ আমরা বিজ্ঞানের পদ্ধতির বিভিন্ন অংশগুলি আলাদাভাবে দেখিয়েছি। আগের পাঠ অনুসরণ করে একটি খোপের সঙ্গে অন্য খোপের যুক্তিসঙ্গত পারম্পর্য নির্ণয় করুন ও তীর চিহ্ন ব্যবহার করে দেখান। প্রথম যোগসূত্রটি দেখানো আছে।

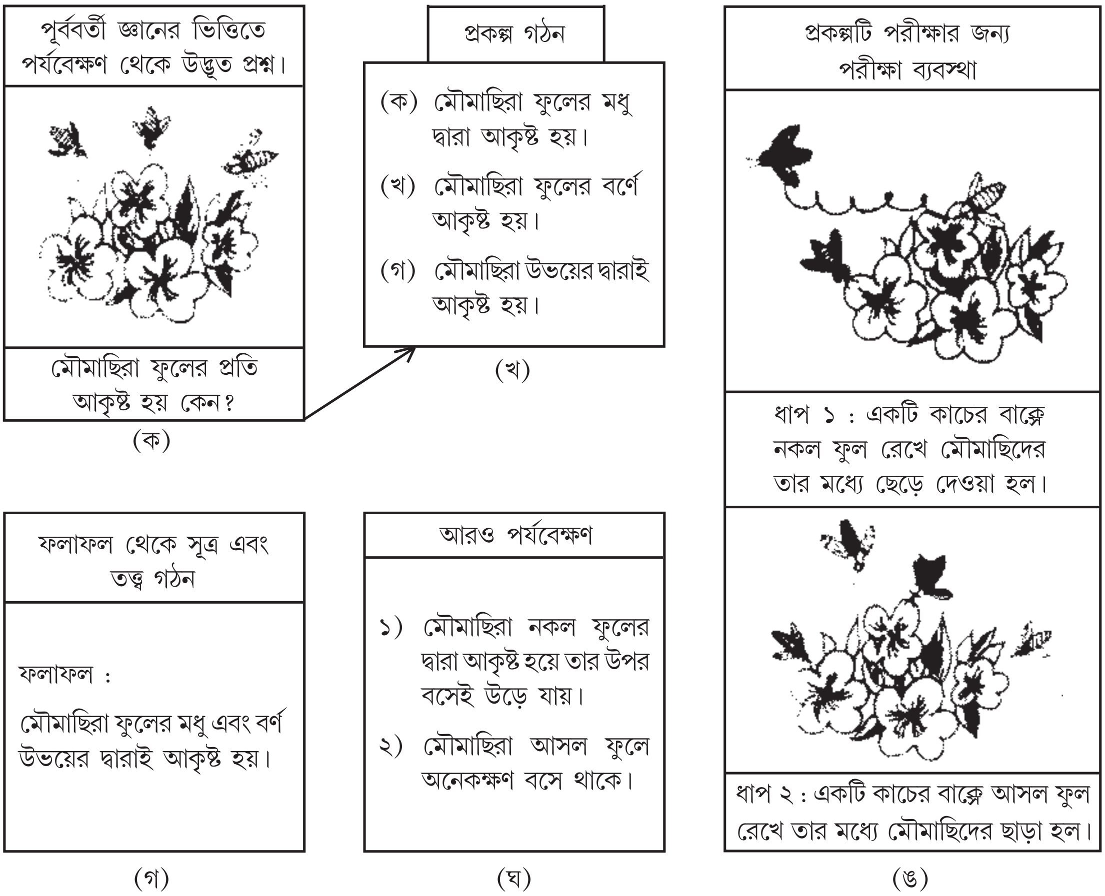

চিত্র ১.৪ : একটি উদাহরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যাখ্যা

১.৩.৩ বিজ্ঞানের ঐতিহ্য

বিজ্ঞানচর্চার একটি দিক আছে যা সমাজের অন্যান্য সফল উদ্যোগ থেকে ভিন্ন। বিজ্ঞানচর্চা সর্বদাই পরিপূর্ণরূপে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানচর্চার ওপর নির্ভরশীল। পূর্ববর্তী জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞানীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও পদ্ধতি নিষ্ফল। আবার পূর্ববর্তী জ্ঞানভাণ্ডারে কোনো সংযোজন ছাড়া একজন বৈজ্ঞানিক কর্মী বিজ্ঞানী নামের দাবি করতে পারেন না। বিজ্ঞানীরা সর্বদাই প্রচলিত সত্যকে রূপান্তরিত করে প্রকৃত সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যথা আইনজীবী, পুরোহিত ও প্রশাসক অর্থাৎ যাঁরা শুধু পূর্বলব্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেন বা ব্যবহার করেন তাঁদের থেকে বিজ্ঞানীদের কাজকর্ম একেবারেই আলাদা।

বিজ্ঞান হল ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের একীকরণ। যে-কোনো মুহূর্তে বিজ্ঞান পূর্ববর্তী সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাধনার একীকরণের চূড়ান্ত রূপ। কোনো ব্যক্তি-বৈজ্ঞানিকের অবদান সবসময়েই বিজ্ঞানের সামগ্রিক জ্ঞানের মধ্যেই বিলীন হয়। শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে বিগত দিনের ব্যক্তি-শিল্পীর সৃষ্টি সবসময়েই সমাদৃত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

অতীত যেহেতু বর্তমানের মধ্যেই বিলীন থাকে, সেইজন্য জ্ঞানের আধুনিকতম অবস্থাই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। যেমন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান বা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের মতো শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গীত আমরা আজও উপভোগ করি। সারা পৃথিবীর শিল্পপ্রেমিকরা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত 'মোনালিসা' চিত্রের প্রতিরূপ সংগ্রহ করেন। কালিদাস ও শেক্সপীয়ারের রচনা আজও পঠিত হয়। কিন্তু নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' বা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মূল গবেষণাপত্র পাঠ করতে আজ কেউই উৎসাহিত হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, আজকের যুগে তাঁদের ধারণাগুলি যেরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাই সবচেয়ে জরুরী।

ধর্ম এবং শিল্পের উপলব্ধিতে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অনুভূতির এক বড় ভূমিকা আছে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভাবাবেগের যথাসম্ভব ঊর্ধ্বে উঠে বিজ্ঞানকে এক নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেবার চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল কোনো স্থানে অথবা কালে, যে-কোনো ব্যক্তির দ্বারা যাচাই করে নেবার সুযোগ আছে। এটাই বিজ্ঞানকে তার শাশ্বত চরিত্র দিয়েছে।

বিজ্ঞানের সত্যতা কেবলমাত্র তার প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। বাস্তবজীবনে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে তার প্রয়োগেই বিজ্ঞানের চরম পরীক্ষা।

অনুশীলনী ৫

২নং স্তম্ভে যেসব বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তার কোন্‌গুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য ১নং স্তম্ভে অন্যান্য সামাজিক বিষয় যথা, আইন, ধর্ম, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলি যথোপযুক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করুন। উদাহরণ হিসাবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সেই সঙ্গে আইন ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১	২
(ক) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান	(১) ব্যক্তিগত মতামত ও অনুভূতির ভূমিকা নেই।
(খ) অন্য বিষয়, যেমন আইন	(২) যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
	(৩) অতীতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি সমাদৃত হয়।
(গ) ধর্ম	(৪) পূর্ববর্তী জ্ঞান ব্যবহৃত এবং ব্যাখ্যাও হয়।
(ঘ) শিল্প ও সঙ্গীত	(৫) পরিবর্তন-সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত কাজকর্ম।
	(৬) সাধারণ ধারায় মিশে যায়।
	(৭) নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়।
	(৮) যে-কোনো ব্যক্তির যে-কোনো স্থানে ফলাফলের সত্যতা যাচাই করে নেবার সুযোগ আছে।
	(৯) ব্যক্তিগত মতামত ও বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩.৪ বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা

এ পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনায় বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে, একটি কর্মপদ্ধতি হিসাবে এবং জ্ঞানের এক বর্ধিষ্ণু সদা-পরিবর্তনশীল ধারা হিসাবে দেখা গেল। এই আলোচনা অবশ্য অন্য অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। যেমন, আজকের দিনে বিজ্ঞানের মুখ্য ভূমিকা কী? সমাজ-বিকাশে বিজ্ঞানের প্রভাব কতখানি? কোন্ সামাজিক কারণ বিজ্ঞানের প্রগতিতে সহায়ক আর কোন্‌টিই বা বিজ্ঞানের বিকাশে বাধাস্বরূপ? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি আমরা এখন আলোচনা করব।

এই পাঠক্রমের অষ্টম একককে আপনি এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে পড়বেন।

বিজ্ঞান ও উৎপাদনের পন্থা

উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। মানবজাতির ইতিহাসই হল মূলত প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রূপান্তরিত করে তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা মানুষের বিভিন্ন প্রয়াস। এই প্রয়াসে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের পন্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে (চিত্র ১.৫ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগকে আমরা ঐ যুগে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে চিহ্নিত করব। যেমন প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগ ইত্যাদি। গত কয়েক শতাব্দীতে উৎপাদনের পদ্ধতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। তাই শিল্পযুগ নামেই একে অভিহিত করার রেওয়াজ। কোনো কোনো সময় অন্যভাবে আণবিক যুগ বা মহাকাশ যুগও (Space age) বলা হয়।

আদিম মানুষ এমন জিনিস সংগ্রহ করত এবং কোনো বস্তুকে এমন রূপ দেবার চেষ্টা করত যাতে সে সেটিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তার নিজের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। এইভাবেই বিভিন্ন প্রকৌশলের

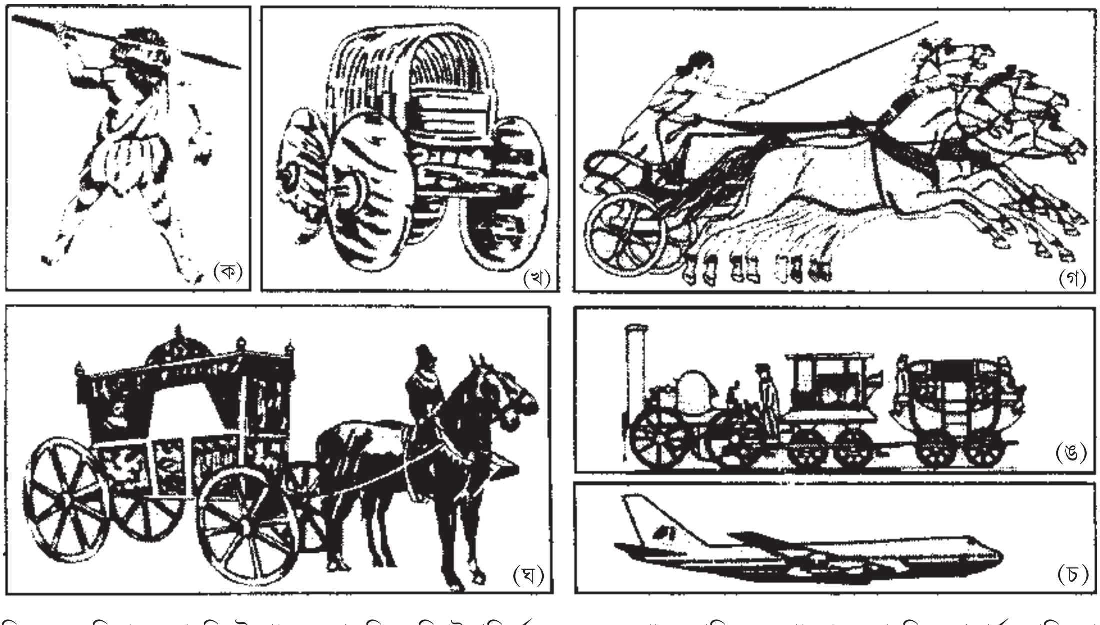

চিত্র ১.৫ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনের পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। এখানে আদিম অবস্থা থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

আবিষ্কার। পরবর্তী এককগুলিতে দেখবেন মানুষের প্রয়োজনে কেমনভাবে সমাজে প্রকৌশল এবং পরে বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে।

বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান বিভিন্ন সময়ে বিকশিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, যখনই কোনো সমাজে সংগঠিতভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী উৎপাদন করে সমাজের মানুষকে একধরনের পরিতৃপ্তি দেবার ভাবনাচিন্তা এসেছে, বিজ্ঞানের বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতি উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটায়। তবে যে-কোনো সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রা ও বৈচিত্র্যে একধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবেই। তাই, এই প্রক্রিয়ায় যখনই তৎকালীন উৎপাদন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে তখনই বিজ্ঞান থমকে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের অসম বণ্টন সমাজে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছে। বিজ্ঞানের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার এটাও একটা কারণ। তবে যেসব সমাজ নতুন চিন্তাভাবনা গ্রহণে আগ্রহী ছিল, সেগুলির অগ্রগতি ঘটেছে, বিজ্ঞানও সেখানে বিকাশলাভ করেছে। পরবর্তী এককগুলিতে আপনি দেখবেন যেখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের সংযোগ ঘটিয়েছেন সেখানেই বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। যেখানে চিকিৎসক, কারিগর, প্রযুক্তিবিদ্ ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত মানুষের সঙ্গে সমাজের মননশীল চিন্তাবিদ্‌দের সমস্তরে মেলামেশা ছিল সেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে।

বিজ্ঞানের প্রগতি শুধু যে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে তাই নয়; উৎপাদনের পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন সমাজেরও রূপান্তর ঘটায়। উদাহরণ হিসাবে, উৎপাদন যখন মূলত কৃষিনির্ভর ছিল, তখন মানুষ বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বসতি স্থাপন করে নিজ নিজ জীবনধারা অনুসরণ করে দিন কাটাত। কিন্তু কলকারখানা-নির্ভর শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পনগরীর গোড়াপত্তন হল। কারণ একই পেশায় বহু মানুষকে তখন একই জায়গায় নিযুক্ত করার প্রয়োজন হল। এদের জীবনযাত্রা ও গ্রামীণ জীবনযাত্রা অনেকটাই আগের থেকে পরিবর্তিত হল।

এই সমস্ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সমাজে অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সংঘাতে নতুন সামাজিক সংগঠন তৈরি হয়। ইউরোপে একসময় বড় বড় জমিদারদের নিজ নিজ এলাকা সংরক্ষণের ফলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবাধ গতিবিধি হচ্ছিল। এঁরা চাইছিলেন, বিস্তৃত ভৌগোলিক ক্ষেত্র জুড়ে একই আইন প্রযোজ্য হোক। ফলে সংঘাত দেখা দিল। সৃষ্টি হল নতুন সামাজিক বিন্যাস। একথা পৃথিবীর অন্যান্য ভৌগোলিক অঞ্চলের ক্ষেত্রেও সত্য। কয়েক শতক আগে বিজ্ঞান ও শিল্প সমানতালেই বিকাশলাভ করেছিল, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি ছিল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বিজ্ঞানকে অনুসরণ করেই শিল্পে অগ্রগতি ঘটে।

বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শ

ওপরের আলোচনায় আমরা বলেছি যে বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। তবে শুধুমাত্র বাস্তব প্রয়োগ নয়, তত্ত্ব ও ধারণা বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের তত্ত্ব তার সফল প্রয়োগগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করে যাতে সেগুলিকে একসঙ্গে বোঝা সম্ভব হয়। আমরা পরবর্তী অংশে দেখব যখনই কোনো তত্ত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তখনই বিজ্ঞানের এক-একটি বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে। বিজ্ঞানে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এমনও হয়েছে যে, সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যবস্থার অভাবে ইতিহাসের কোনো যুগে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে নেহাত পোশাকী ও যান্ত্রিক মনে হয়েছে। আবার, পরবর্তী কোনো যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সেই একই ধারণার সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ ধারণা তখন হয় সংশোধিত নয় তো বর্জিত হয়েছে এবং এইভাবে বিজ্ঞান একধাপ এগিয়ে গেছে। এও দেখা গেছে যে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ কতটা হতে পারে তা সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যেমন, জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশের সামাজিক পরিস্থিতি এর প্রয়োগের অনুকূল নয়। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদনে প্রচুর উন্নতির সহায়ক হলেও যেসব অঞ্চলে কৃষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিক সেখানে তাঁরা যন্ত্রের ব্যবহারে সমর্থ হন না।

একইরকমভাবে যে সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন তার সাধারণ চিন্তাধারা বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবিত তত্ত্বকে প্রভাবিত করে। এমনও হয় যে, যে তত্ত্ব সমাজের জ্ঞানীগুণীদের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় তা সর্বজনস্বীকৃত হলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। নতুন আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে যে নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন হয় তা প্রচলিত ধ্যানধারণার থেকে একেবারে আলাদা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই-এর মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, যার ফলে অতীতে বিজ্ঞানীদের বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন করা হয়েছে এমনকি শাস্তিবিধানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীণের সাহায্যে দেখতে পেলেন ও অন্যদের দেখালেন যে, বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলি গ্রহটির চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁর প্রস্তাব—'পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে—ছিল এরই অনুরূপ। তিনি এও দেখালেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে পাহাড়, পর্বত এবং উপত্যকা রয়েছে। কিন্তু তৎকালীন ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এবং ঈশ্বর চন্দ্রকে নিটোল গোলাকার করে সৃষ্টি করেছেন। নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন।

তৎসত্ত্বেও, ইতিহাসের ধারা আমাদের দেখায় যে, কিছু ছোটখাটো ব্যতিক্রম বাদ দিলে বিজ্ঞানে নতুন মতবাদ শেষ পর্যন্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে সমাজে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। এটা যে শুধু বিজ্ঞানকেই অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধ্যানধারণাকেও প্রভাবিত করেছে।

অনুশীলনী ৬

(ক) নীচের খালি জায়গায় তিন-চার লাইনের মধ্যে সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি কীভাবে বিজ্ঞানের বিকাশ দ্বারা প্রভাবিত হয় তার দুটি উপায় বর্ণনা করুন।

....

....

....

(খ) প্রদত্ত শব্দগুলি ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও মতাদর্শ সম্পর্কে নীচে বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

বিজ্ঞানের বিকাশে মতাদর্শ এবং .... গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের প্রমাণ অথবা .... বিজ্ঞানে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বিভিন্ন তত্ত্ব সমাজের সাধারণ .... পরিমণ্ডল দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রচলিত ধারণা অপেক্ষা বৈপ্লবিকভাবে .... তত্ত্ব উদ্ভাবিত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে তারা গ্রহণীয় হয় না কারণ সেগুলি .... তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয় না। তবে সেগুলি গ্রহণীয় হয়ে উঠলে বিজ্ঞানে বিরাট .... হয়। এগুলি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ...., সেই সঙ্গে মননশীল ....-কে সাধারণভাবে প্রভাবিত করে।

(চিন্তাভাবনা, খণ্ডন, অগ্রগতি, ভিন্ন, বৌদ্ধিক, প্রচলিত, ধারণা, বিশ্বাস।)

দেখা যাচ্ছে, সমাজে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরম্পরা এবং প্রচলিত চিন্তাভাবনার ওপর বিজ্ঞানের বিকাশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের পরিপার্শ্ব থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার নতুন আলোকে আমাদের ক্রমাগতই এই ঐতিহ্যকে বারবার ভেঙে নতুন রূপ দিতে হবে।

এখন এই অংশে আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম, তার সারমর্ম অনুধাবন করা যাক।

★ আমরা দেখলাম বিজ্ঞান একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

★ সামাজিক প্রয়োজনে অথবা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত কৌতূহলে বা যে-কোনো কারণে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের এক নিজস্ব পদ্ধতি আছে।

★ বিজ্ঞানে ক্রমপুঞ্জিত জ্ঞানের এক ঐতিহ্য আছে। পুরানো জ্ঞানভাণ্ডার নতুন জ্ঞান আহরণের ভূমি প্রস্তুত করে এবং নতুন জ্ঞানভাণ্ডারে বিলীন হয়।

★ যে-কোনো সমাজে বিজ্ঞানের কতকগুলি বিশেষ ভূমিকা আছে। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং সংরক্ষণে বিজ্ঞান একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

★ সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা দ্বারা বিজ্ঞানচর্চা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সমাজে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনে।

★ বিজ্ঞানে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই যে সমাজে কর্মী এবং চিন্তাশীল মানুষজন পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশায় এবং চিন্তাভাবনার আদান-প্রদানে অভ্যস্ত সেখানেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্ব যেমন, তত্ত্ব ছাড়া প্রয়োগও তেমনই নিষ্ফল।

বিজ্ঞানের যে ধর্মগুলি ওপরে উপস্থাপিত হল তার প্রতিটি থেকেই বিষয় সুস্পষ্ট যে আমরা বিজ্ঞানকে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি। আমরা বিজ্ঞানকে মানবজাতির ঐতিহ্যের স্বাভাবিক অংশ বলে মনে করছি। এই মহান ঐতিহ্যকে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে, এই ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞানকেও বোঝা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বিজ্ঞানের প্রবহমান ধারাকে তার জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনুসরণ করব। এই কাহিনী যত এগিয়ে চলবে ততই এই অংশে বর্ণিত বিভিন্ন আপাত-বিমূর্ত ধারণাগুলি আপনার কাছে স্বচ্ছ এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

১.৪ সারাংশ

এই এককে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের কীর্তির এক অভিন্ন অংশরূপে দেখার চেষ্টা করেছি। এ পর্যন্ত আমরা পড়লাম যে :

★ যদি আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত কোনো প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চাই তাহলে আমাদের বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আধুনিককালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধরনকে বুঝতে হলে আর এগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশ সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসের জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন।

★ বিজ্ঞানের ইতিহাস শুধু কিছু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাজের বিবরণ আর মুখস্থ করার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাল তারিখ নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। বিজ্ঞান কীভাবে সমাজের অভিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে, কেমন করে বিজ্ঞানের বিকাশ মানবসমাজের বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এ তারই কাহিনী। পরিবর্তিত বস্তুগত অবস্থান সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সমাজকে নিয়ে গেছে উন্নততর পর্যায়ে। উন্নততর এই অবস্থান আবার বিজ্ঞানের সামনে আরও জটিল ও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এইভাবে সমাজ ও বিজ্ঞান একে অন্যের সাহায্যে বিকশিত হয়েছে।

★ আধুনিক সমাজে বিজ্ঞানকে নিজস্ব পদ্ধতি ও ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা যায়। তত্ত্ব আর প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিকাশে অতি নিবিড়ভাবে যুক্ত।

★ কোনো নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞান উৎপাদনের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞান যে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাই নয় উৎপাদনের পদ্ধতিকেও উন্নত করে।

★ বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত তত্ত্ব এবং ভাবনা আবার সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

আবার অন্যদিকে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস আর চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনে।

১.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে সঠিকভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের বর্ণনা দেয়? সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন। বিজ্ঞানের ইতিহাস হল :

(ক) বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির সময়ানুক্রমিক বর্ণনা।

(খ) বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন অবদানের বিবরণ।

(গ) বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়াবিক্রিয়ার এবং কেমন করে একে অন্যকে প্রভাবিত এবং রূপান্তরিত করে তার কাহিনী।

(ঘ) বিভিন্ন যুগে বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিখ্যাত উদ্ভাবন ঘটেছে তার সাধারণ বিবরণ।

(২) নীচের খালি জায়গায় চার-পাঁচ লাইনে নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(ক) কোনো নির্দিষ্ট সমাজে

(১) কোন্ কোন্ বিষয় সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে?

....

....

....

....

....

(২) কর্মকাণ্ডের কোন্ কোন্ ক্ষেত্র নির্দিষ্টভাবে বিজ্ঞানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে?

....

....

....

....

....

(খ) বিজ্ঞানের ফল মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হবে নাকি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হবে তা কীসের ওপর নির্ভরশীল?

....

....

....

....

....

(গ) সমাজে কার দ্বারা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হওয়া উচিত?

....

....

....

....

....

(৩) নীচের বাক্যগুলিতে কিছু সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হল। এর মধ্যে কোন্‌গুলি বিজ্ঞানের প্রগতিতে সহায়ক আর কোন্‌গুলি বিজ্ঞানের প্রগতিতে বাধাস্বরূপ? যেগুলি সহায়ক তার পাশে ‘স’ এবং যেগুলি বাধাস্বরূপ তার পাশে ‘ব’ লিখুন।

(ক) সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর উদ্ভব যারা নিজেদের স্বার্থে স্থিতিশীল সামাজিক পরিস্থিতি রক্ষায় প্রয়াসী।

(খ) সামাজিক পরিস্থিতি এমন যে পণ্য উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে আর সমাজের সদস্যরা মোটামুটিভাবে খুশী।

(গ) সমাজে বিজ্ঞানের সুফলের অসম বণ্টন।

(ঘ) পরিমাণগতভাবে এবং গুণগতভাবে সমাজে পণ্য উৎপাদন সীমিত রয়েছে। পণ্য উৎপাদনে একধরনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো গেছে।

(ঙ) সমাজ নতুন চিন্তাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে আর উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

(চ) যাঁরা শুধু দৈহিক পরিশ্রম করেন আর যাঁরা বৌদ্ধিক কাজকর্মে যুক্ত, উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করেন, এই দুই গোষ্ঠীর মানুষকে একইরকম মর্যাদা দেওয়া হয়।

১.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী (১) (ক) স, (খ) মি, (গ) মি, (ঘ) স, (ঙ) স

(২) (ক) আর্থসামাজিক, আবিষ্কার

(খ) প্রভাব, শক্তিশালী

(গ) নিরাপদ, গতিরুদ্ধ

(ঘ) নতুন, পরিবর্তন

(৩) (ক) (১) ×, (২) ✓

(খ) (১) ✓, (২) ×, (৩) ✓, (৪) ✓

(৪) (ক) অর্থনৈতিক, পানীয় জল, আবাসনের, বিশ্বজগৎ, কৌতূহল, ব্যক্তি, পূর্ববর্তী

(খ) ক → খ → ঙ → ঘ → গ → ক

(৫) (ক) ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮

(খ) ১, ২, ৪

(গ) ৪, ৯

(ঘ) ৩, ৪, ৯

সমাজ বিজ্ঞানের বিকাশ

(৬) (ক) (১) উৎপাদন বৃদ্ধি করে

(২) আধুনিক যুগে বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি করেছে।

(খ) ধারণা, খণ্ডন, বৌদ্ধিক, ভিন্ন, প্রচলিত, অগ্রগতি, বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) (গ)

(২) (১) কোনো সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা ও প্রচলিত চিন্তাধারাই মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের নিয়ামক। যেমন কোনো সমাজে যদি প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত হয় তাহলে বিজ্ঞান সেই সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই ব্যবহৃত হবে। আবার কোনো বাজার-অর্থনীতির সামাজিক অবস্থায় বিজ্ঞানকে মুনাফা বৃদ্ধি করার কাজে নিয়োগ করা হবে। উন্নত যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, সৌখিন ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মতো ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা বর্তমান ভারতীয় সামাজিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

(২) নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, যেমন, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্রায়ণ ও ব্যবস্থাপন, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ, সামরিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।

(খ) সমাজে প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং তাদের স্বার্থের ওপরই নির্ভর করে বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার হবে নাকি অপব্যবহার হবে। ঠিক কোন্ বিশেষ সময়ে ঐ সমাজের অবস্থান, এটা তার উপরও নির্ভর করে।

(গ) বিজ্ঞান সমাজে কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কেমনভাবে ব্যবহৃত হবে তা আমাদের মতো বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষেরই স্থির করা উচিত। যেমন, আমাদের মতো সামাজিক অবস্থায় বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র উপগ্রহ নির্মাণ এবং উৎক্ষেপণ, আণবিক চুল্লী তৈরি অথবা দক্ষিণমেরু অভিযানের আয়োজনে ব্যবহার না করে প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজেও লাগানো উচিত। এগুলির মধ্যে আছে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান, খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, সুপরিবহণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের বিস্তার।

(৩) (ক) ব, (খ) স, (গ) ব, (ঘ) ব, (ঙ) স, (চ) স।

একক ২ □ প্রাচীন পৃথিবীতে বিজ্ঞান

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

২.২ আদিম মানবসমাজ

২.২.১ খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার

২.২.২ আদিম জীবনযাত্রার বস্তুগত ভিত্তি

২.২.৩ আদিম জীবনযাত্রার সামাজিক ভিত্তি

২.২.৪ বিজ্ঞানের সূচনা

২.২.৫ প্রস্তরযুগের পরিসমাপ্তি

২.৩ কৃষি ও সভ্যতা

২.৩.১ কৃষিকাজ ও সভ্যতার সূচনা

২.৩.২ ব্রোঞ্জ যুগে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

২.৩.৩ সিন্ধু সভ্যতা

২.৩.৪ ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার পতন

২.৪ সারাংশ

২.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

২.৬ উত্তরমালা

২.১ প্রস্তাবনা

প্রথম পর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে কী বোঝাতে চাই, বা কেন আমাদের বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের রূপ কী। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর নিজস্ব পদ্ধতি এবং রীতিনীতি আছে। বিজ্ঞানচেতনার ধারাবাহিকতার কিছু নির্দিষ্ট চরিত্র আছে। খুব সাধারণভাবে হলেও আমরা তাত্ত্বিক স্তরে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যের বিক্রিয়াকে

বুঝতে চেষ্টা করেছি। এখন দেখা যাক বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান কীভাবে বিকাশলাভ করে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে।

বিজ্ঞানের সূচনা কীভাবে হল, সেখান থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের। কাজটা বলা সহজ, করা কঠিন কারণ, যত অতীতে যাওয়া হবে ততই সেই সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানা কঠিনতর হবে। যেসব সূত্র আমাদের সে যুগের বিজ্ঞানের কথা জানাতে পারে সেগুলি মানুষের শিল্পকলা এবং প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের আড়ালে লুকিয়ে আছে। আমাদের সেগুলির অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এজন্য সে যুগের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন থেকেই প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসকে উদ্ধার করতে হবে।

ঐতিহাসিকরা প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রা, সামাজিক গঠন, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের ওপর গবেষণা করেছেন। তাঁরা সেই সময়কার জীবনযাত্রার রূপ পুনর্গঠনের জন্য বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং লিখিত পুঁথি পেয়েছেন। সেইসব নিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তথ্যমতে আমরা বিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস তৈরি করব এবং দেখব কীভাবে প্রাচীন মানব-সভ্যতায় এর উন্মেষ ও অগ্রগতি হয়েছে। এই কাহিনী পড়বার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, এ কোনো কাল্পনিক গল্প নয়।

যে সমস্ত বিষয় এখানে উল্লিখিত হয়েছে—প্রত্যেকটির দৃঢ় ভিত্তি আছে। যদি নতুনতর কোনো তথ্য এসে হাজির হয় তবে এ কাহিনী পরিবর্তিতও হতে পারে।

এই এককে আমরা আদিম মানবসমাজের রূপ দেখব, পরবর্তীকালে যার থেকে বিজ্ঞানের জন্ম। আমরা দেখব কীভাবে আদিম সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তর বিজ্ঞানের জন্ম ও অগ্রগতির সূচনা করেছে। আদিম মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। এজন্য এই যুগকে বলা হয় 'প্রস্তর-যুগ'। কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা হল অপর এক যুগের, যাকে আমরা বলি 'ব্রোঞ্জযুগ'। সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ঘটনাবলীরও আমরা আলোচনা করব। তৃতীয় এককে আলোচিত হবে পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগ, 'লৌহযুগ'।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পড়লে আপনি যা যা করতে পারেন তা হল :

- আদিম সমাজের যেসব রীতিনীতি, কারিগরী ও আচার-ব্যবহার বিজ্ঞানের সূচনায় সাহায্য করেছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করা।
- প্রাচীন সভ্যতা থেকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় উত্তরণের ফলে কীভাবে বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করা।
- নগরায়ণ, নগরগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন কীভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের উন্মেষ ঘটিয়েছে তা বর্ণনা করা।

- এছাড়া আপনি যেসব সামাজিক পরিবর্তন ব্রোঞ্জযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছিল সেগুলির রূপরেখা দিতে পারবেন।

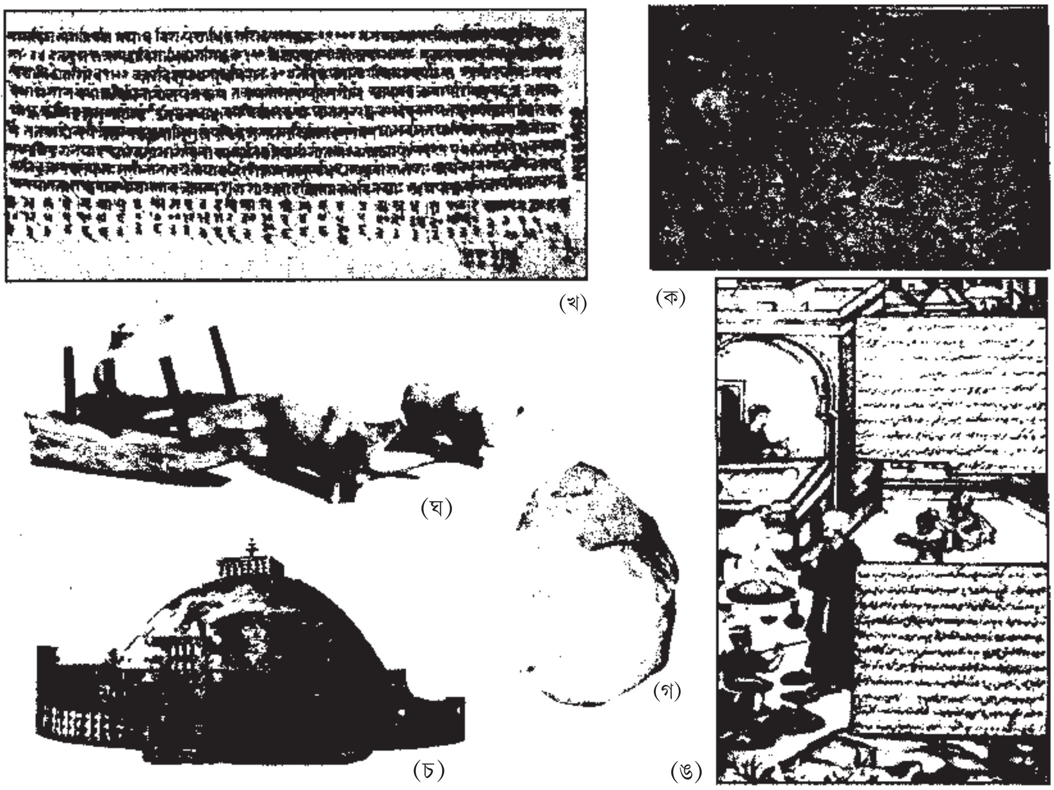

চিত্র ২.১ : একটি সমাজের সময় এবং জীবন অনুধাবন করার জন্য কিছু ঐতিহাসিক সূত্র : (ক) সম্রাট অশোকের সময়ের শিলালিপি (খ) ৪০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে পুনর্লিখিত সূর্যসিদ্ধান্ত; (গ) প্রস্তর কুঠার; (ঘ) মহেঞ্জোদাড়োর খেলনা-গাড়ি; (ঙ) সাঁচীস্তূপ; (চ) মোগল যুগের ক্ষুদ্রচিত্র।

২.২ আদিম মানবসমাজ

এবার কাহিনী শুরু করা যাক। বিজ্ঞানের উন্মেষের কথা জানতে আমাদের মানবসমাজের প্রথম সূত্রপাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। মানব-অস্তিত্বের প্রাথমিক অবস্থায় তা শুধু খাদ্যসংগ্রহ আর শিকারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত।

চিত্র ২.২ : শিকার ছিল সম্পূর্ণ দলগত প্রচেষ্টা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের অঙ্কিত গুহাচিত্র।

২.২.১ খাদ্যসংগ্রহ ও শিকার

জীবনধারণের তাগিদে মানুষকে খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে প্রতিকূল আবহাওয়া ও হিংস্র পশুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়েছে। উভয় প্রয়োজনের জন্যেই দলবদ্ধভাবে বসবাস যে সুবিধের, মানুষ তা বুঝেছিল। যেখানে মানুষ বাস করেছে, সে অঞ্চলেই সে গাছপালার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে, খাদ্যের জন্য মাটি খুঁড়েছে কন্দজাতীয় খাবারের খোঁজে। এই করতে গিয়ে সে কোন্ বস্তু আহারের উপযুক্ত এবং কোথায় তা পাওয়া সম্ভব বুঝতে শিখেছে। শিখেছে কোন্ কোন্ প্রাণী বিপজ্জনক, কোন্‌গুলি নয় এবং শিখেছে কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। পুরুষানুক্রমে এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়েছে যাতে গোষ্ঠীর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে একটা গাছের ডাল বা একটা টুকরো পাথর হাতে তুলে নিয়ে দেখেছে এর সাহায্যে তার পক্ষে গাছের উঁচু ডালের ফল আহরণে সুবিধা হচ্ছে, সুবিধা হচ্ছে মাটি খুঁড়তে, জন্তু-জানোয়ার মারতে এবং আত্মরক্ষা করতে। সময়ের সাথে সাথে সে এইসব আদ্যিকালের যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ারকে উন্নততর রূপ দিতে শিখল। নিয়মিত হাতিয়ার তৈরির পদ্ধতিও চালু হল। এই বিশেষ কারিগরীজ্ঞান, যন্ত্রপাতি প্রকৌশলের রূপে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হল। প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ খাদ্যসংগ্রহ এবং শিকারে যেত দলবদ্ধভাবে। খাদ্যবস্তু যেহেতু সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব ছিল না সেজন্যে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতে হত। এর জন্য তাদের বাড়তি খাবার ভাগাভাগি করে নিতে হত।

ভাগাভাগি করে দেবার প্রবণতা একসময়ে সামাজিক দায়বদ্ধতায় পর্যবসিত হল। বিশেষ করে এটা খুব সাধারণ অভিজ্ঞতাতেই দেখা যেতে লাগল যে, যত বেশি সংখ্যায় মানুষ একসঙ্গে শিকার করতে বা খাদ্যসংগ্রহ করতে যায়, সংগৃহীত খাদ্যের পরিমাণ তত বেশি হয়। সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এর ফলে ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী তাদের বিশেষত্ব, তাদের পছন্দের খাবার ইত্যাদিকে প্রতীক করে তৈরি হতে শুরু করল। এই প্রতীকই হল 'টোটেম'। কোনো একটি গোষ্ঠী কত বড় হবে তা

খাদ্যের মোট যোগান এবং পরিবেশের ওপর নির্ভর করত। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রস্তরযুগের জনসংখ্যা সম্ভবত প্রতি পঁচিশ বর্গ কিলোমিটারে একজনের বেশি ছিল না।

বিজ্ঞানীরা সাধারণত প্রাচীন মানব-সমাজ, বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান করেন প্রত্ন-অঞ্চলগুলির মাটি খুঁড়ে। এই বিজ্ঞানীদের বলা হয় পুরাতত্ত্ববিদ্। প্রাপ্ত হস্তশিল্প, পশু ও উদ্ভিজ্জের অবশেষ, প্রাচীন স্থাপত্য ইত্যাদি থেকে পাওয়া তথ্যাবলী পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এবং প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনে তাঁদের সাহায্য করে। এইসব উৎখননে পাওয়া জিনিসগুলি রক্ষিত হয় জাদুঘরে, যেখানে যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সেগুলিকে গিয়ে দেখতে পারেন।

খাদ্যসংগ্রহে ঘোরাফেরার সময় এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক গোষ্ঠীর দেখা হত। এ সময়ে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উপহার হিসাবে কিছু বস্তুর বিনিময় ঘটত। দু'টি আলাদা ধরনের খাদ্যসংগ্রহকারী গোষ্ঠীর মধ্যে উপহার বিনিময়ের ফলে উৎকৃষ্ট এবং রকমারি খাদ্যের স্বাদ পাওয়া, উন্নততর অস্ত্র তৈরি এবং প্রয়োগ কৌশল শেখা ইত্যাদি সম্ভব হয়ে উঠল। প্রথম দিকে খাদ্য বিনিময় বা উপহার বিনিময় ছিল বিশেষ উৎসব। এইসব উৎসবের ফলে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি তৈরি হল এবং সেই সঙ্গে শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির উন্মেষ ঘটতে থাকল। এই ধরনের আদান-প্রদান এবং ভাগাভাগির জন্য মৌখিক যোগাযোগের প্রয়োজন হত যার সাহায্যে পরিমাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে মতামত দেওয়া নেওয়া সম্ভব হত। এরকম প্রয়োজনের কারণে গড়ে ওঠে ভাষা। সমাজকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হতে এবং সঞ্চিত জ্ঞান এবং কৃষ্টি বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত করতে ভাষাই সাহায্য করেছে।

এ পর্যন্ত আমরা আদিম মানবসমাজের একটি সাধারণ রূপরেখা আঁকতে পেরেছি। বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যাবে। আমরা এবার নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দেব, যেমন কী ধরনের হাতিয়ার এবং পরিধেয় প্রাচীন মানুষ ব্যবহার করত, কীভাবে খাদ্য তৈরির জন্য আগুন ব্যবহার করতে শুরু করল ইত্যাদি। সবকিছু মিলিয়েই ছিল আদিম জীবনযাত্রার বস্তুগত ভিত্তি।

২.২.২ আদিম জীবনযাত্রার বস্তুগত ভিত্তি

প্রাচীন সমাজে মানুষ প্রাণীশিকার, খাদ্যসংগ্রহ, পরিবহণ এমনকি খাদ্য প্রস্তুতির জন্যও বিভিন্ন হাতিয়ারের সৃষ্টি করেছিল। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাকে গুহার আশ্রয় এবং পরিচ্ছদের কথা ভাবতে হয়েছিল। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া বিভিন্ন অস্ত্র এবং হস্তশিল্পই প্রাচীন জীবনযাত্রাকে প্রতিফলিত করে। এইসব হাতিয়ার তৈরি হয়েছে পাথর থেকে। এই কারণেই এই যুগকে বলা হয় 'প্রস্তরযুগ'।

বিভিন্ন হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি

মাটি খোঁড়া বা ছুঁড়ে মারা বা ছাল ছাড়াবার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে পাথরগুলিকে ঘষে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হত। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এক-একটা সময়ে সেগুলির আকার এবং আকৃতি নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এইসব মাপ এবং আকৃতি এমনই স্থায়িত্বে পৌঁছেছিল যে, আজও কিছু কিছু প্রাচীন উপজাতির মধ্যে ঠিক সেই ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চিত্র ২.৩-এ প্রদর্শিত প্রাচীন যুগের

এইসব হাতিয়ারের সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত মাটি খোঁড়ার, শিকার করার ইত্যাদি হাতিয়ারের অনায়াসেই তুলনা করে দেখতে পারেন। সেই যুগের পর আমরা কী অনেকটাই অগ্রসর হইনি?

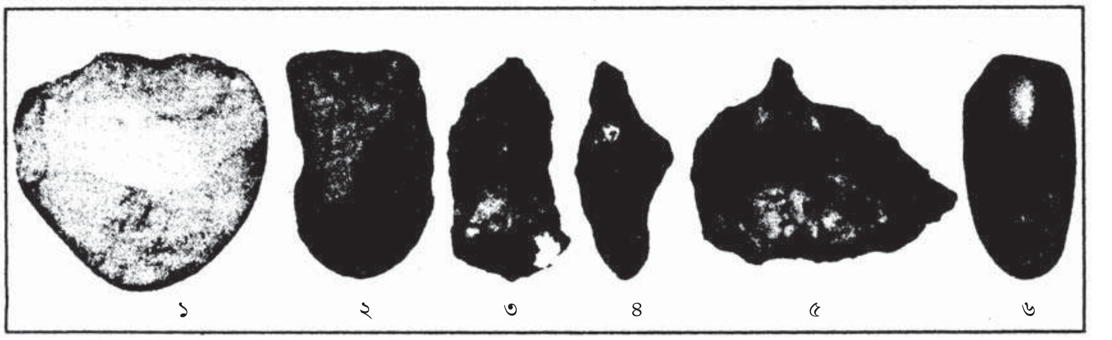

[চিত্র ২.৩ : প্রাচীন মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু হাতিয়ার (১) ছুরি—প্রায় লক্ষ বছরের পুরনো (২) গাছকাটার কুড়ুল—প্রায় লক্ষ বছরের পুরনো। (৩) ছুরি (৪) তীরের ফলা এবং (৫) সেলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার—আনুমানিক ৬০,০০০ থেকে ২৫,০০০ বছরের পুরনো। (৬) গাছকাটার জন্য ব্যবহৃত পালিশ করা পাথর, ৪,০০০ বছরের পুরনো।]

এখানে একটা বিষয় মনে রাখা উচিত যে, কোনো নির্দিষ্ট অস্ত্রকে বাস্তবে রূপ দেবার আগে প্রস্তুতকারকের মনে জিনিসটি সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায়—বর্তমানে কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তেমনই সে সময় কোনো বড় আকারের পাথর কেটে হাতিয়ার তৈরি করা হত। এটা ভালোভাবে বোঝার জন্য চিত্র ২.৪ দেখুন। এটা সচেতনপূর্ব-

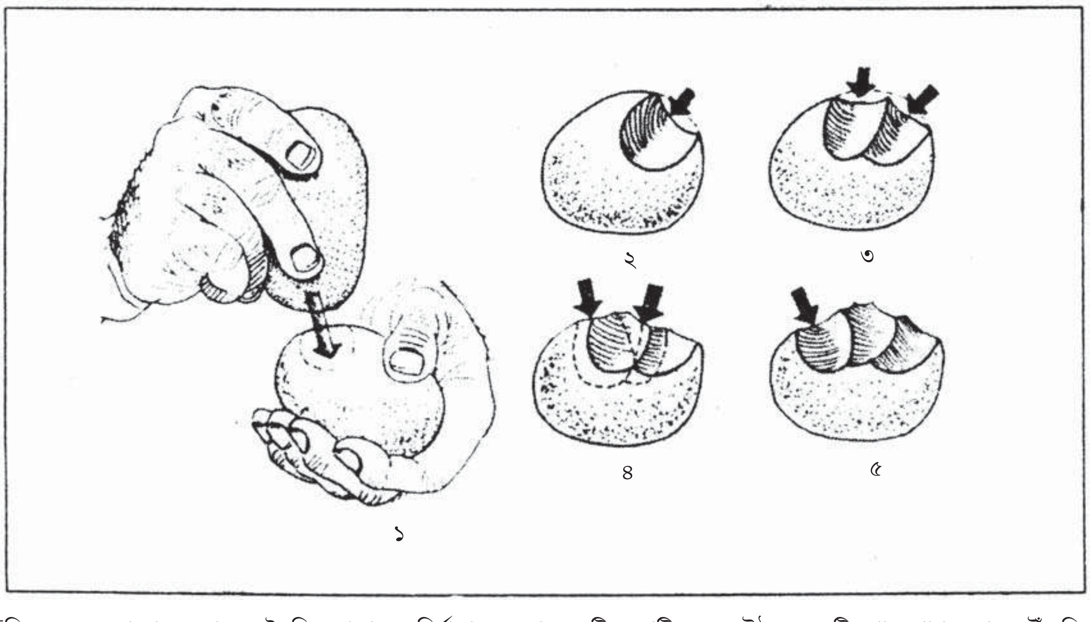

[চিত্র ২.৪ : কোনো যন্ত্র বাস্তবে তৈরির আগে যন্ত্র-নির্মাতার কল্পনায় যন্ত্রটির রূপটি ভেসে উঠত। একটি গোল পাথর থেকে উঁচু-নিচু ধারাল প্রান্ত সমন্বিত কাটবার যন্ত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপ—(১) হাতুড়ির মতো কোনো পাথর দিয়ে প্রথমে গোলাকার পাথরটির প্রান্তে জোরে আঘাত; (২) এবং (৩) দু'টি চোকলা এভাবে কেটে বাদ দেওয়া (৪) পাথরটির উল্টোদিকে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি; (৫) আর একটি চোকলা বাদ দেবার পর হাতিয়ারটি একটি উঁচু-নিচু ধারালো প্রান্তসমন্বিত হয়ে ওঠে।]

দৃষ্টিক্রমে যে-কোনো পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়, যা বিজ্ঞানের, বিশেষ করে এর পরীক্ষামূলক দিকের বিশিষ্ট চরিত্র। এটি গড়ে ওঠে কোনো জিনিস তৈরির জন্য নানাভাবে চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এইভাবে বর্তমানেও আমরা কোনো জিনিস সরাসরি তৈরি করার আগে সেটিকে ছবি এঁকে দেখে নিই। এভাবে ভুল শুধরে নিতে নিতে জিনিসটি আরও উন্নত হয়ে ওঠে।

এই পর্যায়ের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি, এমন যন্ত্রাদির আবিষ্কার, যার সাহায্যে অন্যান্য যন্ত্র তৈরি করা যায়। এর ফলে প্রকৃতি থেকে পাওয়া হাতিয়ারের থেকে আলাদা আরও বিভিন্ন রকম হাতিয়ার তৈরি করা সম্ভব হল।

হাতিয়ার তৈরির এই পদ্ধতি বর্তমানে ঢালাই এবং পেটাইয়ের পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। হাতিয়ার তৈরি করা এবং বিভিন্ন কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে মানুষ বিভিন্ন পদার্থের যান্ত্রিক ধর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—তারা শিখল কোন্ পদার্থ বেশি শক্ত, কোন্ পদার্থ ভঙ্গুর বা কোন্ পদার্থ সহজে ঢালাই করা যায়,—এর মাধ্যমে ভৌতবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হল।

এইসব হাতিয়ার যে শুধু শিকারের কাজে লাগত তাই নয়, কাঠ, হাড় এবং চামড়া জাতীয় অপেক্ষাকৃত নরম জিনিসকে আকৃতি দিয়ে নানা জিনিস তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হত; এর প্রয়োজন ছিল সাজসজ্জা ও শিল্পচর্চায় এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে। ঝুড়ি এবং অন্যান্য পাত্র তৈরি হবার ফলে খাদ্যসংগ্রহের কাজ সহজতর হল। শিকারের হাতিয়ার তৈরি করার যন্ত্রপাতি আর একটু সূক্ষ্ম ও মার্জিত করার ফলে সুতো পাকানো, পেঁচানো, বাঁধা, সেলাই করা, বোনা ইত্যাদি কাজ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল। এর ফলে পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, তাঁবু ইত্যাদি তৈরির প্রকৌশলের উদ্ভব হল। (চিত্র ২.৫ দ্রষ্টব্য)

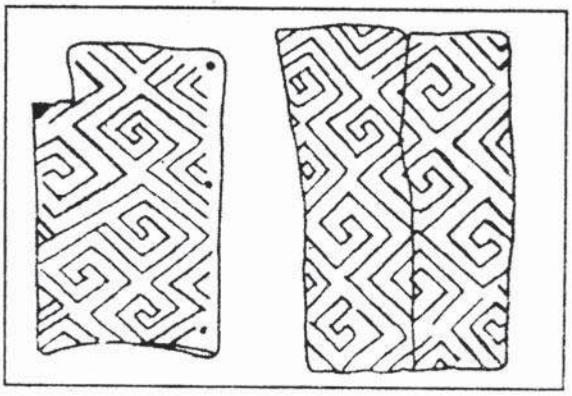

চিত্র ২.৫ : রাশিয়ার কিয়েভ অঞ্চল থেকে পাওয়া প্রস্তরযুগের বয়নের নকশা। এখানে নকশায় ত্রুটি এবং বিচ্যুতি লক্ষণীয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাথরের তৈরি ক্ষুদ্র হাতিয়ার বা 'মাইক্রোলিথ' পাওয়া গেছে। এইসব হাতিয়ার ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তার চেয়েও প্রাচীন। যেখানে মাছ ধরা যায় এরকম ছোটখাটো নদীর কাছে এ জাতীয় হাতিয়ার বেশি পাওয়া গেছে, যদিও এইসব জায়গা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজে গেছে। অকীক (agate), ওনিক্স (onyx) প্রভৃতি দামী পাথরের সূক্ষ্ম হাতিয়ারও পাওয়া গেছে যেগুলির প্রান্ত ঘষে বা দাঁত কেটে ধারালো করা হয়েছে। বর্তমানকালে আফ্রিকার বুশম্যানদের হাতিয়ারের সঙ্গে এগুলির তুলনা করলে বোঝা যায় এগুলি বৃহত্তর কোনো যন্ত্রের অংশ ছিল। এইসব টুকরোগুলি কাঠ, পশুর শিং বা হাড়ের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ আঠা বা আর কিছু দিয়ে জুড়ে বর্শা, তীর, ছুরি, কাস্তে, হার্পুন ইত্যাদি তৈরি করা হত। (চিত্র ২.৬ দ্রষ্টব্য)

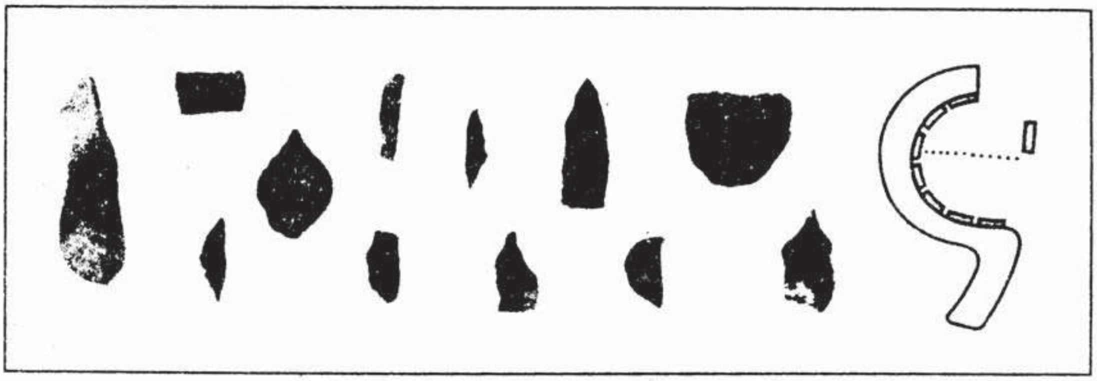

চিত্র ২.৬ : গুজরাটের লঙঘঞ্জ থেকে পাওয়া ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাইক্রোলিথ বা পাথরের তৈরি ক্ষুদ্র অস্ত্র। এগুলি কাঠ বা হাড়ের সঙ্গে যুক্ত করে কাস্তে জাতীয় যৌথ অস্ত্র তৈরি হত।

ওপরে বর্ণিত পাথরের তৈরি হাতিয়ারগুলি কাঠ কাটা, গর্ত করা, পশুর ছাল ছাড়ানো, মাংস কাটা, চামড়ার নীচে পেশীর তন্তু আলগা করা, আবার ঝুড়ি বানানোর জন্য বেত, বাঁশ লম্বালম্বি চেরা, আগুনে ঝলসে নেবার আগে মাছ কেটে নেওয়া প্রভৃতি বহু কাজেই ব্যবহৃত হত। বেশকিছু সরু, তীক্ষ্ণ এবং সূচালো পাথর সম্ভবত সূচ বা ফোঁড়ের কাজ করত চামড়া ইত্যাদি সেলাই করবার জন্য। সেলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হত জন্তুর অস্ত্র। কিছু হাতিয়ার এবং তাদের ব্যবহার এখানে ২.১নং সারণীতে দেখানো হয়েছে। মৃৎপাত্র তৈরি হবার অনেক আগে খাদ্যসংগ্রহ ও রক্ষণের প্রচলিত কাজে ব্যবহৃত হত ঝুড়ি ও চামড়ার থলি। ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন অঞ্চল থেকে প্রায় ৬,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

সারণী ২.১ : কিছু হাতিয়ার ও সেগুলির ব্যবহার।

(১) একটি ভারী ছুরি
(২) কাঠ চেরা, হাড় ফাটানো বা লড়াইয়ের অস্ত্র
(৩) প্রাচীন হাত-কুড়ুল
(৪) মাটি খুঁড়ে কন্দ বার করার যন্ত্র
(৫) চাঁছবার যন্ত্র
(৬) কাঠ চেঁছে আকৃতি দেওয়ার যন্ত্র
(৭) বাটালি
(৮) হরিণের শিঙে সমান্তরাল ফাটল তৈরি করে সূক্ষ্ম সূচ বার করতে
(৯) ছুরির ফলা
(১০) মাংস কাটার জন্য ব্যবহৃত
(১১) বহু কোণবিশিষ্ট পাথর

পরবর্তী যুগের হাতকুড়াল
মৃত প্রাণীর চামড়া ছাড়ানো
ফোঁড়
পশুর চামড়ায় ফুটো করার জন্য
চাঁছার ছুরি
পশুর চামড়া চেঁছে সাফ করার জন্য
বল্লমের ফলা
ছুঁড়ে পশুশিকারের জন্য

(১২) থ্যাঁৎলানো বা চেরা বা পশুকে ছুঁড়ে মারবার জন্য
(১৩) পরবর্তী যুগের হাত-কুড়ুল
(১৪) মৃত প্রাণীর চামড়া ছাড়ানো
(১৫) ফোঁড়
(১৬) পশুর চামড়ার ফুটো করবার জন্য
(১৭) চাঁছবার ছুরি
(১৮) পশুর চামড়া চেঁছে সাফ করার জন্য
(১৯) বল্লমের ফলা
(২০) ছুঁড়ে পশুশিকারের জন্য

পোশাক-পরিচ্ছদ

বুনতে শেখার অনেক আগে থেকেই পরিচ্ছদের ধারণা গড়ে ওঠে, সম্ভবত খাদ্য এবং হাতিয়ার পরিবহণের অভ্যাস থেকে। চুলে, গলায়, কোমরে, কব্জিতে এবং গোড়ালিতে এসব পোশাক আটকান হত। পশুর চামড়া, হাড়, পালক ইত্যাদি এসব পোষাকে সংযোজিত হত। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারটি হচ্ছে, লোমযুক্ত পশু-চামড়া মানবদেহ গরম রাখে। পশুপালন এবং খাদ্যের প্রয়োজনে পশুহত্যা; সেই সঙ্গে পশুচর্মের পরিচ্ছদের ব্যবহার মানুষকে বিশেষ সুবিধা দান করল। এসবের ফলে তারা অনেক বেশি অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে এবং শীতের মোকাবিলা করতে সক্ষম হল।

আগুন এবং বাসনপত্র

কোথায় এবং কবে আগুনের ব্যবহার শুরু, তা ঠিক জানা যায় না। প্রাথমিকভাবে, মানুষ আগুনকে ভয় পেত বলেই মনে হয়। এই ভয় থেকেই হয়তো জন্ম নিয়েছে নানা উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী। আস্তে আস্তে মানুষ আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল। তখন সে দেখল শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে, বন্যপ্রাণীদের ভয় দেখিয়ে তাদের হাত থেকে বাঁচতে আগুন খুবই উপযোগী। হঠাৎ একদিন পোড়া বা ঝলসে যাওয়া মাংস খেয়ে সে রান্না ব্যাপারটা আবিষ্কার করল। দেখল, এর ফলে শক্ত মাংসও সহজে খাওয়া যায়, আর তা সুস্বাদুও হয়। সুতরাং অচিরে খাবারযোগ্য জিনিসের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেল। রান্নার কাজে আগুনের ব্যবহার শেখার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত মানুষ পোড়ামাটির বাসন তৈরি এবং ধাতু গলিয়ে হাতিয়ার তৈরির পদ্ধতি শিখেছিল।

জল গরম করা বা ফোটানো সমস্যা ছিল। প্রথম দিকে চামড়ার থলিতে তাতানো পাথর ফেলে জল গরম করা হত। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ন অঞ্চলগুলি থেকে গরম করে হঠাৎ ঠাণ্ডা করার ফলে ফেটে যাওয়া এরকম পাথর পাওয়া গেছে। অবশ্য ঝুড়ির ওপর পুরু করে মাটি মাখিয়ে সেইসব পাত্রকে যে আগুনের ওপর রাখা যায়, এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। প্রস্তর যুগের শেষ দিকে ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত হল—এইসব মাটিলেপা পাত্র আগুনে ফেটে গেলেও, আগুনে বসানোর আগে যদি মাটির পাত্র আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তা ফাটে না। পোড়ামাটির পাত্র এইজন্যেই এই যুগের একটি বড় আবিষ্কার। এর ফলে পাত্রে দীর্ঘদিন তরল পদার্থ সঞ্চিত রাখার সমস্যার সমাধান হল। এর থেকেই গেঁজানোর ফলে যে ধীর রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তা লক্ষ্য করা গেল। পরে এটাই মদ তৈরি করতে ব্যবহৃত হত। প্রস্তর যুগের শেষ দিকে রংয়ের ব্যবহার, চামড়া ‘ট্যান’ করা প্রভৃতির প্রচলন থেকে বোঝা যায় যে বস্তুর রূপান্তর সংক্রান্ত রসায়ন-বিদ্যার প্রাথমিক ব্যাপারগুলিতে তখনই মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছিল।

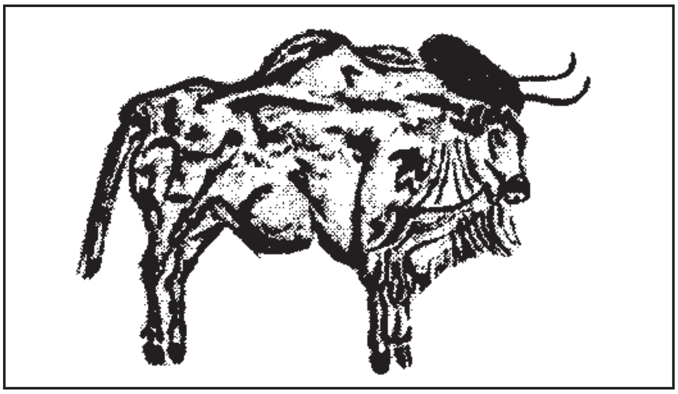

চিত্র ২.৭ : প্রাচীন মানুষের পশুর শারীরবিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্টই জ্ঞান ছিল। স্পেনের আলতামিরা থেকে পাওয়া বাইসনের একটি গুহাচিত্র।

অনুশীলনী ১

আদিম মানবসমাজের কিছু আচরণ এবং প্রকৌশলের ব্যবহার নীচে দেওয়া হল। এর প্রতিটিকে বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা কারিগরিবিদ্যার মধ্যে কোন্‌টির গোড়াপত্তন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? নীচে প্রতি বক্তব্যের পাশে দেওয়া জায়গায় আপনার উত্তর লিখুন।

(ক) বর্শা, কাঁটাযুক্ত হার্পুন, তীর ইত্যাদি শিকারের অস্ত্র তৈরি এবং ব্যবহার :

....

(খ) রান্নার জন্য আগুন ব্যবহার ....

(গ) কাঠ, হাড়, চামড়া ইত্যাদি নরম জিনিসের ব্যবহার ....

(ঘ) পাত্রে তরল পদার্থের সঞ্চয় ....

(ঙ) রং করা, চামড়া ট্যানিং ইত্যাদি ....

(চ) অন্যান্য হাতিয়ার তৈরি করবার জন্য মূল হাতিয়ার তৈরি ....

২.২.৩ আদিম জীবনযাত্রার সামাজিক ভিত্তি

আগের অংশে প্রাচীন মানুষ কীভাবে দৈনন্দিন সমস্যাগুলির মোকাবিলা করত এবং তার কিছু সমাধানও কীভাবে বার করেছিল—সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। হাতিয়ার আবিষ্কার, আগুনের ব্যবহার এবং প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে শেখার ফলে তার জীবনযাত্রা যখন সংগঠিত হয়ে উঠল তখন মানুষের সামাজিক জীবনেরও উন্নতি ঘটল। ভাষা, আচার-আচরণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ইত্যাদি প্রাচীন জীবনের সামাজিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। তাদের সমাজজীবনের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভাষা

শিকার এবং খাদ্যসংগ্রহের জন্য একই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মতো সহযোগিতার জন্যেই ভাষার উদ্ভব হয়ে থাকবে। নির্দিষ্ট দলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো নির্দিষ্ট ধরনের শব্দ চালু ছিল। বিভিন্ন দলের মধ্যে অতিরিক্ত খাদ্যের আদান-প্রদানের সূচনা হবার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের জন্য কথ্য শব্দগুলির মধ্যে কিছু সাধারণীকরণের প্রয়োজন হয়। এই সাধারণীকরণের অর্থ হল, নির্দিষ্ট পশু বা উদ্ভিদের জন্য নির্দিষ্ট শব্দের উদ্ভব। সাধারণ জাতিসূচক শব্দ, যেমন সমস্তরকম পশুর জন্য 'পশু' এবং সমস্তরকম উদ্ভিদের জন্য 'গাছ' ইত্যাদি শব্দ তৈরি হয়েছে অনেক পরে। বর্তমানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির জটিল ব্যাকরণ এবং শব্দাবলী থেকে সহজেই এ জাতীয় সিদ্ধান্তে আসা যায়। সংস্কৃত, গ্রীক্, ফিনিশ ইত্যাদি ভাষাগুলিতে একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। রং (colour) বলতে প্রথমে বোঝাত রক্তের লাল রং। পরবর্তীকালে হলুদ, নীল, সবুজ ইত্যাদি গুলিকেও রং বলা হতে লাগল। ভাষায় বিশেষ অর্থ থেকে সাধারণ অর্থে উত্তরণ ক্রমে বিমূর্তকরণের সূচনা করে। এর ফলে প্রতীকের ব্যবহার

শুরু হয়। শীঘ্রই দেখা গেল বিভিন্ন জিনিসের জন্য একটিমাত্র শব্দের ব্যবহার করতে হচ্ছে। আমরা আগেই 'পশু', 'গাছ', 'রং' ইত্যাদির উদাহরণ দিয়েছি। একইভাবে অনুভূতি, আবেগ, ভাব ইত্যাদির জন্যও মৌখিক প্রতীকের ব্যবহার চলতে লাগল।

ধর্মীয় আচার ও সমাজজীবন

খাদ্যসংগ্রহকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন মানুষ বা আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সামাজিক জীবন আবর্তিত হত। প্রথম দিকে মানুষ যা কিছু খেতে পারত, তাই সংগ্রহ করত, যেমন বীজ, বাদাম, ফল, কন্দ, মধু এবং খালি হাতে ধরা যায়, এমন সব ছোট ছোট প্রাণী। সবচেয়ে বড় যে গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে খাদ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা করত তারা যে ধরনের খাবার সহজে প্রচুর পরিমাণে লভ্য ছিল তার ওপরই বেশি নজর দিত।

এক নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্যগ্রহণকারী মানুষেরা নিজেদের পরস্পরের আত্মীয় এবং একই জনগোষ্ঠীর এক-একজন বলে চিহ্নিত করতে শুরু করল। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ, যারা অন্যরকম খাদ্যে অভ্যস্ত, তাদের এরা যে শুধু আপন মনে করত না তাই নয়, প্রথমদিকে তাদের মানুষ বলেও গণ্য করত না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিশেষ খাদ্যটিকে বলা হত 'টোটেম'।

এই 'টোটেম' সংগ্রহের ব্যাপারটি বিশেষ কিছু ধর্মীয় আচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল (চিত্র ২.৮)। বেশি খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইসব অনুষ্ঠানে কখনও কখনও বলি দেওয়া হত, নরবলিও বাদ যেত না। এইসব খাদ্য-সংগ্রহকারী আদিম জনগোষ্ঠী জীবনধারণের জন্য, প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। তাই ঘাটতি এড়াবার উদ্দেশ্যে কিছু সংস্কারের উদ্ভব হল—যাকে বলা হয় 'ট্যাবু' (Taboo)। এই ট্যাবু যৌন মিলনের ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করল। যাতে খাদ্যের সীমিত সরবরাহে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকে। একজাতীয় টোটেমের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহবাস ট্যাবুর দ্বারা নিষিদ্ধ করে এবং জনগোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করার প্রথা চালু করে গোষ্ঠীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়।

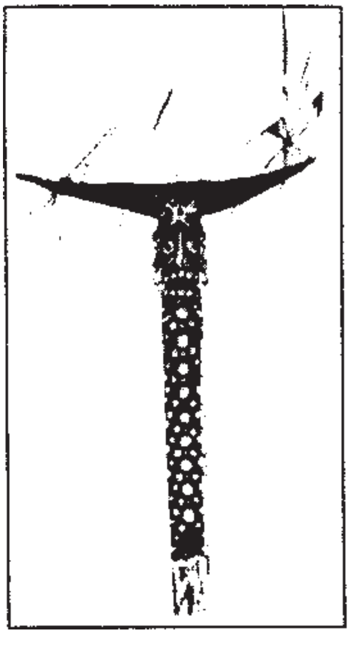

চিত্র ২.৮ : ইন্দোনেশিয়ার নিকট বোর্নিও দ্বীপ হতে পাওয়া একটি প্রাচীন টোটেম খুঁটি। আদিম জনগোষ্ঠী সম্ভবত তাদের টোটেমকে নিয়ে এই খুঁটিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় আচার পালন করত।

জাতি, ধর্ম এবং জাদুবিদ্যা

বোঝাই যায় যে, প্রাচীন আদিম জনগোষ্ঠীর পক্ষে খাদ্যসংগ্রহের এই পর্যায়টি ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। টিকে থাকার জন্য তারা মরীয়া হয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। এজন্য তাদের হাতে ছিল খুব সীমিত প্রকৌশল। প্রকৌশলের

এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা সৃষ্টি করল জাদুবিদ্যা। চিত্র, প্রতীক এবং অনুকরণনৃত্যের ব্যবহারে তারা মনে করত প্রাণী বা উদ্ভিদকে বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তারে উৎসাহিত করা যাবে। কোনো কোনো বস্তুর ওপর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আরোপিত হত। কখনও কখনও এগুলি বাস্তবভিত্তিক ছিল, যেমন কোনো কোনো পাথরের লোহাকে আকর্ষণ করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব শক্তি ছিল কাল্পনিক। যেমন সোনাকে বিপদ বা অশুভ হতে রক্ষাকারী মনে করা। এক অর্থে প্রস্তর যুগের জাদুবিদ্যা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে কারণ তাতে প্রচলিত কোনো প্রকৌশলকে প্রসারিত করার চেষ্টা হয়েছে। এটা মানুষের তরফে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্রমাগত প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করে। জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে অবশ্য জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণাগুলি পাল্টায়নি। বরং এমন হয়েছে যে, পরবর্তী প্রজন্ম এসব ধারণার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। এর ফলে এইসব ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে অর্থহীন পুরাণ কথা এবং কুসংস্কার।

প্রাচীন চিন্তাধারার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব জগতের ওপর 'আত্মা'র (spirit) প্রভাব। সে আত্মা মৃত ব্যক্তি বা দেবতা বা দানব—যে কারও হতে পারে। তার ফলে তাদের সন্তুষ্ট করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন দেখা দিল। সম্ভবত মৃত্যুকে স্বীকার করার অক্ষমতা থেকেই এর উৎপত্তি। এ ছাড়াও অনেক ব্যাপার তারা বুঝতে পারত না; অনেক কিছুর ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেমন বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, দাবানল বা সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকেই অবলুপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার মতো ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব। এসব কিছুই সম্ভবত 'আত্মা'র তত্ত্বে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

চিত্র ২.৯ : শিকারযাত্রার আগে অস্ট্রেলিয় আদিবাসীরা একটি পশুর চিত্রের চারিদিকে নৃত্যরত।

টোটেমকেন্দ্রিক খাদ্যসংগ্রহকারী জীবন, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসহায় অবস্থা এবং প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভারতের বহু পূজ্য বিগ্রহই লাল রঙের পাথরের টুকরো, যার লাল রং আসলে রক্তের বিকল্প। আদিম ধর্মকে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা; বিশেষ করে তার চারদিকের ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যার একটা প্রাথমিক প্রয়াস বলা যায়। কৃষিকাজের বিস্তারের সঙ্গে যখন স্থিতিশীল জীবনধারণ সম্ভব হল, তখন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে মিশে গেল। তাদের 'টোটেম', 'ট্যাবু' এবং আচারগুলিও একত্রিত হয়ে নতুনতর বিশ্বাসের জন্ম দিল, যা পরিচিত হল 'ধর্ম' হিসাবে।

এইসব জনগোষ্ঠীতে মিশে যাওয়া গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছুটা বজায় রেখে চলত, এমনকি তাদের নিজস্ব টোটেমগত স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখত। ভারতে এইরকম সম্পর্ক জাতি হিসাবে বিধিবদ্ধ

হয়ে গিয়েছে। ভারতের জাতিব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তিত হয়েছে এবং এতে উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন ধাপ ও যুগের ছাপ আছে। জাতির নামের মধ্যে টোটেমের চেহারার স্বাক্ষর থাকে, যেমন—কুমীর (মগর), ঘোড়া (বাজি), ময়ূর (মোর), পীপুল (পিঁপ্‌লে) ইত্যাদি। 'মোর' জাতের লোক কখনও ময়ূরের মাংস খায় না, পিঁপলে জাতরা কখনও পীপুল বা অশ্বত্থ গাছের পাতায় খেত না—এইরকম। কৃষিকাজের সময়েও তাদের জীবিকা অনুযায়ী বিশেষ ধরনের জাতিবিন্যাস দেখা যেত—যেমন লতাপাতা বিক্রেতা (বৈদ্য), খননকারী (বদ্দার) ইত্যাদি।

অনুশীলনী ২

নীচের বাক্যগুলির মধ্যে আদিম জীবনের ভাষার কোন্ তিনটি বৈশিষ্ট্য বা ব্যবহার বিজ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করেছে? সঠিক বাক্যগুলির পাশে (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) খাদ্যসংগ্রহ এবং ঘোরাঘুরির সময়ে যোগাযোগ রাখা। ☐

(খ) যন্ত্র তৈরি, ব্যবহার এবং অতিরিক্ত খাদ্যের আদান-প্রদানের সময় যোগাযোগ। ☐

(গ) ধর্মীয় আচার, নৃত্য, গীতের সময় যোগাযোগ। ☐

(ঘ) কোনো বস্তু, কাজ এবং রীতিনীতির বর্ণনায় প্রতীকের প্রয়োগ। ☐

(ঙ) ধর্মীয় আচার, নৃত্য এবং আবেগ প্রকাশে প্রতীকের ব্যবহার। ☐

২.২.৪ বিজ্ঞানের সূচনা

আমরা দেখেছি প্রাচীন মানুষ হাতিয়ার এবং যন্ত্রের ব্যবহার, আগুনে রান্না করা, পশুশিকার, গাছ থেকে ফল বীজ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করা থেকে নানারকম জ্ঞানসঞ্চয় করেছিল। এইসব জ্ঞান, ধর্মীয় আচরণ ও পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে তাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এই সংস্কৃতির গর্ভে কীভাবে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হল, সেটাই এবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। এখানে আমরা বিজ্ঞানের জগতে তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল তার পর্যালোচনা করব।

(ক) বিজ্ঞানসম্মত বলবিদ্যা

হাতিয়ার তৈরি এবং তার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিকে অনেকখানি নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। এর ফলে দৃঢ় বস্তু, জড়-সংক্রান্ত বলবিদ্যা, গতিবিদ্যা, পদার্থের ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। তীর-ধনুক, বর্শা ও বুমেরাংয়ের ব্যবহার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (চিত্র ২.১০)

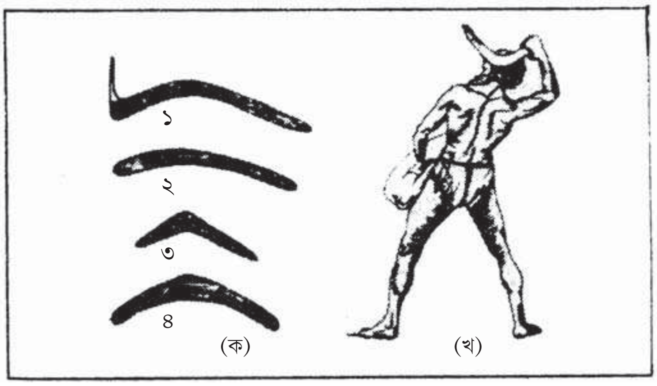

চিত্র ২.১০ : বিভিন্ন প্রকার বুমেরাং। ক—(১) যুদ্ধের জন্য (২) শিকারের জন্য (৩) এবং (৪) ছুঁড়লে ফিরে আসে এমন বুমেরাং। খ—একজন অস্ট্রেলীয় আদিবাসী বুমেরাং ছুঁড়ছে।

লিভারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার একদিকে চাপ দিলে, অন্যদিকে কী প্রতিক্রিয়া হবে, সে সেটা জেনে ফেলল। এইসব কলকব্জার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তার সুফল দেখা ও অনুভব করা যায়। এইভাবেই জন্ম নিল বোধ ও আত্মবিশ্বাস। অন্তত একটি বিষয়ে সে বুঝল, আসলে কীভাবে কাজগুলি হয়।

(খ) পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনা

কোনো ঘটনা প্রকৃতিতে নিয়মিত ঘটতে দেখলে মানুষ তার অর্থ না বুঝলেও তার সুযোগ নিত। কোন্ পরিস্থিতিতে কখন এবং কী আশা করা যায় সুযোগ নেওয়ার পক্ষে সেটুকু জানাই তাদের কাছে যথেষ্ট ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তারা লক্ষ্য করেছিল জমির উর্বরতা ঋতু অনুযায়ী বদলে যায়। গাছের বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণীর আনাগোনাও ঋতু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফল এবং বীজ বছরের একটা বিশেষ সময়ে পাওয়া যায়, অন্য সময়ে নয়। পাখির ঝাঁক, মহিষ এবং হরিণের দল ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে স্থান বদল করে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই প্রস্তরযুগের মানুষ এইসব পর্যবেক্ষণ করেছিল। এই ঘটনা ভারত এবং মিশরে, যেখানে ঋতু পরিবর্তন এবং ভৌগোলিক বিভাজন খুব স্পষ্ট, সেইসব অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সত্য। এর থেকেই পরিবেশ ও প্রকৃতির সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ এবং তার সযত্ন বিবরণের ভিত্তি রচিত হল।

রান্না করা বা মদ প্রস্তুত করার সময়ে, বলবিদ্যার মতো সহজে বলা সম্ভব ছিল না কোন্ কাজের ফলে ঠিক কী ঘটবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটা পাথরকে ওপর দিকে ছুঁড়লে তা নীচে আসবে তা যে কেউ বলতে পারে। তেমনি গাছের কোনো ফল বা পশুকে ঠিকমত লক্ষ্য

করে পাথর ছুঁড়লে তা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবে, এটাও নিশ্চিত। কিন্তু রান্নার ক্ষেত্রে, কী জাতীয় খাবার রান্না করা হচ্ছে, কতটা জলীয় পদার্থ তাতে আছে, কতক্ষণ ধরে আগুনের ওপর রাখা আছে এবং আগুনের তেজ কতটা এমন অনেক কিছুর ওপরে রান্নার ফলাফল নির্ভর করে। মদ তৈরি করার পদ্ধতি তো আরও জটিল। সুতরাং এই বিষয়গুলিতে অনেক রকম অনিশ্চয়তা ছিল। অবশ্য কেউ কোনো ব্যাপারে প্রথমবার চেষ্টা করার সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল তা যদি লক্ষ্য করে থাকে এবং মনে রাখে, তাহলে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার সময় কী ঘটতে চলেছে, সে সম্পর্কে সে খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে। এই বিষয়ে এবং বিশেষ করে পশুদের আচরণের ক্ষেত্রে লব্ধ জ্ঞান মুখের কথার মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়েছে। তবে অনেক সময়েই 'টোটেম' পূর্বপুরুষ বা আত্মাকে জড়িয়ে পৌরাণিক পটভূমিতে পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা খোঁজা হত।

(গ) শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন জিনিস বা ঘটনার মধ্যে নানা ধরনের সাদৃশ্য শ্রেণীবিভাগের সূচনা করে। প্রথমে শ্রেণীবিভাগ হয় প্রাণবন্ত জীব, জিনিস (বস্তু ও পদার্থ অর্থাৎ অজৈব) এবং আবেগ বা কাজের মধ্যে। এর থেকে কার্যকারণের এক ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর একজন সদস্য যেরকম আচরণ করে সেই শ্রেণীর অন্যান্যরাও তেমনই আচরণ করবে। এই জ্ঞানসঞ্চয় এবং অভিজ্ঞতার ঝাড়াই বাছাই 'আদি' রসায়ন এবং জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

অনুশীলনী ৩

নীচের সারণীর প্রথম স্তম্ভে বর্ণিত বিজ্ঞানের তিনটি অঙ্গকে দ্বিতীয় স্তম্ভে বর্ণিত প্রয়োগ বা প্রকৌশলের সঙ্গে মেলান। এখানে অনুশীলনীর একটা অংশ করে দেখানো আছে।

স্তম্ভ ১	সারণী-২
(১) বিজ্ঞানসম্মত বলবিদ্যা	(ক) বুমেরাং ছোঁড়া
(২) পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা	(খ) পশুশিকার (১,২)
(৩) শ্রেণীবিভাগ	(গ) পশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ
	(ঘ) জীবজগতের পর্যবেক্ষণ
	(ঙ) তীরধনুক ব্যবহার
	(চ) বিভিন্ন ঋতুতে গাছের ফল বা বীজ সংগ্রহ
	(ছ) নিষ্প্রাণ জগতের পর্যবেক্ষণ
	(জ) লিভারের ব্যবহার
	(ঝ) নিয়মিত ঋতুচক্রের পর্যবেক্ষণ
	(ঞ) রান্না করা এবং মদ চোলাই

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আদি মানবসমাজ বিভিন্ন প্রকৌশলের উদ্ভাবন করেছিল। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে দেখা যায় প্রস্তরযুগের শেষ দিকে প্রাচীন মানুষ কুঁড়েঘর, সেলাই করা পোশাক, থলি, ঝুড়ি, বালতি প্রভৃতি কাজের জিনিস তাদের জীবনযাত্রায় ব্যবহার করত। তারা শালতি জাতীয় নৌকা, বঁড়শি এবং হার্পুন, গুলতি, বর্শা, বুমেরাং ইত্যাদির কলাকৌশলও উদ্ভাবন করেছিল। (চিত্র ২.১১) এসব অনেক কিছুই আজকের দিনেও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী যেমন এস্কিমো, আফ্রিকায় বুশম্যান, অস্ট্রেলীয় উপজাতি এবং বিভিন্ন ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

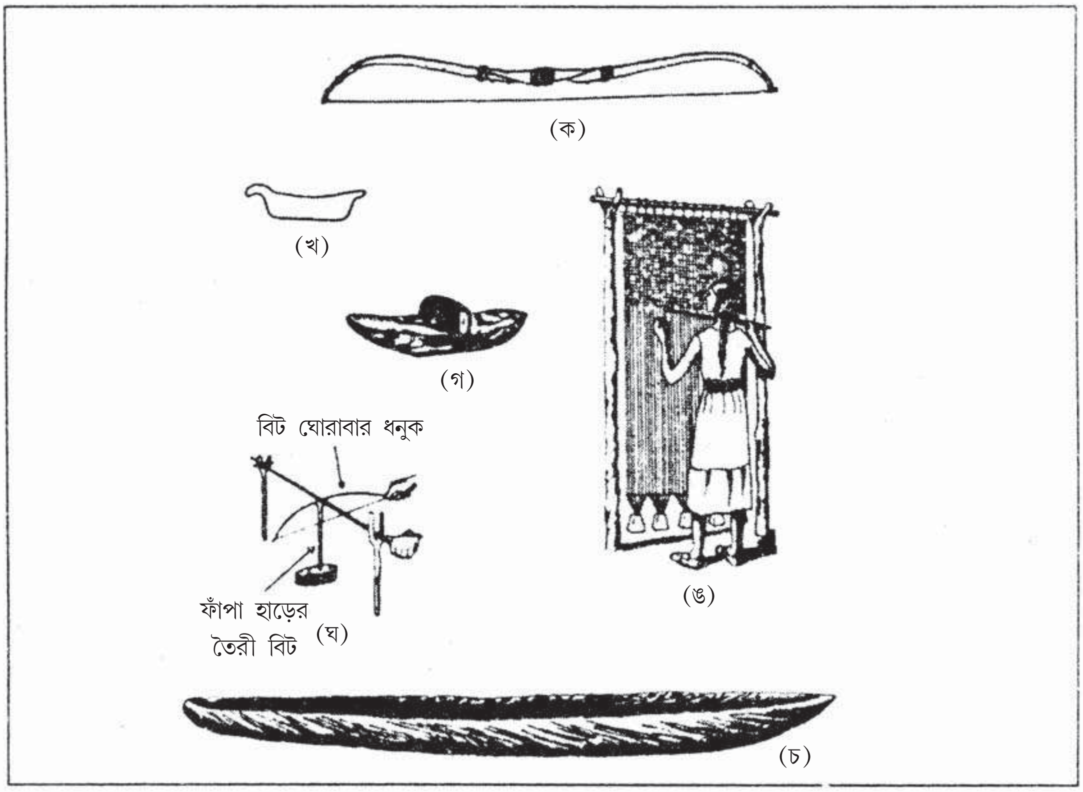

চিত্র ২.১১ : প্রস্তরযুগের শেষদিকে বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার। (ক) জোড়া দেওয়া ধনুক, (খ) নরওয়ের চামড়ার ডিঙি নৌকার বহিঃরেখা, (গ) শস্য গুঁড়ো করবার যাঁতাপাথর, (ঘ) পাথর গর্ত করার তুরপুন, (ঙ) কাপড় বোনার তাঁত—প্রাপ্ত অবশেষ এবং বর্ণনা থেকে পুনর্গঠিত। (চ) গাছের গুঁড়ি খোদাই করে তৈরি ডিঙি নৌকা।

সাধারণভাবে, আদিম মানবসমাজে বিজ্ঞানের উৎপত্তির বিষয়ে আমরা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরি এবং তার ব্যবহার যে বলবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছে, তা আমরা দেখেছি। আগুনের ব্যবহার, রসায়নশাস্ত্র এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান জীববিদ্যার

সূচনা করেছে, তাও দেখেছি। সামাজিক জ্ঞান, ভাষা এবং শিল্পকলার মধ্যেই নিহিত ছিল। সমাজ তখন ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। তখন পর্যন্ত কাজের সুনির্দিষ্ট বিভাগ বা তার ভিত্তিতে জাতিভেদ প্রথা শুরু হয় নি। হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার জন্য মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট প্রয়োগ করেছে। তবে এটা ভেবে আশ্চর্য লাগতে পারে যে কেন আদিম মানুষ সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল না। অবশ্য দুর্গম দূরবর্তী কোনো কোনো অঞ্চলে আজও কিছু আদিম মানব সে অবস্থায় রয়ে গেছে। তবে মোটের ওপর শিকারের ওপর নির্ভর করে এবং শুধুমাত্র খাদ্যসংগ্রহ করে বেঁচে থাকার মানবগোষ্ঠী এখন ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেছে। এর কারণ কী? প্রস্তরযুগের পরিসমাপ্তি ঘটল কেন? এবার আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

২.২.৫ প্রস্তরযুগের পরিসমাপ্তি

শিকার এবং খাদ্য-সংগ্রহের ওপর নির্ভর করা মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভরতা। প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করলেও তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে পারে নি। এজন্য তারা পশু প্রজননও করতে পারেনি। তাই কোনো স্থানে খাদ্যবস্তু নিঃশেষিত হলে সমস্ত গোষ্ঠীকেই স্থান বদল করতে হয়েছে, নচেৎ তারা মারা পড়ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্থান বদল করা কঠিন হয়ে পড়ল। তার ওপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বেশিরভাগ আদিম জনগোষ্ঠীই লুপ্ত হয়ে যায়।

প্রস্তরযুগের শেষদিকে আবহাওয়ারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ইউরোপ এবং সমগ্র উত্তর গোলার্ধে অত্যন্ত শীতল হিমযুগের সূচনা হওয়ায় পশুশিকার এবং খাদ্যসংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ল। ফলে অন্য ধরনের উৎপাদনের সাহায্যে মানবগোষ্ঠীকে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হল। পরের অংশে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে (পাকিস্তানের কিছু অংশ, আফগানিস্থান এবং মায়ানমার সহ) হিমযুগের প্রভাব ইউরোপের মতো প্রবল ও ব্যাপক হয়নি। সুতরাং পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের বিচারে ইউরোপের তুলনায় এখানে খাদ্যসংগ্রহ করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রধান খাদ্য হিসাবে ইউরোপে যেখানে মাত্র আধডজন দানাশস্য, মটর এবং বীজের সন্ধান মেলে, সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশে মহারাষ্ট্রের মতো অতি সাধারণ উর্বরতার জমিতেও চল্লিশ রকম শস্যদানার প্রচলন ছিল। এই দুই স্থানে পরবর্তী কালের অগ্রগতিতে এর যথেষ্ট প্রভাব দেখা দিয়েছিল।

অবশ্য, এই সৌভাগ্যের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রস্তরযুগের প্রভাব ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশিদিন বর্তমান ছিল। প্রতিবেশী দেশগুলিতে মানুষ যেখানে কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনও এখানকার মানুষ খাদ্যসংগ্রহ করেই টিকে যেতে পেরেছিল। এর ফলে কয়েক শতাব্দী ধরে, এমনকি আধুনিক যুগেও, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে এক প্রাচীন সংস্কৃতি এখানে চালু রয়ে গিয়েছিল যেমনটি ইউরোপে ঘটেনি। দু'টি সমান্তরাল সংস্কৃতি এবং উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে কিছু যোগাযোগ বর্তমান ছিল। কখনও কখনও তা সংঘাতেরও সৃষ্টি করেছে, যেমন আমরা তৃতীয় এককে দেখব। কৃষিযোগ্য জমির সন্ধানে আর্যজাতি এবং স্থানীয় আদিবাসীদের

মধ্যে মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ বেঁধেছে। স্থানীয় আদিবাসীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে আবার পুরনো বিশ্বাস এবং রীতিনীতি নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রক্রিয়াগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল।

অনুশীলনী ৪

নীচের বাক্যগুলিতে প্রস্তরযুগের পরিসমাপ্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নীচে দেওয়া শব্দগুলি ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করে বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন।

.... যুগের অবসান প্রধানত দু'টি কারণে ঘটেছিল। প্রথমত, বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট .... ছিল না। এর কারণ, আদিম মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ....কে নিয়ন্ত্রণ করতে জানত না। পক্ষান্তরে তারা ছিল প্রকৃতির ওপর ....। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক .... জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ব্যাহত করেছিল। হিমযুগের সূচনা এমনই এক দুর্ঘটনা। প্রচণ্ড .... আবহাওয়ায় পশুশিকার এবং খাদ্যসংগ্রহ অসম্ভব হয়ে উঠল। সমাজকে টিকে থাকার জন্য .... উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হল। এইভাবে .... মানবসমাজের কৃষিভিত্তিক সমাজে উত্তরণ ঘটল।

[বিপর্যয়, বিকল্প প্রস্তর, আদিম, প্রকৃতি, শীতল, খাদ্য, নির্ভরশীল।]

এইসঙ্গে আমরা প্রস্তরযুগের বিবরণ শেষ করলাম। এই অংশে আমরা প্রস্তরযুগের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়েছি। কীভাবে তাদের জীবনসংগ্রাম থেকে উদ্ভূত নানা প্রকৌশল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্ম দিয়েছে, তাও আমরা দেখেছি। এখানে পড়া থামিয়ে আপনাকে একটু বিশ্রাম নিতে বলব। বরং এক কাপ চা খেয়ে নিন, তারপর এ পর্যন্ত যা পড়লেন তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন।

২.৩ কৃষি ও সভ্যতা

পাথরের বদলে যে নতুন ধাতুসঙ্কর এই যুগে ব্যবহৃত হত তার নাম অনুসারে এই যুগের নাম ব্রোঞ্জযুগ। এই যুগে আসলে উৎপাদনের এক নতুন দিকের সূচনা হয়েছিল। এটি হল কৃষিকাজ। কৃষিকাজের সঙ্গে সমাজে কীভাবে পরিবর্তন এল এবার আমরা তা দেখব। এও দেখব, আর্থসামাজিক পরিবর্তন এবং নগরায়ণের ফলে কীভাবে বিজ্ঞানের জন্ম হল। নগরোন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক গঠনে পরিবর্তন এল এবং তা পরবর্তীকালে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতায় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল।

২.৩.১ কৃষিকাজ ও সভ্যতার সূচনা

কৃষিকাজের সূচনা ঠিক কীভাবে হল, তার কোনো ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। কী ঘটেছিল, তা শুধু আমরা অনুমান করতে পারি। খাদ্যসংগ্রহ করা থেকে হঠাৎ কোনো সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শস্য ফলান শুরু হয়নি। যেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রচুর পরিমাণে বুনো শস্য জন্মাত, তার আশেপাশে অনেক শস্যদানা ছড়িয়ে থাকত। তার থেকেই সংগ্রহ করবার মতো নতুন শস্য জন্ম নিত। শস্য ফলনের

সঙ্গে ঋতুর সম্পর্ক আছে আর শস্যদানা বা বীজ থেকে যে নতুন গাছ হয়, এই জ্ঞানই সম্ভবত কৃষিকাজের সূচনা করে। জলের সহজলভ্যতাও হয়তো এক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। কৃষিকাজের সূচনার ফলে আদিম যুগের অবসান হল এবং মানুষের প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা কমল। মানুষ তার নিজের জীবনযাত্রা এবং ভাগ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করল।

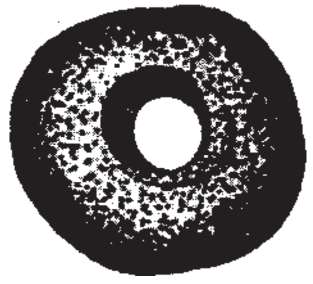

চিত্র ২.১২ : প্রাচীন কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাথরের চাকতি। চাকতির ফুটোয় ডাণ্ডা ঢুকিয়ে মাটির চাঙড় ভাঙা হত।

শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত জমি এবং অনুকূল আবহাওয়ার অঞ্চলের কাছাকাছি স্থায়ী বা আধাস্থায়ী বসবাস কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। এর ফলে গড়ে উঠল গ্রাম, যেখানে মানুষ পেল সামাজিক জীবন আর কিছুটা অবসর। স্বাভাবিকভাবেই যেসব জনগোষ্ঠী উর্বর কৃষিযোগ্য অঞ্চলে স্থাপিত হল সেগুলিই দ্রুত উন্নতি করল। এইভাবে দেখা যায়, মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত এবং চীনে ৪,০০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের

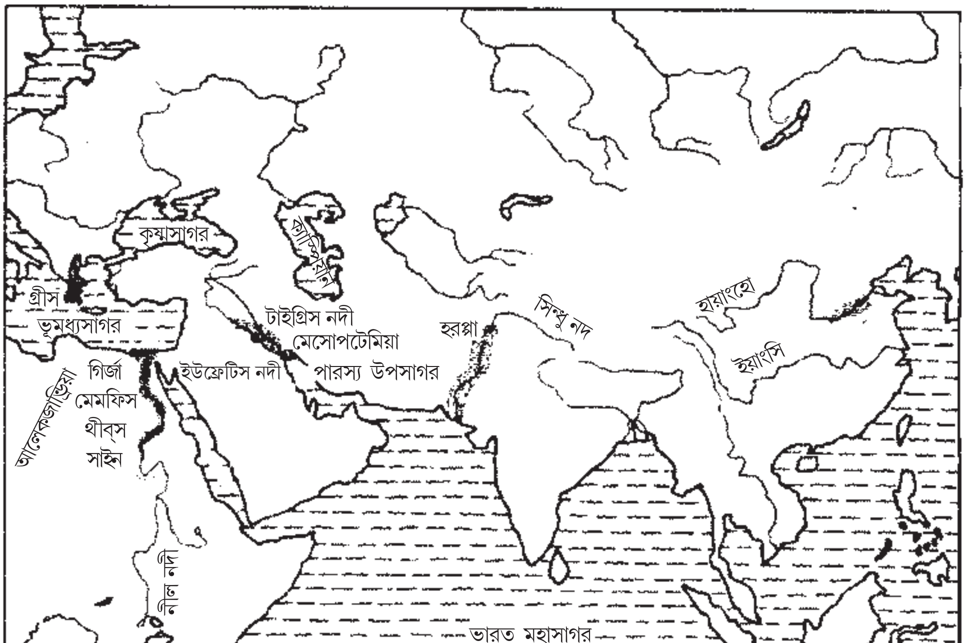

চিত্র ২.১৩ : কৃষ্ণসাগর, ক্যাস্পিয়ান, আলেজান্দ্রিয়া, গিজা, মেম্‌ফিস, থীবস্, সাইনি, ভূমধ্যসাগর, নীলনদ, টাইগ্রিস, মেসোপটেমিয়া, ইউফ্রেটিস, পারস্য উপসাগর, হরপ্পা, সিন্ধু, হোয়াংহো, ইয়াংসি, সিন্ধু নদ, ভারত মহাসাগর

চিত্র ২.১৩ : মিশর, মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) ভারত এবং চীনের চারটি নদী-উপত্যকার সভ্যতা। ছায়াঙ্কিত অঞ্চলে ছিল লৌহযুগের গ্রীক সভ্যতা।

মধ্যে চারটি বৃহৎ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতাগুলি যথাক্রমে নীলনদ, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, সিন্ধু ও হোয়াং হো নদীর বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল। আমরা যে সিন্ধু সভ্যতার উত্তরসূরী, তার বিকাশ ঘটেছিল ২৭০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

চিত্র ২.১৪ : একজন মিশরীয় কৃষক একটি দণ্ড থেকে ঝোলানো শঙ্কু আকৃতির চামড়ার বালতির সাহায্যে জলসেচ করছে; দণ্ডটি একটি স্তম্ভের ওপর ভারসাম্য রেখে বসানো আছে। দণ্ডের অপরদিকে রাখা ওজন জল তোলার কাজ অনেকটা সহজ করে। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক কবরে অঙ্কিত চিত্র। ভারতে আজও লাটাখাম্বা বা ডোঙা নামে পরিচিত এমন জিনিস ব্যবহৃত হয়।

নগরের বিকাশ

সে যুগের মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নদীর উপযোগিতা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। এটাও তারা বুঝেছিল স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জলসেচের মাধ্যমে নদীকে ব্যবহার করতে পারলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো যায় (চিত্র ২.১৪)। তবে একটিমাত্র গ্রামের চেয়ে অনেকগুলি গ্রামের পক্ষে একত্রিত হয়ে এ কাজ করা সহজ ছিল। এ ছাড়া, বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সকলের মিলিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হল। বস্তুসামগ্রী প্রদর্শনের জন্য সুবিধাজনক কিছু স্থানকে চিহ্নিত করা হল। সেখানে শস্যের বিনিময়ে বস্ত্র বা মশলা বা কুশলী কারিগরের তৈরি যন্ত্রপাতি পাওয়া যেত। কিছু প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় কয়েকটি গ্রামের মানুষ সম্মিলিতভাবে নগর গড়ে তোলে। নগর পত্তনের সঙ্গে যারা বস্তুসামগ্রীর উৎপাদন এবং বিনিময়ে সরাসরি অংশ না নিয়েও সবকিছুর পরিচালনা ও সমন্বয় করবে এরকম এক প্রশাসক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটল।

উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি ও বণ্টনব্যবস্থা আর একদিক দিয়ে নগর-ব্যবস্থার বিকাশের সাহায্য করেছিল। মানুষ তার স্থানীয় প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশি উৎপাদন করতে শুরু করল। এজন্য কৃষিভিত্তিক সমাজের সমস্ত মানুষের কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করবার প্রয়োজন হল না। তারা কেউ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করত অথবা কেউ হয়তো সঙ্গীত, নৃত্য বা চারুকলায় উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করত। যারা কৃষিকাজের জন্য যন্ত্রপাতি বা খাদ্যসংগ্রহের পাত্র তৈরি করত, যারা ঘরবাড়ি বা গাড়ি বানাত, যারা চাকে মৃৎপাত্র তৈরি করত, উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দিয়ে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হত। এছাড়াও ছিল প্রশাসক ও পুরোহিত গোষ্ঠী, যারা খাদ্য উৎপাদনে সরাসরি অংশগ্রহণ করত না। এরা সকলেই ছিল নগরের অধিবাসী।

বর্তমান কালের মতোই নগরে বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে হত আশেপাশের বা দূরবর্তী গ্রামগুলির কৃষির ওপর। এর ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হল। যারা উৎপাদন করত অথবা অন্য কাজের মাধ্যমে উৎপাদনে সহায়তা করত অর্থাৎ, যারা নিজে হাতে কাজ করত তাদের সঙ্গে প্রধানত বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা প্রশাসক ও পুরোহিতদের দূরত্ব সৃষ্টি হল। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের উন্নতির ক্ষেত্রে এই বিভাজনের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। এই প্রথম, কাজ ও পেশার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার সূচনা হল। যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করতে পারার ফলে উৎপাদনের কাজে যুক্ত নয় এমন মানুষদেরও সমাজ প্রতিপালন করতে সমর্থ ছিল। এইসব মানুষের চিন্তা করার অবকাশ ছিল, সময় ছিল নিজ বৃত্তির উন্নয়নের, শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির এবং ধর্মীয় ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জনের।

বাড়তি উৎপাদিত সামগ্রী ভূমিপথে, নদীপথে এবং সমুদ্রপথে অন্যত্র পরিবাহিত হত। তার বিনিময়ে জীবনধারণের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এমনকি বিলাসসামগ্রীও আনা হত। এতে ভেলা, নৌকা ও ছোট জাহাজের মতো পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রচণ্ড উৎসাহ এল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, কারিগরি কুশলতার বিনিময় এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হল।

সামাজিক গঠনে পরিবর্তন

আমরা দেখেছি, সামাজিক গঠনের ওপরে আলোচিত প্রবণতা শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রগতির গতিরোধ করেছে এবং সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গেছে। উৎপাদিত শস্য সকলের প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত হত তা মুষ্টিমেয় প্রশাসক গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হতে শুরু করল। তারাই কালক্রমে রাজা ও পুরোহিত শ্রেণীর স্বতন্ত্র এক সম্প্রদায় তৈরি করল। প্রশাসক গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারীরা কালক্রমে সংস্পর্শের অভাবে কৃষিকাজ বা অন্যান্য উৎপাদনমুখী দৈহিক কাজের পদ্ধতি ভুলে গেল। নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের প্রচার করতে ও সমাজের বাকি অংশের সম্ভ্রম আদায় করতে তারা স্মরণসৌধ, মন্দির ও অবসর যাপনের প্রাসাদ নির্মাণে ব্যস্ত হল। আরো বেশি উর্বর জমি দখলের জন্য তারা সৈন্যদল গড়ে তুলল। তাদের গুরুগিরিও বৃদ্ধি পেল। তারা এমন ধারণা সৃষ্টি করল যে, তারা দৈবী-ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন সাধারণ মানুষের পথপ্রদর্শক এবং নেতা হওয়ার জন্য। এভাবে সমাজ উৎপাদক শ্রেণী ও উপভোক্তা শ্রেণীতে বিভক্ত হল।

এর খারাপ দিকটা হল, যারা একদিন জ্ঞান ও প্রকৌশলের সাহায্যে উৎপাদন বাড়িয়েছিল, এবং তার জন্যই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, তারা সেই মৌলিক জ্ঞান ও প্রকৌশল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাস্তব সমস্যার সমাধানে, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা প্রকৌশলের ব্যবহারের বদলে তারা যাদু ও মিথ্যা বিশ্বাস ছড়ানোর আশ্রয় নিল। প্রকৌশল ব্যবহারকারী চাষী এবং কারিগরেরা বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সমস্যায় জর্জরিত হল। তাদের পদ্ধতিগত উন্নতি করার ক্ষমতাই রইল না। পক্ষান্তরে, ভোক্তা শ্রেণী যাদের সময়, সম্পদ ও ক্ষমতা ছিল, তাদের এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহই রইল না। এসবের ফলে

কারিগরীর উন্নতি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হল। ইতিহাসে দেখা যায়, এ জাতীয় রুদ্ধ অবস্থা সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশের কারণ হয়। সিন্ধু সভ্যতায় এমনই ঘটেছে। কোথাও আবার বিজেতা কোনো জাতির প্রভাবে সভ্যতার পুনর্বিন্যাসও ঘটেছে। ইউরোপে ঠিক এমনই ঘটেছিল। সেখানে দুর্বল এবং রুদ্ধগতি সমাজে বিদেশী বর্বরদের আক্রমণ ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতির কেন্দ্রভূমি এক স্থান থেকে অন্য ভৌগোলিক অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার সামাজিক অবস্থার একটা মোটামুটি চিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা এই যুগের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাফল্যের পরিচয় দেব। পরবর্তী যুগের ঘটনাবলীতে এগুলির প্রচুর প্রভাব পড়েছিল।

২.৩.২ ব্রোঞ্জযুগে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

প্রযুক্তির যে প্রধান অগ্রগতি নগরোন্নয়নের সঙ্গে জড়িত ছিল তা হল ধাতুর, বিশেষ করে তামা এবং তার সংকর ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ও ব্যবহার। পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং উন্নততর পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। নগরজীবনের অন্তর্ভুক্ত নানা ধরনের কাজকর্ম সমাজে এক গুণগত পরিবর্তন আনল। এটাই হল সচেতন বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত। এটা সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে, অগ্রগতির এই প্রাথমিক অবস্থায় কারিগর শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী পুরোহিত শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজকর্ম করবার প্রয়োজন হয়েছিল। বস্তুসামগ্রীর সংখ্যা বা পরিমাণ নথিভুক্ত করা, মাপের নির্দিষ্ট একক তৈরি, গণনা এবং হিসাব ও পঞ্জিকা তৈরির মাধ্যমে ব্রোঞ্জযুগে পরিমাণগত বিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হয়। আমরা এখন সংক্ষেপে এই সমস্ত দিকগুলির আলোচনা করব।

ধাতুর ব্যবহার

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এমন দুটি ধাতু সোনা ও তামার উজ্জ্বলতায় মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রথমদিকে এগুলি অলঙ্কার হিসাবেই ব্যবহার হত। প্রস্তরযুগে গলার হার এবং অন্যান্য অলঙ্কারে ধাতুর টুকরো পাওয়া গেছে। তামা অত্যন্ত নরম ধাতু হওয়ায় খনির তামার পিণ্ডকে পিটিয়ে বিভিন্ন আকার দেওয়া সম্ভব হলেও হাতিয়ার বা যন্ত্র তৈরির জন্য তা খুব কাজের ছিল না। পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করবার জন্য আগুনের চুল্লী চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীতে খনিজ তামার আকরিকের বিজারণ ঘটিয়ে তামা নিষ্কাশন সম্ভব হল। পরবর্তীকালে তামা ও টিনের ধাতুসংকর আবিষ্কৃত হল। তামা অপেক্ষা এটি অধিক দৃঢ় ও কঠিন হওয়ায় এর থেকে ঢালাই করে অস্ত্র এবং যন্ত্রাদি তৈরি করা যেত। গলানো তামা এবং টিনের মিশ্রণ ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা হত। মিশ্রণ ঠাণ্ডা হ'লে সেটি ছাঁচের আকার পেত। দেখা গেল, এভাবে তৈরি হাতিয়ার পাথরের তৈরি হাতিয়ারের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট এবং তৈরি করাও সহজ (চিত্র ২.১৫)। ছুতোরের কাজে, রাজমিস্ত্রীর কাজে, যন্ত্র, পাত্র ইত্যাদি তৈরি করতে এই নতুন ধাতুসঙ্কর কারিগরির ক্ষেত্রে প্রায় বিপ্লব নিয়ে এল (চিত্র ২.১৬)।

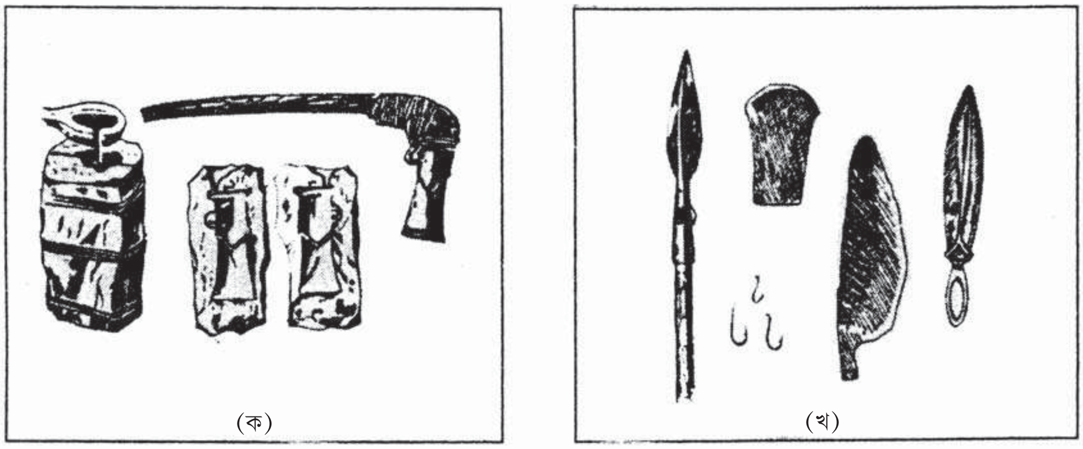

চিত্র ২.১৫ : (ক) তামার কুঠার এবং এটি ঢালাই করবার পদ্ধতি; (খ) তামার অস্ত্র এবং হাতিয়ার—(১) বর্শার ফলা; (২) কুঠার; (৩) বঁড়শি; (৪) করাত; (৫) ছোরা

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

চিত্র ২.১৬ : ১৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয় সম্রাট রেখামায়ারের কবর থেকে প্রাপ্ত কারিগরির চিত্র।

(ক) আসবাব তৈরি (তুরপুন, বাটালি, করাত, হাতুড়ির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়)
(খ) ইট তৈরি এবং ব্যবহার (বাঁকের ওপর মালের ভারসাম্য লক্ষ্যণীয়)
(গ) ব্রোঞ্জ ঢালাই (হাপর এবং চিমটের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়)
(ঘ) নানা আকৃতির তৈরি পাত্র এবং মূল্যবান ধাতু ওজন করা (বাঁকের সঙ্গে এখানে ব্যবহৃত দাঁড়িপাল্লার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়)। লক্ষ্য করুন, এসব কাজ সম্পর্কে লিখিত লিপি রয়েছে। ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অস্ত্র এবং যন্ত্রাদি তৈরিতে এই নতুন ধাতুসংকর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং দূরদেশের বাণিজ্যে এটি ছিল একটি পণ্য। ভারতবর্ষে রাজস্থানে প্রচুর তামার আকরিক সংগৃহীত হত এবং তা ব্যাবিলনে রপ্তানির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা দুর্গম অঞ্চল থেকে শহরে এবং দূরবর্তী স্থানে আকরিক পাঠানোর সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

পরিবহণ

নদী-উপত্যকার সভ্যতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর বসতিগুলি নদীতীরে বরাবর স্থাপিত হয়েছিল এবং কিছু শহরও গড়ে উঠেছিল। শহরের বাড়িঘর, স্মৃতিসৌধাদি নির্মাণের জন্য কাঠ এবং পাথর বহুদূর থেকে বহন করে আনতে হত। নগরগুলির বিকাশ থেকে মনে হয় যে, সকলেরই ভূমির ওপর নির্ভরশীল থাকার প্রয়োজন ছিল না। সমাজে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিল, ফলে কিছু লোক বাণিজ্য অথবা অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহের জন্যও ব্যবহৃত হত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মেসোপটেমিয়া যে বাহরিনের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে ব্যাপকভাবে বাণিজ্য করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তামা ছাড়াও ভারত থেকে ময়ূর, বানর, হাতির দাঁত এবং হাতির দাঁতের চিরুণি, মুক্তা এবং সুতিবস্ত্র রপ্তানি হত। বিনিময়ে রূপো এবং অন্যান্য পণ্য

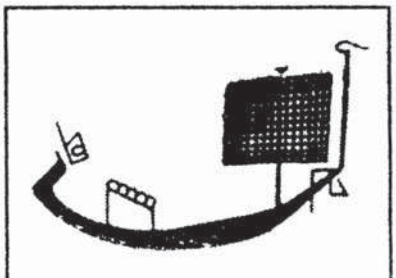

চিত্র ২.১৭ : ৫০০০ বছরের পুরনো নীলনদের নৌকার একটি মিশরীয় চিত্র যাতে পালের সবচেয়ে প্রাচীন চিত্রায়ণ দেখা গেছে

আমদানি হত। বাণিজ্যের প্রয়োজনে এবং বৃহৎ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থার খুবই প্রয়োজন ছিল। নদীগুলির যথেষ্ট নাব্যতা থাকায় সম্ভবত নদীপথে পরিবহণই সবচেয়ে আগে প্রচলিত হয় (চিত্র ২.১৭)।

বেশি পরিমাণ মাল পরিবহণের জন্য গাছের গুঁড়ি থেকে নির্মিত ডোঙা এবং বাঁশ ও নলখাগড়ার তৈরি ভেলার ব্যবহারের নজির আমরা পেয়েছি। পালের আবিষ্কার আগেই ঘটেছিল এবং সেটিই ছিল গতিসঞ্চারের কাজে অপ্রাণিজ শক্তি ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন। নদী-পরিবহণ যখন সমুদ্রপথেও বিস্তৃত হল তখন নৌকা তৈরি এবং নৌচালনার ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। প্রবল হাওয়ার জন্য আরো

মজবুত কাপড়ের পাল এবং তা খাটানোর জন্য আরো মজবুত কাঠামোর প্রয়োজন হল। কাঠের কাজ আরো মজবুত ও টেঁকসই হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। নদী নির্দিষ্ট পথে চলে, তাই নদীপথ কতকটা রাস্তার মতোই। কিন্তু বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে পথ হারানোর সম্ভাবনা আছে। দিক এবং অবস্থান নির্ণয়ের জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন দেখা দিল। কূল-খোঁজা পাখিই ছিল এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। সূর্য এবং তারাদের সাহায্যে নৌচালনাও বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছিল।

সে যুগে তীর বরাবর নৌচালনা করা হত। ডাঙা নাবিকদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে একটি কাককে নৌকা থেকে ছেড়ে দেওয়া হত। তার উড়ে যাওয়ার পথই নিকটতম ডাঙার পথ বলে বোঝা যেত। আপনি হয়তো বাইবেলের নোয়ার গল্প পড়ে থাকবেন। প্রথমে, নোয়া একটি কাককে তাঁর নৌকা থেকে ছেড়ে দেন ডাঙা কোন্ দিকে তা বোঝার জন্য। পরে আবার একটি পায়রাও ছেড়ে দেন; সে ডাঙা উর্বর কিনা তা জানতে।

নগরোন্নয়নের সঙ্গে স্থলপথে স্বল্প-দূরত্বে ভারী জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথমদিকে সম্ভবত স্লেজগাড়িতে এ কাজ করা হত। পাহাড়ের উৎরাই পথে ভারী স্লেজ টানা সহজ ছিল। সমতলভূমিতে গাছের গুঁড়িকে রোলার হিসাবে ব্যবহার করা হত। যদিও চাকা প্রথম কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তবুও চাকার আবিষ্কার পরিবহণ-ব্যবস্থায় বিপ্লব নিয়ে এল। মাল এবং যাত্রী পরিবহণের জন্য ঠেলাগাড়িতে চাকার ব্যবহার ব্রোঞ্জযুগে উন্নয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির একটি। তবে নিরেট চাকাকে গাড়ির সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করা যাতে চাকা সহজে ঘোরে অথচ গাড়ির থেকে খুলে না আসে—এটাই হল সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন। অন্যভাবে বলা যায় চাকা এবং অক্ষদণ্ড (axle) এই দুটি হল মানুষের বুদ্ধিমত্তার যমজ সন্তান। এরপরই মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রথম পশুতে টানা গাড়ি ব্যবহৃত হয়। মিশরে এর ব্যবহার হয় অনেক পরে, কেননা পরিবহণ এখানে প্রধানত নদীপথেই হত। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার গাড়িতে এবং ভারতে বর্তমানেও কোনো কোনো গাড়িতে দেখা যায় যে, অক্ষদণ্ডটি গাড়ির সঙ্গে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকে (চিত্র ২.১৮)।

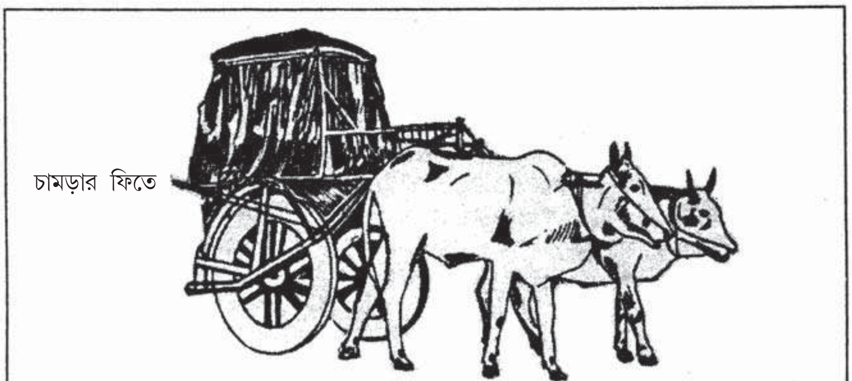

চিত্র ২.১৮ : ভারতের একটি বলদে টানা গাড়ি। অক্ষদণ্ডের সঙ্গে চামড়ার ফিতে দিয়ে গাড়ির সংযোগ লক্ষ্যণীয়।

চাকার ঘূর্ণন, পাথর সরাতে লিভারের ব্যবহার, শস্যাগার ও মন্দির তৈরি করতে ভারী জিনিসকে আনতে তলের সাহায্যে তোলা বা নামানো, এসব কাজ বলবিদ্যার চর্চায় প্রচন্ড উৎসাহ যোগাল। মানুষের গতিশীলতা বাড়াতে বলবিদ্যা এক নাটকীয় ভূমিকা গ্রহণ করল। আর আজকে তো আমরা অতিদ্রুতবেগে পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চলে পৌঁছাতে পারি। সমুদ্র পাড়ি দেওয়া, আকাশে ওড়া, এমনকি মহাকাশযাত্রাও আমাদের হাতের মুঠোয়।

পরিমাণগত বিজ্ঞান

উদ্বৃত্ত কৃষিজ শস্য এবং হস্তশিল্পীদের প্রস্তুত করা অকৃষিজ সামগ্রীর উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় এবং বাণিজ্য জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল। সময়ের সঙ্গে বিনিময় এবং বাণিজ্যে ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রীর বৈচিত্র্য ও পরিমাণও বৃদ্ধি পেল। ফলে কোন্ জিনিসের সঙ্গে কোন্ জিনিস কত পরিমাণে বিনিময় করা হবে তা শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ এবং বিনিময় পরিচালনা করবার জন্য জিনিসপত্রের সংখ্যা, পরিমাণ এবং ওজনের মতো কিছু পরিমাপের প্রয়োজন হল।

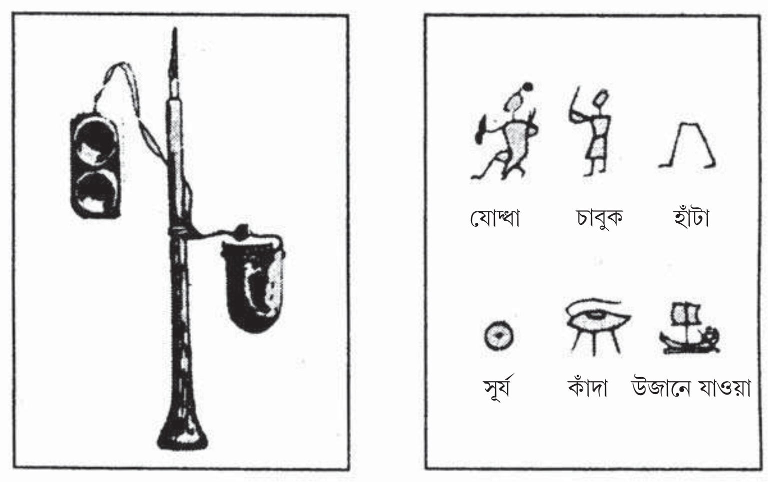

(ক) (খ)

চিত্র ২.১৯ : (ক) প্রাচীন মিশরের লেখার সরঞ্জাম, কালির পাত্র, সূচালো নলখাগড়ার কলম, জলের পাত্র। (খ) কিছু মিশরীয় চিত্রলিপি (hieroglyph.)

বিনিময়ের বস্তু নথিভুক্ত করার জন্য প্রথমে মাপের প্রতীক দিয়ে বস্তুটির ছবি বা সংক্ষিপ্ত চিহ্ন এঁকে রাখা হত। ক্রমে জিনিসের সঙ্গে কাজের চিহ্নও সংযোজিত হল এবং এর ফলে হল লেখার সূচনা। চীনা ভাষার মতো সমস্ত ভাব বোঝাতে একটি প্রতীক চিহ্ন অথবা মেসোপটেমিয়ার কীলকামার (cuneiform) লিপি বা মিশরের চিত্রলিপির (hieroglyphics) মতো প্রতীক এবং শব্দচিহ্ন একসঙ্গে রেখে হয়তো লিপির উদ্ভব হয়ে থাকবে (চিত্র ২.১৯ এবং ২.২০)। নির্দিষ্ট ওজনে বিনিময়ের জন্য

তুলাযন্ত্রের উদ্ভাবন হল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিনিময়ের সঠিক হিসাবের জন্য যোগ ও বিয়োগের মতো সরল অঙ্কের জন্ম হল এবং সেখান থেকেই শুরু হল পাটীগণিত।

বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ইটের ব্যবহার সমকোণ ও সরলরেখার সম্বন্ধে ধারণার জন্ম দিল। এখানেই জ্যামিতির সূত্রপাত। বর্তমানকালের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের এক বড় গোষ্ঠী, যেমন কলকাতার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অক্সফোর্ডের এ্যালচিন (Allchin) মনে করেন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় জ্যামিতির সূত্রপাতও এই সময়েই হয়েছিল।

চিত্র ২.২০ : মেসোপটেমিয়ার কীলকামার লিপি—একটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ রাজা হামুরাবির আইন (১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দর কাছাকাছি) স্তম্ভের উপরিভাগে দেখা যাচ্ছে সূর্যদেব রাজা হামুরাবিকে আইন শিক্ষা দিচ্ছেন এবং নীচে আইনগুলি। এই স্তম্ভের একটি নকল দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

পরবর্তী লৌহযুগে গ্রীক জ্যামিতিবিদরা এই সভ্যতার জ্যামিতিক ধারণাগুলি গ্রহণ করেন এবং তার ফলে এগুলি আধুনিক জ্যামিতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নির্মাণের কাজে ইটের ব্যবহার জ্যামিতিক নকশার ক্ষেত্রফল ও কঠিন বস্তুর আয়তনের ধারণা তৈরি করল। পার্শ্বগুলির দৈর্ঘ্যের হিসাব থেকে এগুলির ক্ষেত্রফল বা আয়তন নির্ণয় করা শুরু হল। প্রথমে শুধু চৌকোণা ব্লকের আয়তনই হিসাব করা হত। পরবর্তীকালে গণিতে অগ্রগতির সঙ্গো মিশরে পিরামিডের আয়তন নির্ণয় করাও সম্ভব হয়েছিল। গণনা এবং হিসাব করার দক্ষতা শীঘ্রই পঞ্জিকা নির্মাণ বা তার থেকে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে লাগল। এই অংশের প্রথমদিকে আমরা দেখেছি যে সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাদের অবস্থান নৌচালনার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। বড় আকারে কৃষিকর্মের পরিকল্পনা করার জন্যও ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজন অনুভূত হত। শস্য ঠিক সময়ে বোনা এবং কেটে তোলা জরুরি ছিল। নদী-উপত্যকায় বন্যা নিয়মিত ব্যাপার ছিল, তাই এ ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতিও ছিল অতি প্রয়োজনীয়। বছরের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে মিশরীয়দের সূর্য ও নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তারা বছরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৪২২ দিন বলে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

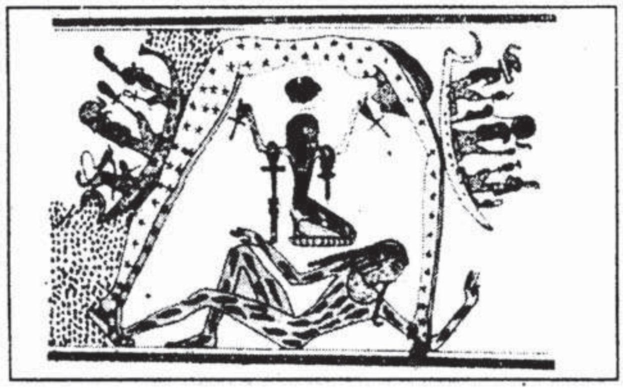

চিত্র ২.২১ : বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রাচীন মিশরীয় ধারণা। ওপরের তারকা-খচিত মানবী হলেন আকাশদেবী 'নাট'। 'নাটের নীচে পবনদেব 'শু', যাঁর দু'হাতে অমরত্বের প্রতীক। তাঁর নীচে শায়িত পৃথিবীর দেবতা 'জেব', যাঁর দেহ পাতায় আচ্ছাদিত। ছবির দু'দিকে নৌকার ছবি সূর্যের দৈনন্দিন আকাশ ভ্রমণ সূচিত করছে।

সুমেরীয়রা এবং মেসোপটেমিয়ায় তাদের উত্তরসূরীরা নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দ্বারা সৌর ও চন্দ্র পঞ্জিকার মধ্যে সামঞ্জস্য এনেছিল। তাঁরা ষষ্টিভিত্তিক গণনার নিয়ম আবিষ্কার করেন, যাতে একটি বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে, (যা এক বছরে দিনের সংখ্যার প্রায় সমান) এক ঘণ্টাকে ৬০ মিনিটে ও এক মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে ভাগ করা হয়। এসব গণনা গাণিতিক সারণীর সাহায্যে করা হত এবং এর থেকেই পরবর্তীকালে পাটীগণিত ও বীজগণিতের সূচনা হয়।

[এক চন্দ্র বছর ৩৫৪ দিনের (১২ × ২৯$^{১}/_{২}$)। সৌর বছরের ৩৬৬ দিনের সঙ্গে মেলাতে, এর সঙ্গে হয় প্রতিবছর ১২ দিন যোগ করতে হয়, অথবা, প্রতি আড়াই বছরে ৩০ দিনের একটি ত্রয়োদশ মাস যোগ করতে হয়।]

নগরোন্নয়নের সঙ্গে আরও একটি সম্মানীয় পেশার জন্ম হ'ল, যেটি হল চিকিৎসাবিদ্যা। যদিও চিকিৎসা শুধু ক্ষত নিরাময়, অস্থি ভঙ্গ, অস্থিচ্যুতি প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ ছিল, তবু চিকিৎসকরা বহু রোগই নির্ণয় করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁরা রোগীদের রোগলক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখতেন এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। বংশানুক্রমে মৌখিকভাবে সঞ্চারিত এইসব বিবরণ পরবর্তীকালে শারীরস্থান (anatomy) এবং শারীরবৃত্তের (physiology) মতো বিষয়ের জন্ম দেয়। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে চিকিৎসকদের ভেষজ গাছ এবং খনিজ দ্রব্য থেকে ঔষধ প্রস্তুতের জ্ঞানও ছিল। এজন্য তাঁরা গাছপালা ও লতাপাতার চাষ করতেন। এর থেকেই পরে উদ্ভিদবিদ্যার জন্ম হয়।

কুম্ভকার, ধাতুকর্মী এবং রত্নব্যবসায়ীদের পর্যবেক্ষণ ও ক্রিয়াকর্মের ফলে রসায়নবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁরা অন্তত নয়টি মৌলের ব্যবহার জানতেন, যেগুলি হল সোনা, রূপা, তামা, টিন, সীসা, পারদ, লোহা, কার্বন ও গন্ধক। এছাড়া, তাঁরা বেশকিছু তরল এবং কঠিন বিকারকের সন্ধানও জানতেন। তাঁরা আকরিক গলিয়ে ধাতু নিষ্কাশন, ধাতুর শোধন ও রঞ্জন, ধাতুর ওপর কলাই-এর প্রলেপ দেওয়া ইত্যাদির মতো জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তবে ব্রোঞ্জযুগে রসায়নশাস্ত্র স্বীকৃত বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সংক্ষেপে বলা যায়, নগরগুলির আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে বাণিজ্য পরিমাণগত বিজ্ঞানের বহুশাখার জন্ম দিয়েছিল। এগুলি হল মাপের প্রমিতকরণ, পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা,

চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি। রসায়নবিদ্যা, বীজগণিত, শারীরস্থান (anatomy), শারীরবৃত্ত (physiology), উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের ভিত্তিও এই যুগেই স্থাপিত হয়েছিল।

অনুশীলনী ৫

নগরজীবনের যে বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রয়োজন হয় এবং যেসব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ব্রোঞ্জযুগে এসব কাজে সাহায্য করেছিল, নীচে সেগুলি সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। সারণীর শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন। উদাহরণ হিসাবে প্রথম শূন্যস্থানটি পূর্ণ করা হয়েছে।

	নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় বিষয়	ঐ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
(ক)	কৃষিকর্ম, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোর মিস্ত্রীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	তামা এবং এর সঙ্কর ধাতু ব্রোঞ্জের আবিষ্কার এবং বিভিন্ন যন্ত্র তৈরির জন্য ঢালাই-এর ব্যবহার
(খ)	বহুরকম জিনিস	....
	অনেক পরিমাণে	....
	বিনিময়	....
(গ)	গৃহ নির্মাণের জন্য	....
	ইটের ব্যবহার	....
	শহর-বিন্যাসের পরিকল্পনা	....
(ঘ)	....	জ্যোতির্বিদ্যা
	....	
	....	
(ঙ)	....	চিকিৎসাবিদ্যা
	....	
	....	
(চ)	অলঙ্কার তৈরি, মাটির পাত্র তৈরি, ধাতুর কাজ ইত্যাদি	....

এ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি উন্নতি কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। সিন্ধু সভ্যতার থেকে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ থেকে আমরা সেই যুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রগতি সম্বন্ধে ধারণা করতে চেষ্টা করব।

২.৩.৩ সিন্ধু সভ্যতা

বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয় অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি নগর আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে। এ নগর দু'টি সিন্ধু উপত্যকায় যথেষ্ট উন্নত সভ্যতার প্রথম নিদর্শন। পরবর্তীকালে কালিবঙ্গান, রোপার এবং লোথাল প্রভৃতি স্থানের খননকার্যে প্রমাণিত হয় যে, এই সভ্যতা দক্ষিণে সুদূর গুজরাট এবং পূর্বে হরিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সঙ্গে দেওয়া মানচিত্রে এই জায়গাগুলি দেখানো হয়েছে (চিত্র ২.২২)।

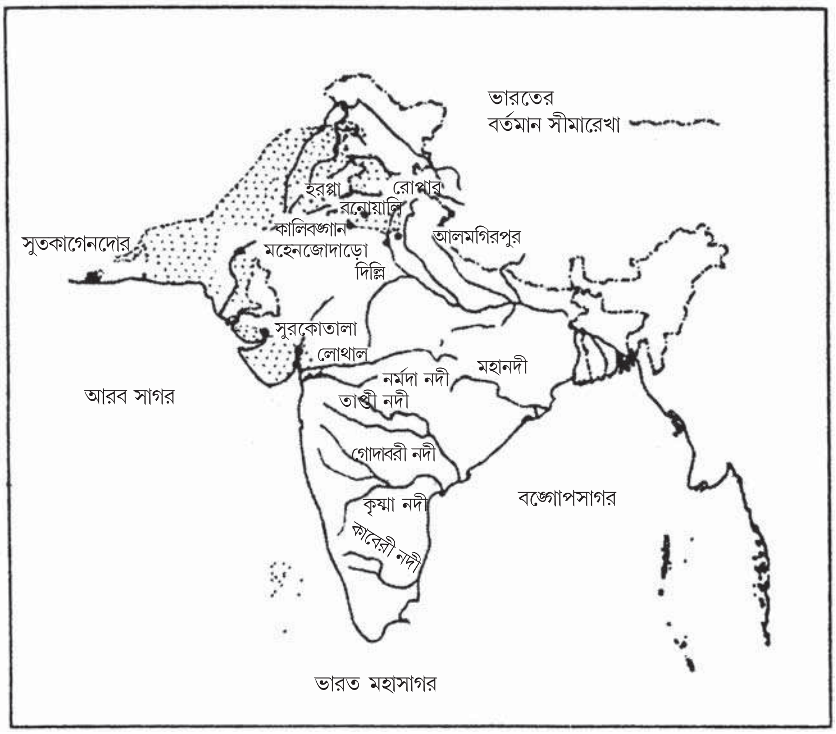

চিত্র ২.২২ : সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার : প্রধান শহরগুলির অবস্থান

সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীন শহরগুলির নগর-পরিকল্পনা আমাদের সত্যই আশ্চর্য করে। নগরগুলির কিছু বাসগৃহ বহুতল বিশিষ্ট এবং প্রাসাদোপম। এগুলি সযত্নে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি এবং উন্নত ধরনের স্নানাগার ও শৌচাগার প্রভৃতি সুবিধাযুক্ত। এগুলি নিশ্চয়ই ছিল ধনীদের প্রাসাদ। শহরগুলি ছিল ২০০ গজ × ৪০০ গজ মাপের এক-একটি আয়তক্ষেত্রে বিন্যস্ত, চওড়া রাজপথ এবং সুন্দর ছোট ছোট রাস্তা দ্বারা যুক্ত। রাস্তাগুলি সোজা এবং পরস্পর সমকোণে অবস্থিত। বৃষ্টির জল নিকাশের চমৎকার নিকাশি ব্যবস্থা এবং অপরিষ্কার জল জমা হওয়ার জন্য গর্ত কাটা ছিল। সুবৃহৎ সুগঠিত শস্যাগারও দেখা গেছে। আয়তাকার বসতিগুলির মধ্যে ছোটমাপের গৃহগুলিতে নিশ্চয়ই মজুর ও দাসেরা বাস করত। সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলিতে সাধারণের ব্যবহার্য স্নানাগার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ২৩′ × ৩০′ × ৮′ মাপের

একটি আয়তাকার জলাধারবিশিষ্ট উন্মুক্ত অঙ্গনকে ঘিরে বহু কামরা এবং বহুতলবিশিষ্ট গৃহ দেখা গেছে। জলাধারের প্রাচীরগুলি ইট দিয়ে সুন্দরভাবে গাঁথা এবং মাঝখানের একটি স্তর জলনিরোধক পিচের তৈরি জলাধারটি। পরিষ্কার করার জন্য একটি সুগঠিত নিকাশি নালা দিয়ে জলাধারের জল খালি করা হত এবং কাছাকাছি অন্য এক কূপ থেকে জল এনে সেটিতে জল ভর্তি করা হত। (চিত্র ২.২৩)

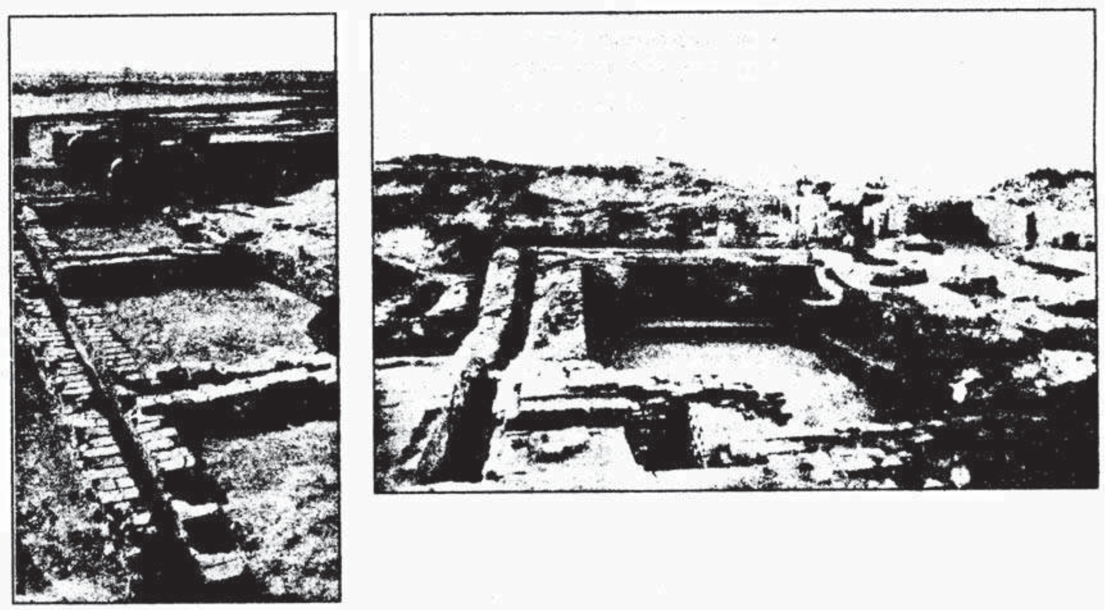

চিত্র ২.২৩ : (ক) বাসগৃহের পাশাপাশি সাধারণ পয়ঃপ্রণালী, লোথাল (খ) মহেঞ্জোদাড়োর জলাধার

সিন্ধুসভ্যতার উন্নতমানের গঠনপ্রণালী ও বিন্যাস প্রমাণ করে যে, এইসব নগরের মানুষদের কারিগরি ও প্রযুক্তির জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত ছিল। জ্যামিতি ও জমির সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে তাঁরা নির্মাণ পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে, নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতির ইট তৈরি, সেগুলিকে গৃহ ও রাজপথ নির্মাণে বিভিন্ন মাপে ও আকৃতিতে সোজাসুজি ও কোণাকুণি স্থাপন করা প্রভৃতির জন্য তাঁদের গভীর জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছিল।

৬০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা 'শুল্ভাসূত্র' নামে একটি পুঁথিতে বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন জ্যামিতিক উপপাদ্য ও স্বতঃসিদ্ধের বিবরণ দেখা যায়। এইসব সূত্র বৈদিক যুগে জটিল আকৃতির যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হত। কালিবঙ্গানের মতো সিন্ধুসভ্যতার কিছু শহরেও যজ্ঞবেদীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তথ্য থেকে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, এই 'শুল্ভা' জ্যামিতি আসলে আদি সিন্ধুসভ্যতার সৃষ্টি। এই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে পরবর্তী যুগে সঞ্চারিত হয়েছে।

আমরা পিথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্য থেকে জানি যে, "সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর বর্গ তার অপর দুটি বাহুর ওপর বর্গদ্বয়ের সমষ্টির সমান হবে।" (চিত্র ২.২৪)

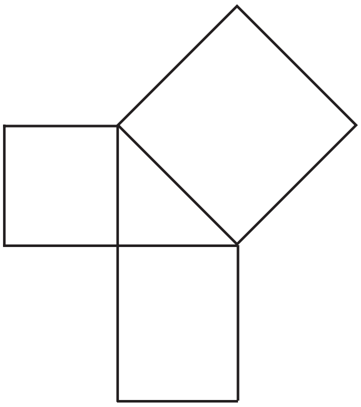

চিত্র ২.২৪ : পিথাগোরাসের উপপাদ্যের চিত্র

এটি গ্রীক চিন্তাবিদ্ পিথাগোরাসের (৫৮২-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আবিষ্কার বলেই আমরা জানি। 'শুল্‌ভাসূত্রে' এর একটি বিকল্প বয়ান আছে, যেটি হল, "আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যে ক্ষেত্রফল রচনা করে তা এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দ্বারা ভিন্ন ভিন্নভাবে রচিত ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান"। এছাড়াও 'শুল্‌ভাসূত্র' জ্যামিতিক চিত্রাবলির অঙ্কন, ক্ষেত্রফলের সমন্বয় এবং পরিবর্তনসাধন, ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের পরিমাপন, বৃত্তকে সমক্ষেত্রফলের বর্গক্ষেত্রে বা বর্গক্ষেত্রকে সমক্ষেত্রফলের বৃত্তে পরিণত করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রফলের সদৃশ চিত্র অঙ্কন করা এবং এই ধরনের আরও অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে। 'শুল্‌ভাসূত্রে' '২' এর বর্গমূলের (√২) মান দেওয়া আছে ১.৪১৪২১৫৬।

এইসব থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীরা যথেষ্ট উন্নত জ্যামিতিক জ্ঞানের অধিকারী ছিল।

মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানে খনন থেকে পাওয়া বিভিন্ন ব্রোঞ্জ নির্মিত যন্ত্রপাতি, পাত্র, সীল, গহনা, খেলনা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, সিন্ধুসভ্যতা বিজ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার এক উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। (চিত্র ২.২৫) প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষা থেকে পাওয়া বিভিন্ন হস্তশিল্পের নিদর্শন প্রমাণ করে যে, মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এদের বাণিজ্য সংযোগ ছিল। সিন্ধুনদের তীরের উর্বর পরিমাটিতে গভীর কর্ষণ ছাড়াই কৃষিকাজ চালানো যেত। এজন্য এখানে ব্রোঞ্জ নির্মিত লাঙলের বদলে শুধু মাটিতে অগভীরভাবে বীজবোনার হাতিয়ারই পাওয়া গেছে।

সিন্ধুসভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সেখানে শুধু শক্ত ছুরি, বাটালি, করাতের মতো মজবুত যন্ত্রপাতি এবং গহনা তৈরিতে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় কখনোই কোনো যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে এর ব্যবহার হয় নি। যে পাতলা বল্লম পাওয়া গেছে তারও কোনো মধ্যশিরা না থাকায় যুদ্ধে তা অচল। কোনো ব্রোঞ্জের তীরের ফলাও পাওয়া যায় নি। মনে হয়, প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা বিশেষভাবে অহিংস ছিল।

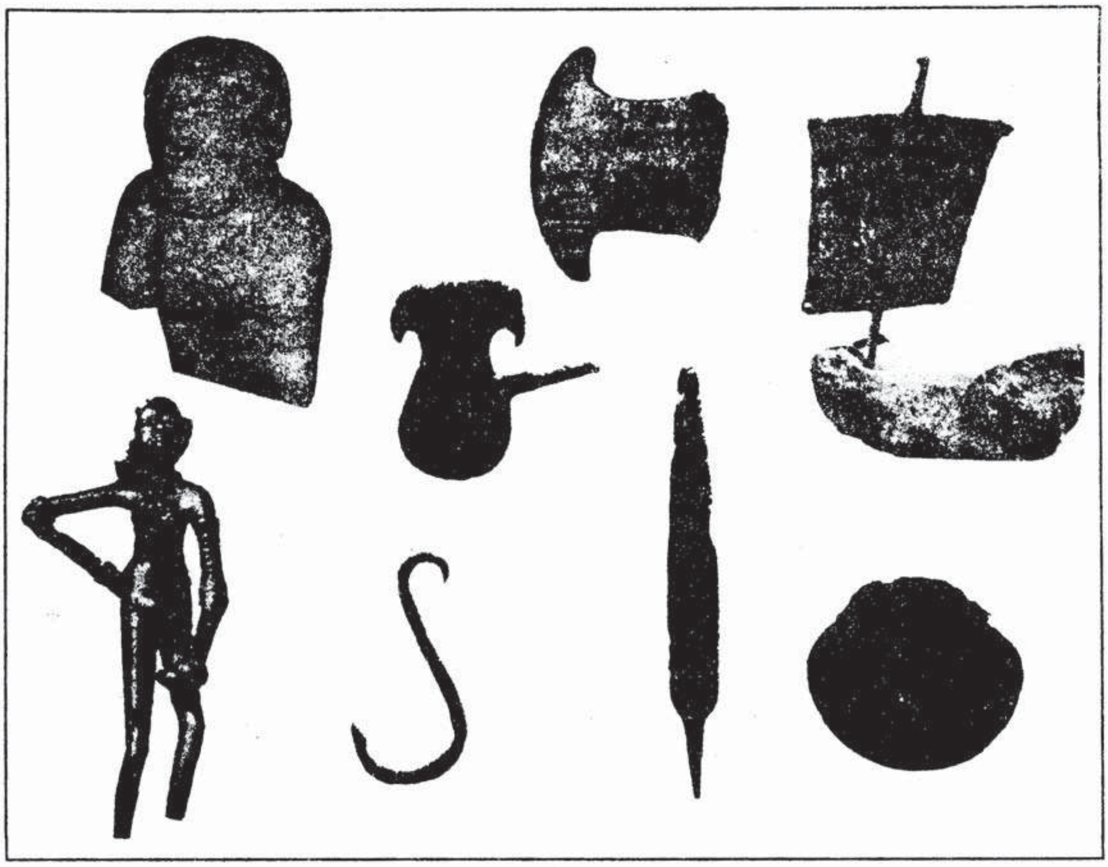

চিত্র ২.২৫ : সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলে খননের ফলে প্রাপ্ত হাতিয়ার ও শিল্পদ্রব্য

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে এইসব সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাস্তব তথ্য থেকেই গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে এসব অঞ্চল থেকে পাওয়া হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি, পাত্র এবং বস্ত্রের মতো শিল্পদ্রব্য, স্থাপত্য এবং নগর পরিকল্পনা নগরের জলসরবরাহ ও নিকাশীব্যবস্থা ইত্যাদির নির্দশন। সেখানে যেসব সীলমোহর পাওয়া গেছে সেগুলির লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে আমরা ঐ যুগের কথা আরও জানতে পারতাম। ঐ সমস্ত সীলমোহরে খোদিত লিপি এবং প্রতীক কোন্ অর্থ বহন করে তা এখনও উদ্ধার কথা সম্ভব হয় নি। তাই ভবিষ্যতে আরও তথ্যসম্ভারের উদ্‌ঘাটন হতে পারে যা ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর নতুন আলোকপাত করবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, আমরা এতক্ষণ দেখলাম উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন কেমনভাবে গ্রাম ও নগরের জন্ম দিল। নগরের বিকাশ আরও চাহিদার সৃষ্টি করে বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার অগ্রগতি ঘটাল। এই অগ্রগতি আবার উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করল। এই সময়ে উদ্ভাবিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পরবর্তী চিত্র ৫০০০ বছরেও বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি। আমরা বেশিরভাগই এখনও একই ধরনের চেয়ার, টেবিল ব্যবহার করি, একই ধরনের ইট, পাথর ও মশলার দেওয়াল আর ছাদওয়ালা গৃহে বাস করি, একই

ধরনের সুতি, রেশম বা পশমের বস্ত্র পরিধান করি, একই রকমের পাত্রে আহার করি। যেসব শস্য আমরা প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তার বেশিরভাগই সে যুগেও জানা ছিল। যে গৌরবময় যুগের কাছে আমরা এত ঋণী, তার অবসান হয় প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এখন আমরা ব্রোঞ্জযুগ সভ্যতার পতনের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

২.৩.৪ ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার পতন

আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন নগর-ব্যবস্থার উত্থানের সঙ্গে উৎপাদনের পদ্ধতির যে বিরাট উন্নতিসাধন হয়েছিল তা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েক শতাব্দী। প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রাথমিক বিস্ফোরণের পর পরবর্তী দীর্ঘসময় ধরে প্রগতি থমকে ছিল। নগরের উত্থান ও পতন হয়েছিল; এক পুরোহিত-রাজতন্ত্র অপর পুরোহিত-রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেছিল, কিন্তু উৎপাদনের পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন সাধন হয়নি। প্রধানত সেচের ওপর নির্ভরশীল কৃষিকাজ এবং সেইসঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সমাজের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানেই এই পদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল।

সম্ভবত সামাজিক বিন্যাসে পরিবর্তনই এরকম ঘটবার কারণ। আদিম সমাজে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী ছিল না। পক্ষান্তরে সমাজে এখন বিভিন্ন স্তরভেদ দেখা দিল। ২.৩.১ অংশে আমরা দেখেছি উৎপাদক এবং উপভোক্তাদের মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল। এর অর্থ এই যে, শ্রমজীবী মানুষ এবং চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা এও আলোচনা করেছি, এর ফলে বিজ্ঞানের প্রগতি কীভাবে তখন থমকে গিয়েছিল। কালক্রমে সমাজে শোষণের সূত্রপাত হল। কৃষক ও নগরের কারুশিল্পীরা ক্রমশ দরিদ্রতর হতে হতে অনেকে শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। সমাজে 'যাদের আছে' আর 'যাদের নেই' এই দুই শ্রেণী বিভাজনের ফলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল। এতে নগর-রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে তাদের কারিগরী ও বৌদ্ধিক অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ হয়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমাগত বহিরাক্রমণও এইসব নগর-সংস্কৃতির ওপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। আরও জমি দখল করে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য-সংকুলানের জন্য তাদের নগর-রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হত। তাই আত্মরক্ষার জন্য তাদের সৈন্যদল গঠন ও দুর্গ নির্মাণ করতে হত। সিন্ধু-উপত্যকার অহিংস সমাজকেও পরবর্তীকালে দুর্গ নির্মাণ করতে হয়েছিল। দুর্গ, প্রতিরক্ষা বেষ্টনী, পাথর ছোঁড়ার গুলতি, চলন্ত মিনার প্রভৃতি যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈরির জন্য বলবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োজন হল। যুদ্ধ জীবনের অংশ হওয়ায় এক নতুন পেশার মানুষ তৈরি হল। এরা নতুন যুদ্ধ-সরঞ্জাম উদ্ভাবন ও উৎপাদন করত। প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের প্রয়োজনে নানা নির্মাণকার্য চালাত। তারাই সম্ভবত বর্তমান যুগের ইঞ্জিনিয়ারদের পূর্বপুরুষ।

নগর-রাষ্ট্র ছিল একাধারে একটি নগর এবং স্বাধীন রাষ্ট্র, যেমন মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলন, গ্রীসের এথেন্স ইত্যাদি।

আমরা ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার কাহিনী শেষ করব এই বলে যে, নদী-উপত্যকার সভ্যতার প্রগতি যখন তার কেন্দ্রে অবরুদ্ধ হয়েছে তখনই তার প্রভাব দূরদূরান্তরে প্রসারিত হয়েছে। অসামান্য ও বহুমূল্য

জ্ঞানসম্ভার পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের পরবর্তী প্রধান যুগ, অর্থাৎ লৌহযুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকখানিই এই প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। লৌহযুগের মানুষ তাদের নিজেদের ধ্বংস করা সভ্যতার মহত্ত্ব অস্বীকার করেনি। হোমারের বিখ্যাত রচনা 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'-তে সেই সময়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। পরের এককে আমরা লৌহযুগের মানুষদের সম্পর্কে জানব।

অনুশীলনী ৬

নীচের দেওয়া বাক্যাংশগুলির মধ্যে ব্রোঞ্জ সভ্যতার পতনের সঠিক কারণ তিনটির পাশে (✓) চিহ্ন দিন

(ক) উৎপাদক এবং উপভোক্তা এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব। ☐

(খ) বিভিন্ন নগরের উত্থান ও পতন। ☐

(গ) যাযাবর দস্যুদের আক্রমণ। ☐

(ঘ) এক পুরোহিত-রাজতন্ত্রের দ্বারা অন্য একটির উৎখাত। ☐

(ঙ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নগরগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি। ☐

২.৪ সারাংশ

আপনি দু'টি প্রধান ঐতিহাসিক যুগ, প্রস্তর যুগ ও ব্রোঞ্জযুগ সম্বন্ধে অধ্যয়ন শেষ করেছেন। এই এককে আমরা আদিম মানবসমাজে বিজ্ঞানের সূত্রপাত এবং প্রাচীন মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশের উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছি। মানুষের ইতিহাসে এই দুই যুগের বিস্তার এক লক্ষ বছরেরও বেশি। নীচে এই এককে পাঠ করা বিষয়গুলির সারসংক্ষেপ করা হল।

- ★ আদিম মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর নানাবিধ প্রচেষ্টা, যার ফলে আদিম যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার ও প্রকৌশলের উদ্ভব হয়, তার মধ্যেই বিজ্ঞানের সূচনা।
- ★ যোগাযোগের উন্নতির প্রয়োজনেই প্রধানত ভাষার সৃষ্টি। আদিম সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও যাদুবিদ্যারও উদ্ভব হয়।
- ★ বর্ধিত জনসংখ্যা এবং জলবায়ুর পরিবর্তন আদিম মানুষকে উৎপাদনের ভিন্নতর পদ্ধতির সন্ধান করতে বাধ্য করে।
- ★ কৃষিকাজ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে সুকৌশলে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ করল। সৃষ্টি হল নগরের। বর্ধিষ্ণু নগরগুলির প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজকর্মে জোয়ার আনল। ফলে বৃদ্ধি পেল জ্ঞানের ভাণ্ডার। নতুন প্রকৌশল উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম দিল।

★ উৎপন্ন বস্তুর অসম বণ্টন সমাজে এক প্রভাবশালী পুরোহিত-রাজতন্ত্রের জন্ম দিল। সমাজের এই চিন্তাশীল গোষ্ঠী কৃষক এবং নগরের হস্তশিল্পীজাতীয় শ্রমজীবীদের থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরি করল। পুরোহিত-রাজতন্ত্রের ক্ষমতা কায়েম করার প্রচেষ্টা এই দূরত্ব বৃদ্ধি করল, ফলে সমাজে ও বিজ্ঞানে এক রুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হল। বহিরাক্রমণ এইসব নগর-রাষ্ট্রগুলিকে আরও দুর্বল করে দিল।

২.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) চার-পাঁচ লাইনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) কোন্ আদিম রীতির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য, নকশা (design) এবং পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়?

....

....

....

....

....

(খ) বস্ত্রের ব্যবহার এবং পশুপালন আদিম সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

....

....

....

....

....

(২) নীচে উল্লিখিত কোন্ বিষয়গুলি 'আত্মা', 'ধর্ম' এবং যাদু ও ধর্মীয় আচারের সূচনা করে তা নির্ণয় করে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(ক) প্রাচীন মানুষ বন্যা, আগুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিল। মানুষ কেন মারা যায় তাও তারা বুঝতে পারত না। এরজন্য তারা দায়ী করত ....কে।

(খ) সকলের খাদ্য উৎপাদনের মতো প্রকৌশলের যথেষ্ট উন্নতিসাধন হয় নি। এটা ভাবা হত যে যদি গাছপালা এবং পশুকে ঘিরে নৃত্যাদি করা হয় এবং বস্তুসামগ্রী উৎসর্গ করা হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে আরও খাদ্য পাওয়া সম্ভব হবে। অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে এই ধারণা .... এর জন্ম দিল।

(গ) মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসহায় বোধ করল এবং প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইল তখনই সে ....এর আশ্রয় নিল।

(৩) নীচের প্রশ্নগুলির তিন-চার লাইনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) আদিম সমাজ থেকে কৃষিনির্ভর সমাজে উত্তরণ সম্ভব হল উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে। নগরের জন্ম হল এবং নতুন আর্থসামাজিক চাহিদা বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের উন্নতি ঘটাল।

(১) আদিম সভ্যতায় ও ব্রোঞ্জ সভ্যতায় উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী ছিল?

....

....

....

....

....

(২) নগরোন্নয়নের প্রথম দিকে প্রযুক্তির উন্নতিসাধন করেছিল এমন কিছু আর্থসামাজিক প্রয়োজনের তালিকা দিন।

....

....

....

....

....

(৩) কীভাবে প্রযুক্তির উন্নতির দ্বারা ঐসব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়েছিল?

....

....

....

....

....

(খ) নগরের উদ্ভব এবং প্রযুক্তির বিকাশ কালক্রমে সমাজের দু'টি সুস্পষ্ট গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিল। এ দু'টি হল উৎপাদক এবং উপভোক্তা।

(৪) এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কী ছিল?

....

....

....

....

....

(৫) সারণীর প্রথম স্তম্ভে দেওয়া তালিকা থেকে কে উৎপাদক এবং কে উপভোক্তা তা চিহ্নিত করে নীচের সারণীতে লিখুন :

	উৎপাদক	উপভোক্তা
কৃষিজীবী		
পুরোহিত		
রাজমিস্ত্রী		
ছুতোর মিস্ত্রী		
প্রশাসক		
চক্রনির্মাতা		
কৃষিযন্ত্র নির্মাতা		
রাজা		

(৬) পূর্বপৃষ্ঠার (ক) এবং (খ) এর বক্তব্য এবং আপনার (১) থেকে (৫) পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর থেকে প্রথম এককে আলোচিত বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয় সেগুলি তালিকাবদ্ধ করুন।

....

....

....

....

....

২.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১. (ক) পদার্থবিদ্যা, প্রযুক্তি (খ) রসায়নবিদ্যা, (গ) পদার্থবিদ্যা, (ঘ) রসায়নবিদ্যা, (ঙ) রসায়নবিদ্যা, (চ) প্রযুক্তি।

২. (ক) ✓ (খ) ✓ (গ) × (ঘ) ✓ (ঙ) ×

৩. (১) ক, খ, ঙ, জ (২) খ, গ, চ, ঝ, ঞ (৩) ঘ, ছ

৪. প্রস্তর, খাদ্য, প্রকৃতি, নির্ভরশীল, বিপর্যয়, শীতল, বিকল্প, আদিম।

৫. (খ) সংখ্যার মান নির্ধারণ, পরিমাণ ও ওজন, ওজনযন্ত্রের ব্যবহার, পাটীগণিত, লিপি।

(গ) সমকোণ, সরলরেখা, আয়তক্ষেত্র, আকারের ক্ষেত্রফল, কঠিনের আয়তন ইত্যাদির ধারণা জ্যামিতির ভিত্তি রচনা করে।

(ঘ) গভীর সমুদ্রে নৌচালনা, পঞ্জিকা তৈরি, ব্যাপকভাবে পরিকল্পনা, বন্যার জন্য প্রস্তুত ইত্যাদি।

(ঙ) ক্ষত, ভগ্নঅস্থি, অস্থিচ্যুতি ইত্যাদির চিকিৎসা এবং রোগনির্ণয়।

(চ) রসায়নবিদ্যা।

৬. ক, গ, ঙ,

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) (ক) যন্ত্রনির্মাতা প্রথমে চিন্তা করত কোন্ ধরনের যন্ত্র সে নির্মাণ করবে (নকশা) এবং কেমন করে তা নির্মাণ করবে (পরিকল্পনা), তারপর সে একটি বড় পাথরকে নির্দিষ্ট আকার দিত।

(খ) বস্ত্রের ব্যবহার আদিম মানুষকে শীতের মোকাবিলা করার ক্ষমতা দিল। পশুপালন তাদের যাতায়াত সহজতর করল এবং খাদ্যের যোগানও বৃদ্ধি করল। তাই আদিম সমাজ এখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও টিকে থাকার পথ খুঁজে পেল।

(২) (ক) আত্মা (খ) যাদু ও ধর্মীয় আচার (গ) ধর্ম

(৩) (১) আদিম সমাজে শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ; ব্রোঞ্জযুগ সভ্যতায় কৃষিকাজ, নির্মাণের কাজ, ছুতোরের কাজ এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের কাজ।

(২) কৃষিকাজের প্রয়োজনে উন্নততর হাতিয়ার, আশ্রয়ের জন্য বাসগৃহ, শস্যসঞ্চয়ের জন্য আধার, বাণিজ্য ও পরিবহনের জন্য গাড়ি ও নৌকা, বর্ধিষ্ণু নগরগুলিতে পরিকল্পিত নগরনির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজন প্রকৌশলের উন্নতি ঘটিয়েছিল।

(৩) তৈজসপত্র নির্মাণ, ধাতুর কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ছুতোরের কাজ, ইটের কাজ, নৌকা তৈরি, পাথরের কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকৌশলগত উন্নতির দ্বারা।

(৪) কৃষক, রাজমিস্ত্রী, চক্রনির্মাতা, ছুতোর এরা নিজেরাই ছিল বস্তুসামগ্রীর উৎপাদক। উপভোক্তারা নিজেরা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত না। তারা অন্যদের উৎপাদিত সামগ্রীতে ভাগ বসাত।

(৫) উৎপাদক : কৃষিজীবী, রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী, চক্রনির্মাতা, কৃষিযন্ত্র নির্মাতা।

উপভোক্তা : পুরোহিত প্রশাসক, রাজা।

(৬) এখানে প্রথম এককে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকা দেওয়া হল।

(ক) উৎপাদনের পদ্ধতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপান্তর হয়। কোনো বিশেষ সময়ে সমাজে আর্থসামাজিক প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রকৌশলের জন্ম দেয়।

(১) বিভিন্ন প্রধান ঐতিহাসিক যুগে এক-একটি বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি প্রাধান্য পেয়েছে।

(২) (ক) উত্তরের দ্বিতীয় ভাগের মতো।

(৩) বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের উদ্ভাবন উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটায় এবং সমাজের সভ্যদের একধরনের পরিতৃপ্তি দেয়।

(খ) (৪) ও (৫) বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের উদ্ভাবন ক্রমে সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের দ্বারা নিজেদের প্রভাব শক্তিশালী করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

একক ৩ □ লৌহযুগ

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৩.২ লৌহযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা

৩.২.১ কৃষিভূমি এবং খনিজ সম্পদের সন্ধান

৩.২.২ নাগরিক সমাজের উদ্ভব

৩.২.৩ বিজ্ঞানের উত্থান

৩.২.৪ চিকিৎসাশাস্ত্রে অগ্রগতি

৩.৩ লৌহযুগে গ্রীসে বিজ্ঞানচর্চা

৩.৩.১ বিজ্ঞানচর্চার কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি

৩.৪ প্রাচীন যুগে পারমাণবিক তত্ত্বের চর্চা

৩.৫ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অবনতি

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৩.৮ উত্তরমালা

৩.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে (দ্বিতীয় একক) আমরা প্রাচীন মানুষদের ধ্যান-ধারণা এবং তাদের ব্যবহৃত কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমরা জেনেছি ব্রোঞ্জযুগে বিজ্ঞানের জন্ম ও অগ্রগতির কথা, এবার আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ সম্পর্কে জানবো। এই যুগকে বলা হয় লৌহযুগ।

দেখা গেছে, প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে সভ্যতার বিকাশ শুধুমাত্র নদী-অববাহিকাগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, এর বিস্তার এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের কৃষিযোগ্য ভূমিতেও ঘটেছিল। একটি বিশেষ ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার এই সভ্যতার প্রসারকে সাহায্য করেছিল। ধাতুটি হল লোহা। আর এই ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহারের জন্যেই এই যুগটিকে বলা হয় 'লৌহযুগ'।

ব্রোঞ্জযুগের ন্যায় প্রযুক্তিগত উন্নতি এই যুগে না হলেও, লোহার সহজলভ্যতা ও স্বল্পমূল্যের জন্য, অনেক সুদূরপ্রসারী, পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল সেই যুগ। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল এই সভ্যতার বিকাশ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই যুগের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখেছি যে, সমাজে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ থমকে দাঁড়ালে, ব্রোঞ্জ সভ্যতার পতন শুরু হয়। আর এই পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল বিদেশী গোষ্ঠীর (Barbarian's) প্রতিনিয়ত আক্রমণ। এইসব বিদেশী যাযাবর গোষ্ঠীর প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুচারণ। তারা লোহার ব্যবহার জানত। এই লোহার সাহায্যে তারা নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করত। বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাতে তারা ছিল ওস্তাদ। এর ফলে এইসব গোষ্ঠীগুলি ছিল অত্যন্ত সচল। তারা নিজেদের খাদ্যসামগ্রী বহন করতে পারত। বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার পতন যেমন ডেকে এনেছিল এইসব যাযাবর গোষ্ঠী, তেমনই এইসব ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, তারা নানা ধরনের প্রকৌশল আহরণও করেছিল। এদের আক্রমণে নানান জাতির জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকার। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, দূর-দূরান্তে এই গোষ্ঠীগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে যে সমস্ত সভ্যতার উদ্ভব হয়, সেগুলি শান্তিপূর্ণ বা খুব উন্নতমানের না হলেও নতুনকে গ্রহণ করার সহজাত ক্ষমতা তাদের ছিল।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি অবহিত হবেন, সেগুলি হল :

- লৌহযুগে ভারতবর্ষ ও গ্রীসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের মূল ধারাগুলি কী।
- ভারতবর্ষ ও গ্রীসের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও প্রকৌশলগত বিকাশের তুলনামূলক ব্যাখ্যা।
- ইউরোপীয় বিজ্ঞানের পতনের মূল কারণগুলি।

৩.২ লৌহযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ইরানের স্তেপ অঞ্চল থেকে যাযাবর ইন্দো-আর্যরা দলে দলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিক ধরে অগ্রসর হয়ে অবশেষে (চিত্র ৩.১) চিহ্নিত স্থানগুলিতে বসবাস ও রাজ্যস্থাপন শুরু করে। এরা প্রধানত পশুপালন ও কৃষিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পশুপালন থেকে স্থায়ী কৃষিব্যবস্থা, ইন্দো-আর্যদের মধ্যে এই রূপান্তর ঘটতে সময় লেগেছিল এক থেকে দেড় হাজার বছর। এই পরিবর্তন খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৭০০ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

এইসব তথ্য আমরা বৈদিক সাহিত্য যেমন বেদ, সংহিতা, উপনিষদ, সূত্রাবলী ইত্যাদি থেকে যেমন পাই, তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও পেয়ে থাকি। এই ইতিহাস আমরা এবারে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করব।

৩.২.১ কৃষিভূমি ও খনিজ সম্পদের সন্ধান

চিত্র ৩.১ : গাঙ্গেয় সমতলে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের বিস্তার ইঙ্গিত করে যে আর্যরা পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পশুপালন থেকে স্থায়ী কৃষিব্যবস্থায় রূপান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে আর্যরা বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। একই সঙ্গে তারা নতুন কৃষিযোগ্য জমি ও খনিজ সম্পদের সন্ধানে ছিল। এই উদ্দেশ্যে আর্যরা প্রচুর বনজঙ্গল পরিষ্কার করে। এই সময়টি ইতিহাসে 'ঋগ্বেদ'-এর যুগ বলে পরিচিত।

ঋগ্বেদের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-খ্রিস্টপূর্ব ৭০০)

এই সময় আর্য গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে ও স্থানীয় অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল ও তারা সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করছিল। তাদের তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। তাদের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ছিল রথ, লোহার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতিতে। গাঙ্গেয় সমতলে প্রাপ্ত ঐ সময়কার (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০) মৃৎপাত্রগুলিকে বলা হয় চিত্রিত মৃৎপাত্র। এগুলি হরপ্পার মৃৎপাত্রের মতো অত উন্নত নয়। ৩.২ চিত্রে এদের পার্থক্য দেখতে পাবেন। ইট তৈরির বিশেষ কোনো পদ্ধতি এখানে ছিল না, যেমনটি হরপ্পায় দেখা গেছে। বিভিন্ন কলাকুশলী, যেমন ছুতোর, রথ প্রস্তুতকারক, ধাতুশিল্পী এবং জাহাজ তৈরির শিল্পীরা, গোষ্ঠীর স্বাধীন সদস্য ছিলেন। সুতাকাটা এবং তাঁত বোনা শুধুমাত্র মহিলাদের একচেটিয়া ছিল।

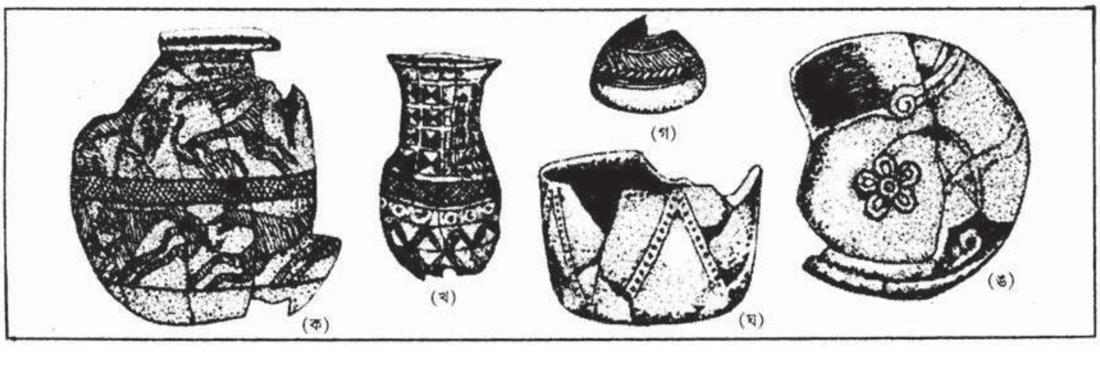

চিত্র ৩.২ : সিন্ধু-উপত্যকার ধূসর মৃৎপাত্র ও চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের স্কেচ হরপ্পার মৃৎপাত্র : (ক) দাইমাবাদ থেকে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ (খ) লোথাল থেকে (গ) নাভাদাতোলি থেকে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০।
চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র : (ঘ) বাটি (পানিপথ) এবং (ঙ) অহিছত্র। বৈচিত্র্য, ধরন, নক্সা এবং পোড়াবার তাপমাত্রা থেকে বোঝা যায় যে, হরপ্পার মৃৎপাত্রই বেশি উৎকৃষ্ট।

বিজ্ঞানের অন্য শাখায় অগ্রগতি সম্পর্কে বলতে হলে, বলা যায় যে, ঋগ্বেদে এমন উল্লেখ আছে যেখানে মহাবিশ্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ। এখন আমরা জানি যে, এই ধারণা ভুল। যাগযজ্ঞ, বলিদান জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান সূর্য, তারা ও গ্রহদের অবস্থানের ভিত্তিতে পালিত হত। এইজন্য পুরোহিতদের প্রয়োজন হল পঞ্জিকার। এই প্রয়োজন থেকেই গ্রহ-নক্ষত্র বা বিভিন্ন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চলাচলকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার তাগিদ তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তাদের তৈরি পঞ্জিকার সময়, দিন, মাস ও বৎসর এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন ঋতুকেও এইসব পঞ্জিকা নির্দেশ করেছে। অবশ্য এই সমস্ত প্রচেষ্টায় গ্রহ, নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলীর চলাচল সম্পর্কে গভীর কোনো অনুসন্ধানের ছাপ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্তোত্রে, তাদের বিভিন্ন ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনও এদের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা বা আকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য লক্ষ্য করা গেছে। কোনো স্তোত্রে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কেও উৎসাহ দেখা গেছে।

যজুর্বেদের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-খ্রিস্টপূর্ব ৪০০)

ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে কৃষিজমি ও খনিজ সম্পদের খোঁজে ক্রমশ পূর্বদিকে সভ্যতার বিস্তার ঘটতে থাকে। এই সময় থেকে শুরু হয় যজুর্বেদ-এর যুগ, যা ৬০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। যজুর্বেদে বারোটি বলদ দিয়ে টানা লাঙলের উল্লেখ পাওয়া যায়। জমিতে গভীর চাষ দিতে এই ধরনের লাঙল ব্যবহৃত হত। তা না হলে, শক্ত জমিতে ভালো ফসল ফলান বা তার উর্বরতা শক্তি ধরে রাখা সম্ভব হত না। এই ধরনের লাঙলের ফলা তৈরিতে লোহার ব্যবহার আবশ্যিক ছিল। বাকি অংশ কাঠ থেকেই তৈরি হত, ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির সাহায্যে। কিন্তু এই লোহা তারা পেল কোথা থেকে? রাজস্থান অঞ্চলে না হয় তামা মেলে কিন্তু লোহার খনি তো ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে, অনেক দূরে। ভারতের সেরা লোহা ও তামা, গাঙ্গেয় সমতলভূমির পূর্ব প্রান্তে দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে মেলে। গাঙ্গেয় সমতলভূমির বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে নির্মিত তামার হারপুন ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি হয়তো আর্য বণিকরা এখানে বিক্রয় করতেন। এগুলি প্রমাণ করে যে আর্যরা আগুনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও ভাটির সাহায্যে তামা শোধন প্রক্রিয়ার কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। (চিত্র ৩.৩)

যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আর্যদের সুবিধে ছিল যে তারা নৌ-চলাচল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল। ঋগ্বেদে একশো দাঁড় বিশিষ্ট নৌকার উল্লেখ পাওয়া গেছে। গঙ্গা দিয়ে বাণিজ্যতরী বারাণসী পেরিয়ে পাটলিপুত্র ও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে যেত বাণিজ্য ও নতুন ভূখণ্ডের খোঁজে। যজুর্বেদের একটি শ্লোকে জমি ও অন্যান্য উপকরণের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে, এইভাবে : “আমার জন্য সাধারণ শস্য, খাদ্য, ক্ষুধা থেকে মুক্তি, ধান্য, তিল, বীন, কলাই, গম, ডাল, জোয়ার (যজ্ঞের মাধ্যমে সমৃদ্ধিলাভ করুক) : আমার জন্য পাথর, মাটি, পর্বত ..... স্বর্ণ, মিশ্রধাতু (ব্রোঞ্জ), সীসা, টিন, লৌহ, তাম্র, অগ্নি.....যা কর্ষিত ও অকর্ষিত জমিতে উৎপন্ন হয়, পোষ্য ও বন্য গবাদিপশু, যজ্ঞের মাধ্যমে সমৃদ্ধিলাভ করুক।

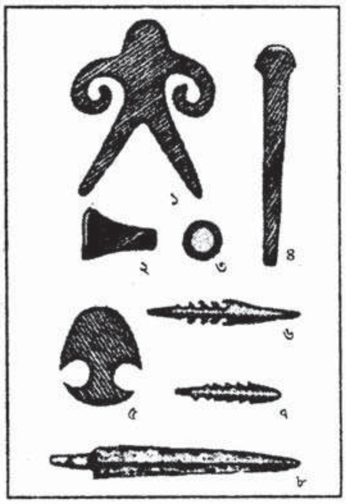

চিত্র ৩.৩ : গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে প্রাপ্ত তামার দ্রব্যাদির স্কেচ : (১) অর্ধনর মূর্তি (২) কুঠার (৩) আংটা (৪) দন্ত-কুঠার (৫) দ্বি-প্রান্ত কুঠার (৬) হারপুন (বর্শা বিশেষ) (৭) তলোয়ার

পরাজিত আর্য বা অনার্য গোষ্ঠীর লোকেদের জয়ী গোষ্ঠীর লোকেরা 'দাস' হিসেবে ব্যবহার করত।

অর্থশাস্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এর রচয়িতা কৌটিল্য, যিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০।

সময়ের সঙ্গে আর্যদের মধ্যে উচ্চমানের লোহার চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বাড়তে থাকে। সারা দেশ জুড়ে নতুন নতুন খনির সন্ধানে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০ পর্যন্ত আর্যরা অন্ধ্র ও মহীশূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। লৌহ, তাম্র, রৌপ্য ও টিন সংক্রান্ত ধাতুবিদ্যার চর্চা ও তার উন্নতি আর্যরা মৌর্যযুগ অবধি অব্যাহত রাখে। বিভিন্ন আকার থেকে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের ধাতু নিষ্কাশিত হয়, তার বিবরণ আমরা পাই 'অর্থশাস্ত্র' নাম গ্রন্থটি থেকে।

৩.২.২ নাগরিক সমাজের উদ্ভব

বৈদিক যুগের সাহিত্য থেকে তৎকালীন সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। এই সময়ে সামাজিক কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ক্রমশ সুনির্দিষ্ট নাগরিক সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছিল। যখন আর্যরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন একটি নতুন শ্রেণী তৈরি হতে যাচ্ছে, যাদের বলা হত 'দাস'। এদের দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নেওয়া হত। এই সময়েই পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যারা বলি-প্রদান জাতীয় আর্য ও অনার্য আচার-অনুষ্ঠানে বিশেষ পারদর্শী ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভব। এর অর্থ হল, কারিগর ও শ্রমিকগণ উৎপাদন করছে, শুধুমাত্র স্থানীয় সমাজের চাহিদা পূরণের জন্যেই নয়, বরঞ্চ সেই উৎপাদিত পণ্য দূর-দূরান্তে আর্য ও অনার্য, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দু'টি প্রধান পথ তৈরি হল উত্তরপথ ও দক্ষিণপথ। ৩.৪ চিত্রে এগুলি চিহ্নিত হয়েছে। সারথবাহ (Sarthavahas) ও বৈদেহিক (Vaidehikes) এই দুই ধরনের ব্যবসায়ী তক্ষশিলা থেকে মগধ এইসব পথে যাতায়াত শুরু করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে সে যুগের যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে, তার থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

এ যুগের শেষ দিকে চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব ঘটে। উত্তর পথের সংলগ্ন সমস্ত অঞ্চল থেকে ছাত্ররা বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে যেমন তক্ষশিলাতে যাত্রা করত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্যে। এখানে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ব্যাকরণবিদ্ পাণিনি, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে চিকিৎসক আত্রেয় শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী এক হাজার বছর জীবক, কুমারভচা, ভেলা, পরাশরের মতো আত্রেয়ের বিখ্যাত শিষ্যরা ভারতবর্ষে চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

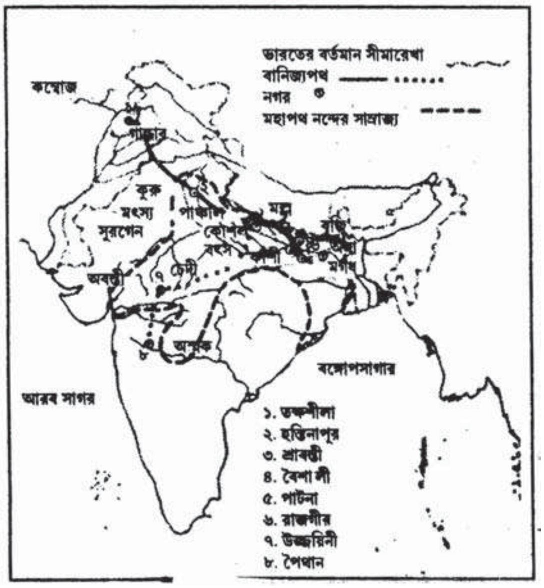

চিত্র ৩.৪ : খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ষোলোটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ (—) বাণিজ্যের দক্ষিণপথ (.........) মহাপদ্ম নন্দর অধীনে মগধ সাম্রাজ্য, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক।

খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনধারার প্রকাশ দেখা যায়। সময়টা বৈদিক কালের মতো ঘাটতি, দ্বন্দ্ব আর সংঘাতে আকীর্ণ ছিল না।

এই সময়ে ছোট ছোট রাজ্য তৈরি হতে থাকে যাদের বলা হত জনপদ। প্রতিটি জনপদের শীর্ষে থাকতেন রাজা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি নিয়ম ও আইন অনুযায়ী রাজ্য শাসিত হত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ষোলোটি জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র ৩.৪ দেখুন)। জনপদগুলির আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। এখানকার সমাজে রাজা, পুরোহিত, বিদ্বান, সৈনিক, ব্যবসায়ী, কৃষক, হস্তশিল্পী এবং সাধারণ শহুরে শ্রমিক ছিল। সুষ্ঠু রাজ্যপরিচালনার জন্য ও একই সঙ্গে ধনীর ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে, সামাজিক কাঠামো দ্রুত অনমনীয় হয়ে ওঠে এবং সমাজ অচিরে চার বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই সামাজিক স্তরবিন্যাসকে স্থায়ী রূপ দিতে ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া হয়।

অনুশীলনী ১

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি 'ব্রোঞ্জযুগ' ও 'লৌহযুগ'-এর সমাজচিত্র তুলে ধরেছে। যে বাক্যটি ব্রোঞ্জযুগকে চিহ্নিত করছে তার পাশে 'ব' ও যেটি লৌহযুগকে চিহ্নিত করছে তার পাশে 'ল' লিখুন।

(১) সভ্যতাটি ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল ....।

(২) এই যুগের অধিকাংশ অধিবাসী সিন্ধুনদের উপত্যকায় বসবাস করতেন ....।

(৩) এই সভ্যতায় বাণিজ্য চলত 'বিনিময় প্রথায়', অর্থাৎ, একটি সামগ্রীর পরিবর্তে অন্য আরেকটি সামগ্রী গ্রহণ করা হত ....।

(৪) এই যুগে পণ্য উৎপাদন শুরু হয়, অর্থাৎ কিছু পণ্য স্থানীয় ব্যবহারের জন্য নয়, দূর-দূরান্তে ব্যবসার জন্যও তৈরি হত ....।

(৫) এই যুগে জাতিভেদ (Caste system) প্রথার উদ্ভব হল ....।

(৬) এই যুগে উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য করা হত, অর্থাৎ সমাজের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে যা বাড়তি হত ....।

(৭) বহুসংখ্যক মানুষ নব নব উদ্ভাবনে অংশগ্রহণ করেছিল ....।

(৮) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়মিত মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়েছিল ....।

(৯) সমাজে দু'টি প্রধান গোষ্ঠী ছিল : পুরোহিত-রাজা; কৃষক ও শহুরে কারিগরশ্রেণী, ইত্যাদি ....।

(১০) অল্পসংখ্যক মানুষ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন ....।

৩.২.৩ বিজ্ঞানের উত্থান

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে লৌহযুগে ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোর পরিচয় আমরা লাভ করেছি। সুনির্দিষ্ট নগর-সভ্যতার উদ্ভব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। এবারের আলোচনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় কী ধরনের অগ্রগতি ঘটেছিল, তার বিবরণ দেওয়া হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র :

ঋগ্বেদের সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ কতদূর হয়েছিল, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী যুগে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেকটাই ঋগ্বেদের সময়কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত অথবা সেই জ্ঞানেরই বিস্তৃত অনুসন্ধান। এই ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় যদি আমরা মনে রাখি যে, এই যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রধানত জ্যোতিষবিদ্যা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের থেকেই হয়েছিল। এই সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষবিদ্যায় পরিণত হয়।

শুল্‌ভা সূত্রের কথা আপনারা ইতিমধ্যেই ২.৩.৩ পরিচ্ছেদ থেকে জেনে গেছেন। সেখানে জ্যামিতি সম্পর্কে যথেষ্ট উচ্চমানের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, পাটীগণিতেও যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় মেলে। দশের গুণিতক ও ঘাত (power) এমনকি $১০^{১২}$ (দশ লক্ষ কোটি) পর্যন্ত সংখ্যা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ও তার ব্যবহারও হত, বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল স্পষ্ট। শুলভা সূত্রে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশের বর্গ, দ্বিঘাত সমীকরণ, অনির্ণেয় সমীকরণ, বিন্যাস ও সমবায় বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রসায়ন

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ স্থলে প্রাপ্ত লৌহযুগের মৃৎশিল্প, কাচ ও লোহার যন্ত্রপাতি থেকে সে সময়ে রসায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। আপনি চিত্র ৩.৫ থেকেই বুঝতে পারছেন যে, সেই সময়ের লোকেরা লৌহ নিষ্কাশনে ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভারতীয় ধাতুশিল্পীরা লোহা ও ইস্পাত তৈরিতে উচ্চমানের প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছিলেন।

প্রায় ত্রিশটি স্থান থেকে সে যুগের যে সমস্ত কাচের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা হয় যে, এই যুগের শেষ পর্বেই কাচ উৎপাদনের কৌশল তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। এইসব ধ্বংসস্তূপ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়কার মৃৎপাত্র, থালা, হাঁড়ি, ঢাকনা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সে যুগের মানুষরা যে গেঁজানোর পদ্ধতি, রঞ্জন কৌশল এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক ও রং তৈরি করতে জানতেন তারও প্রমাণ মেলে।

উদ্ভিদবিদ্যা

ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগে সবদেশেই মানুষ ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। স্বভাবতই, কৃষির প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিববিদ্যারও অগ্রগতি ঘটে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিও এযুগে উদ্ভিদবিদ্যার অগ্রগতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার বিভিন্ন স্তোত্রে উদ্ভিদ বিষয়ক কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

(১) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ, যথা—মূল, তুলা (অঙ্কুর), কাণ্ড, শাখা, বলসা (পল্লব) ইত্যাদি।

(২) অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (morphology) ও ব্যবহারের ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ, যথা—ঔষধি, বল্লী বা লতা বা ঝোপ, গুচ্ছ ইত্যাদি।

(৩) উদ্ভিদের শারীরবিদ্যাগত বিবরণ, যথা—জমিতে কী দিলে গাছের পুষ্টি হয়, যেমন গোবর ইত্যাদি।

উদ্ভিদবিদ্যার সুসংবদ্ধ চর্চা পরাশর লিখিত ‘বৃক্ষায়ুর্বেদ’-এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক। পূর্ববর্তী উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানকে এই পুস্তক অনেকখানি বিধিবদ্ধ করতে সফল হয়েছিল। অবশ্য, আমরা এই আলোচনার মধ্যে যাব না।

প্রাণিবিদ্যা

সে যুগের মানুষ হাতি ও ঘোড়ার মতো জন্তুকে পোষ মানাতো প্রধানত যুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে এবং এই কারণেই প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত পশুর শারীরস্থান (anatomy) এবং শারীরবিদ্যা (physiology) চর্চার। বৈদিক সাহিত্যে প্রায় ২৬০ ধরনের পশুর নাম পাওয়া যায়। সেখানে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবদেহের শারীরবিদ্যা চর্চার প্রমাণ মিলেছে। বেদ-পরবর্তী যুগের সাহিত্যেও বহু পশুর নামের উল্লেখ এবং একইসঙ্গে তাদের জীবনবৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণের প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণই হয়তো পরবর্তী যুগে শ্রেণীবিভাগ, বংশগতি, ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তাকে উস্‌কে দিয়েছে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যার যে অগ্রগতির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি, তা ওই সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছিল তার তুলনায় কিছুই নয়। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা করব।

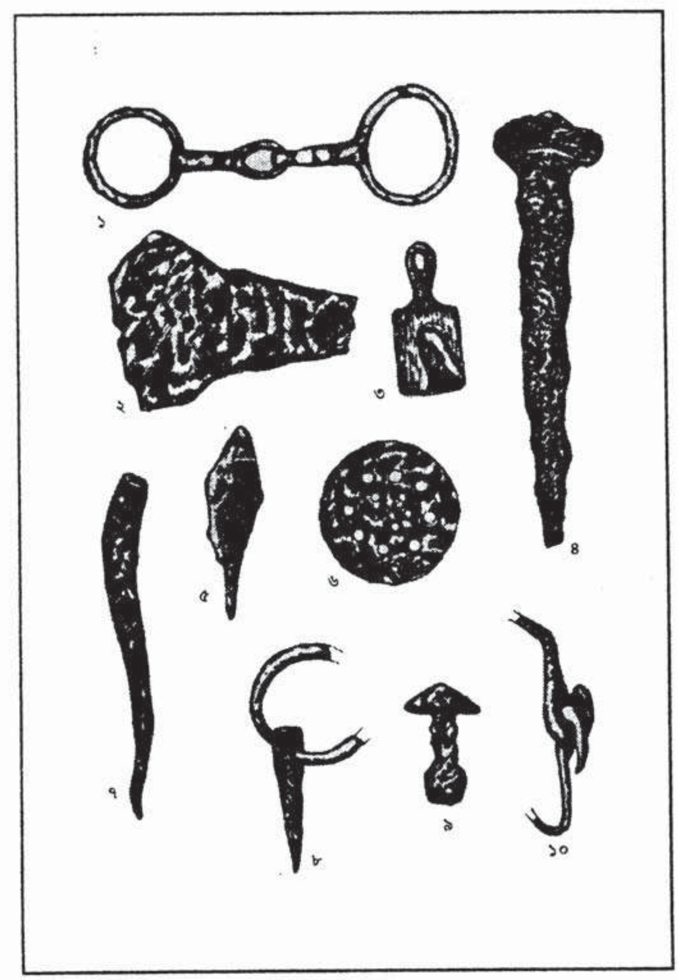

চিত্র ৩.৫ : তক্ষশিলা, হস্তিনাপুর, উজ্জয়িনী ও শিশুপালগড় অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন লোহার জিনিসের স্কেচ :
(১) শিকল (২) একটি লোহার কুঠারের নিম্নভাগ (৩) ক্ষুদ্রাকৃতির ঘণ্টা (৪) মাথা-বাঁকানো তার (৫) বর্শা-ফলক (৬) ছিদ্রযুক্ত সামান্য উত্তল লোহার চাকতি (৭) বড় চৌকো পেরেক (৮) দরজার কড়া (৯) গোলাকার লোহার টুকরো, তার মধ্যে পেরেক আঁটা (১০) শেকলের অংশ।

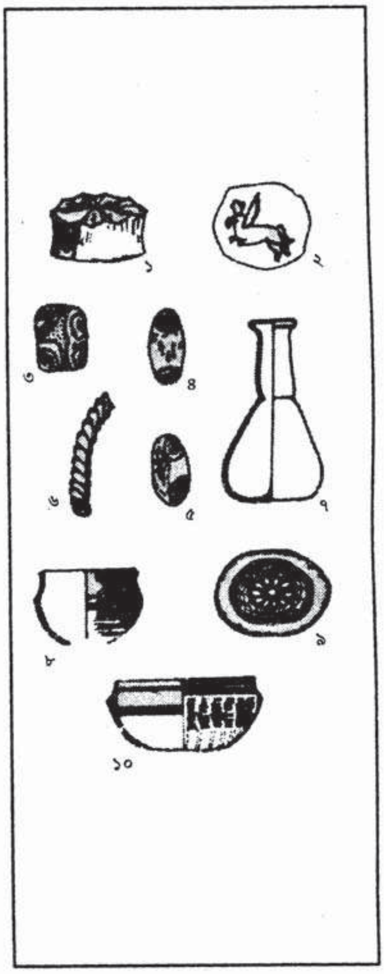

চিত্র ৩.৬ : প্রাচীন কাচের জিনিসপত্রে স্কেচ :
(ক) তক্ষশিলা থেকে প্রাপ্ত (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে প্রথম শতক) : (১) কানের দুলের প্যাঁচ (২) শীলমোহর (৩, ৪, ৫) পুঁতি (৬) বালার অংশ (৭) মদের পাত্র (মোটা লাইনের অংশটি পাওয়া গেছে)
(খ) অরিকামেদু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতক : (৮, ১০) রোমান কাচের পাত্র (৯) নকশা করা (Millefiori) কাচের পাত্র।

অনুশীলনী ২

লৌহযুগের ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিকাশ সম্পর্কে নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি সত্য/ভ্রান্ত বলুন :

(ক) জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ, যার জন্ম জ্যোতিষবিদ্যা ও যজ্ঞীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে হয়েছিল, তা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র সম্পর্কে ব্যাপক চর্চার সূচনা করে এবং এই চর্চা থেকেই নতুন নতুন মডেল, সূত্র ও তত্ত্বের উদ্ভব হয় ....।

(খ) বলিদানের বেদী নির্মাণের প্রয়োজন থেকে জ্যামিতির বিকাশ হয়েছিল ....।

(গ) লৌহযুগে ভারতবাসী ইস্পাত তৈরি করতে জানত ....।

(ঘ) উদ্ভিদ ও পশুদের শ্রেণীবিভাগ, শারীরবিদ্যা, শারীরস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়েছিল ....।

(ঙ) আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের সবটাই বৈদিক যুগে হয়েছিল, এখন আমরা তাকে পুনরাবিষ্কার করছি ....।

৩.২.৪ চিকিৎসাশাস্ত্রে অগ্রগতি

বৈদিক যুগে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের। সে যুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল রোগব্যাধির কারণ হচ্ছে পাপকর্মের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের রোষ। আবার অপদেবতারা ভর করলেও রোগ হত। এই সমস্ত ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে রোগের কারণ, ওষুধের ব্যবহার, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের উপকারিতা নিয়ে বেদে একাধিক অনুমানভিত্তিক আলোচনা আছে। “চিকিৎসাসংক্রান্ত জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের অংশ”, এই আয়ুর্বেদিক মতো এসেছে পরবর্তী যুগে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, পুনর্বসু আত্রেয়, তক্ষশিলায় আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা যেমন ভেল, জাতুকর্ণ, হারিত, ক্ষরাপানি, পরাশর প্রত্যেকেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। আত্রেয়, পতঞ্জলী (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) এবং পরবর্তী যুগে আরও অনেক বিশেষজ্ঞ ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থ চরক-সংহিতার ওপর টীকা লেখেন। মূল সংহিতার খুব সামান্য অংশই আজ পাওয়া যায়। আজ এই সংহিতা সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানি, তা ওই টীকাগুলি থেকেই আসে। অনুমান করা হয় চরক-সংহিতা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত রচনা ও সুশ্রুত-সংহিতা, এই দু'টিই খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত; কারণ, এদের রচয়িতা কে এই নিয়ে কিন্তু বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন এগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা, আবার অনেকে বলেন যে, এদের রচয়িতারা হলেন, কতকগুলি গোষ্ঠীর চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসকের দল। রচনার প্রধান অংশে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির শ্রেণীবিভাগ ও লক্ষণসমূহ, তাদের নিরাময় পদ্ধতি, ওষুধের গুণাগুণ, প্রয়োগ পদ্ধতি ও পরিমাণ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে। এই রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ :

(১) এদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।

(২) বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিকাশে এদের প্রভাব ছিল।

(৩) বহু যুগ ধরে আয়ুর্বেদচর্চার মাধ্যমে এগুলির প্রায়োগিক ব্যবহার হচ্ছে।

দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি

দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিগত প্রশ্নে, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল :

(১) চিকিৎসকের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে রোগীকে সুস্থ করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে ছল-চাতুরী গ্রহণ বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াও শাস্ত্রসম্মত। যেমন, চিকিৎসার প্রয়োজনে যদি রোগীকে মাংস ভক্ষণ করাতে হয়, তাহলে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ অথবা ব্যক্তিগত অভিরুচিকে অতিক্রম করার কৌশল চিকিৎসককেই স্থির করতে হবে।

(২) চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যেকার সম্পর্ক হবে পিতা ও পুত্রের ন্যায়। রোগীকে সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসক নিজের জীবন বিপন্ন করেও তাঁর কর্তব্য করবেন।

(৩) অগ্রজ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসাসংক্রান্ত আলোচনাচক্র থেকে চিকিৎসকরা তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবেন।

(৪) পর্যবেক্ষণলব্ধ চলাচলের গুরুত্ব বিজ্ঞানে সর্বাধিক এবং তার ন্যূনতম শর্তও বটে। বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের মধ্যে যা চোখে দেখা যায়, তা সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। একজন জ্ঞানী চিকিৎসক, শুধুমাত্র যুক্তির খাতিরে, কোনো একটি ঔষধের কার্যকারিতা পরীক্ষায় সচেষ্ট হবেন না, যেখানে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা ওই ওষুধের গুণাগুণ ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত।

রোগ ও তার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়

রোগ ও তার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে চিকিৎসকরা রুগীর সমস্ত বহিরঙ্গ ও তার বর্জ্যদ্রব্যকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করতেন। যেমন ‘দেখা’, ‘শোনা’, ‘গন্ধ নেওয়া’, ‘স্পর্শ করা’ ইত্যাদি ছিল প্রত্যক্ষ আর নাড়ী পরীক্ষা ছিল অপ্রত্যক্ষ পরীক্ষা। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল কখনও এককভাবে, কখনও মিলিতভাবে কোনো বিশেষ রোগকে নির্দেশ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফোঁড়া ফাটার সময় রক্তের ফেনার সঙ্গে যে শব্দ হয় চিকিৎসক তা শুনতেন। তেমনই পেটের অভ্যন্তরে (অন্ত্র), ভাঙ্গা সন্ধিতে বা স্বর পরিবর্তনে যে শব্দ মেলে, তা পরীক্ষা করে অন্য রোগের সূত্র পাওয়া যেত। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করতেন না, তিনি রোগীর ঘর-বাড়ি, জাতি, বসবাসের ধরন, খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য অসুখের ইতিহাসলব্ধ জ্ঞানের ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। যে রোগীর নিরাময়ের সম্ভাবনা নেই, কোনো বুদ্ধিমান চিকিৎসক তার চিকিৎসা করেন না—এটাই ছিল সেইসময় প্রচলিত মতবাদ। এইজন্যেই, দুর্লক্ষণ বা ‘অরিষ্ট’ যা মৃত্যুকে ডেকে আনে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে (এই আলোচনা বিভিন্ন রোগ অনুযায়ী বিভক্ত)।

আরোগ্য লাভের পদ্ধতি

গুরুত্বপূর্ণ আরোগ্য লাভের পদ্ধতিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(ক) জোর করে বমি করানো।

(খ) রেচক ঔষধের প্রয়োগ।

(গ) মলদ্বারের মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ।

(ঘ) মলদ্বারের মধ্যে তৈলাক্ত ঔষধ প্রয়োগ এবং

(ঙ) নাসিকায় ঔষধ প্রয়োগ।

রোগের ধরন দেখে চিকিৎসক ঠিক করতেন কোন্ পদ্ধতিটি তিনি গ্রহণ করবেন। ওপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, তার উল্লেখও দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার রোগের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগও করা হয়েছিল।

রোগের উপশম করে, এমন দ্রব্যাদিকে দু'ভাগে ভাগ করা হত—এক, যে সমস্ত দ্রব্য প্রতিষেধক হিসেবে, আর দুই, যাদের রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হত। চরক-সংহিতার ভাষ্য অনুসারে, এরা হয় প্রাণী, নয় উদ্ভিদ, নয় খনিজাত দ্রব্য। ঔষধের অন্যপ্রকার শ্রেণীবিভাগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঔষধের ফলাফল বিচার করে বলা হত বমন উদ্রেককারী অথবা রেচকধর্মী ঔষধ। এই প্রকার বিভাগ আবার পঞ্চাশটি ভাগে বিভক্ত ছিল, কী ধরনের উপশম কোন্ ঔষধ প্রদান করে, তার ওপর ভিত্তি করে।

অস্ত্রোপচার

অস্ত্রোপচার বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ, সুশ্রুত-সংহিতা শুধুমাত্র রোগের লক্ষণ ও তার সম্ভাব্য চিকিৎসা-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেই রচিত হয়নি। এই গ্রন্থ রচনার পিছনে শারীরবিদ্যা, অন্তঃস্থ শারীরস্থান এবং বিশেষভাবে শরীরের অন্তঃস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধে জ্ঞান উল্লেখযোগ্য ছিল। যেমন আলসার বা ক্ষতের চিকিৎসায় বলা হচ্ছে, শরীরে যন্ত্র বা অস্ত্র প্রবেশ করানোর সময়, যতক্ষণ না পুঁজ দৃষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ শিরা, হাড়, ইত্যাদির মতো বিপজ্জনক স্থান অবশ্যই সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতে হবে। সংহিতায় বিভিন্ন ধরনের লোহার যন্ত্রপাতি যা কাটা-ছেঁড়া, উৎপাদন ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হত, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। স্থানীয় কর্মকারদের দ্বারা তৈরি, এইসব যন্ত্রপাতির কোন্‌টি কেমন ধারালো, কেমন তার আকৃতি বা মাপ, তার বর্ণনা আমরা সেখানে পাই (চিত্র ৩.৭ এবং ৩.৮ দ্রষ্টব্য)। এই সংহিতার দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল :

(ক) অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে ক্ষতস্থানের বিধৌতিকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, যা রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ—লব্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিত বহন করে।

(খ) অনুভূতিনাশক ঔষধের ব্যবহার। যদিও বলা হয়েছে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে শক্ত করে বাঁধতে হবে, যাতে অস্ত্রোপচার চলাকালীন সে নড়াচড়া না করতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, রোগীকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে মদ খাওয়াতে হবে, যাতে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে সে অজ্ঞান না হয়ে যায় অথবা কাটা-ছেঁড়ায় কষ্ট না পায়।

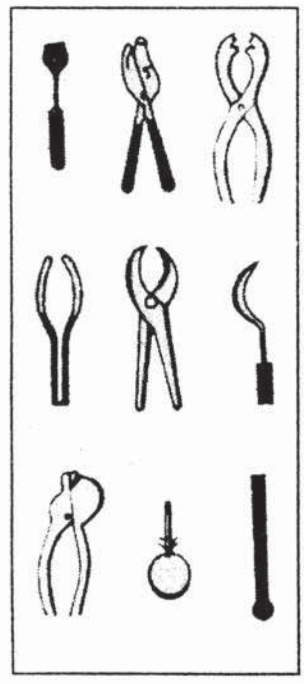

চিত্র ৩.৭ : সুশ্রুত বর্ণিত শল্য-চিকিৎসার অস্ত্র —চিত্রশিল্পী দ্বারা পুনর্গঠিত

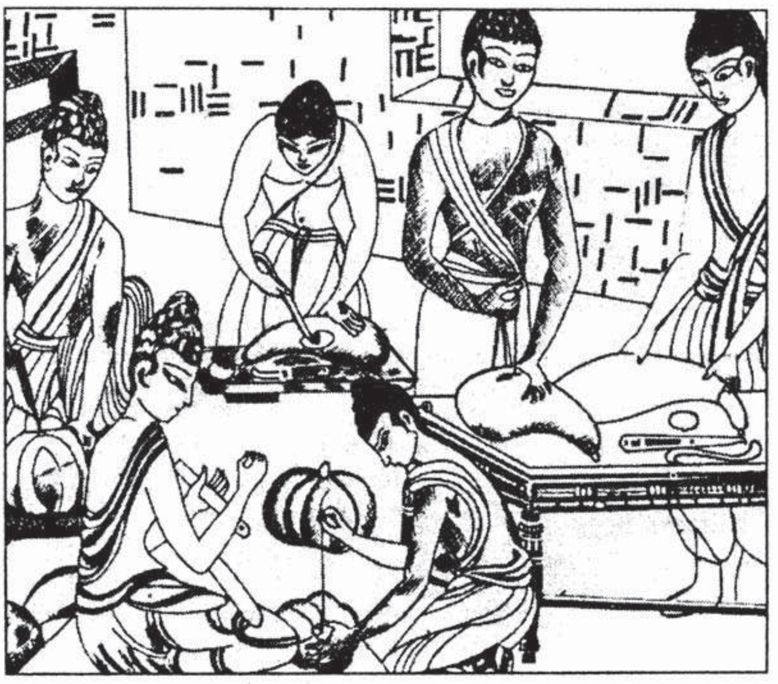

চিত্র ৩.৮ : শিল্পীর চোখে অভ্যাসরত সুশ্রুতের ছাত্ররা। এখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা কুমড়া, লাউ, শসা ও অন্যান্য সব্জির ওপর অস্ত্রোপচার অভ্যাস করছেন। জীবিত মানুষের ওপর অস্ত্রোপচারের আগে তারা সব্জি, মৃত পশু পূর্ণ আকৃতির পুতুল ইত্যাদির ওপর অভ্যাস করতেন।

এই বচনগুলি ঐতরেয় উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে নেওয়া

তাহলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লৌহযুগে ভারতবর্ষের চিকিৎসা পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হত। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, চরক ও সুশ্রুত দ্বারা অনুসারিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পুরোহিতদের রোষ ও অসন্তোষ উদ্রেক করেছিল। এর কারণ, বোধ হয়, তাদের দ্বারা অনুসারিত পদ্ধতি অনেক সময়েই পুরোহিতদের ধারণার সঙ্গে ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ, তাঁরা ‘দেবতারা দুর্বোধ্যতা পছন্দ করেন’ অথবা ‘প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ তাঁদের ঘোর অপছন্দ’—এই ধারণা প্রচার করে বেড়াতেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে, ভারতীয় চিকিৎসকরা উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে কোনোপ্রকার তফাৎ করতেন না। এটাও একটা কারণ যেজন্য পুরোহিতরা চিকিৎসকদের অপছন্দ করতেন।

অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে, সেই যুগের চিকিৎসাপদ্ধতিতে, তৎকালীন সমাজের চিন্তা-ভাবনার কোনো প্রভাব ছিল না। যেমন বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত নানা চিন্তা, অর্থাৎ মহাবিশ্বের উদ্ভব, পৃথিবী ও প্রাণের সৃষ্টি, এসবেরই প্রতিফলন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রোগের উৎস হিসেবে ‘ত্রিদোষ’, অর্থাৎ ‘বায়ু’, ‘পিত্ত’ ও ‘কফ’-এর উল্লেখ তৎকালীন সমাজের চিন্তা-ভাবনারই প্রতিফলন। একইভাবে, রোগের উপশম ঘটায় এমন দ্রব্যাদির গুণাগুণকে ‘পঞ্চভূত’, অর্থাৎ ‘পৃথ্বি’, ‘অগ্নি’, ‘জল’, ‘বায়ু’ ও ‘আকাশ’-এর সঙ্গে একত্রিত করার মধ্যে দিয়ে ওই একই মানসিকতার প্রভাব লক্ষ্য

করা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুসারে, সকল জীবনের মধ্যেই 'ত্রিদোষ'—বায়ু, পিত্ত ও কফ বিদ্যমান। এই তিনের মধ্যে সমতা কোনো কারণে ব্যাহত হলেই দেহে রোগের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য সেই যুগে দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদে গোঁড়ামী সত্ত্বেও চিকিৎসকরা রোগীর পক্ষে যা প্রয়োজনীয়, তাই নির্দেশ করতেন।

অনুশীলনী ৩

নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলির মধ্যে যেগুলি চরক এবং সুশ্রুত দ্বারা অনুসারিত অথচ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি সম্মত নয়, সেগুলি (✓) চিহ্নিত করুন।

(ক) পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই চিকিৎসা-সংক্রান্ত জ্ঞান গড়ে উঠেছে।

(খ) ব্যাপক অনুসন্ধান ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হলে তবেই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করা হত।

(গ) ঔষধ বা চিকিৎসাপদ্ধতি নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

(ঘ) এটা মনে করা হত যে বায়ু, পিত্ত, কফ—এই ত্রিদোষই রোগের কারণ। আর পাঁচটি মৌল—পৃথ্বি, জল, অগ্নি, বায়ু ও ব্যোম—এদের থেকেই রোগনির্মূলকারী বস্তুরা তাদের ঔষধি গুণ লাভ করে।

(ঙ) ঔষধ ও রোগের শ্রেণীবিভাগ করা হত।

এটা সত্যি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে চিকিৎসাবিজ্ঞান যার সূচনা হল গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্যে তা শেষ পর্যন্ত সেই পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফলের শ্রেণীবিভাগের চেয়ে বেশি আর অগ্রসর হতে পারল না। এই বিজ্ঞান কখনোই শক্ত তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারল না। যদিও প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, তার গর্ভ থেকে কোনো সাধারণ সূত্র বা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হল না। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় কী চতুর্থ শতকের পরবর্তী যুগে এই বিজ্ঞান ক্রমশ নতুন—পর্যবেক্ষণ ছেড়ে, অলৌকিকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থার জন্য দায়ী হয়তো অনেক কারণ, তবে এর মধ্যে অন্যতম যে ধর্মীয় গোঁড়ামী সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে যে অগ্রগতি ঘটেছিল, তা পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে বহুলাংশে ভিন্ন ছিল। ব্রোঞ্জযুগে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে, একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ নতুন নতুন প্রকৌশল উদ্ভাবন করেছিল। শিখেছিল ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি, জাহাজ নির্মাণ বা ঔষধ তৈরির কৌশল। যেহেতু বেঁচে থাকার তাগিদ সকলের মধ্যেই রয়েছে, তাই এই উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার রূপটি ছিল সার্বজনীন, অর্থাৎ অসংখ্য মানুষ সেই প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিলেন।

কিন্তু লৌহযুগে এসে দেখি, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ, যেমন পর্যবেক্ষণ থেকে সূত্রায়ণ, রোগীর চিকিৎসা বা জ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মকে পরিচিত করানো, ইত্যাদি মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর দায়িত্বে পর্যবসিত হয়। এরা সাধারণভাবে রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করতেন। এই ব্যবস্থার ভালো-মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। এর ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে যে, এই ব্যবস্থার ফলে দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত না থেকে কিছু মানুষ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বা কোনো জটিল সমস্যাকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার প্রচেষ্টা করতে অথবা তা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারতেন। অন্যদিকে, এর ফলে যারা জ্ঞানের চর্চা করতেন তারা ক্রমশ ব্যবহারিক জগৎ ও তার কারিগরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এটা ভারতীয় এবং গ্রীক, উভয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল।

এবার আমরা, গ্রীসে লৌহযুগে বিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে জানব।

৩.৩ লৌহযুগে গ্রীসে বিজ্ঞানচর্চা

পৃথিবীর ইতিহাসে লৌহযুগে ভারত এবং গ্রীসের সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা জানি যে, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। হয়তো জ্ঞানের বিস্তার হয় প্রথমে পশ্চিম এশিয়ার মাধ্যমে এবং শেষে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-এ আলেকজান্ডারের আকস্মিক উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণের ফলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাই সহজেই বলা যায় যে, ভারত এবং গ্রীস বিশ্ব সৃষ্টিরহস্য চর্চায়, চিকিৎসাশাস্ত্রে, শল্যচিকিৎসায় এ ধরনের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে একে অপরকে প্রভাবিত করে।

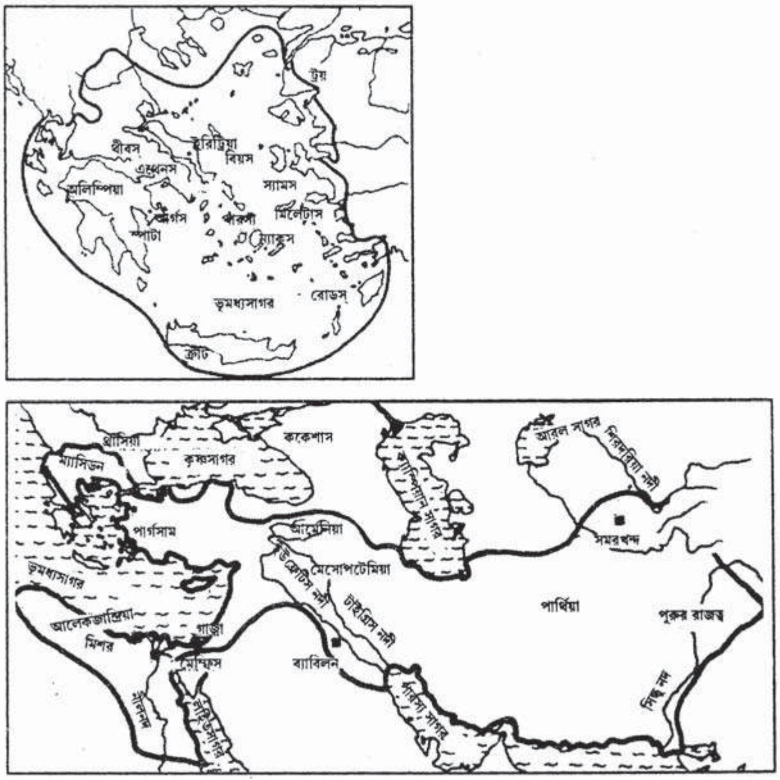

চিত্র ৩.৯ : (ক) গ্রীক নগররাষ্ট্র (খ) আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য

একই সময়ে ভারত ও গ্রীসে সভ্যতার বিকাশে অপর যে সাদৃশ্যটি দেখা যায় তা হল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে একই ধরনের গঠন। ভারতে যেখানে নিম্নশ্রেণীর মানুষের ওপর ব্যবহারিক ও কায়িক শ্রমের ভার ছিল, গ্রীসে তেমনি এ ধরনের কায়িক শ্রমের ভার ছিল ক্রীতদাসদের ওপর। কারিগর ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে সবসময় চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় নিম্নতর শ্রেণীর বলে মনে করা হত। যদিও অনেক স্বাধীন নাগরিক নানা কারুশিল্পের কাজ করতেন তবুও তাঁদের কাজকে দাসেদের সমপর্যায়ের এবং জঘন্য ও নীচুস্তরের বলে গণ্য করা হ'ত। তাই লক্ষ্য করা গেছে যে, গ্রীস এবং ভারত এই উভয়

দেশেই চিন্তাশীল বিজ্ঞানচর্চা থেকে প্রয়োগ কৌশলের উদ্ভাবনকে দূরে রাখা হয়েছে। তার ফলে ব্যবহারিক কাজকর্মের ওপর চিন্তাবিদ্‌দের প্রভাব এবং প্রায়োগিক চিন্তার অভ্যাস কমে গিয়েছিল।

যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং শিক্ষাদানে রত ছিলেন এমন মানুষদের শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চা এক অদ্ভুত ধারায় চলে। প্রথম দিকে, এর ফলেই গ্রীক বিজ্ঞান, যেমন জ্যামিতি, বলবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং বিশ্বসৃষ্টির রহস্য বিষয়ক চর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিকশিত হয়, কিন্তু শেষে এর ফলেই গ্রীক বিজ্ঞান চর্চা অনেক বেশি অনুমান-নির্ভর ও বিমূর্ত হয়ে ওঠে। এই বিমূর্ত ভাবগুলি বাস্তব জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। যাই হোক, এই ধারণাগুলি যেহেতু সেই সময়ের অগ্রগামী উদ্ভাবক ও দার্শনিকেরা সূত্রাকারে পরিণত করেছিলেন, তাই এই দুর্বোধ্য ধারণাগুলি সাধারণের কাছে 'প্রকৃতির নিয়ম' বলে গৃহীত হয়। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই ধারণার বিরোধিতা করতেন তাদের অগ্রাহ্য করা হত। ফলে এই বিমূর্ততা আগামী ২০০০ বছরের বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

ভারতে পদার্থবিদ্যায় এবং সৃষ্টিরহস্যচর্চার ক্ষেত্রে অবাস্তবতা বাড়ে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সঙ্গে চিকিৎসা-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যার যোগাযোগ দৃঢ় ছিল উপরন্তু চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ নিরাময়ের জন্য নিষিদ্ধ মাংস ও অন্যান্য বস্তুর প্রয়োজন হত। জীবনরক্ষা এবং রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকরা সাধারণভাবে 'কর্ম' এবং অন্যান্য প্রাচীন মতবাদকে উপেক্ষা করতে শুরু করেন। খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে অধ্যাত্মবাদী এবং শাসকগণের দোষারোপের ফলে ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা নিশ্চল হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানচর্চায় তৎকালীন মতাদর্শ এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রভাবের ক্ষেত্রে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। এই যুগের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রচনা সর্বদা ঈশ্বরকে অভিবাদন জানিয়ে শুরু হত। কিন্তু মূল রচনাটি দার্শনিক চিন্তাধারা এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত ছিল। অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির রহস্য বিষয়ক এবং চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু রচনার (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঁচটি মৌলিক উপাদান—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) এবং তিনটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল। সেই যুগে গ্রীক বিজ্ঞান চর্চা অবশ্য তৎকালে প্রচলিত সামাজিক দর্শন ও ভাববাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল যেমন ডেমোক্রিটাস (Democritus) এবং তিনটি ক্ষেত্রে হিপোক্রেটাসের (Hippocratus) চর্চাগুলি।

এই সময় ছিল গ্রীক বিজ্ঞান চর্চার অনুসন্ধানের যুগ। দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরা ক্রমাগত কোনো বিষয়ের কারণ ও যুক্তির অনুসন্ধান করতেন। কিন্তু তাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অভাবে এবং ক্রীতদাস সমাজের দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর খুঁজতেন।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে গ্রীক দার্শনিকরা যেমন থালেস (Thales), এম্পেডকলস (Empedocles) এবং পিথাগোরাস (Pythagoras) এর ব্যতিক্রম ছিলেন, কারণ তাঁরা পৃথিবী কী তা অনুমান করেছিলেন এবং তাঁদের পৃথিবী সৃষ্টির তত্ত্বে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা ছিল না। সৃষ্টির মূল উপাদান চারটি—মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি—এই তত্ত্বের প্রবক্তারূপে আয়নীয় দার্শনিকদের উল্লেখ প্রয়োজন। আমরা পরের অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করব।

অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) ছিলেন প্রথম সারির একজন গ্রীক দার্শনিক। তিনি গ্রীক বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন; পৃথিবীর সৃষ্টি কীভাবে হয়, এই তত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তিনি আয়নীয় দার্শনিকদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবী সর্বদা একই রকম আছে এবং থাকবে, কারণ ঠিক এইরকম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অ্যারিস্টটলের মতে, আদর্শ জাগতিক বিশ্ব ছিল আদর্শ সামাজিক বিশ্বের ধরনে গড়া, যেখানে স্বাধীনতাহীনতা স্বাভাবিক ছিল। এই পৃথিবীর সবই, সে বিবর্তনের নীচু ধাপে থাকা মাছই হোক বা গ্রীক নগররাষ্ট্রের ক্রীতদাসই হোক এরা সকলেই নিজের জায়গা জানে, এবং স্বাভাবিকভাবেই সেটিকে রক্ষা করে চলে। এইভাবেই নির্জীব বস্তুগুলি তখনই নড়াচড়া করে যখন তারা নিজের জায়গার বাইরে যায় এবং আবার তাদের পূর্বনির্ধারিত মূলস্থানে ফিরে আসে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি পাথরকে বাতাসে ছুঁড়লে সেটি পৃথিবীর দিকে নেমে আসে বা আগুনের ফুলকি ওপরে উঠে যায় স্বর্গীয় আগুনের সঙ্গে মিলিত হতে। প্রাকৃতিক নিয়মেই সজীব বস্তু সচল থাকে—তাই পাখিরা স্বাভাবিক নিয়মে আকাশে ওড়ে, মাছ জলে সাঁতার কাটে। এইভাবেই তিনি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, প্রকৃতির সমস্ত গতিই পূর্বনির্ধারিত বা শেষ উদ্দেশ্যসাধক।

অ্যারিস্টটল কখনোই এমন কথা কাউকে বলেন নি যা তাঁরা পূর্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বুঝিয়ে চলতেন যে, তারা পৃথিবীকে যেমন জানে পৃথিবী ঠিক তেমনই; যতদিন পৃথিবী একইরকম থাকবে ততদিন অ্যারিস্টটলের ধারণা বহাল থাকবে। যাই হোক, আমরা দেখেছি যে পৃথিবী একই অবস্থায় থাকেনি এবং অ্যারিস্টটলের এই চিন্তাধারার বিরোধিতা হয়, যদিও এই ঘটনা ঘটতে প্রায় ২০০০ বছর সময় লেগেছিল।

চিত্র ৩.১০ : অ্যারিস্টটলের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানচর্চা হল জীবনবিজ্ঞান।
তিনি কিছু সামুদ্রিক প্রাণী, মৌমাছি ও তাদের রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন।

৩.৩.১ বিজ্ঞানচর্চার কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি

আমরা এখন গ্রীক বিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা আলোচনা করব।

জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা

একটি আদর্শ পৃথিবীর সঠিক রূপ এবং অনুপাত করার প্রয়োজনেই পিথাগোরাস (Pythagoras) খ্রিস্টপূর্ব (৫৮২-৫০০) এবং কিয়স (Chios) দ্বীপের হিপোক্রেটাসের (Hippocratus) (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০) জ্যামিতি চর্চার অগ্রগতি হয়। শেষোক্তজন দীর্ঘদিন ধরে উত্তর না পাওয়া সমস্যা, যেমন বৃত্তকে বর্গ করা এবং ঘনককে দ্বিগুণ করা ইত্যাদির সমাধানে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই দুই ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হন। তবে জ্যামিতির বক্ররেখা বিষয়ের গবেষণার পথ দেখান তিনি।

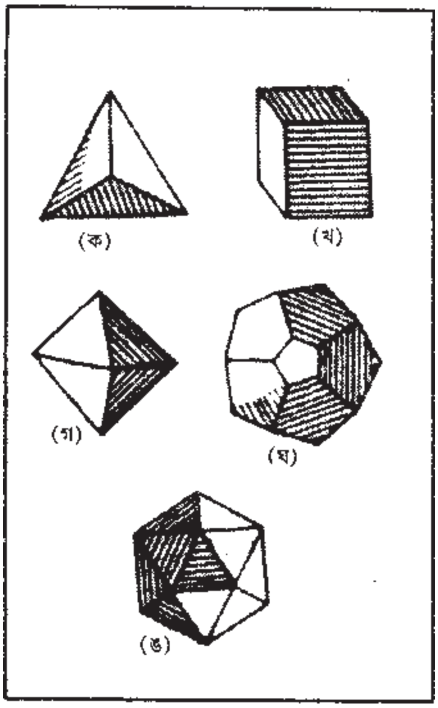

চিত্র ৩.১১ : গ্রীকদের দ্বারা চর্চিত পাঁচটি জ্যামিতিক ঘনবস্তু : (ক) চতুস্তলক (Tetrahedron) (খ) ঘনক্ষেত্র (Cube) (গ) অষ্টতলক (Octahedron) (ঘ) দ্বাদশ তলক (Dodecahedron) (ঙ) বিংশ তলক (Icosahedron)। প্রত্যেক ঘনবস্তুর প্রত্যেক তলের আকার এবং ক্ষেত্রফল সমান। বিখ্যাত বিংশতি গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক পিথাগোরাসই এগুলির আবিষ্কারক।

ইউডক্সাস (Eudoxus) (খ্রিস্টপূর্ব ৪০৮-৩৫৫) সম্ভবত বিশিষ্টতম গ্রীক গণিতবিদ্ ছিলেন। তিনি সমকেন্দ্রিক গোলকের সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদের গতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। তিনি এও ব্যাখ্যা করেন যে, এরা প্রত্যেকে তার বাইরের গোলকের একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সপক্ষে তার কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে থাকে। এই পদ্ধতিটি নিতান্তই অপরিণত এবং অতি সারল্য দোষে দুষ্ট; এর দ্বারা সেই সময়ের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকেও ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এইভাবে পাওয়া ধাতব গোলকগুলি দীর্ঘকাল ধরে জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার যন্ত্রপাতির ভিত্তিরূপে গণ্য হয়।

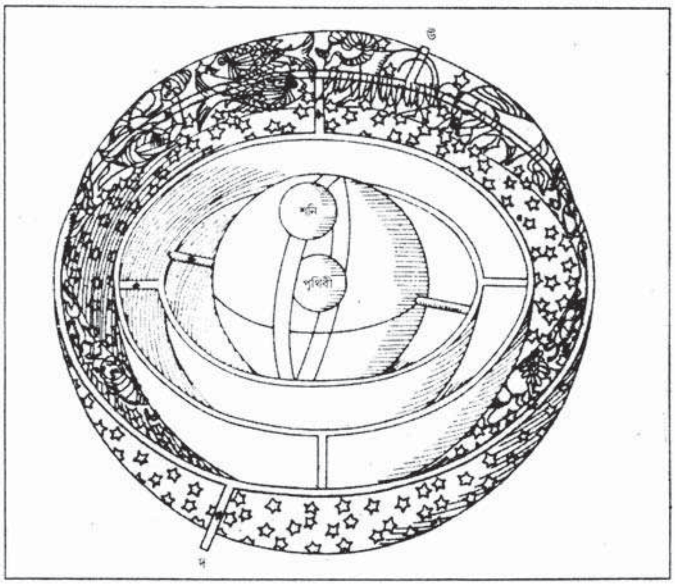

চিত্র ৩.১২ : গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করার জন্য ইউডক্সাসের 'গোলকের মধ্যে গোলক প্রতিকল্পর' অংশবিশেষ। গ্রহরা পৃথিবীর চতুর্দিকে নিখুঁত বৃত্তপথে পরিভ্রমণরত এই বিশ্বাসে ইউডক্সাস পৃথিবীর চারদিকে ২৭টি সমকেন্দ্রিক গোলক অঙ্কন করেন। প্রত্যেকটি গোলক নিজস্ব গ্রহটি সহ বিভিন্ন অক্ষের চারপাশে পরিভ্রমণরত ছবিতে তীরচিহ্ন—গোলকগুলির ঘূর্ণন বোঝাচ্ছে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২০০ বিদগ্ধ পণ্ডিতসমাজে এবং এথেন্সের শিক্ষাগৃহের পরিবেশে জ্যামিতিচর্চার যে ধারা গড়ে ওঠে তা আলেকজান্দ্রিয়ার যাদুঘরে রাখা আছে। প্যারগা (Perga) অ্যাপোলোনিয়াস (Apollonius) (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০) ইউডক্সাসের (Eudoxus) জ্যামিতির সম্প্রসারণ করেন এবং উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত এবং পরাবৃত্ত প্রভৃতি শঙ্কুর বিভিন্ন ছেদে আকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রচনা করেন, ইউক্লিডের (Euclid) (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০) স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী গণিতের জ্ঞানসমূহও একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ জ্ঞানে পরিণত হয়। বর্তমানে স্কুলে এই জ্যামিতি পড়ানো হয়।

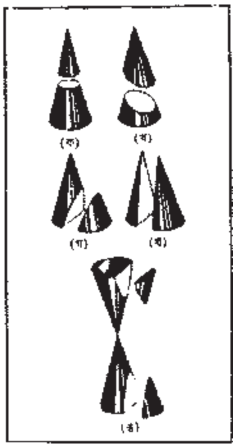

চিত্র ৩.১৩ : অ্যাপোলোনিয়াসের শঙ্কুচ্ছেদ।
(ক) শঙ্কুর ভূমিতলের সমান্তরালভাবে কাটা অংশ বৃত্ত তৈরি করে। (খ) তেরছা-ভাবে কাটা অংশ একটি উপবৃত্ত তৈরি করে। (গ) শঙ্কুর ওপর অঙ্কিত সরলরেখার সমান্তরাল ছেদ করে পরাবৃত্ত পাওয়া যায়। (ঘ) শীর্ষবিন্দুর মধ্য দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হলে পরস্পরচ্ছেদী দু'টি রেখা পাওয়া যায়। (ঙ) শঙ্কু এবং তার প্রতিবিম্বকে রেখে ছেদ করলে অধিবৃত্ত পাওয়া যায়।

তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্তরে ছিল। অ্যারিস্টটলের শিক্ষক প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (Plato) মতে, আকাশের গায়ে বিশ্বটিই আদর্শ এবং যেসব বিচ্যুতিগুলি দেখা যেত সেগুলি অগ্রাহ্য করা যায়। অপরপক্ষে, গ্রহ এবং তারাদের সঠিক অবস্থান জানাও জরুরি ছিল। ফলে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আদর্শ সহজ এবং সুন্দর পৃথিবীর ধারণাকে অগ্রাহ্য না করে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অপেক্ষাকৃত জটিল প্রতিকল্প উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। জ্যোতির্বিদ্যার গাণিতিক ভিত্তি হল ইউডক্সাসের গোলকগুলি যা, ৩.১২ চিত্রে দেখানো হয়েছে। কিন্তু গ্রহগুলির প্রকৃত গতিবেগ জানার জন্যে হিপার্কাস (Hipparchus) (খ্রিস্টপূর্ব ১৯০-১২০) একটি সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করেন যা "চক্রের মধ্যে চক্র" নামে পরিচিত। উপরন্তু তিনি জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার জন্য অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তী ২০০ বছর পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। প্রায় ২০০ বছর পরে টলেমি (Ptolemy) (৯০-১৬৮ খ্রিস্টাব্দে) এই তত্ত্ব গ্রহণ করেন; যাতে বলা হয় যে, পৃথিবী কেন্দ্রে এবং বাকি গ্রহগুলি, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে (চিত্র ৩.১৪)। এটাই ছিল পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা।

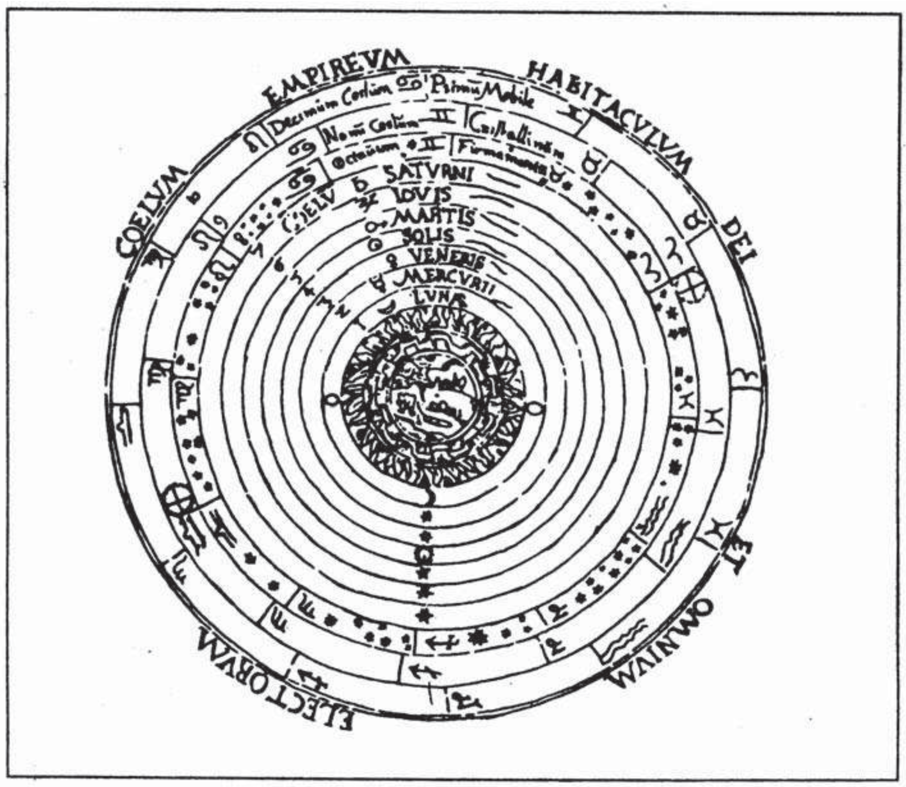

চিত্র ৩.১৪ : টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের নকশা। মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, জল—এই চারটি মূল উপাদান সহ পৃথিবীকে কেন্দ্রে দেখানো হয়েছে। এই উপাদানগুলির ওপর আছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। তারপর স্থির নক্ষত্রদের অবস্থান, তারপর নবম ও দশম গোলক, যাদের চালিকাশক্তি ঐশ্বরিক এবং অন্যান্য গোলকও এদের মাধ্যমেই তাদের গতি লাভ করে। এরপর স্বর্গ যেখানে ঈশ্বর ও তাঁর নির্বাচিত প্রিয়পাত্ররা বাস করেন।

সামোস দ্বীপের অ্যারিসটার্কাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩১০-২৩০) প্রভৃতিরা বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন যে সূর্য কেন্দ্রে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্য গ্রহরা ঘুরছে। কিন্তু এই ধারণা তখন বাতিল করা হয়, কারণ তা দর্শনশাস্ত্রমতে অসমঞ্জস আর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিরোধী ছিল বলে মনে করা হয়। যাইহোক এই মতবাদ আরব দেশীয়দের দ্বারা প্রচারিত হয়। কোপারনিকাস (Copernicus) (১৪৭৩-১৫৪৩) এই তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করেন; শেষে গ্যালিলিও (Galileo) (১৫৬৪-১৬৪২), কেপলার (Kepler) (১৫৭১-১৬০০) এবং নিউটন (Newton) (১৬৪২-১৭২৭) এই মতের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে ৬, ৯ এবং ১০ এককে আরও পাঠ করবেন।

বলবিদ্যা

বিজ্ঞানের অপর শাখা বলবিদ্যা বিষয়ে গ্রীক সভ্যতার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলবিদ্যা উদ্ভূত হয় প্রয়োজনীয় বহুবিষয় থেকে, সেচ ব্যবস্থা, ভারী বস্তুকে সরানো বা তোলা, জাহাজ নির্মাণ, সামরিক সাজসজ্জা ও নানা যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় সৈন্যদের সাথে ঐ অঞ্চলের কারিগরদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়; তার ফলে পুলি, চরকি, স্ক্রু ইত্যাদি আবিষ্কারগুলি মানুষের ব্যবহারে আসে এবং ক্রমশ উন্নত হয়।

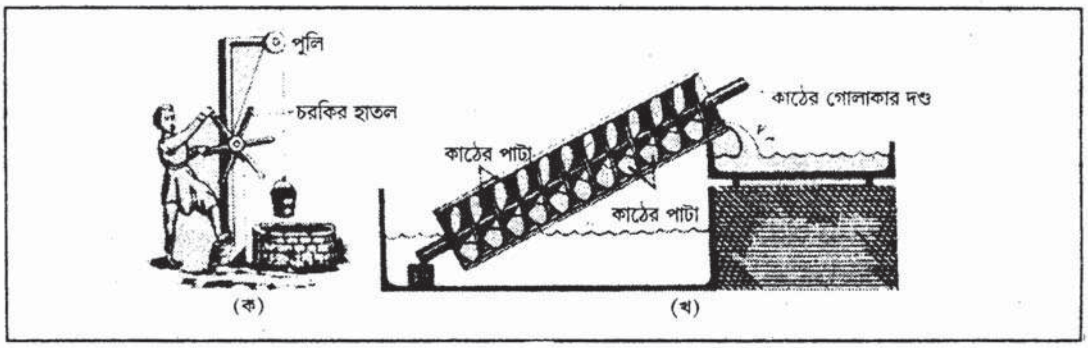

চিত্র ৩.১৫ : গ্রীসে ব্যবহৃত কিছু যান্ত্রিক কৌশল। (ক) চরকি এবং পুলি-কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য। (খ) আর্কিমিডিস পরিকল্পিত জলসেচের জন্য ব্যবহৃত জল তোলার স্ক্রুর প্রস্থচ্ছেদ কতকগুলি কাঠের পাটা একটি গোলাকার কাঠের দণ্ডের কিনারাতে পেঁচিয়ে তক্তা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে; যখন জলে ডুবিয়ে ঘোরানো হয় তখন জল পেঁচানো পাতের ওপর দিয়ে দমকে বেরিয়ে আসে।

বিভিন্ন বল সাম্যাবস্থায় ক্রিয়া করে কোনো বস্তুর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে—বলবিদ্যা সংক্রান্ত এই জ্ঞান প্রয়োগ করে আর্কিমিডিস (Archimedes) (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭-২১২) যন্ত্র তৈরির পদ্ধতিকে উন্নত করেন। ভাসমান বস্তু ও উদস্থিতিবিদ্যা বিষয়ে তাঁর অবদান আজও অপরিহার্য।

চিকিৎসাবিদ্যা

অপর যে বিষয় গ্রীসে এবং ভারতে সমমানের উন্নত হয় তা হল চিকিৎসাবিদ্যা, যদিও দু'দেশের ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি সম্পূর্ণ বিপরীত উৎস দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতে চরক এবং সুশ্রুত ভ্রাম্যমান চিকিৎসক ছিলেন

এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করতেন। এর ফলে গণতান্ত্রিক চিন্তার এবং বিশ্বদর্শনের উন্মেষ ঘটে। অপরদিকে, অভিজাততন্ত্রের সমর্থনে গ্রীক-চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা তার পুরনো ধারাতে চলে। সেইযুগে গ্রীক সভ্যতা যখন তার উচ্চ-কোটীর কৃতিত্বের আসন থেকে ক্রমশ অবনমনের দিকে যাচ্ছিল তখন ধনী নাগরিকেরা ও যাঁরা নিজেদের প্রাচুর্য এবং ভোগবাদে নিমজ্জিত রেখেছিলেন—তাঁরা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া চলতে পারতেন না। লক্ষ্য করার যে, আলেকজান্দ্রিয়ার যাদুঘর শারীরবিদ্যা এবং শব-ব্যবচ্ছেদবিদ্যার গবেষণাকে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছিল।

গ্রীক-চিকিৎসাবিদ্যায় কিয়স (Chios)-এর হিপোক্রেটিস (Hippocrates) একজন প্রবাদপুরুষ। তাঁর কাজগুলি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০-৩৫০-এর মধ্যে লিখিত হয়। তাঁর কাজের অন্তর্ভূত ছিল সযত্ন নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা। রোগ বা তার আরোগ্যের কারণ হিসাবে যাদুবিদ্যা বা ধর্মীয় আচার-আচরণের উল্লেখ করা হয়নি। যাই হোক, হিপোক্রেটিস (Hippocrates) প্রবর্তিত চিকিৎসাবিদ্যা, চার মৌলিক উপাদানের তত্ত্ব (Four elements) দ্বারা দমিত করা হয়। এই তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন একজন আয়নীয় দার্শনিক এমপেডক্লস্ (Empedocles), তাঁর ধারণায় চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় ক্ষেত্রের ক্ষতি হয়।

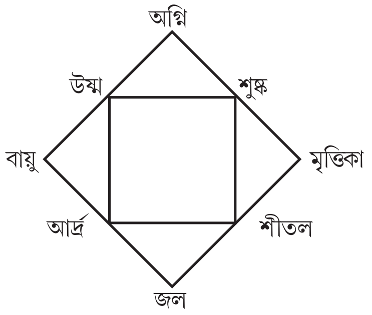

চিত্র ৩.১৬ : প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ্ এমপেডক্লসের চার উপাদান : তাঁর মতে এই 'মূল উপাদান'গুলি বিভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর নির্ভর করে তাতে কোনো্ গুণ যুক্ত হয়েছে তার ওপর। যেমন, প্রাথমিক উপাদানে শীতলতা ও শুষ্কতা এই দুই গুণ হয়ে তা মৃত্তিকায় পরিণত হয়, শীতলতা ও আর্দ্রতা যুক্ত হলে তা জলে পরিণত হয়, উষ্মতা ও শুষ্কতা যুক্ত হলে তা অগ্নিতে আর উষ্মতা ও আর্দ্রতা মিলে হয় বায়ু।

এই সময়ের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক হিরোফিলাস (Herophilus) (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁর গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম নার্ভের কার্যাবলী বুঝতে পারেন, এবং সংজ্ঞাবহ নার্ভ ও চালক নার্ভের প্রভেদ করেন। তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে নাড়ীর স্পন্দনের ব্যবহার চালু করেন। ইর‍্যাসিসট্রেটিক্স (Erasistratics) (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৮০) আরও এগিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের অদ্ভুত গুণের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ের মৌলিক কাজগুলির বেশিরভাগ অংশই মূল আকারে পাওয়া যায়নি। গ্যালেন (Galen) (১৩০-২০০ খ্রিস্টাব্দে) এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল রোম। তিনি এই মূলতত্ত্বগুলি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে এগুলির বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। অ্যারিস্টটলসম পাণ্ডিত্যের অধিকারী গ্যালেন আরবীয় ও মধ্যযুগীয় চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ করে শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করেন। গ্যালেনির দর্শনে আত্মার প্রবাহ ও ভাঁটাপড়া এবং শিরা-

উপশিরার মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালন, হৃৎপিণ্ড তাপের উৎস ও ফুসফুস ঠাণ্ডা বাতাসের উৎস, এই তত্ত্ব বর্ণিত হয়। এই বর্ণনা যদিও কিছুটা অবাস্তব তথাপি এর ফলেই মানবদেহ সম্বন্ধে মূল জ্ঞান পাওয়া যায়। বিস্ময়কর ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্যালন পর্যন্ত তিনি বিদেহী আত্মা ও আত্মার প্রাচীন ধারণাকে ভাঙতে পারেননি। প্রাচীন এই মতবাদ মানুষের নিজস্ব শরীর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অগ্রগতিকে আরও প্রায় ১৫০০ বছর পর্যন্ত ব্যাহত করেছিল।

অনুশীলনী ৪

দেখা যায় যে, গ্রীক বিজ্ঞানের অগ্রগতি দু'টি বিশেষ ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি পর্যবেক্ষণকে প্রকৃতভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং অপরটি আদর্শ পৃথিবীর ধারণাকে বোঝার জন্য উপযুক্ত তত্ত্ব এবং পদ্ধতির সৃষ্টি করে। নীচের সারণীতে দ্বিতীয় স্তম্ভে গ্রীক বিজ্ঞানের উন্নতির তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্তম্ভে দেওয়া দু'ধরনের উন্নয়নের কোনো্টির সঙ্গে এগুলি মেলে তা সনাক্ত করুন।

১		২	
(ক)	অ্যারিস্টটলের সুষম, সুন্দর ও আদর্শ বিশ্বজগতের ধারণার ওপর ভিত্তি করে অগ্রগতি	(১)	ভাসমান বস্তু সম্বন্ধে পুলি, জলতোলার স্ক্রু ইত্যাদির আবিষ্কার।
		(২)	পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেল।
		(৩)	সুষম আকারে কঠিন পদার্থ এবং বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির চর্চা।
(খ)	পরিবর্তনশীল জগতের বাস্তব পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে অগ্রগতি	(৪)	বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের বিবরণ, নার্ভের কার্যাবলী এবং ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদির চর্চা।
		(৫)	প্রকৃতির চারটি উপাদানের সমতুল্য দেহের চারটি রস।
		(৬)	নিখুঁত গোলক ও বৃত্ত ব্যতীত প্রকৃতিতে অন্য আকার দেখার অক্ষমতা। এর দ্বারা সমকেন্দ্রীয় গোলকের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের গতির ব্যাখ্যা।
		(৭)	সামুদ্রিক প্রাণী ও মৌমাছি এবং তাদের রোগ-সম্বন্ধীয় চর্চা।
		(৮)	'পৃথিবী অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তাই আছে এবং ভবিষ্যতে সর্বদা একই থাকবে'—এই ধারণা।

এই পর্যন্ত আমরা গ্রীক বিজ্ঞানের কয়েকটি ক্ষেত্র, যেমন জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। বস্তু প্রকৃতির অপর একটি বিষয় যা দার্শনিকদের মুগ্ধ করেছিল।

বিশ্বে বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধীয় দার্শনিক ধারণা ভারত এবং গ্রীসে সমতুল্য তত্ত্বের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। আমরা এখন এই তত্ত্বগুলির কিছু নিয়ে আলোচনা করব। এই ধারণাগুলি হয়তো আপনাদের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। আমরা জানি যে এগুলি এখন আর অভ্রান্ত নয়। যাই হোক, এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল এবং তাদের বোঝার প্রচেষ্টাকেই প্রকাশ করে।

৩.৪ প্রাচীন যুগের পারমাণবিক তত্ত্বের চর্চা

ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের মধ্যে প্রাচীনতম হল সাংখ্য (Sankhya) দর্শন। এই দর্শন অনুযায়ী চেতনা ব্যতীত সবকিছু মৌলিক বস্তু থেকে সৃষ্টি। এই দার্শনিক ধারণার মতে চেতনা, জড়বস্তু (inertmass) এবং শক্তি পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত এবং নির্ভরশীল। বিবর্তনের পদ্ধতিতে বস্তুকে যেমন সৃষ্টি করা যায় না তেমন ধ্বংসও করা যায় না এবং ভর, শক্তি ও চেতনা এই তিনের সমষ্টি একই থাকে; ভর এবং শক্তির পুনর্বিভাজনের ফলে বস্তুজগত, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে বৈচিত্র্য আসে। বস্তুকে তার পাঁচটি গুণের সাহায্যে চেনা যায়—গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, বর্ণ এবং শব্দ। এগুলি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুরও পাঁচটি প্রকৃতি ছিল, যথা—(ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং শূন্য (empty space)।

গ্রীসের থালেস (Thales) এবং আরও কয়েকজন, সম্ভবত আরও অনেক পরে (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০) বিশ্বসৃষ্টির জড়বাদী দর্শন প্রচার করেন—এটি আগের ধারণার সমতুল্য থালেসের মতে সবকিছুর সৃষ্টি প্রথমে জল থেকে এবং পরে পৃথিবী, বায়ু এবং জীবজগৎ পৃথক হয়ে যায়। অক্ষর জুড়ে যেমন শব্দের সৃষ্টি হয় তেমনি পৃথিবী ও বায়ুর সঙ্গে কুয়াশা ও অগ্নি এই দুই উপাদান যুক্ত হওয়ার ফলে বস্তুর সৃষ্টি হয়। সাংখ্যের মতে এই উপাদানগুলিকে দু'টি বিরুদ্ধ চরিত্রের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। একদিকে বায়ু, ঝড়, বন্যা, ঝড় প্রভৃতিকে বাস্তবে ঘটতে দেখা যায় অপরদিকে এরাই উষ্ম, শীতল, ভিজে, শুষ্ক, হালকা, ভারী প্রভৃতি গুণকে প্রকাশ করে।

সাংখ্য এবং গ্রীক মতবাদের স্পষ্ট অবদান হল যে, তারা ভগবানের হস্তক্ষেপ ছাড়া এবং পূর্বকল্পিত কোনো নকশা ছাড়াই কীভাবে বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং কেমন করে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটে তার একটি ছবি তৈরি করেন। কিন্তু এই ধারণাগুলির দুর্বলতা ছিল যে, এগুলি অস্পষ্ট এবং বিবরণ প্রধান। তাদের এই ধারণাগুলি কোনো সুনির্দিষ্ট পথে এগোয়নি; এগুলির সাহায্যে কোনোকিছুই সৃষ্টি করা যায়নি এবং এর কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল না। যাই হোক, এই ধারণাগুলির সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলিই প্রথম মানুষের নিজের উৎস এবং বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে খোঁজ করার প্রচেষ্টাকে প্রকাশ করে।

বস্তুর প্রকৃতিকে জানার অন্য এক পদ্ধতি হল পরমাণুর অস্তিত্ব বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়া। দৃশ্যমান সকল বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত—এই ছিল ধারণাটি। পরমাণুর কতকগুলি বিশেষ সমবায় বস্তুর প্রকৃতি ও গুণ নির্ধারণ করে।

ভারতীয় বৈশেষিকা (Vaisesika) ধারার বিখ্যাত প্রবক্তা ছিলেন কণাদ (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০)। তিনি ছোট কণাগুলিতে ব্যাসহীন গাণিতিক বিন্দুরূপে বিবেচনা করেন। এই বিন্দুগুলির চারটি প্রচ্ছন্ন গুণগত উপাদান ছিল, যেমন—পৃথিবী, বায়ু, জল ও অগ্নি এবং এর ভিত্তিতেই তাদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। কমপক্ষে একই ভাগের ছয়টি পরমাণুকে একত্রিত করে এবং মধ্যবর্তীস্থান শূন্যতা দিয়ে পূরণ করে—একটি রাসায়নিক মৌলের সদৃশ একটি জটিল অণুর সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন অসমসত্ব পরমাণুর সম্মিলিত হওয়ার যে সমস্যা তা জৈনরা সমাধান করেন। জৈনরা বলেন যে, যখন দু'টি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত পরমাণুকে একত্রিত করা হয় তখনই ঐ পরমাণুসমষ্টি একটি নতুন বস্তুর সৃষ্টি করে। পরমাণুগুলির যুক্ত হওয়ার কৌশল ছিল একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক পরমাণুর পারস্পরিক আকর্ষণ। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রকৃতির দ্বারাই যৌগিক পদার্থের সমস্ত গুণগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

এ ধরনের চর্চা খুবই উচ্চস্তরের বুদ্ধিদীপ্ত কাজ ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অনেক অপূর্ণতা ছিল। দার্শনিকগণ তাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে নানা বিরুদ্ধমতের তত্ত্ব একত্রিত করতে দ্বিধা করতেন না। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করার সময় তাঁরা বাস্তবে যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জেনেছিলেন তার সঙ্গে যা পর্যবেক্ষণ করেননি—সবই রেখেছিলেন। এমনকি ধর্মীয় পুস্তক থেকে তাঁরা জেনেছিলেন বা যার কোনো অস্তিত্বই নেই এমন বিষয়ও তাঁরা একত্রে রেখেছেন। এইভাবে জৈনরা তাদের বস্তুবাদী চিন্তায় কর্ম এবং আত্মার উল্লেখ করেছেন, আর বৈশেষিকরা ব্যাখ্যা করেন যে, পরমাণু গতি পায় অদৃষ্টের দ্বারা অর্থাৎ আগের জন্মের কৃতকর্মের ফলে।

আশ্চর্যজনকভাবে গ্রীক পরমাণুতত্ত্বের প্রবক্তারা আত্মা, অদৃষ্ট এবং কর্ম এ সকল ধারণা থেকে মুক্ত ছিলেন। ডেমোক্রিটাস (Democritus) (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪২০) শূন্যে বিরাজমান অসংখ্য ছোট ছোট অবিভাজ্য বস্তুকণার দ্বারা বিশ্বজগৎ গঠিত একথা কল্পনা করেন। পরমাণুগুলি অপরিবর্তনীয়, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারে এই পরমাণুগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু গঠনে সমর্থ;—এরকম মনে করা হত। তাদের গতি থেকেই সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তন ঘটত।

এই পারমাণবিক তত্ত্ব পূর্বনির্ধারিত সংহতির তত্ত্ব মেনে চলে না; অর্থাৎ এই তত্ত্ব বলে না যে, বিশ্ব সুস্থিত এবং তার সমস্ত কার্যাবলী পূর্বনির্দেশিত পথেই হয়েছে বরং এই তত্ত্বকথা বলত যে, বিশ্ব পরিবর্তনশীল। এই মতো প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের প্রতিষ্ঠিত মতের বিরোধিতা করে—সেই অর্থে এটি ছিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী।

আমরা গ্রীক অথবা ভারতীয় পরমাণুবাদকে—তাদের বুদ্ধিদীপ্ততা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ধারণার অংশ বলে বিবেচনা করতে পারি না। বাস্তবে প্রমাণ করা যায়—এমন কোনো সিদ্ধান্তে এর থেকে পৌঁছনো যায় না। যাই হোক, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, গ্রীক পরমাণুচর্চা তার সহজাত বস্তুবাদিতা এবং যুক্তিবাদিতা দ্বারা গ্যাসেন্ডি (Gassendi) (১৫৯২-১৬৫৫) ও নিউটন (Newton) (১৬৪২-১৭২৭) এমনকি এঁদের মাধ্যমে ২০০০ বছর পরে ডালটনকেও (Dalton) (১৭৬৬-১৮৪৪) প্রভাবিত করেছিল।

অনুশীলনী ৫

নীচের সারণীতে একদিকে আমরা লৌহযুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও সমাজের চিত্র এবং অপরদিকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও সমাজের চিত্র লিপিবদ্ধ করেছি। দু'দিকেই আমরা কিছু ফাঁকা জায়গা রেখেছি যেগুলি আপনাদের পূর্ণ করতে হবে। প্রথম অংশটি আমরা উদাহরণস্বরূপ করে দেখালাম।

চিত্র ৩.১৭ : ডিমক্রিটাস

গ্রীক বিজ্ঞান	ভারতীয় বিজ্ঞান
(ক) গ্রীক সমাজ সম্ভ্রান্ত কৃষক, শিল্পী, বৈশ্য এবং দাস প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।	ভারতেই বর্ণ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, এখানে চারটি শ্রেণী বা বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র।
(খ)	বিজ্ঞানের বেশিরভাগ অগ্রগতিই ভারতে তৎকালে প্রচলিত দর্শন ও ভাবধারা থেকে মুক্ত ছিল যদিও প্রায় সমস্ত কর্মই শুরু হত ঈশ্বরকে স্মরণ করে। এঁরা অনুমানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে ব্যবহারিক ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন।
(গ) গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর সমর্থনেই বিকশিত হয়।	....
(ঘ) গ্রীক বিশ্বসৃষ্টির চারটি উপাদন—বায়ু, অগ্নি, কুয়াশা এবং মৃত্তিকা।	....
(ঙ)	.... ভারতীয় পরমাণুবিদ্‌রা বস্তু ও পরমাণুবাদের ধারণার মধ্যে আত্মা, কর্ম বা অদৃষ্টের ধারণা আনেন।

৩.৫ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অবনতি

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীক সাম্রাজ্য অরাজকতার ফলে এবং শক্তিশালী রোমের চাপে ধ্বংসের পথে যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ইটালি সুন্দর আবহাওয়া বিশিষ্ট এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বর্ধিষ্ণু জনগণসহ একটি কৃষি-নির্ভর দেশ ছিল। রোমানরা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নিজেদের একটি জনসমর্থনপুষ্ট, শক্তিশালী, সামরিক একনায়কতন্ত্র রূপে গড়ে তোলে। সৈন্যবাহিনী পূর্ব এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি এবং ব্রিটেন,

চিত্র ৩.১৮ : রোমান সাম্রাজ্য—খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী।

জার্মানির পশ্চিমাংশ এবং অস্ট্রিয়া (চিত্র ৩.১৮) জয় করে। সৈন্যবাহিনী তখন ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং ধনবান বণিকশ্রেণী এবং ক্রীতদাসের মালিকরা দেশ শাসন করতে থাকে। আসল শক্তি ছিল সৈন্যদের, কারণ সম্রাট সৈন্যদের মধ্যে যাতে বিদ্রোহ না হয় এবং অন্য কেউ সম্রাট হয়ে না বসে, তার জন্য এদের ব্যবহার

করে প্রচুর কর আদায় করতেন। ধনবানেরা তাদের প্রাসাদ থেকে ক্রীতদাসদের সাহায্যে উর্বর জমিগুলিতে চাষ-আবাদ করতেন। অন্যদিকে অনুর্বর এলাকাগুলিকে ক্রীতদাস ও নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষদের (Pagan natives) বসবাসের জন্য ছেড়ে রাখা হত। ফলে, অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল কেবলমাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগে সাম্রাজ্য থেকে জোর করে অর্থ আদায় ও ক্রীতদাসের দ্বারা চাষ-আবাদ। এই পরিস্থিতিতে এটা বোধহয় আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, সেখানে নতুন প্রয়োগ-কৌশল সহযোগে উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনীতির উন্নয়ন করার কোনো চাহিদা ছিল না। তাই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান ছিল অত্যন্ত সীমিত।

রোমান যুগে যখন প্রয়োগকৌশলের কোনো উন্নতি ছিল না এবং বিজ্ঞানের কোনো অগ্রগতি হয়নি তখন প্রচলিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই সামরিক এবং অসামরিক শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনে প্রাসাদ নির্মিত হত। পোড়া ইট এবং চূণ ও আগ্নেয়গিরির ছাই দিয়ে তৈরি জমাট বস্তু দিয়ে রাস্তাঘাট, বন্দর, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার এবং নাট্যশালা প্রস্তুত করা হত।

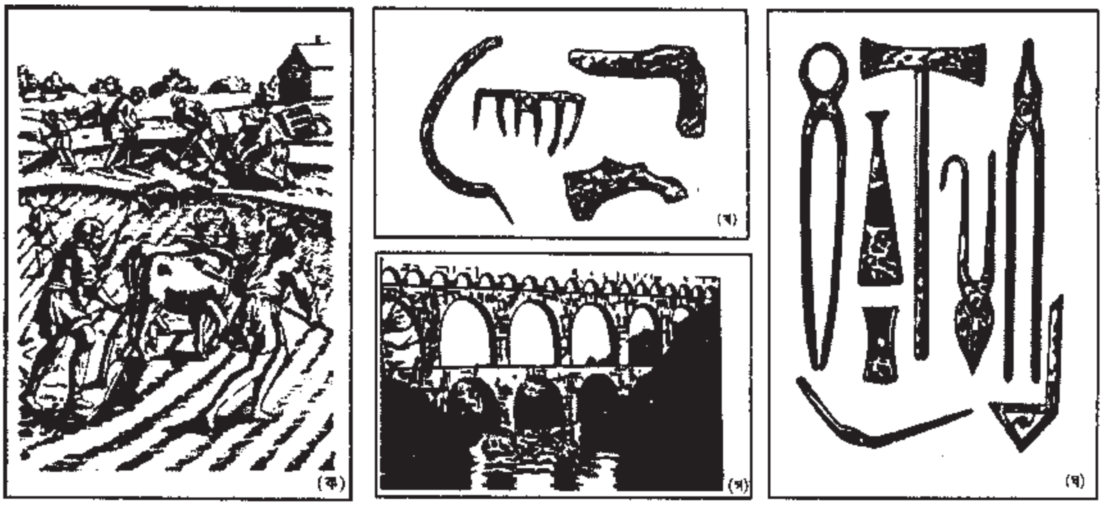

চিত্র ৩.১৯ : (ক) রোমান কৃষিজমিতে লাঙল দেওয়া এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ : যেমন—কাঠখোদাই, লাঙল বানানো, ঝুড়ি বোনা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। প্রেক্ষাপটে একটি মই লক্ষ্যণীয়।

(খ) কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (১) কাস্তে, (২) দাঁতাল, (৩) বাগানে ব্যবহৃত ছুরি এবং (৪) কুঠার।

(গ) পোড়ানো ইট এবং আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত ছাই ও চূণের কংক্রীট দ্বারা নির্মিত জলবাহী ক্যানেল। এই ক্যানেল রোমান সাম্রাজ্যে শত শত কিলোমিটার জল পরিবহণে ব্যবহৃত হত।

(ঘ) অট্টলিকা নির্মাণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (১) সাঁড়াশি, (২) কণিকা, যা দিয়ে চূর্ণ বালির মিশ্রণ ছড়ানো হয়। (৩-৬) হাতুড়ির মাথা, (৮) কাটাকাটির যন্ত্র, (৯) রাজমিস্ত্রীর যন্ত্র।

মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তিদের হাতে সম্পদ এবং ক্ষমতা জমা হওয়া ও দাসেদের প্রতি তাদের পাশবিক নিষ্ঠুরতার ফলে যে দারিদ্র্য, তা বস্তুসামগ্রীর চাহিদাকে কমিয়ে দেয়। সেজন্য বৈশ্যশ্রেণী এবং কারিগরশ্রেণীর অবস্থা আরও অবনতির দিকে যায়। বিজ্ঞানের চর্চায় নতুন প্রকৌশল আবিষ্কারের কোনো প্রয়োজন না থাকায় বিজ্ঞান তার প্রধান গুণ, প্রকৃতির প্রতি কৌতূহল হারায়। রোম সাম্রাজ্যের পরে ইউরোপে ভূমিদাস প্রভুত্ব ও সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয় তাই পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা গতিহীনতা দেখা যায়। ইউরোপকে অন্ধকার যুগ গ্রাস করে এবং শিক্ষা ও জাগরণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে প্রাচ্য। আপনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অগ্রগতি বিষয়ে ৫ এবং ৬ এককে আরও পাঠ করবেন।

জে. ডি. বার্নালের বিখ্যাত গ্রন্থ (Science in History) (পৃষ্ঠা ২৩১) পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন সামাজিক অধঃপতন কীভাবে বিজ্ঞানের পতন ডেকে আনে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক বা তার পূর্বেই ধ্রুপদী সভ্যতার ভিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানের দুর্ভাগ্য যে তার মৃত্যু অনেক প্রলম্বিত হয়েছিল। এই সময়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল, তাও হারিয়ে যায়। আহরিত জ্ঞান যদি নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তাও অবশিষ্ট থাকে না, সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। প্রথমে বইয়ে পুরু ধুলো জমে, কারণ কেউ পড়ে না বা খুব কম লোকের কাছে তাদের প্রয়োজন থাকে। এরপর একদিন আসে যখন কেউ আর সেগুলি পড়ে বুঝতে পারে না। সেগুলি ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং সব শেষে, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের ভাগ্যে যা জুটেছিল, অর্থাৎ যেটুকু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তা সাধারণ স্নানাগারের জল গরম করার জন্য পোড়ানো হয়। এছাড়া, আরও হাজার উপায়ে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

৩.৬ সারাংশ

এই পর্বে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ পর্যন্ত আমরা লৌহযুগে ভারতীয় এবং গ্রীক সভ্যতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি সম্বন্ধে জেনেছি। আমরা দেখেছি যে, এই যুগে ভারত এবং গ্রীসে একই ধরনের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস গড়ে ওঠে, যা এই সমাজে বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলেছিল। আমরা এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে বলছি।

ভারতে কৃষিজ ভূমি এবং খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমিতে সভ্যতার বিস্তার ঘটায়। যাযাবর আর্য উপজাতির কৃষিজীবী সম্প্রদায়রূপে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অভ্যাস করতে প্রায় হাজার বছর সময় লেগেছিল। এই উপজাতি সমাজ ক্রমশ কিছুটা বিবাদমুক্ত নাগরিক এবং সংগঠিত সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল। নাগরিক বসতিগুলিতে ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন শুরু হল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। পরবর্তী সময়ে তা দৃঢ় হয়। প্রায় একটি সময়ে গ্রীসে দাস-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

প্রথমদিকে এই যুগে উভয় সভ্যতায় বিজ্ঞানের কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন—জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, বলবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়।

অবশ্য এই রকম অনমনীয় সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কারণে শ্রমজীবীরা বুদ্ধিজীবীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের বিচ্ছেদ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। গ্রীসে, এর ফলে, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এক আদর্শবাদী দর্শন সৃষ্টি হয় এবং জগৎ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়। অ্যারিস্টটলীয় মত শুধুমাত্র গ্রীকবিজ্ঞানেই নয় বিশ্বের বিজ্ঞানেও পরবর্তী ২০০০ বছর পর্যন্ত প্রাধান্য পায়।

ভারতে চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাচর্চা ছিল একেবারেই ব্যতিক্রমী। এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকরা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ধনী ও দরিদ্রের শুশ্রূষা করতেন। এর ফলে চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অবশ্য তা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না, যেমন—তিনটি রস এবং পাঁচটি মৌল উপাদানের তত্ত্ব।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান হয়। রোমের অর্থনীতি সামরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা লুঠ এবং ক্রীতদাসদের পরিশ্রম করা চাষ-আবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেখানে নতুন ধারণাকে গ্রহণ করার এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োগ-কৌশলের উন্নতি করার কোনো উৎসাহ ছিল না। তাই বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে রোমান যুগের অবদান ছিল নগণ্য। প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে সংস্কৃতির এই রুদ্ধগতি অবস্থা বজায় থাকে।

৩.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) রোমে লৌহযুগে রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, নাট্যশালা ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে প্রচলিত জ্ঞানের প্রয়োগ হয়। কোনো নতুন প্রয়োগ-কৌশল বা কোনো নতুন ধারণার সৃষ্টি সেখানে হয়নি। ক্রমশ বিজ্ঞানচর্চায় আর নতুন প্রশ্নও উদ্ভূত হয়নি। বিজ্ঞানের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থা কী ধরনের সামাজিক জীবনযাত্রার ফলে হয়?

....

....

(২) একক ১এ পাঠ করা কিছু ধারণা ও মতামতের ব্যাখ্যা এই এককে আলোচিত কিছু উদাহরণে পাওয়া যায়। এই একক থেকে নীচের বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করে এমন উদাহরণগুলি ফাঁকা জায়গায় লিখুন।

(ক) তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে বিচ্ছেদ বিজ্ঞানের বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

....

....

....

(খ) সমাজের প্রচলিত ধারণা এবং বুদ্ধিবাদী পরিমণ্ডল বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে প্রভাবিত করে।

....

....

....

(গ) নতুন তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণা ও দর্শনের সংঘাত শুরু হয়। এগুলি মুছেও যেতে পারে অথবা নতুন কোনো ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় পরবর্তীকালে পুনর্জীবিত হতে পারে।

....

....

....

(ঘ) স্থিতিশীলতা সামাজিক রুদ্ধগতি অবস্থা আনে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের গতি রুদ্ধ হয়।

....

....

....

৩.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

(১) (১) ল, (২) ব, (৩) ব, (৪) ল, (৫) ল, (৬) ব, (৭) ব, (৮) ল, (৯) ব, (১০) ল,

(২) (ক) ভ্রান্ত, (খ) সত্য, (গ) সত্য, (ঘ) সত্য, (ঙ) ভ্রান্ত।

(৩) ঘ

(৪) (ক) (২), (৩), (৫), (৬), (৮)

(খ) (১) (৪) (৭)

(৫) (ক) কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে গ্রীক বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রচলিত সামাজিক দর্শন ও ভাবধারার দ্বারা বেশিরকমই প্রভাবিত হয়েছিল।

(খ) ভারতবর্ষে চিকিৎসকরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব রোগীরই একরকমভাবে চিকিৎসা করতেন।

(গ) ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী পাঁচটি মৌলিক উপাদান হল—মৃত্তিকা (ক্ষিতি), জল (অপ্), অগ্নি (তেজ), বায়ু (মরুৎ) ও মহাশূন্য (ব্যোম)।

(ঙ) গ্রীক পরমাণুবিদ্‌রা 'আত্মা', 'অদৃষ্ট' এবং 'কর্ম' এর ধারণা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁদের পরমাণুর তত্ত্ব পরিবর্তনশীল জগতের ছবি উপস্থাপিত করেছিল।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) (ক) রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি সৈন্যবাহিনী দ্বারা লুণ্ঠন এবং দাসশ্রেণীর দ্বারা কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

(খ) মুষ্টিমেয়র হাতে অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিল আর সাধারণ জনসাধারণ ছিল দরিদ্র। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নতুন প্রকৌশলের উদ্ভাবনে বিজ্ঞানের কোনো উৎসাহ ছিল না।

(২) (ক) ভারতবর্ষে নীচুশ্রেণীর কৃষকরা ও হস্তশিল্পীরা এবং গ্রীসদেশে দাসেরা ব্যবহারিক এবং কায়িক কাজ করত। এইসব মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এমন মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তত্ত্ব এবং প্রয়োগের এই দূরত্ব বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(খ) ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাবিদ্যা সৃষ্টিতত্ত্বের অনুমান অনুযায়ী 'তিনদোষ' এবং 'পঞ্চভূতের' তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পরমাণু-তত্ত্বতেও 'আত্মা', 'অদৃষ্ট' এবং 'কর্ম' এর ধারণা প্রবর্তিত হয়েছিল। আপনি অনুশীলনী ৪-এ যেমন দেখেছেন, গ্রীসদেশেও অ্যারিস্টটলের আদর্শ বিশ্বজগতের ধারণা দ্বারা বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্র প্রভাবিত হয়েছিল।

(গ) 'চরক', 'সুশ্রুত'-এর বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আচরণ ভারতীয় পুরোহিত সমাজের ধ্যানধারণার বিরোধী ছিল। খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী থেকে গোঁড়া ধর্মীয় ধ্যানধারণা এবং অন্যান্য বাধার সম্মুখীন হয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যা পর্যবেক্ষণ উপেক্ষা করে বেশিমাত্রায় অতীন্দ্রিয়বাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এখন আবার একে বিজ্ঞাননির্ভর করে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে। একইরকমভাবে গ্রীসে ও সামোস দ্বীপের আরিসটারকাসের দেওয়া গ্রহদের গতিসংক্রান্ত তত্ত্ব, প্রচলিত দার্শনিক মতবাদের বিরোধী হওয়ায় গৃহীত হয়নি। কোপারনিকাস এই তত্ত্ব আবার পুনর্জীবিত করেন।

(ঘ) রোমান সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানের পতন এই ধারণার প্রমাণ।

একক ৪ □ ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৪.২ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নগর-সভ্যতা

৪.২.১ ভারতীয় রাষ্ট্র

৪.২.২ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রযুক্তির বিকাশ

৪.২.৩ দাক্ষিণাত্যের বিকাশের ধারা

৪.৩ গুপ্ত যুগ

৪.৩.১ সমাজব্যবস্থা

৪.৩.২ শিল্প ও প্রকৌশলগত নৈপুণ্যের বিকাশ

৪.৩.৩ গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতি

৪.৩.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতি

৪.৩.৫ গুপ্ত যুগের পতন

৪.৪ সংঘাতের যুগ

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৪.৭ উত্তরমালা

৪.১ প্রস্তাবনা

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে আলোচনা আমরা ইতিমধ্যেই একক ৩-এ করেছি। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, নাগরিক সভ্যতার বিকাশ সেই যুগে কীভাবে বিজ্ঞানের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। আপনি এখন পড়বেন, ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়ের ইতিহাস। এই পর্বের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এবং তা বিস্তৃত ছিল এগারোটি শতক জুড়ে। এই সময়েই, উত্তর ভারত জুড়ে বনভূমি পরিষ্কার করে, স্থায়ী কৃষিকার্মের সূচনা হয়। একদিকে যেমন ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ বিস্তৃত সাম্রাজ্যে বিলীন হয়ে যেতে থাকে, তেমনি তার ফলে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। এই সমস্ত সাম্রাজ্য বিশাল এলাকা জুড়ে একই নিয়মকানুন ও আইন চালু করে। ভারতবর্ষের বুকে এমন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, যার দৃষ্টি প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত ছিল। ফলত, দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার আসে এবং খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী অবধি এই ধারা বজায় থাকে।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক স্বর্ণময় যুগ ছিল সেটা—বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে এই যুগে, একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুই উদার ধর্মতত্ত্ব—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য এই যুগের শেষ ভাগে এসে দুই ধর্মেরই অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয় এবং ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রথার পুনরুত্থান ঘটে। তবে এই সমস্ত ধর্মের মধ্যেকার সংঘাত ও তৎসম্পর্কিত বিতর্ক বিজ্ঞানের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিজ্ঞানের অধঃপতন শুরু হয় যখন বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে ছোট ছোট সামন্তরাজ্যের উদ্ভব হয়। সৌভাগ্যবশত, তার আগেই ভারতীয় বিজ্ঞানের ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি আরবরা আত্মস্থ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় আরবদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য এবং ভারতবর্ষ পুনরায় অনেককাল পরে সেই বিজ্ঞানের ফসলগুলি ফিরে পায়। আপনি বিজ্ঞানে আরবদের অবদান ও মধ্যযুগের ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবেন একক-৫-এ।

উদ্দেশ্য :

এই একক অধ্যয়নের পর, আপনি :

★ বলতে পারবেন মৌর্য ও গুপ্ত যুগে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় কী বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল।

★ বলতে পারবেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশের ধারা কেমন ছিল।

★ বলতে পারবেন কোন্ কোন্ কারণে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অধঃপতন শুরু হয়ে গেল।

৪.২ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নগরসভ্যতা

একক-৩-তে আমরা আলোচনা করেছি যে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ষোলোটি জনপদের মধ্যে প্রধান শক্তি হিসেবে মগধের উত্থান ঘটে (চিত্র ৩.৪ দেখুন)। মগধের এই উত্থান, ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নগরসভ্যতা বিকাশের রাস্তা খুলে দেয়, যা হরপ্পার এক হাজার বছর পরের ঘটনা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই সভ্যতার উত্থান বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত। শেষ মহান মৌর্যসম্রাট ছিলেন মহামতি অশোক। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭০ বর্ষে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণে অধুনা কর্ণাটক রাজ্যের অনেকাংশ জুড়ে অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। (চিত্র ৪.১)

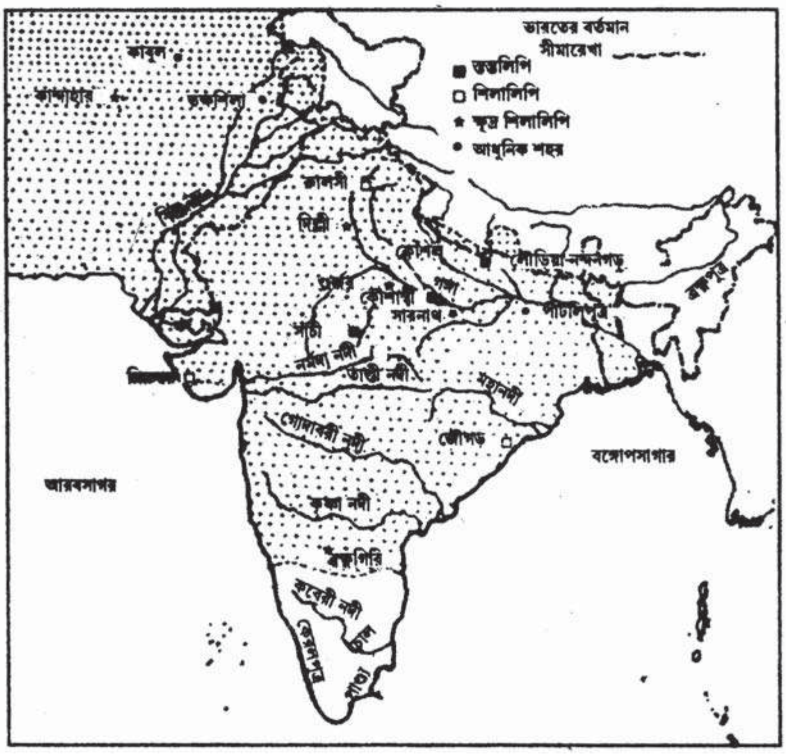

চিত্র ৪.১ : অশোকের সাম্রাজ্য আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব (২৭৪-২৩৬)

তখন রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষিযোগ্য জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ছোট ছোট রাজ্য জয় করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জমির ওপর দখলকারী কায়েম করা। এই সমস্ত দখলী জমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যরাই স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ শুরু করে। এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকতেন একজন রাজকর্মচারী, যিনি অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হতেন। কৃষিকাজে তাঁরা নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করেন। তখন কৃষিজমির বন্দোবস্ত ছিল দুই ধরনের। প্রথম ধরনের জমি থেকে রাষ্ট্র কর পেত। এর প্রশাসনের আংশিক স্বায়ত্তশাসন বজায় ছিল, যদিও উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজ-কোষাগারে জমা পড়ত। দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থায় জমিগুলি সরাসরি সম্রাটের অধীনে থাকত। এগুলি 'সীমা' জমি নামে পরিচিত ছিল। এগুলি চাষ-আবাদের জন্য শূদ্রশ্রেণীর ১০০ থেকে ৫০০ জনের এক-একটি দল নিযুক্ত থাকত। এরা সম্রাটকে উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করত। এসবের ওপরে ছিল 'সেনাবাহিনীর রেশন' সংক্রান্ত কর এবং রাজাকে প্রদেয় দানসামগ্রী।

বিস্তীর্ণ ভূমির দখল নেওয়া ও তার রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজন ছিল সুশিক্ষিত এক সেনাবাহিনী, ধর্মীয় ও আদর্শ নির্ভর উপরি-কাঠামো, সুদৃঢ় কৃষিব্যবস্থা এবং উন্নত খনিজ-শিল্প। সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল একটি

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা, যা এমত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে এবং বিস্তৃত করতে সক্ষম। এখন মৌর্য সাম্রাজ্যে (চিত্র ৪.২) কী ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন রাষ্ট্রক্ষমতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল তা দেখা যাক।

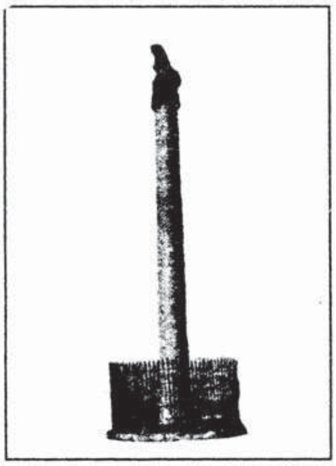

(ক)

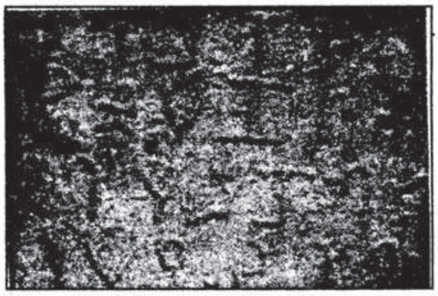

(খ)

চিত্র ৪.২ : সম্রাট অশোকের নীতি ও তার সময়কে জানতে সাহায্য করেছে খরোষ্ঠী লিপিতে শিলা, পাথরের স্তম্ভ ও গুহায় উৎকীর্ণ তাঁর বাণী; কান্দাহারে প্রাপ্ত বাণীগুলি গ্রীক লিপি ও ভাষায় উৎকীর্ণ। (ক) লৌড়িয়া—নন্দনগড়ে অশোকের সময়ের শিলালিপি।

৪.২.১ ভারতীয় রাষ্ট্র

ভারতীয় রাষ্ট্র ও নীতি সম্পর্কে এক বিস্তৃত আলোচনা আমরা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র থেকে পাই। তাঁর মতে, এই রাষ্ট্র ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রমুখী। এই রাষ্ট্র একাধারে শিল্পের প্রধান মালিক আবার বাজারজাত পণ্যের উৎপাদক ছিল। রাষ্ট্র যে সমস্ত পণ্য উৎপাদন করত, সেগুলি কেনাবেচা করতেন ব্যবসায়ীরা। সেই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিক্রমা করতেন। কখনও কখনও পণ্য বিক্রয়ের জন্য সুদূর মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত যেতেন। ব্যবসার শর্ত ও পণ্যের মূল্যমান রাষ্ট্রই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ম-কানুন, তা জমির ফসলের জন্যই হোক অথবা ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যই হোক, ছিল সুনির্দিষ্ট। এই রাজস্ব ব্যবহৃত হত এক বিশালকায় সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সংখ্যায় ৫ লক্ষ এইরকম এক সৈন্যবাহিনী ব্যবহৃত হত নানান কাজে—ভূমির দখল নেওয়া, তাকে রক্ষা করা, সাম্রাজ্যের সীমানা রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বলবৎ রাখা। রাজস্বের একাংশ প্রজার হিতসাধনে, বিশেষভাবে যাদের সাহায্য করার কেউ নেই, যেমন অনাথ বালক-বালিকা, বৃদ্ধ ও বিধবা, পঙ্গু ও গর্ভবতী নারীর কল্যাণে ব্যয় হত।

সৈন্যবাহিনী রাজ্য জয় করতে পারে, কিন্তু বিজিত রাজ্যের অধিবাসীদের স্বেচ্ছায় ও শান্তিপূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে উদ্যোগী করতে পারে না। এই কাজে রাষ্ট্র ধর্মকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই কাজে ব্রাহ্মণরা অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। কোনো নতুন এলাকা রাজ্যের দখলে এলেই, রাজার প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে তাঁরা প্রবেশ করতেন। এর পর চেষ্টা চলত স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে আর্য দেবতাদের একাসনে সামিল করার। তাঁদের সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেরা নতুন নতুন শাস্ত্রও রচনা করতেন। বিভিন্ন স্থানীয় রীতিনীতি আত্তীকরণের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হত। একই সঙ্গে চান্দ্রমাসে যুক্ত করা হল নতুন কিছু তিথি। মীন, কচ্ছপ, বাঁদর, ষাঁড় জাতীয় জীবজন্তু, যা ছিল আদিম জনগোষ্ঠীর টোটেমীয় দেবতা, তা হিন্দু ধর্মপুস্তকে স্থান পেল মহাদেবতাদের (যেমন বিষ্ণু) সঙ্গী হিসেবে অথবা তাঁদের পুনরাবতার বলে। তাছাড়া এটাও প্রচার করা হত যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সর্দারও আসলে ‘দ্বিজ’। এভাবে একদিকে যেমন এদের উচ্চবর্ণের মর্যাদা দেওয়া হল, অন্যদিকে তেমনি এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সমাজের অগ্রণী অংশকে সাম্রাজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হল। সূক্ষ্মভাবে স্থানীয় সমাজে বর্ণবিন্যাসের সূত্রপাত করা হল। শ্রেণী ও জাতি-বিভাজিত সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় আদি জনগোষ্ঠীর মিলন সম্পূর্ণ করতেই এই প্রচেষ্টা চলত। এর ফলে, নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকে সঙ্গে নিয়েই স্থানীয় সমাজের নতুন বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায় উদ্ভূত হল এবং তারা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণের কৃষক ও মজুরশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হল।

ব্রাহ্মণগণ যে নতুন জাতি-বিন্যাস প্রথা সহজেই চালু করতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁরা স্থানীয় সমাজে নতুন কৃষিপদ্ধতি ও পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থাও চালু করতে পেরেছিলেন। বন কেটে বা পুড়িয়ে জমিচাষের রীতি বা প্রাচীন খাদ্য অন্বেষণের রীতিকে সরিয়ে তাঁরা তাদের হাতে তুলে দিলেন লাঙল। নতুন শস্য আর দূরবর্তী বাজারের সন্ধান দিয়ে ব্রাহ্মণরা এই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে একই সঙ্গে দিলেন উচ্চ ফলনের প্রতিশ্রুতি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন।

এই সমস্ত পদক্ষেপ ভূমি থেকে শস্যের উৎপাদনকে নিশ্চিত করে প্রজাদের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্ম দিল। শান্তিপূর্ণ জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল। রাষ্ট্রের সম্পদও তাতে বৃদ্ধি পেল। তবে দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ভূত হওয়া এই ধর্মই একসময় সংস্কৃতির বিকল্প ও উৎপাদন বৃদ্ধির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। মনে হয়, নতুন ধর্ম স্থানীয় জীবনের কুসংস্কার ও অর্থহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। নিম্নবর্গের মানুষেরা এই সমস্ত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল আর তার ফলেই তাদের অন্যের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হত। আর পরিশেষে, এই সমস্ত কুসংস্কার বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বিকশিত হওয়ার পথেও বাধাস্বরূপ হয়েছিল।

সম্রাট অশোক যে কুসংস্কার ও আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে বুদ্ধের শিক্ষা ও বাণীকে গ্রহণ করবেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রথম পর্বে বৌদ্ধধর্মে কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানের স্থান ছিল না। একদিকে যেমন এই ধর্ম ছিল শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে সরল ও অনাড়ম্বর কিন্তু অর্থপূর্ণ এক জীবনযাপনের বাণী প্রচার করত এই ধর্ম। যুক্তি আর দয়া ছিল তার মূলমন্ত্র। অশোক ও তার পরবর্তী যুগের রাজারা, বৌদ্ধবিহারগুলিকে প্রচুর অনুদান দিয়ে গেছেন। কারণ এই বিহারগুলিই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার

মূল কেন্দ্র। নালন্দা, এক বিশাল বৌদ্ধ-বিহার, যেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে তাদের মতামত বিনিময় করেছেন। ভারতীয় সম্রাটগণ দীর্ঘদিন বৌদ্ধবিহারগুলিকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা করেছেন।

(ক)

তোমাকে বলা হয়েছে বলেই কোনো কথা
তুমি বিশ্বাস করবে না
অথবা, তা পরস্পরের অন্তর্ভুক্ত বলে
কিংবা, তুমি নিজেই তা কল্পনা করেছ বলে
তোমার শিক্ষক বলেছেন বলেই
তুমি তা মেনে নেবে না
শুধুমাত্র পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পরে,
যা তুমি মনে করবে সকল মানুষের
পক্ষে হিতকর,
সেই মতবাদেই তুমি আস্থাবান হবে
এবং তাকে অবলম্বন করবে
সেই হবে তোমার পাথেয়।

চিত্র ৪.৩ : (ক) বুদ্ধমূর্তি, গুপ্তযুগ, পঞ্চম শতাব্দী   চিত্র ৪.৩ : (খ) বুদ্ধের উপদেশ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করুন।

এইভাবে বৌদ্ধবিহারগুলি ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং ব্যবসায়ীদের পুঁজি ও অর্থ সরবরাহ করা শুরু করে। বৌদ্ধধর্মের সংযমী সরল জীবনযাত্রার আদর্শও একসময়ে আচার-অনুষ্ঠানের ঘেরা-টোপে বাঁধা পড়ে। আমরা দেখি, প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও, পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে হিন্দুধর্মের আদর্শ ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করা শুরু করে। বলা যায়, শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মই জিতে যায়।

এতক্ষণ আমরা, মৌর্য যুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলাম, কারণ এদের বিকাশের ধারা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। এবার আমরা প্রযুক্তির বিকাশ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তার আগে, আপনি কয়েকটা অনুশীলনীর উত্তর লিখে ফেলুন না!

চিত্র ৪.৪ : নালন্দা বৌদ্ধবিহার

অনুশীলনী ১

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্ পাঁচটি উদীয়মান মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রকৌশলগত উন্নতির সহায়ক আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে? সঠিক উত্তরগুলি নির্দিষ্ট খোপে চিহ্নিত (✓) করুন।

(ক) বিশাল ভূখণ্ডের অধিগ্রহণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ।

(খ) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয়।

(গ) বিপুল সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন।

(ঘ) আন্তঃসাম্রাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য।

(ঙ) রাজস্ব সংগ্রহের জন্য আইন প্রণয়ন।

(চ) কৃষি ও খনিজ শিল্পের বিকাশ।

(ছ) আদর্শগত ও ধর্মীয় উপরি-কাঠামোর উত্থান।

৪.২.২ মৌর্য সাম্রাজ্যে প্রযুক্তির বিকাশ

মৌর্য যুগের প্রকৌশলগত বিকাশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আমরা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ থেকে পাই। এই গ্রন্থে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রে কীভাবে অপকেন্দ্রিক বলের প্রয়োগ হত, তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। অবশ্য এখানে বায়ু, জল, বাষ্প অথবা বিদ্যুতের মতো জড়বস্তুজাত শক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো আলোচনা নেই।

সেই সময়ে বাস্তু-কারিগরীবিদ্যার (Civil Engineering) প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল। 'সীতা' জমির (সম্রাটের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যার চাষ হত) ফলন বাড়ানোর জন্য নানাপ্রকার সেচব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সৈন্য চলাচল ও বাণিজ্যের সুবিধের জন্য গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে উন্নতমানের সড়ক নির্মিত হয়েছিল।

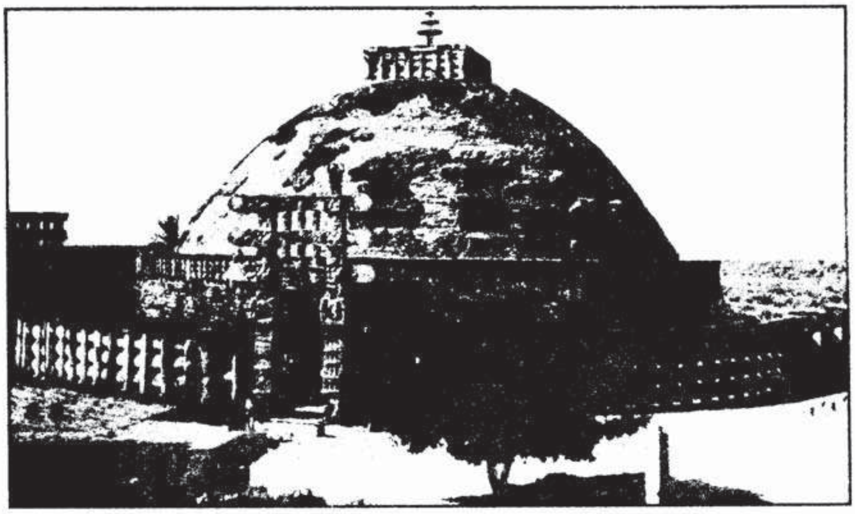

চিত্র ৪.৫ : সাঁচী স্তূপ। স্তম্ভের গায়ে সূক্ষ্ম স্থাপত্যকর্ম তৎকালীন কারিগরী নৈপুণ্যের চিহ্ন বহন করছে।

কাঠের সরু গুঁড়ি ফেলে জলাভূমির ওপর রাস্তা বানানো হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীতে এইরকম রাস্তা বিহার প্রদেশে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ছিল। অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ছিল কাঠের। ভারতবর্ষে, ইমারত তৈরিতে পাথর ব্যবহারের সূচনা খুব সম্ভবত অশোকই করেছিলেন। স্তম্ভ এবং খিলান নির্মাণের আগে পাথরকে আরশির মতো মসৃণ করে নেওয়া হত। (চিত্র ৪.৫)

এই সময়ে গ্রামীণ শিল্পেরও খানিকটা বিকাশ ঘটেছিল। 'সীতা' জমির পাশে ক্ষুদ্রশিল্প ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার হত শস্য ঝাড়াই, তৈলবীজ নিষ্পেষণ, কার্পাস বা পশম থেকে সুতো কাটা ও তৈরি, কম্বল বোনা ইত্যাদি কাজে; কাঠের গুঁড়ি থেকে তক্তা বা কড়ি-বরগা তৈরিও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। কারখানাভিত্তিক উৎপাদনের ধারণা খুব সম্ভবত ঐ সময়েই অঙ্কুরিত হয়, কারণ এই সমস্ত জিনিসই উৎপাদিত হত রাজ-ভাণ্ডারের অধিকর্তার প্রত্যক্ষ তদারকিতে। যখন কৃষিকাজে ভাঁটা থাকত, তখনই স্থানীয় শ্রমিকদের এখানে নিযুক্ত করা হত। প্রত্যেক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ মাল-মশলা স্বাভাবিকভাবেই নষ্ট হয়, তা হিসাবপত্রে নিখুঁতভাবে তোলা হত। কুশলী শ্রমিকের গড়পড়তা উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের ওজন, পরিমাপ ইত্যাদি হিসাব রক্ষার অঙ্গ ছিল। এই হিসাবপত্র ব্যবহার হত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে।

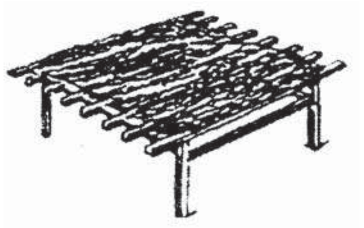

চিত্র ৪.৬ : অর্থশাস্ত্রে রকমারি গ্রামীণ উদ্যোগের উল্লেখ রয়েছে। যেমন পশম পরিষ্কার করা (carding)। নিম্নমানের পশম ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে চাটাইয়ের ওপর তা বিছিয়ে দেওয়া হত, তারপর সরু তারের চিরুনী দিয়ে পশমের পাক খোলা হত।

নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বোধহয় গ্রহণ করেছিল ধাতুবিদ্যা ও ধাতুসংক্রান্ত প্রকৌশল। ক্ষমতার কেন্দ্র যে উত্তর-পশ্চিম থেকে মগধে সরে এসেছিল তার মূলে ছিল লোহা, তামা, টিন, সীসা ও অন্যান্য ধাতুর ক্রমবর্ধমান চাহিদা। মৌর্য সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত দু'টি জিনিসের ওপর—অস্ত্রশস্ত্র আর লাঙলের ফলা এবং এই দু'টি বস্তুর উৎপাদনের জন্যেই প্রয়োজন ছিল ধাতুর। এছাড়া অন্যান্য পণ্যসামগ্রী, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে আসত তার জন্যও লাগত বিভিন্ন ধাতু। অর্থশাস্ত্রে ধাতু নিষ্কাশন ও বিজারণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য বিবরণ রয়েছে। বিভিন্ন আকরিক পদার্থের আকৃতিগত ও অন্যান্য গুণগত পার্থক্য এবং তাদের নির্দিষ্ট নিষ্কাশন পদ্ধতির বিবরণ অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংকর ধাতু তৈরির প্রক্রিয়া ওই সময়েই উদ্ভাবিত হয়েছে। সংকর ধাতু তৈরি করার জন্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণ, বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্য থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মানের লৌহ আকরিক সংগ্রহ করা হত, এই সমস্ত সংকর ধাতু থেকে তৈরি তরবারি বিভিন্ন দেশে বিক্রি করা হত। গ্রীস দেশও এর খরিদ্দার ছিল।

অনুশীলনী ২

আমরা নীচের অংশে, সাম্রাজ্যের কতকগুলি প্রয়োজন লিপিবদ্ধ করছি। প্রতিটি বিবৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীটি চিহ্নিত করুন :

(ক) ব্যবসায়ী ও সৈন্যবাহিনীর গতিশীলতা

....

(খ) জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

....

(গ) ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য কৃষিজ পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ

....

(ঘ) অস্ত্রশস্ত্র ও লাঙলের ফলা তৈরি

....

আমরা দেখলাম যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের গ্রামীণ শিল্প, বাস্তু-কারিগরীবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও খনিজ কারিগরীবিদ্যার মতো বিষয়সমূহের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। এবার আমরা জানব ভারতের অন্যান্য অংশে, বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে এই সময়ে কী হচ্ছিল।

৪.২.৩ দাক্ষিণাত্যের বিকাশের ধারা

অশোকের শাসনকালের পরেই, মৌর্য সাম্রাজ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে প্রথম যে উল্লেখযোগ্য সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে, তা হল কুষাণ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের সূচনা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এবং এর বিস্তার শুধুমাত্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; মধ্য এশিয়ার কিয়দংশ এবং বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্থানের সমগ্র ভূখণ্ড এর অন্তর্গত ছিল। কনিষ্কের (দ্বিতীয় শতাব্দী) রাজত্বকালে কুষাণ সাম্রাজ্য পূর্বদিকে বিহারের অংশবিশেষ এবং দক্ষিণে নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণভারতে সাতবাহন, ক্ষত্রপ এবং ভাকাতদের ন্যায় শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব এই সময়েই ঘটেছিল।

চিত্র ৪.৭ : ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাম্রাজ্য, ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ

এই সময়টা ছিল দক্ষিণভারতের ইতিহাসে কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। এই যুগের উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁতি, মণিকার, স্বর্ণকার, রঞ্জক, ভাস্কর এবং ধাতু ও গজদন্তের কারিগরদের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, কারিগরীশিল্পে সময়টা ছিল খুবই উন্নত। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে, করিমনগর ও নলগোণ্ডা জেলায় প্রাচীনকালের লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি আর হাতা, ক্ষুর, কুঠার, কাস্তে, কোদাল বা লাঙলের ফলার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের হদিশ মিলেছে (চিত্র 4.8)। সীসা, তামা, ব্রোঞ্জ, রূপো ও সোনার মুদ্রার সন্ধানও এখানে পাওয়া গেছে। এদের অনেকগুলিই সাতবাহন যুগের। এর থেকেই স্পষ্ট হয়, সেই সময় তাঁরা শুধুমাত্র লোহা নয়, পিতল, দস্তা, অ্যান্টিমনির মতো পদার্থের ধাতুবিদ্যাও আয়ত্ত করেছিলেন। আবার গজদন্ত, কাচ ও পুঁতি দিয়ে তৈরি সৌখিন দ্রব্য বা বস্ত্র ও রেশমশিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। দক্ষিণের কিছু কিছু শহর রঞ্জনশিল্পে প্রভূত উন্নত ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে

রঞ্জনশিল্পের জন্য ব্যবহৃত ইট-নির্মিত চৌবাচ্চার সন্ধান তামিলনাড়ুর উরাইউর ও আরিকামেডুতে পাওয়া গেছে। সেই সময়ে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তৈলচক্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

সমুদ্রপথে বাণিজ্য তখন প্রসারলাভ করেছিল। বণিকরা জানতেন যে, মৌসুমী বায়ুকে সমুদ্রযাত্রায় সঙ্গী করতে পারলে সুবিধা হয়, আর তাঁরা পুরো সুযোগটা নিতেন। লোহা ও ইস্পাতসামগ্রী, যার মধ্যে ছুরি-কাঁচিও ছিল, আফ্রিকায় রপ্তানি হত। রোমে যেত মসলিন, মুক্তো, মণিমাণিক্য, গহনা আর মশলাপাতি। এই বহির্বাণিজ্যই সাতবাহন রাজ্যের নগরগুলিতে সমৃদ্ধি এনেছিল।

এই সাম্রাজ্যগুলির অবক্ষয় শুরু হয় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে। চতুর্থ শতকের গোড়ায় গুপ্ত রাজবংশের সূচনা, বলা চলে তখনই ভারতীয় সাম্রাজ্যগুলি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এবার আমরা গুপ্তযুগের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানব আর দেখব কীভাবে তা সেইসময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

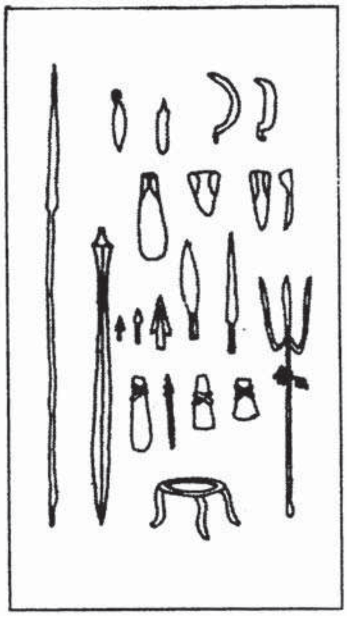

চিত্র ৪.৮ : দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমাধি থেকে প্রাপ্ত লোহার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিসপত্র। লক্ষ্য করুন, কাস্তে, ছোরা, কুঠার, তীরের ফলা, বর্শা-ফলা, তলোয়ার, ত্রিশূল, আর তেপায়াটি।

৪.৩ গুপ্ত যুগ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৮০-৪১৫ খ্রিস্টাব্দ) কালেই, গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তার ছিল সর্বাধিক। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত জুড়ে তার শাসন কায়েম ছিল। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক মানদণ্ডেও চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ, যা এই কালেরই অন্তর্গত, তার বিকাশের ধারা জানতে হলে, এই কাল, যার বিস্তার ছিল ১০০ বছরের কাছাকাছি, তার সম্পর্কে পরিচিত হওয়া দরকার।

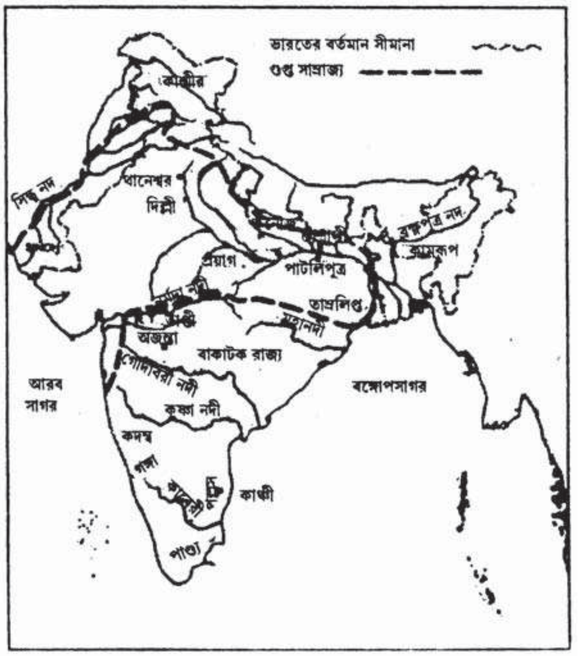

চিত্র ৪.৯ : খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষে গুপ্ত সাম্রাজ্য

৪.৩.১ সমাজব্যবস্থা

গুপ্ত যুগেও অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। তাই গুপ্ত সম্রাটরাও, মৌর্যদের অনুসরণে ভূমি অধিগ্রহণ প্রথা চালিয়ে গেছেন। সমুদ্রগুপ্ত গঙ্গা, নর্মদা ও মহানদীর অববাহিকা অঞ্চলের একাধিক অরণ্য-রাজ্য অধিকার করেছিলেন। সেই সময়, বনাঞ্চল কেটে সাফ করায় কৃষিজ জমির ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে শিথিল হয়ে যায় এবং ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে মৌর্যযুগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নতুন আইন প্রণীত হয়। এই নতুন আইনে জমি-জমার প্রশাসন ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার যাদের ওপর ন্যস্ত হয়, তাদের নিজেদের জমি নিজেদেরই চাষ করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকে না। গুপ্ত সম্রাটদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যাই থাক্ না কেন, রাষ্ট্রের নীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। বৌদ্ধ, জৈন ও প্রাচীন হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সকলেই রাজকোষ থেকে অর্থসাহায্য পেতেন। আগে শুধুমাত্র বংশের পরিচয়ই সমাজে মর্যাদা দিত, গুপ্ত যুগে এসে আর্থিক অবস্থা তার স্থান খানিকটা নিয়ে নিল। এর ফলে ব্রাহ্মণরা তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি অনেকটা হারালেন। অন্যদিকে, কৃষি ও হস্তশিল্পের গুরুত্ব থাকায়, শূদ্রদের সামাজিক অবস্থায় খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হল। সাধারণভাবে দেখলে, কে কী করছেন সেটা সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এর ফলে, ব্রাহ্মণরাও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের বাইরে অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

রাষ্ট্রীয় বাঁধন-মুক্তি প্রাথমিকভাবে খোলামেলা আবহাওয়া সৃষ্টি করে ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগকে স্বাগত

জানাল। এটাই, একদিকে যেমন সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যকে খানিকটা খুণ্ণ করল, অন্যদিকে তেমনি কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমের বজ্রমুষ্টিকে কিছুটা শিথিল করল।

এতক্ষণ আমরা গুপ্ত যুগের সমাজব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা এখন নিশ্চয় স্পষ্ট যে, এই যুগের সমাজব্যবস্থা মৌর্য যুগের সমাজব্যবস্থা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। এবার, আমাদের আলোচনার বিষয়, গুপ্ত যুগে শিল্প ও প্রকৌশলগত নৈপুণ্যের যে বিপুল উন্নতি ঘটেছিল, সেই সম্পর্কে।

৪.৩.২ শিল্প ও প্রকৌশলগত নৈপুণ্যের বিকাশ

এই সময়ে, নতুন কৌশল ও বীজের ব্যবহারের ফলে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই সময়ে শুধু শিল্পের গুণমান নয়, তার বৈচিত্র্যের বিকাশও বহুলাংশে ঘটেছিল। এই অংশে, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা এটাও দেখব, কীভাবে বাণিজ্যের প্রসার এই উন্নতিতে সহায়তা করেছিল।

কৃষি

এই সময়ে গোলমরিচ ও মশলাপাতির চাষ হত, যা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনও মেটাত, আবার রপ্তানিও হত। এছাড়া, নানাপ্রকার শস্য, যেমন ধান, গম, যব, তিল, ডাল, বিন এবং শাকসব্জীর মধ্যে শসা, পেঁয়াজ, রসুন, কুমড়ো ও পানের চাষ হত। নতুন ফলের মধ্যে পীচ ও ন্যাসপাতির চাষ তখনই শুরু হয়েছিল। এত বিভিন্ন প্রকারের চাষ-আবাদ কিন্তু হঠাৎ শুরু হয়নি। এলোমেলোভাবে যেমন তেমন করেও চাষ করা হত না। কৃষিকাজে সহায়ক তথ্যপঞ্জী রচিত হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন ফসলের জন্য উপযোগী জমির বিবরণ থাকত। এছাড়াও থাকত বিভিন্ন গাছ-গাছালীর অসুখ সম্পর্কিত তথ্য, কতখানি দূরত্ব বজায় রেখে কোন্ বীজ বা চারা রোপণ করতে হয়, কীভাবে তার আগে তাদের জমি তৈরি করে নিতে হয়। এইসব তথ্যপঞ্জীতে আরও থাকত বিভিন্ন শস্য, বা সব্জী বা ফলের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির বিবরণ। যেহেতু অনেক ধরনের জমি আবাদ হত, তাই নানাপ্রকার চাষের উপকরণ তৈরি হল। বিভিন্ন ধরনের জমির জন্য উপযুক্ত ওজন ও আকৃতির লাঙলও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল। এই সমস্তই কৃষিক্ষেত্রে লোহার ব্যাপক ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

শিল্প

এই যুগ ধাতুবিদ্যা ও বয়ন শিল্পে দ্রুত পরিবর্তনের চিহ্ন বহন করেছে। মরিচাবিহীন লোহা ও তামার সংকর ধাতুর ব্যবহার তখন ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছিল। এগুলি ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিক ও সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নানা জটিল সামগ্রী তৈরি হত (চিত্র ৪.১০)। এই সমস্ত দ্রব্যের মান এত উন্নত ছিল যে, সেগুলি ব্যাপকভাবে, এমনকি সুদূর আফ্রিকাতেও রপ্তানি হত। অবশ্য এদের নকশায় কিছু পরিমাণ গ্রীক ও রোমান এবং মধ্য এশিয়ার প্রভাব পড়েছিল, যদিও মোটের ওপর তারা স্থানীয় চরিত্রই বহন করত।

বয়নশিল্পে, সুতি ও রেশমবস্ত্র বুননের প্রকৌশল এই সময়ে পুরোপুরি করায়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। রঞ্জন তৈরি ও বস্তুসামগ্রী নানা রঙে ছোপানোর প্রক্রিয়া এই সময় ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে। ভারতীয়

বস্ত্র, বিশেষভাবে বারাণসী ও বাংলায় তৈরি কাপড় তার সূক্ষ্ম বুনট ও হাল্কা ওজনের জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল। পশ্চিমে এখানকার বস্ত্রজাত সামগ্রী খুব জনপ্রিয় ছিল এবং এইসব বহুল পরিমাণে রপ্তানিও হত।

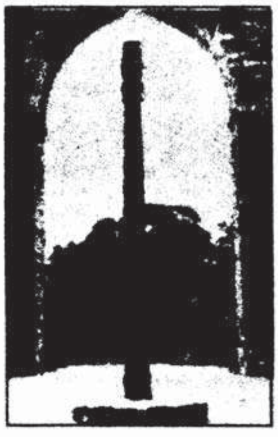

চিত্র ৪.১০ : দিল্লির মেহরৌলিতে লৌহস্তম্ভ

এই প্রেক্ষাপটে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যখন কমে গেছে, শিল্পীদের গিল্ড বা 'শ্রেণী' তখন একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছিল। অনেক স্বাধীনভাবে তারা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারত। বিভিন্ন ব্যক্তি, এমনকি সময়ে সময়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তারা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হত। এই সমস্ত 'শ্রেণী' বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা ধার করত এবং পরে সুদসহ ফেরত দিত। এসব কিছুই শিল্পের উন্নতিতে প্রচণ্ড গতি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছিল। আমরা এও দেখি যে, বাণিজ্যের বৃদ্ধি শিল্পের উন্নতিতে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

বাণিজ্য

দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসারে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্যের প্রসারে অনেকগুলি কারণ কাজ করেছিল। যেমন, নতুন নতুন অঞ্চলে অভিবাসনের সূচনা ; যোগাযোগ, পরিবহণ ও বাণিজ্যিক পথের সার্থক সমন্বয়সাধন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গোটা সাম্রাজ্যজোড়া একটি বৃহৎ বাজার আর বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য উচ্চ পরিমাণে টাকার লেনদেনকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছিল। শিল্পীদের মতোই বণিকদের সংগঠনও 'শ্রেণী' নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গা আর সিন্ধু নদীর ধার ঘেঁষে প্রধান বাণিজ্যপথগুলি অবস্থান করত। তখনও কিন্তু পণ্যের প্রবেশ ও বিক্রি রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ করত। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে কুষাণ, সাতবাহন ও গুপ্ত রাজারা কূটনৈতিক যোগাযোগের সাহায্য নিতেন। ভারতীয় নাবিকদের দ্বারা নৌবাহন জ্ঞানের প্রসার, মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা ও নতুন নকশার সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণ, বাণিজ্যের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আরব ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ, রোম, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, যথা—জাভা, সুমাত্রা ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সুদৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। গিল্ড বা 'শ্রেণী'র মতো সংগঠনগুলিও বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করেছে।

চিত্র ৪.১১ : প্রাচীন বাণিজ্যপথ

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, গুপ্ত যুগে পণ্য উৎপাদন ও তার আদান-প্রদান পূর্ণ গতিলাভ করেছিল। এই সাফল্য অন্তর্দেশীয় বাজার ও বহির্বাণিজ্য, উভয়ের কল্যাণেই অর্জন করা গিয়েছিল।

এই সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল উৎপাদনের নতুন প্রকৌশল, পরিচালন ব্যবস্থার সহায়ক নতুন গাণিতিক কৌশল ও সংখ্যাপদ্ধতি, নতুন স্থাপত্যশিল্প, যোগাযোগব্যবস্থা ও নৌবাহনজ্ঞানের। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, এই সমস্ত দাবিই উঠেছিল এমন একটা সময়ে যখন রাষ্ট্রশক্তির মুষ্ঠি অনেকটা আলগা হয়ে গেছে, বিভিন্ন ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল, ফলত, ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে পরিবেশ বহুলাংশে অনুকূল। পুরনো আমলের সমাজপতিরা অনেকক্ষেত্রেই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন। সামাজিক ক্ষেত্রে সচলতা লক্ষ্য করা গেল, শিক্ষিত এবং নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদানে যা উৎসাহ জোগাল। প্রাচীন জাতিভেদপ্রথা তখনও বিরাজ করছিল, তবে তার কাঠামো অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। নতুন যে জাতিভেদপ্রথা তার জায়গায় জন্ম নিল, তার ভিত্তি ছিল শ্রমের বিভাজন এবং তা আগের মতো পীড়াদায়ক ছিল না।

এইরকম একটা অবস্থায়, ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিরাট অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা সেই আলোচনাই করব। তার আগে আপনি নিম্নলিখিত অনুশীলনীর উত্তর লিখে ফেলুন।

অনুশীলনী ৩

(ক) গুপ্ত যুগের সমাজব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য বলুন, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

....

....

....

(খ) নীচে কতকগুলি কারিগরী শিল্প ও প্রকৌশলগত উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে থেকে যে চারটি আপনার বিবেচনায় গুপ্ত যুগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাদের বেছে নিন ও পাশের বাক্সে (✓) চিহ্ন দিন।

(১) নির্মাণে সিমেন্ট ও কংক্রিটের ব্যবহার। ☐

(২) নানা বৈচিত্র্যের শস্য, ফল, সব্জী ও মশলা বপন, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য নতুন প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। ☐

(৩) মরিচা-বিহীন লোহা ও তাম্রসংকর তৈরি। ☐

(৪) বায়ু-কল ও জল-কলের ব্যবহার। ☐

(৫) হাল্কা ও সূক্ষ্ম বুনটের বস্ত্রসামগ্রী তৈরি, বস্ত্র রঞ্জন। ☐

(৬) ব্রোঞ্জ নির্মিত লাঙলের ফলার ব্যবহার। ☐

(৭) উন্নত প্রকারের জাহাজ ও মৌসুমী বায়ু সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে নৌচালনায় অগ্রগতি। ☐

৪.৩.৩ গণিতশাস্ত্রে অগ্রগতি

আমরা আগেই জেনেছি, গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় সুপ্রাচীন। ২ এবং ৩ এককে আমরা 'শুলভ' জ্যামিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ঐতিহ্য, জৈন গণিতজ্ঞদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে—খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে, গ্রীকদের সংস্পর্শে এসে, ভারতীয় গণিত হয়তো তাদের প্রভাবিত করেছিল এবং নিজেও প্রভাবিত হয়েছিল। মহীশূর ও উজ্জয়িনীর গণিতজ্ঞরাও হয়তো জৈনদের সংস্পর্শে এসে থাকবেন কারণ গুপ্ত যুগে জৈনদের প্রভাব ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্রগতি যে পথেই হয়ে থাকুক না কেন, গুপ্ত যুগ স্মরণীয় পাটীগণিত, বীজগণিত ও সংখ্যা ও গণনা-পদ্ধতিতে তার অবদানের জন্য। এই সময়কার সূত্রায়ণের ওপর ভিত্তি করেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতি। তাই, আমরা লক্ষ্য করি, এ যুগের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, যেমন ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির বা আর্যভট্ট সকলেই গণিতজ্ঞও বটে। গুপ্ত যুগেই এই ঐতিহ্যের যে সমাপ্তি ঘটেনি, তার প্রমাণ আমরা পাই ভাস্করের মধ্যে, যিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র পশ্চিমে আরবদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এখন একটু বিস্তারিতভাবে সেই গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক্।

জৈন গণিতশাস্ত্র

জৈন ধর্মোপদেশে, গাণিতিক ব্যুৎপত্তির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। স্থানাঙ্গ-সূত্র (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) 'সূর্যপ্রজ্ঞাপ্তি', ভদ্রবাহবিসংহিতা (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০), উমাস্বতীর 'ক্ষেত্রসমস্যা' (১৫০ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদিতে পরিমিতিবিদ্যা (mensuration), করণী, ভগ্নাংশ, বিন্যাস ও সমবায় (permutation & combination), জ্যামিতি, সূচক সংক্রান্ত নিয়মাবলী, সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয়সমূহের আলোচনা ও জৈন গণিতশাস্ত্রকারগণ ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যবহার, পরবর্তী যুগে ধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতীয় গণিতবিদ্‌দের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এখানে জৈন গণিতজ্ঞদের কাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

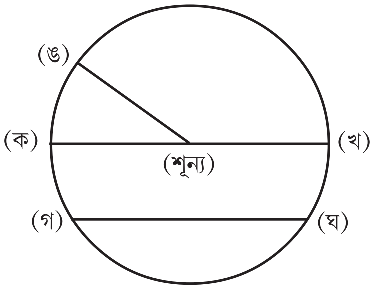

চিত্র ৪.১২ : একটি বৃত্তাকার যার কেন্দ্র শূন্য, ব্যাস কখ

পরিমিতিবিদ্যায়, জৈন গণিতজ্ঞরা বৃত্তের ব্যাস, পরিধি, চাপ এবং জ্যা-এর মধ্যেকার সম্পর্ক বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন (চিত্র ৪.১২)। তাঁরা করণীর আনুমানিক মানও নির্ণয় করেছিলেন। জৈনরা যে জটিল এবং বৃহৎ উৎপাদক নিয়ে কাজ করতেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। মিশ্র সংখ্যার ক্ষেত্রে জৈনরা হামেশাই আনুমানিক মানে চলে যেতেন। যখনই কোনো ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$ থেকে বৃহৎ হত, তখনই তা একক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত। আবার ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$ থেকে ক্ষুদ্র হলে তা পরিত্যক্ত হত। যেমন ৩১৮১৪$\frac{২১৮}{৬৩০}$ কে লেখা হত ৩১৫০৮৯ আবার ৩১৮১৪$\frac{৫৫০}{৬৩৬}$ কে লেখা হত ৩১৮১৫ হিসাবে।

ভাগবতী সূত্রতে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) জৈনরা ‘n’ সংখ্যক সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তুসমূহের সমবায়, কখনও একবারে একটি করে ধরে (একক সংযোগ) কখনও একবার দু'টি করে ধরে (দ্বিক-সংযোগ), কখনও একবারে তিনটি করে ধরে (ত্রিক-সংযোগ), অথবা আরও বেশি করে ধরে, ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সব ক্ষেত্রেই তাঁরা বিন্যাস ও সমবায়ের সঠিক নিয়মটি বার করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমনটি আমরা আজকে জানি।

এর ফলে জৈন এই ধরনের সূত্রে খোঁজ পেয়েছিলেন :

$$^{n}C_1 = n$$

$$^{n}C_2 = \frac{n(n-1)}{1\times 2}$$

$$^{n}C_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{1\times 2\times 3}$$

$$^{n}n_1 = n$$

$$^{n}n_2 = n(n - 1)$$

$$^{n}n_3 = n(n - 1)(n - 2)$$

জৈন গণিতশাস্ত্রে সংখ্যা সম্বন্ধীয় যে অন্তর্লীন নিয়মটি ব্যবহৃত হয়েছে, আধুনিক সূচক সূত্রে তা হল :

$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$, এবং $(a^m)^n = a^{mn}$

যেখানে এবং পূর্ণসংখ্যা অথবা ভগ্নাংশ।

ভারতবর্ষে বীজগণিত

বলা চলে, ব্রহ্মগুপ্তের (প্রায় ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ) সময় থেকে বীজগণিত, গণিতশাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়েই, ভারতীয় গণিতজ্ঞরা প্রথম অজ্ঞাত রাশিকে নির্দেশ করতে রং বা মণিমুক্তোর নাম প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া যেমন, রাশির ঘাত বা মূল নির্দেশ করতে আক্ষরিক প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এইরকম কিছু প্রতীক সারণীতে দেখানো হয়েছে। তাঁরা ঋণাত্মক রাশি বোঝাতে ফুটকি চিহ্ন ব্যবহার করতেন, যদি সংখ্যায় ফুটকি চিহ্ন না থাকত, তাহলে ধরা হত রাশিটি ধনাত্মক।

সারণী ৪.১ : বর্তমান ও প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত গাণিতিক চিহ্ন

আধুনিক চিহ্ন	প্রাচীন ভারতীয় চিহ্ন
চল (variable)	**চল**
X Y Z ইত্যাদি	ম (মাণিক্য)
	নি (ইন্দ্রনীল)
	মু (মুক্তো) ইত্যাদি
প্রক্রিয়া (operation)	**প্রক্রিয়া**
+	যু (যুত)
–	+ (ব্রাহ্মী লিপি অনুযায়ী ‘ক্ষয়’তে +)

আধুনিক চিহ্ন	প্রাচীন ভারতীয় চিহ্ন
$\times$	গু (গুণ)
$\div$	ভা (ভাগ)
$(\ )^2$	ব (বর্গ)
$(\ )^3$	ঘ (ঘন)
$(\ )^4$	ব- ব
$\sqrt{\ }$	মূ (মূল)

তাঁরা বীজগাণিতিক সমীকরণকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন :

(ক) একটি অজ্ঞাত রাশির সমীকরণ।

(খ) একাধিক অজ্ঞাত রাশি সমন্বিত সমীকরণ।

(গ) অজ্ঞাত রাশির গুণফলে সমীকরণ।

সেই সময়ে, একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারা একমাত্রা ও দ্বিমাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণে (first and second degree indeterminate equations) সমাধান-পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন :

$$by = ax + c$$

এবং $ax^2 + c = y^2$

উচ্চতর ঘাতের সমীকরণ সমাধানের প্রচেষ্টাও তাঁরা করেছেন।

সংখ্যা ও গণনা-পদ্ধতি

বীজগণিত বাদে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান বোধহয় সংখ্যা ও গণনা পদ্ধতির আবিষ্কার। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যখন অনেক বড় আর খুব ছোট সংখ্যা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে হল, তখনই শব্দ ও অক্ষর দ্বারা সংখ্যাকে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল। এর উদাহরণস্বরূপ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা বা মূল্যবান ধাতুর নিখুঁত পরিমাপের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা যায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, কীভাবে বাণিজ্য ও নৌ চলাচলের প্রসার এই ধরনের বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়ে বাণিজ্যের যেভাবে প্রসার ঘটছিল তাতে পণ্য আদান-প্রদানের হিসাব, হরপ্পার যুগের মতো দাঁড়ির পর দাঁড়ি সাজিয়ে আর রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। একইভাবে, পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে আকাশে তারার সংখ্যা অথবা তাদের দূরত্ব অথবা তাদের পর্যায়কালের হিসাব রাখা প্রাচীন পদ্ধতিতে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল (চিত্র ৪.১৩ দ্রষ্টব্য)। এই যুগে ব্যবহৃত কয়েকটি লিপি যেমন খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী সংখ্যালিপি সারণী ৪.২-এ দেখানো হল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক

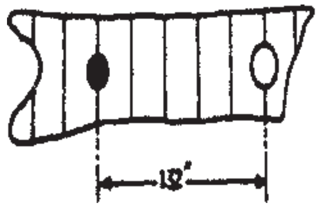

চিত্র ৪.১৩ : ইন্ডাস রেখার অঙ্কন চিত্র

থেকে দ্বিতীয় শতক অবধি, অশোক, শক, পারথিয়ান এবং কুষাণ উৎকীর্ণলিপিতে আমরা খরোষ্ঠী সংখ্যালিপির নিদর্শন পাই। খরোষ্ঠী লিপিতে দেখা যায় ৩০০ পর্যন্ত সংখ্যার প্রতীক রয়েছে। প্রথমে ১ থেকে ১০, তারপর ১০-র গুণিতকে ১০০ পর্যন্ত, তারপর ২০০ এবং ৩০০ এই ছিল মোট প্রতীক। মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলি প্রকাশ করতে যৌগিক নিয়মের (additive principle) ব্যবহার করা হত। কয়েকটি উদাহরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল :

আধুনিক সংখ্যা :	২২	৭৪	১২২	২৭৪
যেভাবে লেখা যায় :	২+২০	৪+৭০	২+২০+১০০	৪+৭০+২০০
খরোষ্ঠী প্রতীক :				

আপনিও খরোষ্ঠী পদ্ধতিতে কয়েকটি সংখ্যা লিখে ফেলুন না! দেখবেন, মজা লাগবে। ব্রাহ্মী পদ্ধতিতে ২০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যালিপি ছিল এবং এই পদ্ধতি তুলনায় অনেক উন্নতও ছিল। তবে, আধুনিক যুগে ব্যবহৃত দশমিক পদ্ধতির তুলনায়, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী, উভয়েই যে অনেক জটিল সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন বা শূন্য ব্যবহার কৌশলের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের একটি গুর্জর উৎকীর্ণলিপিতে। পরবর্তীকালে, গোয়ালিয়র, মহীপাল, বৌকা ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে এর পরিচয় পাওয়া গেছে। মনে হয়, তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। তাঁদের হাতেই এই পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ঘটে। আরবরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এর সংখ্যালিপির প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ফলে, আজ এইগুলি আরব সংখ্যালিপি বা সংখ্যা হিসেবে পরিচিত।

ভারতবর্ষে, সংখ্যালিপি কোনো সত্তা, ধারণা বা বস্তুর নামানুসারে প্রকাশিত হত। এই নাম-শব্দগুলি, সংখ্যার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নির্বাচন করা হত। উদাহরণস্বরূপ—

(ক) শূন্য বা ০ ছিল 'খ', 'আকাশ', 'অম্বর', 'শূন্য'

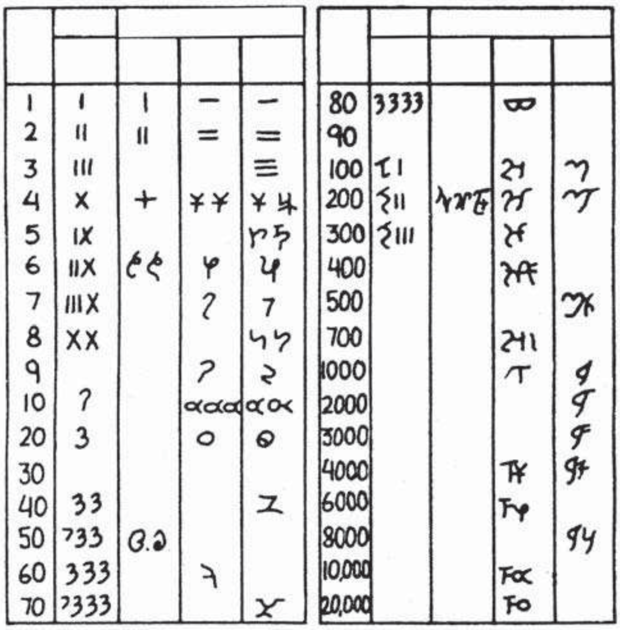

সারণী ৪.২ : খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী সংখ্যালিপি

(খ) ১ ছিল পৃথিবীর কোনো প্রতিশব্দ, যেমন 'ভূ', 'ধরা', 'পৃথ্বী', 'আদি' ইত্যাদি। অথবা চাঁদের কোনো প্রতিশব্দ, যেমন ইন্দু, চন্দ্র ইত্যাদি।

(গ) ২ ছিল 'যম', 'অশ্বীন' (যমজ), 'পক্ষ' (পাখির দু'টি ডানা), অথবা 'কর' (দু'টি হাত) ইত্যাদি।

(ঘ) ৩ ছিল (ত্রি) 'গুণ', 'জগৎ'

(ঙ) ৪ ছিল 'বেদ', 'সমুদ্র' ইত্যাদি

(চ) ৫ ছিল 'ভূত' (মৌল), 'ইন্দ্রিয়' অথবা 'শর'

এই প্রক্রিয়ায় বৃহৎরাশি লেখা বেশ জটিল ছিল। শব্দকে একের পর এক যুক্ত করে বৃহৎরাশিকে প্রকাশ করা হত। শ্লোকের মধ্যে শব্দের রাশিকে পড়া হত বাম থেকে দক্ষিণ। তবে, সংখ্যালিপিতে তা সাজানো থাকত দক্ষিণ থেকে বামে। যেমন ১৪,৪০০ সংখ্যাটি লেখা হত।

খ-খ-বেদ সমুদ্রর-চন্দ্র

যখন সংখ্যালিপিতে দক্ষিণ থেকে বামে লেখা হবে, তখন এইরকম দাঁড়াবে : ১৪,৪০০। একইভাবে, আমরা আরও উদাহরণ সারণী ৪.৩-এ দিয়েছি। আপনিও এই সারণীতে ৬ থেকে ৭ সংখ্যাগুলির শব্দ-নাম এখান থেকে জানতে পারবেন।

সারণী ৪.৩

শব্দ	সংখ্যা
১. *নব-বসু-গুণ-রস-রসঃ*	৬৬৩৮৯
২. *স্বর-যম-যম-দ্বি*	২২২৭
৩. *শূন্য-দ্বি-পঞ্চ-যম*	২৫২০
৪. *বসু-বেদ-যম-খ-ধরা*	....
৫.	৫৩৭৯

অনুশীলনী ৪

সারণী ৪.৩ শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন, সংখ্যালিপি অথবা শব্দ বসিয়ে।

আপনি আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে, তাদের পদ্ধতিতে কয়েকটি সংখ্যা লিখে ফেলুন না!

এখানে, এই প্রথম দেখা গেল, একটি পদ্ধতি তৈরি হয়েছে, যার সাহায্যে সংখ্যাকে শব্দে প্রকাশ করা যাচ্ছে— লিখিতভাবে অথবা কথা বলার সময়ে।

এই অধ্যায়ে, আমরা চেষ্টা করেছি ১৫০০ থেকে ২০০০ বছর আগে গণিতশাস্ত্রে যে অগ্রগতি হয়েছিল, তার একটি বিবরণ দিতে। এবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে চোখ ফেরানো যাক্, সেখানেও দারুণ কাজ হয়েছিল।

৪.৩.৪ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগতি

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু এই অগ্রগতির সময়ানুক্রমিক বিবরণ, বিভিন্ন আবিষ্কার ও মতবাদের সঠিক সময়কাল পেশ করা খুবই কঠিন।

যেমন কঠিন বিভিন্ন আবিষ্কার বা মতবাদের ওপর পূর্ববর্তী দিকপাল বা গ্রীকদের প্রভাবের পরিমাপ নির্ণয়। এর মূল কারণ হল, ওই পর্বের অধিকাংশ সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হই পরবর্তী যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের রচনা থেকে যাঁরা অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের নিজেদের কর্মকে পূর্ববর্তী কোনো জ্ঞানীর বক্তব্য হিসেবে পেশ করেছেন; উদ্দেশ্য—যাতে তৎকালীন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের সমর্থন লাভ করা যায়। এছাড়াও, সেই সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠিক কোন্ অবস্থায় পৌঁছেছিল তা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে কারণ বিজ্ঞানীরা সামাজিক অনুমোদন অর্জনের জন্য তাদের সুচিন্তিত ও অন্য সকল দিক থেকে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয় চরিত্র (যেমন রাহু ও কেতু) ঢুকিয়ে দিতেন। আমরা একক-৩ থেকে জেনেছি যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনাপর্ব বৈদিক যুগে চিহ্নিত হয়েছে। সেই আদি ইতিহাস গ্রন্থে যা আলোচিত হয়েছে, তা 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। সেই সময়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের পর্যবেক্ষণ করে নিখুঁতভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য তাঁরা সৌরজগৎ (planetary system) সম্পর্কে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ তৈরি করতে পারেননি।

গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী ঘুরছে ও সূর্য এবং নক্ষত্ররা স্থির। রাহু ও কেতুর জন্য 'গ্রহণ' হয়—এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনিই গ্রহণ-এর প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকার।

ত্রিকোণমিতির সারণী তৈরি আর্যভট্টের আরেকটি অবিস্মরণীয় অবদান। জ্যামিতিক উপায়ে আর্যভট্ট ত্রিকোণমিতির সারণী তৈরি করেছিলেন এবং সেই সারণী থেকে লব্ধ 'সাইন' ও 'কোসাইন'-মান, তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহার করতেন। এছাড়া তিনি সমান্তর (arithmetic) ও গুণোত্তর শ্রেণীর (geometric series) যোগফলের সূত্র আবিষ্কার করেন, এবং Σn^2 এবং Σn^3 এইরূপ প্রগতির যোগফল নির্ণয় করেন। আর্যভট্টের পরে বরাহমিহিরের (জন্ম ৫০৫ খ্রিস্টাব্দ) আগমন ঘটে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎসংহিতা'-তে আর্যভট্ট ও তার পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বরাহমিহিরের সমস্যা ছিল, তিনি জ্যোতিষবিদ্যাকেও, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের চাপ, এর একটা কারণ হতে পারে। বরাহমিহির নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং রাজদরবারে নিযুক্তও ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে, তাঁর নিজের গবেষণা চালিয়ে যেতে পারার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্রাহ্মণসমাজ ও রাজার আনুকূল্য লাভ। এর ফলে তিনি এক ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পড়েছিলেন যেখানে একদিকে তাঁকে বিজ্ঞানের যুক্তি ও নীতিকে স্বীকার করতে হচ্ছে, অন্যদিকে প্রাচীন ঋষিদের মতামতকেও অগ্রাহ্য করা চলবে না। তাই, তিনি তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে তিনটি আলোচিত বিষয়ের একটি হিসেবে জ্যোতিষবিদ্যাকে বেছে নেন। একদিকে, জীবনধারণের জন্য তিনি যেমন রাজা ও রাজপুত্রদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করতেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, গ্রহণ সম্পর্কে বরাহমিহিরের বক্তব্য আলোচনা করা যেতে পারে। সেই সময়কার পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রাখলে, বলা চলে, বরাহমিহির দুই প্রকার গ্রহণ সম্পর্কেই যথেষ্ট

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা এটা জানে না তাদের সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু, তারপরই তিনি মন্তব্য করলেন, "সাধারণ মানুষ অবশ্য খুব জোর গলায় বলে থাকে যে, (রাহুর) মাথাই গ্রহণের কারণ, না হলে ব্রাহ্মণরা কখনই পুণ্যস্নান করতেন না।"

বরাহমিহিরের হতাশা এবং তাঁকে যে পরিমাণ চাপ সহ্য করতে হয়েছিল, তার জন্য আমরা সকলেই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু, একথা বলতেই হয় যে প্রাকৃতিক কারণকে বিশ্লেষণ করতে তিনি বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানকে একই আসনে বসিয়েছিলেন, তার জন্য আর্যভট্টের পরবর্তী যুগে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, একশো-বছর পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও আর গ্রহণের কারণ হিসেবে রাহু-কেতুর ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেননি। ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ), যিনি অন্যদিকে একজন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তিনিও তাঁর 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "অনেকেই মনে করেন (রাহুর) মস্তক গ্রহণ ঘটায় না। এটা একদম বোকার মতো ধারণা, কারণ তার মস্তকের দরুনই গ্রহণ হয়।............................কারণ বেদ, যা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ঈশ্বরের বাণী ভিন্ন আর কিছু নয়, সেখানেই বলা হয়েছে যে, ওই (রাহুর) মস্তকই গ্রহণের জন্য দায়ী।"

এই বক্তব্য রাখার সময় ব্রহ্মগুপ্ত নিশ্চিতভাবেই অবগত ছিলেন যে তিনি আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং শ্রীসেনার মতো তাঁর পূর্বসূরীদের বৈজ্ঞানিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত এক ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, আর্যভট্ট ও বরাহমিহির যেভাবে রাহুর অস্তিত্বকে অলৌকিক ঘোষণা করেছেন, তা মেনে নিলে, "তিনি আর স্বর্গসুখে ধন্য হবেন না..........................সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মমতকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন এবং এটা মেনে নেওয়া যায় না।"

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, আর্যভট্টের পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেভাবে বিজ্ঞান এবং অপবিজ্ঞানের মধ্যে সমঝোতা করেছেন, তাতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে দূরন্ত সম্ভাবনা ছিল, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধহয়, আর্যভট্টের সেই যুগান্তকারী ধারণা, পৃথিবী ঘুরছে আর সূর্য ও তারারা স্থির। অথর্ববেদে বলা আছে যে, পৃথিবী স্থির। এর বিরুদ্ধে কোনোকিছু বলাই হচ্ছে ধর্মবিরুদ্ধ। আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এই ব্যাপারে বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লালা সহ সকল আর্যভট্ট পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাঁর সেই যুগান্তকারী ধারণাকে হয় এড়িয়ে গেছেন, না হয় তার অপব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা তাঁদের ব্রাহ্মণ প্রভুদের কাছে সৎ হিন্দু হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, যাঁরা বেদে ও পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণায় বিশ্বাস করেন। কেউ কেউ মনে করেন, সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার জন্য পাণ্ডুলিপির বিকৃতিও হয়তো ঘটানো হয়েছিল।

অনুশীলনী ৫

নীচের সারণীতে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও তাদের কর্ম যথাক্রমে ১নং এবং ২নং স্তম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে। যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সঙ্গে যে কর্মটি যুক্ত, সেটি চিহ্নিত করুন।

১	২
(ক) আর্যভট্ট	১। রাহু ও কেতুর কারণে গ্রহণ নয়।
	২। পৃথিবী ঘুরছে আর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্থির।
(খ) বরাহমিহির	৩। পৃথিবী স্থির আর সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহরা তার চারপাশে ঘুরছে।
(গ) ব্রহ্মগুপ্ত	৪। পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়াপাতের কারণেই গ্রহণ হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞানের এই স্বর্ণযুগ অনাদিকাল স্থায়ী হয়নি। এর পতন গুপ্ত যুগের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল। আমরা এবার সেই ব্যাপারটাই জানব।

৪.৩.৫ গুপ্ত যুগের পতন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হতে শুরু করে পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। সাম্রাজ্যের উত্তরদিকে হুনরা আক্রমণ হানে এবং পাঞ্জাব, রাজস্থান, পূর্ব মালব ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের দখলে চলে যায়। হুন শিলালিপি মধ্যভারতেও পাওয়া গেছে। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ক্রমশ স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। দেখা গেছে, ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজেরাই ভূমির পাট্টা প্রদান করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের কর্তৃত্ব লোপ। এর ফলে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজস্বের ভারী লোকসান হয়, কারণ ব্যবসা ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত উন্নত। একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে জমি দান করার প্রথাকে টিকিয়ে রাখা, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ায়, শিল্প ও পণ্যদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেল। এর ফলে, বহু দক্ষ শ্রমিক অনুৎপাদক পেশায় নিয়োজিত হল। ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে, গুজরাত থেকে মালবে রেশম তন্তুবায়ীদের একটি দল এই কারণেই পাড়ি জমান।

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে, ভেতরে ও বাইরে উভয় দিকের চাপই কাজ করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে যে সামাজিক ও বৌদ্ধিক অবস্থার প্রয়োজন হয় ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে তা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও দীর্ঘদিনের জন্যে শান্তি ও সুস্থিরতার অবসান ঘটে। অস্থিরতা ও সংঘাত প্রকট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল দক্ষিণভারতের চোল সাম্রাজ্য। এখানে গুপ্তযুগের মতোই শিল্প ও প্রকৌশলের বিকাশ ঘটে। এখন আমরা ইসলাম ধর্মের প্রবেশের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে অগ্রগতি হয়েছিল তার বিবরণ পড়ব।

৪.৪ সংঘাতের যুগ

৭৫০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমরা দেখি উত্তর-পূর্ব ভারতে পাল সাম্রাজ্য, উত্তর-পশ্চিমে প্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। নবম শতকে, দক্ষিণাত্যে পল্লব, চালুক্য, পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের পরাস্ত করে চোলরাজারা নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করেন।

উত্তরভারতে এই সময়টা অবক্ষয়ের যুগ। পূর্বে, রোম ও সাস্যানীয় (Sassanian) সাম্রাজ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য যে সমৃদ্ধি এনেছিল, তা ওই দুই সাম্রাজ্যের পতনে বিনষ্ট হয়। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ছোট ছোট জায়গীরদারদের উত্থান শুরু হয়, যাঁরা সবসময়েই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের উদ্ভব বাণিজ্যের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছিল। কারণ এরা সব সময়েই চাইত কয়েকটি গ্রাম বা কিছু গ্রাম সমষ্টিকে নিয়ে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা।

সমাজে জাতিভেদ প্রথা আবার জাঁকিয়ে বসল। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ও শূদ্রের সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হল। কুমোর, তাঁতী, স্বর্ণকার, বাদ্যকার, নাপিত প্রভৃতি অসংখ্য জাতি যারা এই জাতীয় কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের নীচু জাতি হিসেবে দেখা হত। বৌদ্ধিক মহলে, এই জাতি-বিন্যাসের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়ীকরণের চেষ্টা চলত। এই সময়ে মহিলাদের সামাজিক অবস্থানও যুগের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করে। মেয়েদের বৌদ্ধিক যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তার বেদপাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাদের বিবাহের বয়স ছয় থেকে আট বছরে নামিয়ে আনা হয়, যা বৈদিক যুগে ছিল ষোলো বা সতেরো বছর। এইভাবেই তাদের মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এই অবক্ষয়ের যুগেও কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। দ্বিতীয় আর্যভট্ট (আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে তাঁর কীর্তির জন্য স্মরণীয়। দ্বিতীয় ভাস্কর (জন্ম ১১১৪ খ্রিস্টাব্দ) বিখ্যাত তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থের কারণে। গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত—'লীলাবতী', 'বীজগণিত', 'গণিতধ্যায়' এবং 'গোলাধ্যায়' (চিত্র ৪.১৪ দেখুন)।

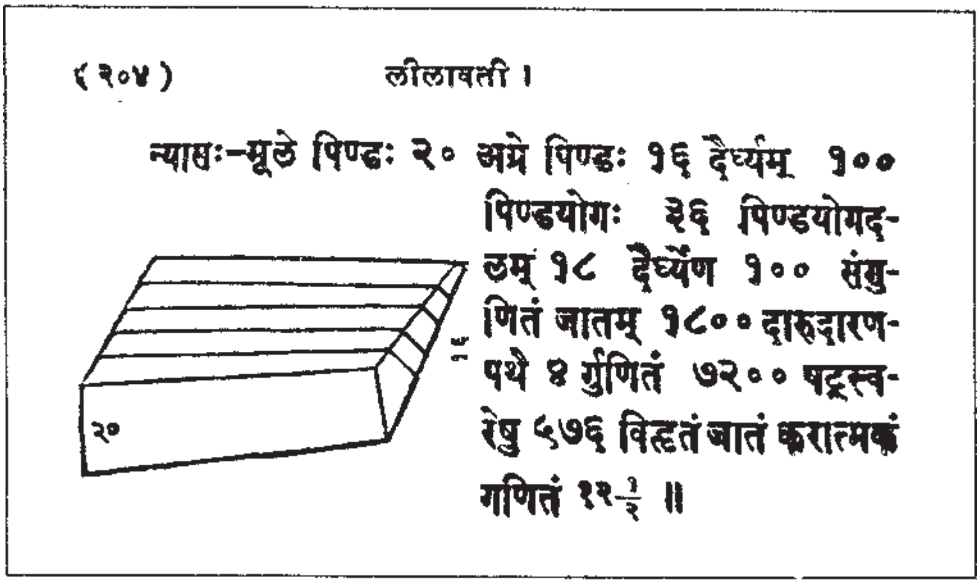
(২০৪) लीलावती ।

न्यासः—मूले पिण्डः २० अग्रे पिण्डः १६ दैर्घ्यम् १०० पिण्डयोगः ३६ पिण्डयोगदलम् १८ दैर्घ्येण १०० संगुणितं जातम् १८०० दारुदारणपथै ४ र्गुणितं ७२०० षट्स्वरेषु ५७६ विहृतं जातं करात्मकं गणितं १२ $\frac{1}{2}$ ॥

চিত্র ৪.১৪ : আধুনিক কালে লীলাবতীর একটি পৃষ্ঠা পুনর্নির্মাণ করে দেখানো হয়েছে কীভাবে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে চারটি স্থানে ছেদিত একটি কাষ্ঠখণ্ডের মোট ছেদন তল (Total cross-sectional area) নির্ণয় করা সম্ভব।

এইসঙ্গেই, প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অগ্রগতির ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা সাঙ্গ করছি।

আপনি যদি এই বিষয়ে, আরও বিশদ বিবরণ জানতে উৎসাহী থাকেন, তাহলে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত বইগুলি পড়তে পারেন।

৪.৫ সারাংশ

- এই এককের আলোচনায় আমরা দেখেছি, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়েছিল। এই উদীয়মান রাষ্ট্রের অধিকতর কৃষিজ জমিরই প্রয়োজন ছিল না, এর সঙ্গে তার দরকার ছিল উন্নত কৃষিব্যবস্থা, যা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়। খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনও তার ছিল, কারণ এছাড়া কৃষিক্ষেত্রের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরি বা সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে সৈন্যবাহিনীর যে অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয়, তার উৎপাদনও সম্ভব হত না। এই প্রয়োজনে তারা আদিবাসী সম্প্রদায়কে তাদের অধীনস্থ করে এবং তাদের কৃষিজমির দখল নেয়। অবশ্য, জমিচাষের জন্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য আদিবাসীদের সাহায্যও তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে, সমাজে আদিবাসী জনগণকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয় এবং এর ফলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ও ঘটে যায়। এই সবই, তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কে একটি নমনীয়তা এনেছিল।
- বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতো উদার দার্শনিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উদয় এই যুগেই ঘটেছিল।
- এই সমস্ত ঘটনা মৌর্যযুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এই সময়ে, শিল্প ও প্রকৌশলে লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা যায়। অবশ্য, সম্রাট অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।
- খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতক হচ্ছে দক্ষিণভারতের ইতিহাসে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়কাল।
- গুপ্তযুগে, পূর্বেকার কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির মুঠি শিথিল হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় প্রশাসন, যা ছিল সবদিক দিয়েই অনেক নমনীয়, তার স্থান দখল করে। কারিগর, ব্যবসায়ীদের শ্রেণী ছিল এবং প্রশাসনে তাদের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণদের প্রভূত জমি দান করতেন, ফলে ওই সময়ে পুরোহিত ভূস্বামীদের উদ্ভব হয়। এই সমস্ত পরিবর্তন স্থানীয় উদ্যোগে উৎসাহিত করে। ফলে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন শিল্প ও প্রকৌশল গ্রহণে সকলে উৎসাহিত বোধ করে। অবশ্য, এইসব একই সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী কৃষকদের সামাজিক অবস্থানকে নিম্নগামী করেছিল।
- এই সময়ে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, যা জৈন গণিতজ্ঞ ও আর্যভট্টের ন্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কর্মে প্রতিফলিত। গুপ্তযুগের হস্তশিল্পীরা লোহা ও ব্রোঞ্জের কাজে নিজেদের উৎকর্ষের পরিচয় রেখেছেন। দিল্লির মেহরৌলীতে যে লৌহস্তম্ভ (আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ) দাঁড়িয়ে আছে তা সেই যুগের কারিগরী দক্ষতার প্রতীক।

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে বিজ্ঞানে অগ্রগতি বড় রকমের ধাক্কা খায়। এর পরে যা কিছু সামান্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, তা সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্ভবপর হয়।

৪.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

তিন বা চার লাইনের সংক্ষিপ্ত জবাব লিখুন।

(১) মৌর্য ও গুপ্তযুগের সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনে কী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

....

....

....

(২) কোন্ অবৈজ্ঞানিক চর্চা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের পতনের কারণ?

....

....

....

(৩) ভারতীয় সমাজের কোন্ বৈশিষ্ট্য গুপ্ত পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের পতনের জন্য দায়ী?

....

....

....

৪.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী

(১) (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ)

(২) (ক) সরু তক্তা দ্বারা সড়ক নির্মাণ।

(খ) কৃষিতে লাঙলের ফলার ব্যবহার প্রবর্তন ও নানাপ্রকার সেচ-ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ।

(গ) শস্যের খোসা বা ভূষি ছাড়ানো, তুলো ও পশম ছাড়ানো, সুতো বোনা ইত্যাদির প্রযুক্তি।

(ঘ) ধাতুবিদ্যা ও ধাতুশিল্প।

(৩) (ক) (১) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

(২) সাধারণভাবে, বংশ-পরিচয় নয়, আর্থিক অবস্থা ও সমাজে কে কোন্ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

(৩) কৃষি ও কারিগরী উৎপাদনের গুরুত্ব, কৃষক ও শূদ্রদের মতো শ্রমজীবী মানুষের অবস্থায় উন্নতি এনেছিল।

(খ) (২), (৩), (৫), (৬)

(৪) ১০২৪৮ নব-স্বর-গুণ-ভূত

(৫) (ক) (২), (৪)

(খ) (৩), (৪)

(গ) (১), (৩)

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) মৌর্যযুগে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, অন্যদিকে গুপ্তযুগে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছিল ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

(২) জ্যোতিষবিদ্যাকে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখার অবৈজ্ঞানিক চর্চাই এই পতনের কারণ।

(৩) (ক) ছোট ছোট প্রাদেশিক শাসনকর্তা যাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে উৎসাহ জোগাতেন কিন্তু বাণিজ্যিক প্রশ্রয় দিতেন না।

(খ) জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে সমাজে গেড়ে বসল।

টীকা :

অপকেন্দ্রিক বল (Centrifugal Force) : বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণকারী কোনো বস্তুর ওপর যে বহির্মুখী বল ক্রিয়া করে।

উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) : উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কিত বিশেষ বিজ্ঞান।

ধাতুবিদ্যা (Metallurgy) : ধাতু-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; বিশেষত আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতির চর্চা।

প্রকৌশল (Technique) : কলা-কৌশল; নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যান্ত্রিক কৌশল বা বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

প্রযুক্তি (Technology) : শিল্প ও উৎপাদন-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা; শিল্পে সুশৃঙ্খলভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রকৌশলের সঙ্গে পার্থক্য হচ্ছে, 'প্রকৌশল' যেখানে একটি ধরনের বিশেষ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কৌশল বা বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে চিন্তিত, সেখানে 'প্রযুক্তি' অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণিবিদ্যা (Zoology) : প্রাণিজগৎ সম্পর্কিত বিশেষ বিজ্ঞান।

প্রত্নবিদ্যা (Archaeology) : প্রাচীন (বিশেষভাবে প্রাগৈতিহাসিক) মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে চর্চা, সাধারণভাবে খননকার্যের মাধ্যমে এই জ্ঞান সংগৃহীত হয়।

লাইসিয়াম : বক্তৃতাকক্ষ; যেখানে শিক্ষাদান করা হয়।
(Lyceum)

বংশধারা : পিতা ও মাতার নিকট প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ।
(Heredity)

বলবিদ্যা : গতি ও বল সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চা।
(Mechanics)

বিদেশী গোষ্ঠী : Barbarians-এর বাংলা এখানে 'অসভ্য' বা 'বর্বর'-এর পরিবর্তে 'বিদেশী
(Barbarians) গোষ্ঠী' করা হয়েছে। কারণ দেখাই যাচ্ছে, 'অসভ্য'-রা আসলে অসভ্য নয়, অনেক উন্নত প্রকৌশল তারা করায়ত্ত করেছিল। তারা লোহার ব্যবহার জানত। প্রাচীন গ্রীস বা রোমে Barbarians বলতে বিদেশী বোঝাত, এখানে সেই অর্থই অনুসরণ করা হয়েছে।

শারীরবিদ্যা : জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নিয়ে চর্চা করে বিজ্ঞানের যে শাখা।
(Physiology)

শারীর-সংস্থান-বিদ্যা : শরীরে গঠন সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
(Anatomy)

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. বিজ্ঞানের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), সমরেন্দ্রনাথ সেন, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৪ (পুনর্মুদ্রণ)।
2. Ancient India : A Text Book For Class XI, R. S. Sharma, NCERT, 1986.
3. A Concise History of Science in India : Ed. by D. M. Bose, S. N. Sen, B. V. Sibbarayappa, Indian National Science Academy, 1971.
4. An Introduction to the Study of Indian History : D. D. Kosambi, Bombay, 1956.
5. The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline : D. D. Kosambi, Vikas Publishing House, 1987.
6. Science and Society in Ancient India : D. P. Chattopadhyay, Research India Publications, Calcutta, 1979.

NOTES

পাঠ উপকরণ

এফ. এস. টি.—১

পর্যায়—২

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রারম্ভিক পাঠক্রম

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এস. টি.—1

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রারম্ভিক পাঠক্রম

পর্যায়
2

পৃষ্ঠা

আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব 121

একক 5 ❑ মধ্যযুগে বিজ্ঞান 140

একক 6 ❑ নবজাগরণ (রেনেসাঁ) এবং তারপর 167

একক 7 ❑ ঔপনিবেশিক ও আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান 197

একক 8 ❑ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকৃতি 218

দ্বিতীয় পর্যায় ❐ আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব

প্রথম পর্যায়ে আমরা মানব সমাজের গোড়া থেকে লৌহযুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আর শুরুতেই তৈরী করা ধারণা-কাঠামোর সাহায্যে এই যুগে বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এই পর্যায়ে সেই চেষ্টাই আমরা আরও বিশদভাবে করব আর সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের কথা বলব।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইওরোপীয় সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনই আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের কারণ বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তন অন্ধকার যুগের অজ্ঞতা আর হতাশাকে দূরীভূত করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। একেই বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিপ্লব। যাই হোক এই পর্যায় আমরা শুরু করব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদানের কথা দিয়ে, কারণ ধ্রুপদী যুগের বিজ্ঞানচর্চাকে আরবরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই চর্চাকে তাঁরা ইওরোপীয় এবং এমনকি ভারতীয়দের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। বহুক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষামূলক পদ্ধতি এবং তার যুক্তিসম্মত ব্যবহারকে তাঁরাই প্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন।

মধ্যযুগ, ঔপনিবেশিক আমল এবং আধুনিক যুগে ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশের কথা বর্ণনা করার পর আমরা ষোড়শ শতাব্দীর পরে ভারত কেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইওরোপ থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করব। আধুনিক যুগে এসে দেখি যে ইতিহাস আর অতীত অভিজ্ঞতা একীভূত হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এক অত্যন্ত জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। বিংশ শতাব্দীতে এসেই বিজ্ঞান তার পথ খুঁজে পেয়েছে---- এই এক শতাব্দীতেই যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক কাজ হয়েছে তা পূর্ববর্তী সমগ্র কাজের পরিমাণ থেকে অনেক বেশী। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের একটি নিজস্ব পথ আছে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্য থেকে স্বতন্ত্র। সামাজিক প্রেক্ষাপটে যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা করে সমাজের ব্যবহারের জন্য তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চাই তাহলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। বিজ্ঞানের এই দুটি দিকই এই পর্যায়ের ৮ম এককের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পর্যায় পড়ার সময় প্রথম পর্যায়ের অভিলক্ষ্যের কথা মনে রাখতে হবে এবং মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগেও একইভাবে বুঝতে হবে। অন্যভাবে বললে, এই পর্যায়টি পড়ার পর।

- মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের বিকাশ কিভাবে ঘটল বোঝা যাবে।
- বিজ্ঞান ও সমাজের সম্পর্ক এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব সম্বন্ধে জানা যাবে।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা হবে এবং কিভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান করা যায় তার জ্ঞান লাভ করা যাবে।
- বোঝা যাবে যে বিজ্ঞান হল একটি নৈর্ব্যক্তিক, বিকাশশীল, সদা অসম্পুর্ণ এবং সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের সমন্বয় এবং এই জ্ঞান সর্বদাই পরিবর্তন সাপেক্ষ।

একক ৫ □ মধ্যযুগে বিজ্ঞান

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
৫.২ আরব রেনেসাঁ
৫.২.১ আরব বিজ্ঞান
৫.২.২ আরব বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অবক্ষয়
৫.৩ মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৫.৩.১ বিজ্ঞানের অবদান
৫.৩.২ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার
৫.৪ ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা
৫.৫ সারাংশ
৫.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
৫.৭ উত্তরমালা

৫.১ প্রস্তাবনা

তৃতীয় একক-এ আমরা দেখলাম, রোমের পতনের পরের ৫০০ বছরে বিজ্ঞানের কেন্দ্র প্রাচ্যের দিকে সরে এসেছিল। এছাড়াও চতুর্থ এককে দেখেছি, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী—এই সময়পর্ব হল ভারতের ব্যাপক সাংস্কৃতিক অগ্রগতির যুগ। ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতি ঘটেছিল গুপ্ত যুগে (৩২০-৪৮০ খ্রিস্টাব্দ)। এদিকে ষষ্ঠ শতাব্দীতেই ভারতে গড়ে উঠেছিল এক জটিল ধর্মীয় ও বর্ণভিত্তিক প্রথা। ধীরে ধীরে এই কঠোর সমাজ ব্যবস্থা, প্রচলিত ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস এবং ভেঙে পড়া সাম্রাজ্য ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকে ঠেলে দিল এক অনড় অবস্থার দিকে। এর ফলে বিজ্ঞানের বিকাশও স্তিমিত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে তৃতীয় ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে দেখা দিল খ্রিস্টান ধর্মের উত্থানের যুগ। প্রথম পর্যায়ে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং তার একটা লোকগ্রাহ্য জনপ্রিয়তাও ছিল। যাইহোক অচিরেই রোমান সাম্রাজ্য খ্রিস্টীয় চার্চ-এর কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেয় এবং খ্রিস্টীয় মতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাব, এই ঘটনাই ইউরোপে বিজ্ঞানের বিকাশের কণ্ঠরোধ করে। যখন প্রাচীন ভারতীয় ও রোমান সংস্কৃতির অবক্ষয় চলছিল সেইসময় বিশ্বের অন্য কোনোখানে ইতিবাচক একটা উন্নতির ধারা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব আরব সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানকে প্রভূত

শক্তি যুগিয়েছিল। যদিও ইসলামী সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়ে যায় একাদশ শতাব্দীতেই, তবুও ইসলামী বিজ্ঞানের সুফল কিন্তু বৃথা যায়নি। একাদশ শতাব্দীতে যখন ভারতে ইসলামের আগমন ঘটে সেই সময়ে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা বড় অংশ তখন ভারতের অধিকারে আসে। একদিক থেকে এটি মধ্যযুগের ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাকে একটা আকার দিতে পেরেছিল।

এই এককে আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি সুদীর্ঘ পর্যায়কে ছুঁয়ে যাব, প্রায় সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা এখানে বলব খ্রিস্টানধর্মের ইতিহাস এবং তারপর দেখব কীভাবে আরব রেনেসাঁ এবং ইসলামের উত্থান আরব বিজ্ঞানকে বিকশিত করতে সহায়তা করেছিল। এই এককের পরের অংশে আমরা মনোনিবেশ করব মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের দিকে।

উদ্দেশ্য

এই একক অধ্যায়নের পর সম্ভব হবে :

- বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশে আরব বিজ্ঞানের অবদান বিষয়ে বোঝা।
- মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশের স্তর-পরম্পরায় হিসেব-নিকেশ করতে পারা।
- মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞান বিকাশে বাধাসৃষ্টিকারী বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা।

৫.২ আরব রেনেসাঁ

তৃতীয় এককে আমরা দেখলাম, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের শুরু হল। বিশাল সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের অর্থনীতির পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে উৎপাদনে বন্ধ্যাদশা দেখা দেওয়ার ফলে মানুষের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল করের বোঝা যার আদত ফল হল চরম শোষণমূলক সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি।

রোমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের নিপীড়ন ও প্রতিবাদের মধ্য থেকেই খুব সম্ভবত খ্রিস্টান ধর্ম বেড়ে উঠেছিল। এটা আদৌ কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, খ্রিস্টান ধর্ম ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের ঘিরে—কারণ তারাই ছিল তখন সবচেয়ে নিপীড়িত জাতি। যাইহোক, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পার্থিব শক্তির সঙ্গে কোনোরকম বোঝাপড়াকে অস্বীকার করতেন। খ্রিস্টান ধর্মের জনপ্রিয় আবেদনের মধ্যে ছিল বাইরে আত্মসমর্পণ এবং এর সঙ্গে নিপীড়ন আর পাপপূর্ণ সমাজে কোনো ভূমিকা না-নেওয়ার দৃঢ় মনোভাব—এই দুয়ের সমন্বয়। একারণে তাদের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায়, এই ধর্মের আবেদন ও শক্তি মানুষের মধ্যে অনেকটাই বেড়ে উঠেছিল। খুব শিগ্‌গিরই এটি আর নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেই শুধু আটকে থাকল না। এবং এর শিক্ষাও প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই চার্চ নিজেই এক অনড় নীতির পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়ে এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে রাজ্য শাসনের অংশীদার হয়ে ওঠে। খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের লোকেরা খ্রিস্টান ধর্মকে বহিরাগত, ঘৃণার্হ এবং নিপীড়ক সরকারের সঙ্গে এক করে দেখতে শুরু করেন।

যাইহোক এই নেতিবাচক ঘটনার পাশাপাশি শিগ্‌গিরই একটি ইতিবাচক ঘটনাও যুক্ত হয়েছিল—সপ্তম শতাব্দীতে এক নতুন ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব ও তার বিস্তার। ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মের গ্রহণযোগ্য দিকগুলো আত্মসাৎ করে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীর সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত সহজ কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত আচার-বিধির প্রণয়ন করে বিশ্বাসীদের মধ্যে এক বাস্তব স্বর্গের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির পথ দেখান। সুতরাং শিগ্‌গিরই ইসলাম সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সিরিয়া ও ইরাক থেকে আরবরা যখন ইসলামের বার্তা নিয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল দখলে প্রবৃত্ত হয় তখন তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের দিক থেকে খুব সামান্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

অচিরেই স্পেন থেকে ভারতবর্ষ—এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসলামের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ল, এবং এর ফলে ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিস্তৃত পথও খুলে গেল। ব্যবসার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও বাড়তে থাকল। যার ফলে বহু জিনিস, যেমন—ইস্পাত, কাগজ, সিল্ক, চীনামাটির উৎপাদনে নতুন নতুন কলাকৌশলের উদ্ভাবনও ঘটতে থাকল।

ততদিনে খ্রিস্টান ধর্ম একীভূত হয়েছে এক অবক্ষয়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে। তার ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ও আফ্রিকার পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা চলে যেতে থাকেন পারস্যের দিকে। কারণ পারস্য তখন শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এইসব মানুষের অধিকাংশই ছিলেন প্রচলিত ধর্মবিরোধী, তাঁরা গোঁড়া রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে মুসলমান খলিফার শাসনে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ করতেন। ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে একজন সিরীয় সন্ত, নেস্টর এবং তাঁর অনুগামীরা খ্রিস্টান অনুশাসনের বিরোধিতার কারণে শাস্তি পান। তাঁরা পালিয়ে যান পারস্যে, সেখানে সাসানীয় রাজারা এই শক্তিশালী সংস্কৃতির চর্চায় প্রবল উৎসাহ দান করছিলেন। একই কারণে, মিশরীয় সন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার উৎচেস (Eutyches) (৩৭৬-৪৫৪ খ্রিস্টাব্দ) আর তাঁর অনুগামীরাও খ্রিস্টীয় চার্চের চাপে পড়ে মিশর থেকে পারস্যে পালিয়ে যান। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় এই পণ্ডিতদ্বয়ের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পরবর্তী অংশে আমরা দেখব, কীভাবে আরব বিজ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে; এবং আরো দেখব, বিজ্ঞানের জগতে আরবদের অবদান কতখানি।

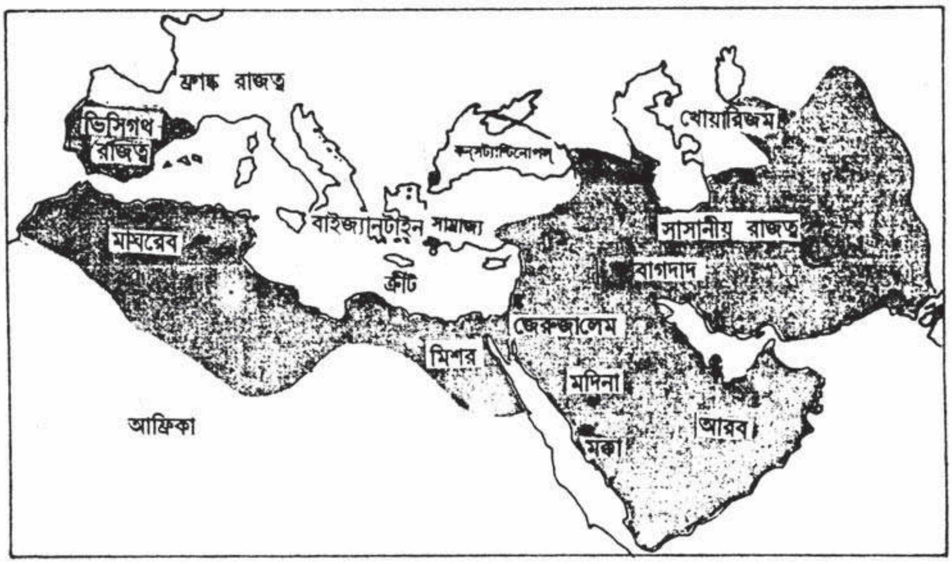

চিত্র ৫.১ : ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামধর্মের বিস্তার

৫.২.১ আরব বিজ্ঞান

এই আরব-কেন্দ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই নতুন শক্তিশালী সংস্কৃতির আলোকে গ্রীকদের ধ্রুপদী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরম্পরাকে পরীক্ষা করে দেখার ও বোঝার আগ্রহ। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত পুঁথিপত্র আরবদের হাতে পৌঁছানোর ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও তাঁদের ছিল প্রাচীনদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রবল আগ্রহ। মূল গ্রীক রচনার প্রতিস্তরের মধ্যে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। এইসব রচনা তাঁরা অনুবাদ করেছিলেন, অনুধাবন করেছিলেন এবং তাকে পরিবর্ধন করেছিলেন। খলিফা-আল্-মামুন 'দার-এল-হিক্‌মা' নামে একটি অনুবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে হুনাইন ইবন ইসাক ও তহবিত-ইবন খুরার মতো বিখ্যাত পণ্ডিতরা অ্যারিস্টটল ও টলেমির রচনাসমূহ এবং গ্রীকদের অন্যান্য বিজ্ঞানের ধ্রুপদী রচনাসমূহ আরবীয় ভাষায় অনূদিত করেন। অল্ মনসুর, হারুন-অল্-রসিদ, অল-মামুন এবং অল-মুতাওয়াখিল-এর মতো মহান খলিফারা এইসব পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়াও তাঁরা অনুবাদ করেছিলেন ভারতীয় চিকিৎসাসংক্রান্ত, শল্য চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী। এইসব আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল বণিক, পরিব্রাজক ও অল্ বিরুনীর (৯৭৩-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ) মতো পণ্ডিতদের ব্যাপক ভ্রমণের ফলে। সুদূর ভারত, চীন ও গ্রীস দেশের স্থানীয় কৃষ্টি থেকে তাঁরা আহরণ করেছিলেন এইসব জ্ঞান।

আশ্চর্যের বিষয় হল যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পুঁথিপত্রই শুধু অনুবাদের জন্যে নির্বাচন করা হত; ইতিহাস, নাটক বা কবিতা নয়। কয়েক শতাব্দী পরে, ইউরোপে যখন আরবী ভাষায় লেখা এই জ্ঞানের ভাণ্ডারে প্রবেশ করার চেষ্টা করল তখন তারা প্রায় সমস্ত পুরোনো সভ্যতার অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বইপত্র হাতে পেল। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিভাগের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর জন্যে ইউরোপকে ফিরে তাকাতে হল সরাসরি গ্রীক ও ল্যাটিন পুঁথিপত্রের দিকে।

স্থল ও জলপথে বাণিজ্য ছাড়াও আরব বিজ্ঞানের এই বাড়বাড়ন্তের আর একটি কারণ ছিল—এর ভাষার ব্যবহার অর্থাৎ রাজা থেকে দাসদের মধ্যে প্রচলিত একই ভাষায় এর চর্চা। এর ফলে সাধারণ কারুশিল্পী থেকে পণ্ডিতদের মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র বজায় থাকত—এই যোগসূত্র বিজ্ঞানের বিস্তারে অনেকাংশে সহায়তা করেছে।

আরব বিজ্ঞান ধ্রুপদী গ্রীক বিজ্ঞানের সঠিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এবং অন্যান্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ভাবনা-ধারণাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। তবুও মনে হয় এই পরম্পরাকে উন্নত করে তোলা বা বৈপ্লবিক রূপান্তরণের কোনো আকাঙ্ক্ষাই আর পরে দেখা যায়নি। আরবদের বিজ্ঞান চর্চার যুক্তিক্রম যা আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য তা অধ্যয়ন করলে স্তম্ভিত হতে হয়। অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস এবং গ্রীক বিজ্ঞান ও তার পুরোধাপুরুষ অ্যারিস্টটলের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন তাঁদের বিকাশের প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা ছিল তাঁদের বিজ্ঞানের প্রধানতম স্তম্ভ। জ্যোতিষশাস্ত্রই এদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এই জ্যোতিষশাস্ত্রই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গীয় ধারণার সঙ্গে ক্ষুদ্র জগতের মানবের যোগসূত্রের কাজ করেছিল। এই পর্যায়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে অল-কিন্দি, অল-রাজি, ইবন সিনা, অল-বিরুনী প্রভৃতি আরব বিজ্ঞানের মুখ্য পণ্ডিতবর্গ জ্যোতিষশাস্ত্র ও কিমিয়াবিদ্যার অলীক দাবিগুলি স্পষ্টভাবে নস্যাৎ করেছিলেন। ওপরে আমরা আরব বিজ্ঞানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছি। এর থেকে কিছু বাছাই প্রশ্নোত্তর তৈরি করা সম্ভব।

অনুশীলনী—১

নীচের দ্বিতীয় কলামে দেওয়া উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি আরব বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়তা অথবা বাধা দিয়েছিল? প্রথম ও দ্বিতীয় কলামে দেওয়া উপাদান ও কারণগুলির মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয়কারী রেখা যোগ করে দেখাতে হবে।

১	২
(ক) আরব বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়ক উপাদান।	১। গ্রীস, ভারত ও চীন-এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরম্পরাগুলোকে আরবরা আত্মস্থ করে নিতে চেয়েছিলেন।
	২। গ্রীকদের রচনা সম্পর্কে তাঁরা খুব বেশি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন।
	৩। আরবরা বহুদেশ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন এবং অসংখ্য তথ্য আহরণ করেছিলেন।
(খ) আরব বিজ্ঞানের বিকাশে বাধাসৃষ্টিকারী উপাদান।	৪। আরব বিজ্ঞানের চর্চা হত রাজা ও দাসদের মধ্যে যে একই ভাষা প্রচলিত ছিল তার সাহায্যে।
	৫। তাঁরা জ্যোতিষ, অ্যালকেমি বা কিমিয়াবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয়বাদী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি।
	৬। বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয়ে আরবরা ছিল খুবই যুক্তিসম্মত পদ্ধতির সমর্থক।

আমরা এখন বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, আলোকবিজ্ঞান ও রসায়নের ক্ষেত্রে আরবদের বিশেষ অবদানের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত

আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রীক পরম্পরাকেই ধরে রেখেছিলেন। কখনও কখনও ধর্মীয় হস্তক্ষেপ ঘটলেও তাঁরা টলেমির 'অ্যালমাজেস্ট' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও তাঁরা গ্রীকদের অনুসৃত পদ্ধতিতে কোনো নতুন মাত্রা যোগ করেননি তবুও যে-ধারা তাঁরা ধরে রেখেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানে তা এক অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে গণিতের বিকাশের প্রয়োজন। আরবরা ভারতীয় সংখ্যা-পদ্ধতিকে আত্মস্থ করেন এবং তার বহুল প্রচলন ঘটান। এমনকি গুদাম ঘরের কেরানি থেকে ব্যবসাদার পর্যন্ত, তাদের বাণিজ্য চালাবার কাজে এই সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার করত। সংখ্যাপদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার হিসাবরক্ষণের কাজকে যথেষ্ট সহজ-সরল করে দেয় এবং লেখার ক্ষেত্রে অক্ষরের প্রভাবের মতোই গণিতশাস্ত্রের ওপর এর প্রভাব দেখা যায়। আরবরা ভারতীয় বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি সংক্রান্ত রচনাবলী অনূদিত করেন এবং এইগুলি বহু ভৌত ও ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ভূগোল

আগেই আমরা দেখেছি যে আরবরা ছিলেন ভ্রমণপিপাসী জাতি। আরবীয় পণ্ডিতরা সুদূর রাশিয়া, মধ্য আফ্রিকা, ভারত ও চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁরা লিখে গেছেন যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য ও সুসংবদ্ধভাবে এবং বহু মানচিত্র ও নকশা তাঁরা তৈরি করে গেছেন। তাঁদের ভূগোল শুধু বর্ণনামূলক নয় বরং আয়তন ও পরিমাপের সম্পর্কেও একটা ভালো ধারণা সেখানে থাকত। এই পদ্ধতির ফলেই তাঁরা এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আধুনিক ভূগোলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

চিত্র ৫.২ : আরবদের দ্বারা কৃত পৃথিবীর মানচিত্র

বিজ্ঞানসম্মত রসায়ন

আরবীয় চিকিৎসক, সুগন্ধ প্রস্তুতকারক ও ধাতুবিদ্রা সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন রসায়নে। এর প্রধান কারণ হল, আরব পণ্ডিতরা তাদের পূর্বসূরী গ্রীকদের মতো কখনোই পরীক্ষাগারে কাজ করার

ব্যাপারে—যেমন ঔষধ, লবণ বা মূল্যবান ধাতব পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করায়—পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এব্যাপারে আরবরা ছিলেন মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় পরম্পরার ধারক এবং তাঁরা ভারতীয় ও চৈনিক সূত্র থেকেও প্রভূত জ্ঞানার্জন করেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁদের নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান যুক্ত করে তৈরি হয়েছিল বিজ্ঞানসম্মত রসায়নের প্রথম বিবরণ।

আরব রসায়নবিদ্‌রা প্রাচীন পাতন-যন্ত্রপাতির বিশাল প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছিলেন এবং বেশি মাত্রায় সুগন্ধি উৎপাদনে এর ব্যবহার শুরু করেন। সোডা, ফটকিরি, তুঁতে (লৌহের সালফেট), শোরা ও অন্যান্য লবণও তাঁরা বেশি মাত্রায় উৎপাদন শুরু করেন। এসব বস্তুর রপ্তানি ছাড়াও বিশেষত বস্ত্রশিল্পে ব্যাপক ব্যবহার ছিল। যখন তাঁরা কোনো নতুন কৌশল বা প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করার চেষ্টা করতেন সে-সময়ে যে বিক্রিয়া তাঁদের প্রক্রিয়াকে সম্ভব করে তুলতে সাহায্য করত সেই বিক্রিয়াটি পুরোপুরি না বুঝে বিরত হতেন না। আরব রসায়নবিদ্‌রাই বিক্রিয়ার সময় দুটি বিক্রিয়কের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রকৃতিকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এই প্রথম রাসায়নিক পরিবর্তনের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হল যা হয়ে উঠেছিল আধুনিক রসায়নের ভিত্তি।

ঔষধ

ওষুধের ক্ষেত্রেও আরবরা গ্রীক পরম্পরাকেই রক্ষা করেছিলেন এবং এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল নতুন ধরনের রোগ ও ওষুধের সম্পর্কে জ্ঞান; আর এটি সম্ভব হয়েছিল বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলে ইসলামের বিস্তারের ফলে। শুধু মুসলমান চিকিৎসাবিদ্‌রা নয়, ইহুদি চিকিৎসকরাও বহু ধরনের ব্যাধি সম্পর্কে চর্চা করেছিলেন। স্বাস্থ্য চর্চায় আবহাওয়া, স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্যাখাদ্য প্রশ্নের ব্যাপারেও তাঁরা নিজেদের ওয়াকিবহাল করে তুলেছিলেন। এমনকি তাঁরা ব্যবহারিক রন্ধন শিল্পের দিকেও নজর দিয়েছিলেন।

আলোকবিদ্যা

মরু অঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ম দেশের চক্ষু রোগের প্রাদুর্ভাবকে ঠেকাবার উদ্দেশ্যেই আরব চিকিৎসকরা চক্ষু সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণের জন্য সচেষ্ট হন। আবার চোখের শল্যচিকিৎসার কারণেই তাঁরা চোখের গঠন-

চিত্র ৫.৩ : অল্-বিরুনীর গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সীজারীয় ছেদনের প্রাচীনতম নিদর্শন

সংক্রান্ত ব্যাপারে জানা-বোঝায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আরব চিকিৎসকরা এই প্রথম প্রকৃতার্থেই প্রতিসরণ সংক্রান্ত আলোকবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ আলোকবিদ্যার যে-অংশ কাচের লেন্সের মতো স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে দিয়ে আলোর গমন বিষয়ে আলোচনা করে—সে সম্পর্কে। এমনকি এই জ্ঞানই আধুনিক আলোকবিদ্যার জনক। বিশেষত বয়োবৃদ্ধদের পড়াশুনার সময়, অথবা বিবর্ধক হিসাবে স্ফটিক বা কাচের লেনস্-এর সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে চোখের লেন্সের জ্ঞানই সর্বপ্রথম পথ দেখায়। ইবন্-অল্-হৈথাম (আনুমানিক ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর 'আলোকীয় তথ্যভাণ্ডার' এই বিষয়ে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা গ্রন্থ।

অনুশীলনী—২

বিজ্ঞানের বিকাশে আরবদের সম্পর্কে নীচে দেওয়া বাক্যগুলির কোন্ তিনটি ঠিক? ঠিক বাক্যটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) সংখ্যা-পদ্ধতির ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলা।

(খ) বারুদের আবিষ্কার।

(গ) এই প্রথম যুক্তিগ্রাহ্যভাবে রসায়নশাস্ত্রকে দেখা; বেশিমাত্রায় লবণের উৎপাদন শুরু।

(ঘ) সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের নকশা তৈরি করা।

(ঙ) চক্ষু-বিজ্ঞানে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতির ব্যবহার।

আরব বিজ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে এ পর্যন্ত দেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাদের গুরুত্ব ও বিস্তারের আভাসমাত্র। পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের হাতে পড়ে অধঃপতনের দশা থেকে গ্রীক বিজ্ঞানকে আরব পণ্ডিতরা মুক্ত করেন। তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন এক জীবন্ত ও বিকাশশীল বিজ্ঞানের। পারস্য, ভারত ও চীন-এর অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা গ্রীক গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রকে সংকীর্ণ ভিত্তি থেকে সরিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁরা বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির প্রক্রিয়ার বিকাশও ঘটিয়েছিলেন এবং চক্ষু সংক্রান্ত আলোকবিদ্যা ও বিজ্ঞানসম্মত রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আর এই বিকাশের ধারা চলেছিল খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এবং তারপর থেকে, আমরা দেখতে পাই, আরব বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটল। ঐ সময়ে তাদের মধ্যে ছিলেন ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন বিজ্ঞানী যেমন আভেরস (আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) ও ইবন খালদুন (আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী)। যাইহোক, সেই জীবন্ত ও বিস্তৃত বিজ্ঞানের আন্দোলনের আর অস্তিত্ব ছিল না। এখন আমরা বোঝবার চেষ্টা করব যে কেন আরব সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটেছিল যার ফলাফল হিসেবে আরব বিজ্ঞানও ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ল।

৫.২.২ আরব বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অবক্ষয়

রাজা, ধনী ব্যবসায়ী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযুক্তি প্রথমদিকে ফলপ্রসূ হলেও শেষপর্যন্ত তা আরব বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে। এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে যেমন

বিজ্ঞানের নানা শাখার ওপর অনুবাদ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ আর সুগভীর আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, তেমনি, আবার, এই একই কারণে আরব বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় মানুষের—অর্থাৎ মানুষ সন্দেহ করতে শুরু করেছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর লোকদের পরামর্শদাতা এই শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আসলে কোনো কাজের নয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই ধর্মীয় উন্মাদনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল; আর রাজকীয় শক্তিই হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের ভাগ্যনিয়ন্তা। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে, বাইজানটাইন ও ইসলামীয় সাম্রাজ্যগুলি ভেতরে ভেতরে ভাঙতে শুরু করে এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে স্থানীয় শাসকদের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ধর্মযুদ্ধের সময়ে (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি) সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে গিয়ে স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হয় যেখানে অধীনস্থ কৃষক ও কারিগরদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের কবলে পড়তে হয়। ফলে শিল্পের বাজার এবং উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। অবক্ষয় ও অচলাবস্থায় এই সময়ে স্তেপ অঞ্চল থেকে নতুন বর্বর জাতির আগমন ঘটে। তারা সারা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং আরব সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করে।

চার্চের পুনরুত্থান এবং ধর্মচর্চার প্রাধান্যের ফলস্বরূপ বিভিন্ন রাজার নেতৃত্বে সাতটি ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলির উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং অন্যান্য রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করানো।

আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুত্থান এবং ধ্রুপদী যুগে গ্রীস, ভারত ও কিছুটা চীনের, উন্নয়নের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রক্ষা করাই ছিল আরব বিজ্ঞানের মূল কৃতিত্ব। একথা আমরা সবাই জানি যে, ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের পর ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। আরবরা যে ধ্রুপদী বিজ্ঞানের বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল রেনেসাঁ যুগ সেই বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল এবং এইভাবেই সূচনা হয়েছিল এক নবযুগের যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এই ভূমিকায় ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ষষ্ঠ এককে।

৫.৩ মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এবার আমরা দেখব, মধ্যযুগের ভারতে কী ঘটেছিল। ৫.২.১ অনুচ্ছেদে পড়া গেছে, ভারত ভ্রমণকালে অল-বিরুনী (খ্রিস্টাব্দ ৯৭৩-১০৪৮) ব্যাপকভাবে ভারত পরিক্রমা করেন। ভারতীয়দের সমাজজীবন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কেও তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর লেখা থেকে ভারত সম্পর্কে আমরা বহু মূল্যবান তথ্য পাই। তিনি তাঁর রচনায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পূর্বতন যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নয়নের উল্লেখও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতের অবদান এবং আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের কাজের সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি লিখে গেছেন—যা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি চতুর্থ অধ্যায়ে। অল্ বিরুনীর মতে, ভারতীয়রা কনৌজ, থানেশ্বর ও শ্রীনগরের (কাশ্মীর) অক্ষাংশ বার করার চেষ্টা করেছিলেন। টলেমি নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্থানের গ্রহণের সময়ের ওপর ভিত্তি করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হত। উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়েই তাদের মূল মধ্যরেখাটি গিয়েছিল।

অল্-বিরুনী দেখিয়েছিলেন যে, পদার্থ সম্পর্কে ভারতীয় ধ্যানধারণা গ্রীকদের অনুরূপ ছিল ৩.৪ পরিচ্ছেদে এ-সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁর মতে বিজ্ঞানের জগতে ভারতের সবচেয়ে বড় অবদান—দশমিক-এর ধারণার প্রবর্তন। সংখ্যার জন্য যেসব চিহ্ন ভারতীয়রা ব্যবহার করতেন পরবর্তীকালে তা আরবীয় ও বর্তমানকালে তা আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবস্থার উৎস।

অল্-বিরুনী শুধু পদার্থের বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বিচারবিশ্লেষণ করে পদার্থের স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করতেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞান অবক্ষয়ের মুখে এবং আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘আমাদের সময়ে নববিজ্ঞানের সূচনা অথবা নতুন ধরনের গবেষণার ব্যাপারটা একবারেই অসম্ভব। এখন বিজ্ঞানের নামে যা কিছু আছে তা হল সুবর্ণযুগের ফেলে আসা দিনের চিহ্ন মাত্র’। এই অবস্থার জন্য তিনি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবকেই দায়ী করেছেন। ঘটনাক্রমে এই ব্যাপারটাই ভারতীয় বিজ্ঞানের অভিজাত চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। শুধু গুটিকয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হিসেবেই বিজ্ঞানচর্চার সীমা বাঁধা ছিল। জনজীবন অথবা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্কই আর ছিল না। অবশ্য ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

ইসলাম যখন ভারতে প্রবেশ করে সে-সময় ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ প্রায় অস্তমিত। যুক্তিগ্রাহ্য দর্শনের বিরুদ্ধে আল ঘজালির অতীন্দ্রিয়বাদ কঠিন প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। তাহলেও এই আরব বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছিল গ্রীক সভ্যতা, চীন ও ভারতের বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহ থেকে। এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল বিস্তৃত আরব সভ্যতার ভেতর থেকে গ্রহণ করা বহু নিত্যনতুন পরিবর্তনের ধারা। দিল্লিতে সুলতানী সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় পারসিক ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ফলে, এই সমগ্র জ্ঞান ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞানের উন্নয়নে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

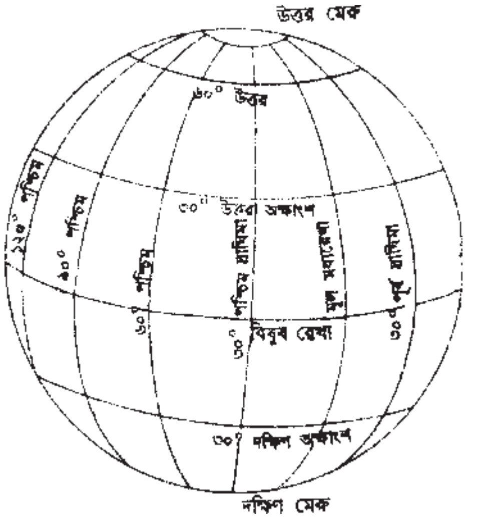

চিত্র ৫.৪ : মধ্যরেখা হল এমন একটি কাল্পনিক বৃত্ত যা পৃথিবীর দুটি মেরুর মধ্য দিয়ে গিয়ে পৃথিবীকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করে। ১২টি মধ্যরেখা সমদূরত্বে অবস্থিত হয়ে পৃথিবীকে ২৪টি সমান অংশে ভাগ করে। প্রত্যেকটি অংশ মেরুদুটিকে স্পর্শ করে তার নিকটবর্তী অংশের সঙ্গে ১৫° কোণ করে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী প্রথম এবং প্রধান মধ্যরেখা ইংল্যান্ডের গ্রীনউইচের মধ্য দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। এই প্রধান মধ্যরেখা এবং অন্য যে-কোনো স্থানের মধ্য দিয়ে যে মধ্যরেখা গেছে তাদের মধ্যের কোণ দুটির মধ্যের ক্ষুদ্রতরটিকে সেই স্থানের দ্রাঘিমাংশ বলা হয়। পৃথিবীর উপর যে-কোনো স্থানের দ্রাঘিমাংশ গ্রীনউইচের সাপেক্ষে পূর্ব বা পশ্চিমে, যেদিকে ক্ষুদ্রতর কোণ তৈরি হয় সেই অনুযায়ী মাপা হয়। বিষুবরেখার সমান্তরাল করে পৃথিবীপৃষ্ঠে আঁকা রেখাগুলিই সমান্তরাল অক্ষাংশ। অক্ষাংশ বিষুবরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে কোণ নির্দেশ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে-কোনো স্থানের অবস্থান অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

৫.৩.১ বিজ্ঞানের অবদান

কিছু সময় ধরে কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান ও নিত্যনতুন আগন্তুকদের দ্বারা বাহিত বিজ্ঞানের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান চলেছিল। যাইহোক, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান দিল্লির সুলতান এবং মুঘল সম্রাট ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সহজেই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এবার আমরা মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান বিষয়ে আলোচনা করব।

জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞান

কেবল দিনপঞ্জিকা তৈরি, গ্রহণের দিনক্ষণ দেখা অথবা সময় নির্ধারণের জন্যই জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। জ্যোতিষ বিদ্যায় কোষ্ঠী রচনার জন্যও একে কাজে লাগানো হত। মক্কার সঠিক দিক নির্ধারণ করে, মসজিদগুলিকে ঠিকমতো বসানোর জন্যও প্রয়োজন ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান। আমরা দেখতে পাই, ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রিস্টাব্দ) একটি মানমন্দির নির্মাণ করান যেখানে এক বিশেষ ধরনের **অ্যাস্ট্রোলেব** (astrolabe) যন্ত্র ও জল-ঘড়ির সাক্ষাৎ মেলে। জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি শাসকবর্গের আকর্ষণ মুঘল যুগেও অব্যাহত ছিল। জ্যোতির্বিদ নিয়োগ করে তাদের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ করার জন্য হুমায়ুন যথেষ্ট খ্যাত ছিলেন।

(ক)

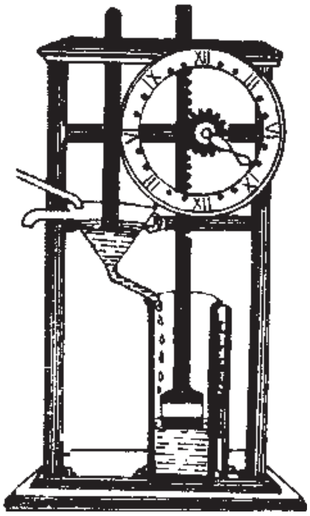

(খ)

চিত্র ৫.৫ : (ক) অ্যাস্ট্রোলেব : চিত্রে ১০ থেকে ২৫ সেমি ব্যাসের ছোট বহনযোগ্য ধাতব চক্রাকৃতি অ্যাস্ট্রোলেবের অংশাঙ্কিত বেড়টি সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে। (খ) জলঘড়ি : বেলনাকৃতি পাত্রের মধ্যে জল পড়ার ফলে ভাসমান পিস্টন উপরে ওঠে এবং কাঁটাটি ঘুরে ডায়ালের উপর সময় দেখায়।

সপ্তম শতাব্দীর ভারতে নির্মিত অ্যাস্ট্রোলেবগুলি যে ধাতু, কাষ্ঠ ও গাণিতিক শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও সঠিক বৃত্তীয় ক্রমাঙ্কনের সূক্ষ্মতায় যে উন্নতি হয়, পরিমাপন পদ্ধতিতে তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-র পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজা জয়সিংহ দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী, মথুরা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে মানমন্দির স্থাপন করেন। মানমন্দিরের যন্ত্রপাতির দিকেও তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অক্ষাংশ নির্ধারণ ও সময় স্থির করার জন্য বিশালাকৃতি পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র নির্মাণ করা। মোটামুটি সঠিক জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত সারণী সংকলনে, দিন পঞ্জিকার ভ্রম সংশোধনে এবং গ্রহণ সম্পর্কে অনেকটা সঠিক পূর্বাভাস দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। জয়সিংহ-র জ্যোতির্বিদ্যার সারণী 'জিজ-এ মুহম্মদ শাহী' 'জিজ-এ উলুঘ বেগ'-এর কাছে যথেষ্ট ঋণী হলেও, তার মূল হিসাব ও সংখ্যাগুলি ছিল একেবারেই আলাদা। এতদ্‌সত্ত্বেও জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্বের ক্ষেত্রে টলেমীয় পদ্ধতির বাইরে নতুন কোনো অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। কোষ্ঠী বিচার ও জ্যোতিষবিজ্ঞানই এই ধারার এক বিচ্যুতি বলে মনে হয়।

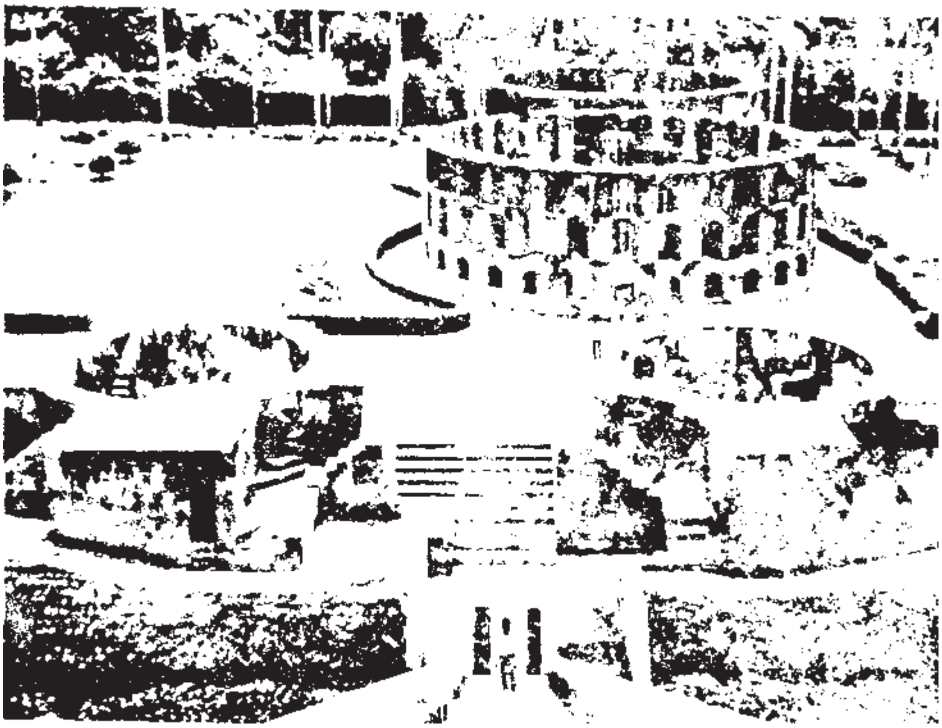

চিত্র ৫.৬ : রাম যন্ত্র একটি বেলনাকৃতি অ্যাস্ট্রোলেব এবং জয়প্রকাশ (ডানদিকে), যন্তর মন্তর, দিল্লি।

ধ্রুপদী উৎসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আপেক্ষিক গুরুত্ব ও গতিবিদ্যার সূত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয়ের আভাষ, আবুল ফজলের লেখায়ও বিদ্যমান। আইন-এ আকবরী (১৫৯৫ সালে বইটির কাজ সমাপ্ত হয়) গ্রন্থের একটি গোটা অধ্যায় জুড়ে এ বিষয়ে আলোচনা সেই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর লেখা থেকে মনে হয়, আর্কিমিদিসের সূত্র এবং বাতাসে ও জলের মধ্যে বস্তুর ওজনের পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বিভিন্ন পদার্থের আণবিক গঠন-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান ও আপেক্ষিক গুরুত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। অল্-বিরুনীর তৈরি বিভিন্ন ধাতু ও মূল্যবান পাথরের আপেক্ষিক

গুরুত্বের একটি সারণী তিনি পুনর্গঠন করেন। আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপ করার এই ব্যাপারটি বাস্তবে কাজে লাগে যখন দেখি আকবর এর সাহায্যে কাঠের গুণাগুণ নির্ধারণ করাচ্ছেন। আবুল ফজল তাঁর বইটিতে বাহাত্তর রকম কাঠের আপেক্ষিক গুরুত্বের একটি সারণীও লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভূগোল

এই সময় বিজ্ঞানের অন্য একটি শাখা—ভূগোলবিদ্যায়ও উন্নতি সংঘটিত হয়। অ্যাস্ট্রোলেবের সাহায্যে অনেক সঠিকভাবে অক্ষাংশ নির্ধারণ করা যেত। মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সাদিক ইসপাহানী বিশ্বমানচিত্র সমন্বিত বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ এক বিশাল কোষগ্রন্থ নির্মাণ করেন। গ্রন্থটিতে তিনি যেসব মানচিত্র প্রস্তুত করেন, বিশেষত ভারতের, সেগুলি ভারতকে উপদ্বীপ হিসেবে ও এর সর্বদক্ষিণে শ্রীলঙ্কার অবস্থান প্রায় সঠিকভাবে দেখায়। নদনদী সম্পর্কে অবশ্য খুব কম তথ্যই বইটিতে আছে। ভারতের ক্ষেত্রে শুধু গঙ্গা ও যমুনা নদী দুটি চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে নদী দুটির গতিপথ প্রায় সঠিক বলা যায় যা সমসাময়িক ভারতের ইউরোপীয় মানচিত্রে অনুপস্থিত। তিনি মানচিত্রে প্রাকৃতিক গঠন চিহ্নিত করেছেন। ঢেউখেলানো রেখার সাহায্যে পর্বতমালা এবং নানারকম রঙের সাহায্যে নদী ও মহাসাগর দেখিয়েছেন। তবে, সাদিক যাত্রাপথ দেখানোর কোনো চেষ্টাই করেননি—১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যেটি ইউরোপে প্রথম শুরু হয়। এই সময় ভারত নতুন আবিষ্কৃত পৃথিবী (আমেরিকা) সম্বন্ধেও অবগত ছিল। আবুল ফজল তার আইন-এ আকবরী গ্রন্থে এই নতুন ভূখণ্ড সম্বন্ধে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন।

রসায়ন

ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের চিহ্ন চোখে পড়ে। ষষ্ঠদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার কিছু আগেই যে-পদ্ধতিতে দস্তাকে পৃথক করা হত, তার সঙ্গে আরব সভ্যতার পরিচয় ছিল না, আর ইউরোপীয়রা মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পদ্ধতির সন্ধান পায়। রাজস্থানের জওয়ার অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে, ভারতীয়রা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই দস্তা পৃথক করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিল। চীনে এই পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে নবম শতাব্দীতে।

চিত্র ৫.৭ : রাজস্থানের জওয়ার অঞ্চলে পাওয়া একটি দস্তা পাতনের চুল্লীর প্রস্থচ্ছেদ

দস্তা-পৃথকীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল পিতল তৈরি করা। পিতল হল দস্তা ও তামার মিশ্রণে তৈরি একটি সংকর ধাতু। বিভিন্ন ধরনের পিতল প্রস্তুতের জন্যে তিনরকম অনুপাতে দস্তা ও তামার মিশ্রণের কথা আবুল ফজলের লেখায় পাওয়া যায়।

আরবদের কাছ থেকে শেখা তামা ও পিতলে টিনের প্রলেপ লাগানোর বিদ্যাটি মধ্যযুগের ভারতে চালু ছিল। ফলে এই সময়ে তামার পাত্রের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ঝালাইয়ের কাজে, বিশেষত অকীক, স্ফটিক ও ভঙ্গুর পদার্থের ওপর সোনার ঝালাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করা হত যা ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রভূত প্রশংসা লাভ করে।

মনে হয়, ইউরোপের আগেই ভারতে হিমায়ন-মিশ্রণ আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের আগেই জল ঠান্ডা করার কাজে শোরা বা পটাশিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হত—সম্রাট আকবর এই আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

যদিও অভিজাতবর্গরা চিকিৎসক ও শল্য-চিকিৎসক উভয়েরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তবুও শল্য-চিকিৎসকরা সম্ভবত চিকিৎসকদের মতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না।

ভারতে এখনও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত গ্রীক (ইউনানী) পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা মুসলমানদের সঙ্গে এদেশে আসে। আশা করা হয়েছিল যে, এই পদ্ধতি ও ভারতে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদানের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু, এই দুই পদ্ধতি বিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। মিয়াঁ বেহোয়া (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) 'তিব্বি-এ সিকন্দর শাহী' নামে আয়ুর্বেদের নানা উৎসের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সমন্বিত এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জাহাঙ্গীরের প্রিয় শল্যচিকিৎসক মুকার্‌রব খান এই গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করেন চিকিৎসাসংক্রান্ত তাঁর দুটি পদ্ধতিতে।

একই সঙ্গে এই দুটি পদ্ধতির ধারাই অব্যাহত ছিল—এবং সম্ভবত তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আদান-প্রদান ছিল না। সম্রাট ও অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিবর্গ হাকিম ও বৈদ্য—এই উভয় শ্রেণীরই নিয়োগকর্তা ছিলেন। আকবরের রাজসভার চিকিৎসকদের একটি তালিকায় দেখা যায় চারজন বৈদ্যর নাম—অর্থাৎ যাঁরা আয়ুর্বেদ চর্চা করতেন।

শল্যচিকিৎসায় রক্ত মোক্ষণ এবং অস্থিবিদ্যায় স্থানচ্যুত হাড়ের যথাযথ প্রতিস্থাপনের কাজ ছিল সাধারণ চর্চার অন্তর্গত। শোনা যায় কাঙ্গারার শল্যবিদরা নাকি কাটা-নাকের চিকিৎসা করতেন। তাঁরা দেহের অন্য অংশের চামড়া দ্বারা কৃত্রিম নাক তৈরি করতে পারতেন। যাইহোক, তৎকালীন রেনেসাঁ যুগের ইউরোপের তুলনায় অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা বা শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে সুসংবদ্ধ গবেষণার কোনো গুরুত্বই এদেশে দেওয়া হয়নি। নেহাতই অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যেমন প্লেগের বিস্তার ইঁদুরের মাধ্যমেই ঘটে।

জনসাধারণের প্রিয় চিকিৎসকরা একটি আশ্চর্যজনক কৌশলের অবতারণা করেন যেটি হল গুটি বসন্তের টীকা দেওয়া। এই রোগটি মনে হয় সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও ভারতে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়েছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই পদ্ধতিটি কিন্তু খুব নিরাপদ ছিল না।

মুঘল অভিজাতরা ইউরোপীয়দেরও চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করতেন। তবে তাঁদের চিকিৎসাসংক্রান্ত জ্ঞান কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দানিশমন্ড খান (খ্রিস্টাব্দ ১৬৬০-এর সময়ের এক মুঘল অভিজাত) ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের কাছে হার্ভের আবিষ্কৃত রক্তসঞ্চালন তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বার্ণিয়ে একটি ভেড়ার অঙ্গাব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসা বা ওষুধসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় পন্ডিত বা জ্ঞানীদের এই ধরনের আগ্রহের ঘটনা বিরল। এমনকি দানিশমন্ড-এর আদেশে অনূদিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাসমূহও খুব বেশি স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে পাই, মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশের ধারা অত্যন্ত ধীরগতির। ইউরোপের বিজ্ঞানের অগ্রগতির কোনো প্রতিক্রিয়াই এদেশে ঘটেনি। ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে বোঝার চেষ্টার অভাবের যথেষ্ট প্রমাণও দেখা যায়; টমাস রো-এর সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপহার দেওয়া একটি মানচিত্র সম্রাট আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের সভাসদরা কেউই তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেননি। এই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন কারণ সে-সময় প্রায় সারাদেশেই ইউরোপীয় বণিক, পুরোহিত, ভ্রমণকারী ও চিকিৎসকদের দেখা পাওয়া যেত।

এর একটা সম্ভাব্য কারণ হল লেখাপড়ার সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি অর্থাৎ পড়াশুনো ব্যাপারটাই সীমাবদ্ধ ছিল ছোট্ট বিশেষ শিরোমণি সম্প্রদায়ের হাতে। এরও আবার কারণ ছিল ছাপা বইপত্রের অনুপস্থিতি। ভারতে ছাপাখানার প্রচলন করেছিল পর্তুগিজরা। যদিও ছাপা সম্পর্কে তাদের শৈল্পিক জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত এবং যে-সব বইপত্র তারা ছাপত তার গুণমানও খুব উঁচুস্তরের ছিল না। ফলে মুঘল দরবার ও অভিজাতদের দ্বারা সেগুলি প্রশংসিত হয়নি। বইপত্র আবার ধনীদের কাছে সহজপ্রাপ্য হওয়ায় তাঁরাই সুবিধা ভোগ করতেন। আর এসবের ফলেই জ্ঞানের প্রসারের পথ রুদ্ধ হয়েছিল।

অনুশীলনী—৩

নিচের জায়গায় মধ্যযুগের ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি করে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

এ পর্যন্ত আমরা বিজ্ঞানের উন্নতির কথা বর্ণনা করেছি। এবার আমরা দেখব মধ্যযুগে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কী কী নতুন উদ্ভাবন ও পরিবর্তন হয়েছিল।

৫.৩.২ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে ভারতে এক অসামান্য উন্নতি ও পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলি প্রধানত বহির্জগতের পরিব্যাপ্তির ফল হলেও কোনো কোনো প্রয়োগ-বিদ্যার উদ্ভাবন এই ভারতেই ঘটেছিল। বাইরের থেকে এই পরিব্যাপ্তি প্রমাণ করে যে, কারিগরি যন্ত্রপাতির অনুকরণ, প্রয়োগ ও বিকশিত করার প্রস্তুতি ও সামর্থ্য ভারতে ছিল। সামগ্রিকভাবে মনে হয় যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি।

এখন আমরা মধ্যযুগের ভারতে আবিষ্কার বা উন্নতিসাধন ঘটেছে এমন কয়েকটি যন্ত্রের বর্ণনা দেব।

গিয়ার

গিয়ারের সাহায্যে অনুভূমিক বা অভিলম্ব গতিকে যথাক্রমে অভিলম্ব বা অনুভূমিক গতিতে রূপান্তরিত এবং গতিকে ত্বরান্বিত ও মন্দায়িত করা যায় (চিত্র ৫.৮)। সমান্তরাল খাঁজওয়ালা গিয়ার প্রাচীন ভারতেই উদ্ভূত হয়েছিল। খুব সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই কাম্পুচিয়া এটি ভারত থেকে পেয়েছিল। এই সমান্তরাল গিয়ার মধ্যযুগে কাঠের তৈরি তুলো থেকে বীজ ছাড়াবার যন্ত্রে ও কাঠের রোলার যুক্ত চিনি কলে ব্যবহৃত হত।

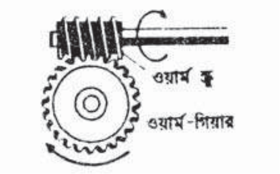

চিত্র ৫.৮ : ওয়ার্ম-গিয়ারে একটি ছোট ঘূর্ণায়মান স্ক্রু-এর দাঁতগুলি অন্য একটি প্যাঁচানো ওয়ার্ম-গিয়ারের খাঁজের মধ্যে চলাচল করে।

জল উত্তোলনের এক উন্নত যন্ত্র সাকিয়া বা পারস্য চক্রের সঙ্গে সমকোণী পিন-ড্রাম গিয়ার আরব জগৎ থেকে ভারতে এসেছিল। ভারতে অবশ্য আগেই জল উত্তোলক কল ঘির্ণি (পুলি ব্যবস্থা) ও পাত্রের মালা-যুক্ত অরঘট্ট ছিল। অরঘট্টয় পিন ড্রাম গিয়ার ব্যবহার করে একে পারস্য চক্রে পরিণত করা হত এবং এই চক্র গো-শক্তির সাহায্যে গভীর স্তর থেকে অবিরাম জল তুলতে সাহায্য করত। গিয়ার চক্র ও দণ্ড কাঠের তৈরি ছিল। খাড়া পিন চক্রের খাঁজে খাঁজে একটি অনুভূমিক পিন ড্রাম বসিয়ে গো-শক্তির সাহায্যে তাকে ঘোরানো হত। পারস্য চক্রের ব্যবহার পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই ব্যাপক হারে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতে শুরু হয়েছিল। এটি জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল এবং সম্ভবত এর ফলে, ঐ অঞ্চলে কৃষির বিস্তার ঘটেছিল।

বেল্ট্-ড্রাইভ্

শক্তি-সঞ্চালন ও গতিবেগ হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য গিয়ার অপেক্ষা বেল্ট-ড্রাইভ্ অনেক সরল যন্ত্র (চিত্র ৫.৯)। বেল্ট-ড্রাইভ্ সুতা কাটার চরকার আকারে ভারতে আসে এবং চরকায় সুতা কাটার গতি প্রায় ছ'গুণ দ্রুততর করে। এটি নিশ্চয়ই সুতা ও কাপড়ের মূল্য হ্রাস ঘটিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে চরকার অন্যান্য উন্নতিসাধনের মধ্যে ছিল ক্র্যাংক্ হাতল যুক্ত করা। আবার সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই হীরা কাটার তুরপুন যন্ত্রেও বেল্ট-ড্রাইভ ব্যবহৃত হত।

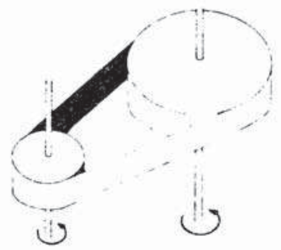
চিত্র ৫.৯ : চরকা, বাড়ির সেলাই মেশিন এবং গাড়ির ইঞ্জিনের পাখায় ব্যবহৃত বেল্ট-ড্রাইভ্।

বয়ন-শিল্প

পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি অভিধান থেকে বয়নশিল্পের উন্নতির একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায়—এখানে গতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত তাঁতের পা-দানির বর্ণনা আছে। তাঁতে পা-দানি যোগ করার ফলে তাঁতি পায়ের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে ফ্রেমের মধ্যে আটকানো ব-শলাকাগুলিকে ওপরে তুলতে পারত। এর ফলে তার মুক্ত হাত মাকুকে এদিক-ওদিক চালাতে পারত (চিত্র ৫.১০ খ)। এতে বুননের হার দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেল। সপ্তদশ

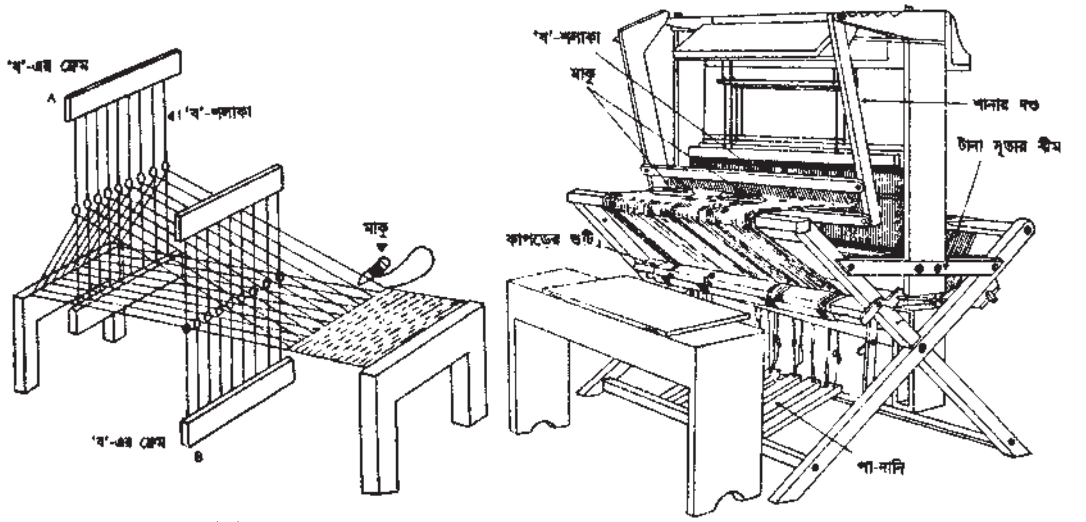

(ক) (খ)

চিত্র ৫.১০ : (ক) একটি সরল তাঁত। 'ব'-এর ফ্রেম A যখন তোলা হয় তখন মাকু তার সঙ্গে যুক্ত টানা সুতোর তলা দিয়ে এবং B ফ্রেমের সঙ্গে যুক্ত টানা সুতোর উপর দিয়ে যায়। (খ) পদচালিত তাঁতে টানা সুতাগুলি একটি বেলনাকার দণ্ডে গুটানো থাকে। প্রতিটি সুতা 'ব' নামের একটি উল্লম্ব শলাকার ছিদ্র দিয়ে যায়। একটি অন্তর একটি ব-শলাকা আলাদা ফ্রেমের সঙ্গে যোগ করা থাকে। যখন একটি ব-এর ফ্রেম তোলা হয় ও অন্যটি নামানো হয় তখন টানা সুতাগুলি দুভাগ হয় এবং তাদের ফাঁকের মধ্য দিয়ে মাকুটি পড়েনের সুতা টেনে নিয়ে যায়। ফ্রেম দুটি অবস্থান বিনিময় করলে আবার ফাঁকা সৃষ্টি হয় এবং মাকুটি আবার তার মধ্য দিয়ে চলে যায়। বুনুনিটি শানার সাহায্যে আঁট করা হয় এবং বোনা কাপড়টি গুটির উপর জড়িয়ে রাখা হয়।

শতাব্দীর মধ্যেই রঙীন নকশা-যুক্ত রঞ্জনের কাজে দুটি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হত। এর একটি হল রঙকে (নকশায়) সীমাবদ্ধ করার জন্য রাসায়নিক ক্রিয়া-রোধী প্রলেপের ব্যবহার এবং দ্বিতীয়টি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে রঙ করার জন্য রঞ্জককে আটকে রাখা। সম্ভবত এই শতাব্দীতেই ভারতে সময়সংক্ষেপকারী ব্লক মুদ্রণ সাধারণ রঞ্জন অপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কাগজ উৎপাদন

একাদশ শতাব্দীর আগে ভারতে কাগজ ব্যবহার হত না। প্রথম শতাব্দীতে চীনাদের এই আবিষ্কার মূলত ঘোরীয় যুদ্ধ-বিজয়ীদের মাধ্যমে ভারতে এসেছিল। একবার এর ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটার পর থেকেই এর উৎপাদন দ্রুত বিস্তৃত হয়; চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাগজ এত সুলভ হয়ে পড়ে যে শুধু লেখার জন্যই নয়, মিষ্টান্ন বিক্রেতারা মোড়কের কাজেও কাগজ ব্যবহার করতে থাকে।

পাতন

ভারত মদ চোলাই করার বিশেষ জ্ঞানও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাভ করে। যদিও বিখ্যাত ভারতীয় রসায়নবিদ্ পি. সি. রায় (১৮৬১-১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং সাম্প্রতিককালে অলচিনেরা (the Allchins) ও নিড্হ্যাম, প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যুক্তি সহযোগে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতে মদ চোলাইয়ের কাজ জানা ছিল, তবে বকযন্ত্রগুলি মনে হয় ছোট ও অনুপযুক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই মদ এবং গোলাপ জল তৈরির জন্যে নানা ধরনের বকযন্ত্র আবির্ভাব ঘটেছিল এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তখন পাতন করা স্পিরিট উৎপাদনে প্রচুর উৎসাহ ছিল।

ব্রিজেট এবং রেমন্ড অলচি হলেন ভূতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী জোসেফ নিডহ্যাম তাঁর চৈনিক বিজ্ঞান ও সমাজের ইতিহাসের ওপর কাজের জন্য সুপরিচিত।

স্থাপত্য শিল্প

তুর্কী বিজয়ের পর ভারতে স্থাপত্য শিল্পের গঠন শৈলীতে এক আমূল পরিবর্তন আসে। সুলতান ও তাদের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্তরা ধনুকাকৃতি খিলান ও গোলাকার গম্বুজের ওপর জোর দিয়েছিলেন আর দক্ষ ভারতীয় রাজমিস্ত্রীরা তা নিপুণভাবে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখনও টিকে থাকা ধনুকাকার খিলানের প্রথম উদাহরণ হল ১২৮০ সালে তৈরি বলবনের সমাধি আর গোলাকার গম্বুজের প্রথম উদাহরণ ১৩০৫ সালের আলাই দরওয়াজা। আস্তর দেওয়ার কাজে চুন, বালি, জলের মিশ্রণের ব্যবহার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ নির্মাণের কলাকৌশলে একটা পরিবর্তন আসে, ফলে অনুভূমিক বীমের স্থাপত্য (trabeate architecture) থেকে ধনুকাকার (arcuate) শৈলীতে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। মনে হয়, প্রাচীন ভারতে প্রকৃত খিলান তৈরির মূলনীতি জানা ছিল; কিন্তু কোনো কারণে তখন বড় খিলান তৈরি করা সম্ভব হয়নি। যাই হোক, কৃত্রিম খিলানগুলো প্রাচীনকালেই তৈরি হয়েছিল (চিত্র ৫.১১ দেখুন)।

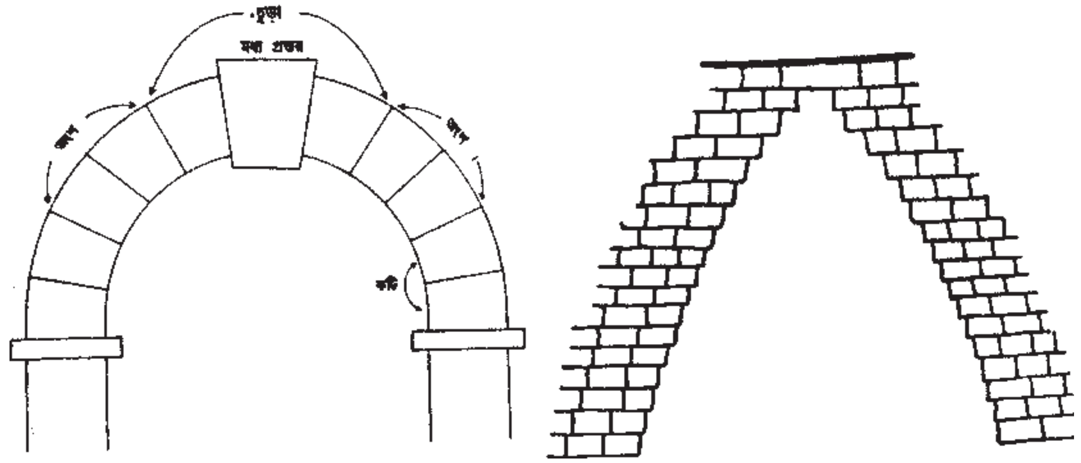

(ক) (খ)

চিত্র ৫.১১ : (ক) প্রকৃত খিলান : এর নিম্নাংশ কটি (springing), মধ্যাংশ অংশ (haunch) ও উপরের অংশ চূড়া (crown)। খিলানটির গঠনে মধ্যপ্রস্তরের (keystone) একটি বড় ভূমিকা আছে। (খ) কৃত্রিম খিলান : এর অনুভূমিক স্তরগুলির প্রতিটি নীচেরটির চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকে। দুপাশের স্তরগুলি চূড়ায় যেখানে মিলিত হয় তার উপরে একটি অনুভূমিক ফলক চাপানো থাকে।

চুন, বালি, জলের মিশ্রণ করে জলাধারের দেওয়াল ও মেঝে জল-নিরোধক (waterproof) করা গিয়েছিল। এইভাবেই ভারতে ব্যবহৃত মুখ্য রঞ্জক নীল তৈরি ও অন্যান্য কাজের জন্য জলাধার ও বড় চৌবাচ্চা তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছিল।

সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা

সামরিক প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই ভারতে অশ্বারোহীদের জন্য দড়ি এবং কাঠের রেকাব প্রচলিত ছিল। সম্ভবত ঘোরী ও তুর্কীরাই লোহার রেকাব ব্যবহারের প্রচলন করেছিলেন, এটি অশ্বারোহীদের যুদ্ধের ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে নালের ব্যবহার ঘোড়ার কর্মক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়।

তুর্কীরা সঙ্গে করে আড় ধনুকও (cross bow) এনেছিলেন (চিত্র ৫.১২)। আড় ধনুকের সমকোণে একটি অতিরিক্ত নালীতে বাণ ভরা থাকত। এই নালীটি বাণের নিখুঁত লক্ষ্যভেদে অনেক বেশি সহায়তা করত। মনে হয়, এই নালীটি হাত-বন্ধুক নলের প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী।

কামান ও বারুদের ব্যবহার সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়নের পরবর্তী অধ্যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের রাজারা ইউরোপ থেকে এই আবিষ্কার গ্রহণ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে ভারতে এর ব্যবহারের প্রবর্তন করেছিলেন।

আকবরের সময়ের মধ্যেই রাজ অস্ত্রাগারে পলিতা দেওয়া গাদা বন্দুকের ব্যবহার ও উৎপাদন সাধারণ ব্যাপার ছিল। অগ্নি সংযোগের পলিতা লোপ এবং বন্দুকের নলকে আরও বেশি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কিছু প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। আকবরের অস্ত্র-নির্মাণশালার কারিগরেরা খুব সম্ভবত চক্রাকার ঘোড়া-যুক্ত বন্দুক নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে বন্দুকের ঘোড়ার সাহায্যে একটি স্প্রিং মুক্ত করলে, করাতের

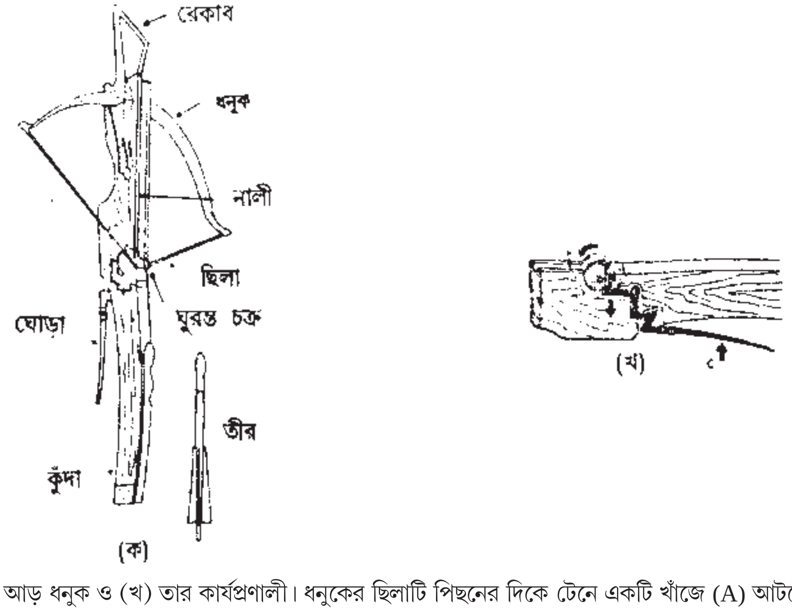

চিত্র ৫.১২ : (ক) আড় ধনুক ও (খ) তার কার্যপ্রণালী। ধনুকের ছিলাটি পিছনের দিকে টেনে একটি খাঁজে (A) আটকে রাখা হত। আড় ধনুকের বিশেষ ধরনের তীরটি কুঁদার উপরের লম্বা নালীর (B) মধ্যে রাখা হত। ঘোড়াটি উপরদিকে ঠেললে (C) যে চক্রের খাঁজে ছিলাটি আটকানো থাকে সেটি মুক্তভাবে ঘুরতে পারে। ছিলার টানে তখন তীরটি প্রচণ্ড গতিতে বাতাসের মধ্যে ধাবমান হয়।

ন্যায় কিনারা যুক্ত চক্রটি গন্ধক যৌগ পাইরাইট খণ্ডের সঙ্গে ঘষা লেগে ঘুরতে থাকে এবং বারুদ কক্ষে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে ইউরোপে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হত এক বিশেষ চক্‌মকি পাথরের অগ্নিসংযোগকারক (flint lock)। ভারতে তা পরবর্তী কালে গৃহীত হয়েছিল (চিত্র ৫.১৩)।

বন্দুক নির্মাণ ও মেরামতকারীদের কাছে বন্দুকের নল তৈরি একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। নলের মধ্যে বারুদের বিস্ফোরণ সহ্য করার জন্য নলটিকে খুবই দৃঢ় হতে হয়। নলের গর্ত তৈরি এবং প্রত্যেক অংশে এর অক্ষের একই সরলরেখায় বিন্যাস (alignment) খুবই নিখুঁত হওয়া দরকার। আকবরের অস্ত্রশালায় লোহার চাদর পাকিয়ে এবং এর কিনারাগুলো জুড়ে দিয়ে বন্দুকের নল তৈরি করা হত। তারপর নলের ছিদ্র ভিতর থেকেই করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে একই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভারী ব্রোঞ্জের কামান নির্মাণের কৃতিত্ব ভারতেরই প্রাপ্য। তবে ভারী কামানগুলির প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা ছিল না, কেননা তাদের গতিশীলতার ও নিশানার অভাব ছিল। তাই দেখা যায়, একজন লোক সহজেই টানতে পারে এমন হাল্কা কামান তৈরিতেই আকবর বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন।

বাণ বা রকেট নামে এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হত। এটি বাঁশের তৈরি, তার অগ্রভাগে লোহার চোঙে দাহ্য পদার্থ থাকত। এই ধরনের ভারতীয় রকেট দেখে কন্‌গ্রীভ (Congreve) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নতুন রকেট উদ্ভাবনে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ধাতব স্ক্রু

নিখুঁত যন্ত্র ও কলকব্জা তৈরির কাজে ধাতব স্ক্রু হল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধাতব খণ্ডগুলিকে একত্রে জুড়ে রাখার কাজে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই স্ক্রু ব্যবহৃত হত। ঘড়ির যন্ত্রপাতিতে এর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে স্ক্রুর ব্যবহার প্রথম শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। এমনকি তখনও ভারতীয় স্ক্রু ইউরোপের স্ক্রু থেকে কম কার্যকর ছিল। স্ক্রুতে খাঁজ কাটা হত না। কিন্তু খাঁজের মতো দেখানোর উদ্দেশ্যে পেরেকের চারদিকে ঝাল দিয়ে তার লাগান হত। ইউরোপে খাঁজ কাটার জন্য লেদ্ মেসিন ব্যবহার হলেও, ভারতে এই মেসিন না থাকায় খাঁজ কাটা সম্ভবপর হত না। এই সীমাবদ্ধতার দরুন ভারতীয় স্ক্রু ঠিকমতো ফিট করত না।

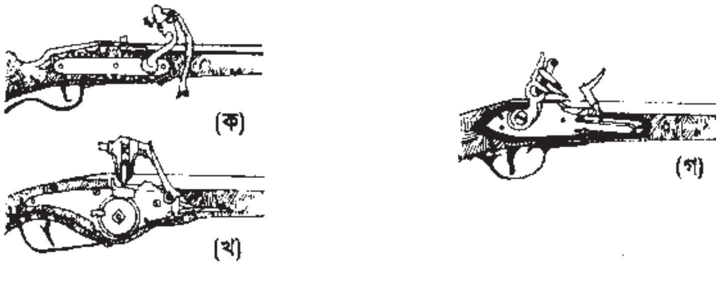

চিত্র ৫.১৩ : মধ্যযুগের বন্দুকে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অগ্নিসংযোগ ব্যবস্থা। (ক) পলিতা ঘোড়া : বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দিলে একটি বাঁকানো দণ্ড বারুদের গর্তে জ্বলন্ত পলিতা প্রবেশ করিয়ে বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। (খ) চক্র ঘোড়া : বন্দুকের ঘোড়া টানলে ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো হাতে গোটানো একটি স্প্রিং ইস্পাতের চক্রটিকে লোহা বা চক্‌মকি পাথরের গায়ে ঘষে দেয় এবং নির্গত স্ফুলিংগ বারুদে আগুন লাগায়। (গ) চক্‌মকি ঘোড়া : এখানে বন্দুকের ঘোড়া চাপলে একটি স্প্রিং চক্‌মকি বা লোহার টুকরা লাগানো হাতুড়িটিকে ঠুকে দেয়। ফলে স্ফুলিংগ তৈরি হয় ও বারুদে আগুন লাগে।

জাহাজ-নির্মাণ

ইউরোপীয় কলাকৌশল অনুকরণের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রগামী জাহাজগুলো আকারে অনেক বড় ছিল এবং এগুলির মূল পাল খুব বড় হত। অনুকরণে তৈরি জাহাজগুলো কোনো কোনো বিষয়ে আসলের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। জল প্রবেশ রোধের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় জাহাজ-নির্মাতাদের দড়ির টুকরাদি গুঁজে দেওয়ার সহজ পদ্ধতি অপেক্ষা একটি তক্তার সঙ্গে অপর একটি তক্তার রিভেট্ করার ভারতীয় পদ্ধতি জাহাজকে অনেক বেশি শক্তিশালী করেছিল। ভারতীয় জাহাজের তক্তার ওপর চুনের যৌগ লেপন করায় সামুদ্রিক আগাছার উপদ্রব থেকে এক অসাধারণ দৃঢ় সুরক্ষার ব্যবস্থাও হয়।

যাই হোক্, জাহাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের ক্ষেত্রে ভারত ইউরোপ থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ভারতীয়রা নৌবাহ বিজ্ঞানের (navigation) আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ব্যর্থ হন। অ্যাস্ট্রোলেব্ (astrolabe) ভারতীয় জাহাজে ব্যবহৃত প্রধান যন্ত্র হিসাবে তখনও পর্যন্ত রয়ে গেল। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নাবিক ও কাপ্তেনরা ভারতীয় জাহাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন স্বভাবতই তাঁরা ইউরোপ থেকে আমদানি করা দূরবীন, কৌণিক উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (quadrant) এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করতেন।

কৃষিকাজ

কৃষি ভারতের বৃহত্তম শিল্প। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় কৃষকরা সারিবদ্ধভাবে বীজ বপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁরা গর্ত করে বীজ বপন করার পদ্ধতি আয়ত্তে আনেন। এই পদ্ধতিতে জমিতে লাঠির সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে বীজ পুঁতে দেওয়া হত। তাঁরা বেশিরভাগ জমিতে এক বছরের ভিতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিক ফসল ফলাতেন (crop rotation)। ভারতীয় কৃষকদের চাষকরা শস্যের তালিকা ছিল বেশ দীর্ঘ। আবুল ফজল প্রায় ৫০ প্রকার খারিফ এবং ৩৫ প্রকার রবিশস্যের উল্লেখ করেছেন। তবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এই সংখ্যার তারতম্য ঘটত। ভারতীয় কৃষিজীবীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা খুব সহজেই নতুন কোনো ফসল ফলাতে আগ্রহী হতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন জগত থেকে এনে এখানে চাষ করা নতুন শস্যগুলির মধ্যে ছিল তামাক ও ভুট্টা। এই শস্যগুলি ব্যাপকহারে জন্মাত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার কৃষকরা গুটিপোকা চাষ শুরু করে। আর সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান রেশম রপ্তানিকারী অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হয়।

উদ্যানবিদ্যা প্রধানত অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তারলাভ করেছিল। বিভিন্ন রকমের গাছের কলম তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছিল। কাশ্মীরে কলম চাষ করে মিষ্টি চেরিফল পাওয়া গিয়েছিল। আর একই উপায়ে খোবানির চাষও বিস্তারলাভ করেছিল। শাহজাহানের সময় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নত জাতের কমলালেবুর ফলন শুরু হয়েছিল। পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজরা আমের কলম তৈরি প্রচলন করেছিল এবং এই উপায়ে প্রথম তৈরি আম হল ‘আলফোনসো’। মনে হয় আমের কলম তৈরি অষ্টাদশ শতব্দীতে উত্তর ভারতে বিস্তারলাভ করেছিল।

মোটের উপর, এই পরিচ্ছেদে আমরা মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যদি আমরা মধ্যযুগীয় ভারতের ৬০০ বছরের বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে তাকাই তো আমাদের হতাশ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্ত কিছু উন্নতি দেখা গেলেও মূলত তা পুরোনো ধ্যান-ধারণার চৌহদ্দিতেই আবদ্ধ থেকে গেছে যাকে সাধারণভাবে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ বলা যেতে পারে। এই মতবাদ বলে যে—জগৎটা সর্বদাই এখনকার মতো একইরকম ছিল এবং একইরকম থেকে যাবে। আর এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে পৃথিবী এবং সবকিছুই অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি ও ইথার এই পাঁচটি জিনিস দিয়ে তৈরি। গ্রীক সমাজের প্রভু ও দাসের ধারণা বা স্তরবিন্যস্ত সমাজকাঠামো এতই স্বাভাবিক ছিল যে এই ধারণা প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে ধারণাকেও প্রভাবিত করেছিল। যেন প্রত্যেক বস্তুরই নিজ নিজ অবস্থান জানা আছে এবং তারা সেই অনুযায়ী কাজ করে যায়।

বাস্তবিকপক্ষে প্রতিটি বিষয়ে সাম্প্রতিকতম অগ্রগতি আয়ত্ত করার, এমনকি সমসাময়িক ইউরোপের আবিষ্কারাদি জেনে নেওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই ছিল না। বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানগুলি একটি সার্বিক, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝে নেওয়ার কোনো তাগিদ ছিল না। কোপার্নিকাসের সৌরজগতের মডেল, গ্যালিলিওর আবিষ্কার (১৬১০) নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতো বিরাট কাজ (১৬৬৫), এমনকি হার্ভে আবিষ্কৃত রক্ত-সঞ্চালন প্রক্রিয়ার (১৬২৮) মতো উল্লেখযোগ্য কাজগুলির প্রতিও খুব কম আগ্রহ ছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার, যার সাহায্যে অনেক মানুষের কাছে জ্ঞানের সম্ভার পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর, অথবা দূরবীন (প্রায় ১৬০০) ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র এসব কোনো কিছুর প্রতি কারো কোনো আকর্ষণ ছিল না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, মুষ্টিমেয় যে কটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিতে হিন্দু বা মুসলিম ধর্মতত্ত্বের চর্চা হত অথবা পুরোনো ধ্যান-ধারণার চর্বিত-চর্বণ হত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিক অন্বেষণ এবং নতুন নতুন সৃষ্টিতে এঁদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

কেন এই অবস্থা? আমরা এখন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব ইউরোপের মতো ভারতে কেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। আরও এগোবার আগে আপনারা হয়তো একটি অনুশীলনীর উত্তর দিতে চাইবেন।

অনুশীলনী—৪

নীচের অংশে মধ্যযুগের অন্তত পাঁচটি অভিনব প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের নাম লিখুন :

....

....

....

....

....

....

৫.৪ ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় সমাজ খুব জটিল হয়ে ওঠে। তাই এই সমাজ থেকে উদ্ভূত এবং এই সমাজে যার অবদান আছে, এমন একটি বিষয়কে অর্থাৎ এখানে বিজ্ঞানকে, বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করলে অতি-সরলীকরণের ঝুঁকি থেকে যায়। যাই হোক্, যদি সরলীকরণ অর্থবহ হয় এবং তথ্য-বিকৃতি না ঘটায় তবে তা গ্রহণযোগ্য কেননা এর ফলে সমাজ ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের একটা সার্বিক ধারণা জন্মায়।

এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা থেকে এটা মনে হতে পারে যে ভারতীয় বিজ্ঞান ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানের অগ্রগতি একই স্তরে ছিল। বিশেষত ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে ছিল। কিন্তু তারপরই ইউরোপীয় বিজ্ঞান ভারতীয় বিজ্ঞানকে পেছনে ফেলে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। বাস্তবিকই ব্রিটিশরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পে তাদের উন্নতির দরুন ভারতকে পরাধীন করে উপনিবেশ বানায়। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে—ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সহজভাবে বলতে গেলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সমাজের মধ্যে পার্থক্য ছিল সমাজকাঠামোয়, ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবের মাত্রায় এবং সমাজে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে। আমরা কী বোঝাতে চাইছি তা ব্যাখ্যা করা যাক্।

আমরা দেখেছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে এক ধরনের চাপ আসে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার তাগিদে। একটা পুরোনো প্রবচন আছে—প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী। হ্যাঁ, দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের শাসকদের মধ্যে বারে বারে যুদ্ধ সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে অনেক বেশি স্থায়িত্ব ছিল বলেই মনে হয়। লোকসংখ্যা কম ছিল, জমি ছিল উর্বর। আর ক্ষুদ্র জোত জমি থেকেও ভারতীয় কৃষকরা তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে পারত। তারা নিজেদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করতে পারত, তারা ছিল দরিদ্র, তবুও আজকের দিনের মতো দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অস্তিত্ব তখন ছিল না। যে বঞ্চনা এখন আমরা দেখি, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর ফল। গ্রামাঞ্চলে ধর্মের আধিপত্য এবং জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের ফলে সাধারণ লোক উচ্চবর্ণের কর্তৃত্বকে ভাগ্যের ফল বলে মেনে নিয়েছিলেন। একটি মোহময় ধারণার প্রচলন ছিল যে, এই অসীম প্রাচীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবিরাম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের এক চক্রে বাঁধা আছে যেখানে নতুন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না। মানুষের মনে এক অদ্ভুত সন্তুষ্টি বিরাজ করত যা প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোয় কিংবা সমাজের পরিবর্তন সাধন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে কোনোরকম সাহায্য করত না।

অন্য একটি কারণ ছিল—যারা কায়িক শ্রম করত জ্ঞানের ভাণ্ডারে তাদের অবদান ছিল না। আর জ্ঞানীরা পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকলেও তাদের নিজেদের জ্ঞানকে প্রয়োগের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হত না। রাজ্যগুলি হয় যুদ্ধবিগ্রহ করেছে নয়তো দীর্ঘকাল ধরে শান্তিতে থেকেছে। কাজেই এটাই সঙ্গত যে এইরকম সমাজে নতুন জিনিস উৎপাদন ও নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের কোনোরকম দাবি ছিল না। সমাজে স্থায়িত্ব ও অপরিবর্তনশীলতা পরস্পরের হাত ধরাধরি করেই চলে। ধনীদের পরিবর্তন আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না আর গরিবদের এই পরিবর্তন সাধনের কোনো ক্ষমতা ছিল না।

আমরা দেখি, যখন ইসলামের প্রভাব উপর্যুপরি ভারতে আঘাত করেছে, তখন তা সাধারণ গ্রামীণ মানুষের গোষ্ঠীজীবনে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি না করার চেষ্টা করেছিল। সেটি তখনকার প্রচলিত হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে নি। এই হিন্দু মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের প্রতি ছিল খুব সহিষ্ণু। আবার একই সঙ্গে তা ভারতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথাকেও সুরক্ষিত করে রেখেছিল।

আমরা দেখি, দেশের শাসনব্যবস্থায় ও সামরিক বাহিনীতে উচ্চস্তরে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। মুসলমান নবাব তাঁর হিন্দু সেনাধ্যক্ষকে নিয়ে এবং হিন্দু রাজা তাঁর মুসলমান সেনাপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ ও একে অপরকে রক্ষা করেছেন বলে জানা আছে। স্বভাবতই সমাজে তখন পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সংস্কৃতি সংমিশ্রণের একটা ধারা ছিল। বর্তমানের ভারতীয় সংস্কৃতি, আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের এবং এদেশে যারা বিভিন্ন যুগে এসেছিল ও বসবাস করেছিল, তাদের মধ্যেকার শত শত বর্ষব্যাপী আদান-প্রদানের ফসল।

ধর্মের ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা সহাবস্থান ছিল। যেহেতু মুসলমানরা সংখ্যালঘু, তাই সম্ভবত প্রয়োজনের তাগিদে এটা ঘটেছিল। ভারতে তাঁদের শাসন বজায় রাখতে ও পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে বিস্তৃত করতে, তাঁদের পক্ষে বিশাল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কোনোপ্রকারেই সম্ভব ছিল না। এর অন্য কারণটি হল—পুরোহিতদের জনগণের ওপর প্রবল প্রভাব ছিল এবং পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের রাজনৈতিক ফলাফল হত সাংঘাতিক। তা প্রচণ্ড বিক্ষোভেরও সৃষ্টি করতে পারত। কাজেই উভয়েই উভয়ের থেকে দূরে থাকতেন। উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা আর্থিক স্বাচ্ছল্য উপভোগ করতেন এবং নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থায় তৃপ্ত ছিলেন। দুটি ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যেও কোনো সক্রিয় বিবাদ-বিতর্ক ও সংস্কারের জন্য কোনো তীব্র আন্দোলন ছিল না। মধ্যযুগে ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের উত্থান হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রচার করত এবং জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা করত। কিন্তু এই প্রচার বেশিদূর না পৌঁছনোয়, তারা খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এইরকম ঘটার সম্ভাব্য কারণ মুদ্রণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; কথিত আছে জাহাঙ্গীরকে একটি ছাপানো বই উপহার দেওয়া হলে তিনি সেই বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এই বলে যে, এই বই তাঁদের নিজস্ব সুন্দর হস্তলিপির তুলনায় বিশ্রী ও অসুন্দর। এই হস্তলিপির জন্য তাঁরা গর্বিত ছিলেন। সুলভ বইয়ের সাহায্যে জনগণের জীবনে ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটানোর সম্ভাবনা তিনি আদৌ বুঝতে পারেননি বা বুঝতে আগ্রহী ছিলেন না। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ইউরোপ ছিল ঠিক এর বিপরীত—এখানে মুদ্রিত বই পাওয়া যাওয়ায় জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল এবং এই জ্ঞান সমাজের পরিবর্তন ঘটানোয় অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর ছাপ ফেলেছিল। আপনারা ষষ্ঠ-এককে এ বিষয়ে আরও বেশি জানতে পারবেন।

ভারতে শিক্ষা মূলত ধর্মীয় শিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল সে সময়ে প্রচলিত চিন্তাধারার বিষয়ে আপত্তি জানানোর বা নতুন মতবাদ প্রস্তাবনার অনুকূল ছিল না। এইরকম অবস্থায় খুব কম লোকই চিন্তার স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারত। গ্যালিলিও প্রদর্শিত সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বমণ্ডলের মতো নতুন তথ্যকে মেনে নেওয়া ছিল আরও অনেক বেশি কঠিন কেননা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানবের বাসস্থানকে কেন্দ্রীয় জায়গায় রেখে ঈশ্বর যে বিন্যাস তৈরি করেছেন বলে বিশ্বাস করা হত, নতুন মতবাদ তাকে পরিবর্তন করে দেয়। বাস্তবক্ষেত্রে জ্যোতিষবিদ্যাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসনে বসানো হয়েছিল বলেই

জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। শৌখিন রসায়ন চর্চা চালানো যেত কেননা তখনও অ্যাল্‌কেমি বা অপরসায়ন বুনিয়াদি ধাতুগুলিকে সোনায় রূপান্তরিত করার কিছুটা আশা জোগাত, তা যতই রহস্যজনক ও অযৌক্তিক মনে হোক না কেন। চিরন্তন সত্য এবং দৈববাণীতে বিশ্বাসের যে গোঁড়ামি বর্তমান ছিল, তা কখনোই মুক্ত চিন্তা ও কল্পনা-প্রবণ দুঃসাহসিক ধ্যান-ধারণাকে মেনে নিত না। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিক্ষিতদের কিছু বদ্ধ ধারণা ছিল যা তাদের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হত না। আর যারা সমাজের নিচের স্তরে ছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষিত হত, তাদের শিক্ষার কোনো সুযোগই ছিল না।

এইসব বিষয়গুলো যদি না থাকত, তাহলে আমরা ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল অবস্থায় থাকতাম কেননা, এখানে আরব ও ভারতীয় বিজ্ঞানের শক্তিশালী স্রোতদুটি একইসঙ্গে বিরাজমান ছিল এবং ইউরোপের তুলনায় আমাদের বহুদূর এগিয়ে থাকা উচিত ছিল। ইউরোপে আরব লেখক আল্‌-ফারগানির লেখা 'জ্যোতির্বিদ্যার সারসংক্ষেপ' এবং কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রের বই, যেমন আল্‌-রাজির 'হাউই, লিবার কনটিনেন্‌স্‌', ইবন-সিনার 'ক্যানন', অ্যাভেরস-এর 'কলিজেট', প্রভৃতি বিস্তৃত আলোচনার গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এইসব বইগুলি তখন ভারতবর্ষে পাওয়া যেত, ব্যবহার করাও যেত, কিন্তু তা করা হয়নি। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের কাজগুলির মতো ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চমকপ্রদ অগ্রগতিগুলি এখানে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। কেননা এগুলি তদানীন্তন ভারতে বিরাজমান পণ্ডিতদের হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল না। এই অবহেলা, উদাসীনতা ও পূর্বে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য আমরা পরাজিত হয়েছিলাম।

এই সবকিছুর সারসংক্ষেপ করে বলা যায়—উভয় ধর্মের পুরানো রক্ষণশীল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অসন্তোষ বা অতৃপ্তি ছিল খুবই কম ফলে তাঁদের কাছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের সমাজ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সমকালীন ইউরোপীয় সমাজের মতো বিজ্ঞান বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম ছিল না। এটি জীবনের কতকগুলি সুখকর দিক যেমন নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারত এবং বাস্তবেও তা করেছিল। অন্য দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এটিই ছিল মধ্যযুগীয় সমাজের মুখ রাখার মতো একটি সদ্‌গুণ।

৫.৫ সারাংশ

এই এককে আমরা আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি দীর্ঘ সময়ের ঘটনাবলী আলোচনা করেছি। ভৌগোলিক দিক থেকেও আমরা আরব বিজ্ঞানের বিকাশস্থল পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে লিখেছি। আমরা যা শিখেছি এখন তার সারসংক্ষেপ করা যাক।

- আমরা দেখেছি, আরব বিজ্ঞান গ্রীক, ভারতীয় ও চীনা সভ্যতার ধ্রুপদী বিজ্ঞানের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের একটা যোগসূত্র তৈরি করেছিল। আরবরাই সর্বপ্রথম একটি যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল যার সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করে ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছিল। আরব বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষ ছিলেন, তাঁদের ভাষা ও সমস্যাগুলি ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিকাশে এটা উৎসাহ যুগিয়েছিল। আমরা আরও দেখেছি, একাদশ শতাব্দী নাগাদ বিভিন্ন কারণে আরব বিজ্ঞানের প্রাণবন্ত বৌদ্ধিক পর্যায় ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল।

- মধ্যযুগের ভারত আরব ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংযোগের ফলে পাওয়া জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার গড়ার সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয়রা অনেক কারিগরি উদ্ভাবন কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, এখানে অনেক কারিগরি উদ্ভাবনও ঘটিয়েছিল। কিন্তু তারা আরবদের যুক্তিসিদ্ধ দর্শন গ্রহণ করতে বা সমকালীন ইউরোপের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই ধরনের মনোভাবের কারণ সেই সময়ে বিরাজমান সামাজিক অবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এর ফলে, ভারতীয় বিজ্ঞান অনেক পিছিয়ে পড়েছিল।

৫.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। মুদ্রণ-যন্ত্রের অভাবে বিজ্ঞানের বিকাশ কীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা চার-পাঁচ লাইনে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

....

....

....

....

....

....

২। নিম্নলিখিত সামাজিক কারণগুলির মধ্যে কোন্ তিনটি মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল? সঠিক উত্তরে টিক্ চিহ্ন দিন :

(ক) সমাজে স্থিতিশীলতা ছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দাবিতে কোনোরকম জরুরি আর্থ-সামাজিক চাহিদা ছিল না। ☐

(খ) কলা, সঙ্গীত, নাটক ও চিত্রকলার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ☐

(গ) অনুসারীদের ওপর হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের চরম কর্তৃত্ব ছিল। সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলো সামান্যই ছাপ ফেলতে পেরেছিল। ☐

(ঘ) সমাজে বুদ্ধিজীবীদের কতকগুলো বদ্ধ ধারণা ছিল, যা প্রয়োগের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করার প্রয়োজন তাদের ছিল না। কৃষক ও কারিগরদের বিদ্যার্জনের কোনো সুযোগ ছিল না। ☐

(ঙ) স্থাপত্য শিল্পে মোগলদের বিশাল অবদান ছিল। ☐

৩। মধ্যযুগের বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত বিবৃতিগুলি সঠিক না ভুল, তা পাশে দেওয়া জায়গায় উল্লেখ করুন :

(ক) ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশে মধ্যযুগ ছিল অন্ধকারতম যুগের নিদর্শন। ☐

(খ) মধ্যযুগে ভারতীয় পণ্ডিতরা জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে খুব বেশি উৎসাহ দেখাননি। ☐

(গ) বিজ্ঞজনের কাজ মুদ্রিতাকারে পাওয়ার সুবিধা ইউরোপীয় সমাজে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ☐

(ঘ) ভারতীয় বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের জীবন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ☐

(ঙ) ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার ফলে প্রাপ্ত কারিগরিবিদ্যার (প্রযুক্তির) ব্যবহার, অনুকরণ ও আরও প্রসারিত করতে ভারতীয়রা উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখিয়েছিল। ☐

৫.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী :

১। (ক) ১, ৩, ৪, ৬

(খ) ২, ৫

২। (ক), (গ), (ঙ)

৩। (ক) রাজা জয়সিংহ কর্তৃক মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা।

(খ) সাদিক ইসফাহনি (Isfahani) কর্তৃক বিশ্বের মানচিত্র প্রস্তুত।

(গ) ধাতু, পাথর, কাঠ ইত্যাদির আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিমাপ।

(ঘ) হিমমিশ্রণের আবিষ্কার।

(ঙ) দেহের একাংশ থেকে আংশিক চামড়া গ্রহণ করে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম নাকের সৃষ্টি; বসন্ত রোগের প্রতিষেধকের প্রয়োগ।

৪। পারস্য চক্র, ক্ষেপণাস্ত্র (রকেট), অশ্বারোহীর লোহার পা-দান, হাল্কা বন্দুক, রিভেট্-করা তক্তাযুক্ত জাহাজ, অ্যাস্ট্রোলেব, গাছের কলম করা।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। মুদ্রণ ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষা একটি ছোট অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পেশাদার ব্যক্তিদের বই পাওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। তাই তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে কোনো যোগাযোগ তৈরি সম্ভব হয়নি। আপনি এই উত্তরটিকে আরও বিশদ করতে পারেন।

২। (ক), (গ), (ঘ)

৩। (ক) ভুল (খ) ঠিক (গ) ঠিক (ঘ) ভুল (ঙ) ঠিক

একক ৬ □ নবজাগরণ (রেনেসাঁ) এবং তারপর

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৬.২ মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রয়োগকৌশল

৬.২.১ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

৬.২.২ মধ্যযুগীয় অর্থনীতির রূপান্তর

৬.৩ নবজাগরণ (১৪৪০-১৫৪০)

৬.৩.১ নবজাগরণের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

৬.৪ নবজাগরণোত্তর যুগে বিজ্ঞান (১৫৪০-১৭৬০)

৬.৪.১ ইউরোপে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল কেন

৬.৫ শিল্পবিপ্লব (১৭৬০-১৮৩০) এবং তারপর

৬.৬ সারাংশ

৬.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৬.৮ উত্তরমালা

৬.১ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগে আরব দুনিয়ায় ও ভারতে যে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশগুলি ঘটেছিল, আমরা সেগুলি একক ৫-এ বর্ণনা করেছি। এখানে আমরা সে সময়ের ইউরোপীয় সমাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করব। একক ৩-এ আপনারা লৌহযুগের গ্রীক ও রোমক সমাজ সম্পর্কে পড়েছেন। আপনারা এও জানেন যে এই লৌহযুগীয় সমাজগুলি ক্রীতদাস সমাজ ছিল। পৌরাণিক বা ক্ল্যাসিক্যাল যুগের দাস অর্থনীতিকে অনুসরণ করে এল একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যা সপ্তদশ শতাব্দীর অনেকটা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যে ক্রীতদাস সমাজকে প্রতিস্থাপিত করে এল, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তার তুলনায় অর্থনৈতিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে ছিল অনেক বেশি বিখণ্ডিত। বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এর বিশেষ অবদান ছিল না। তবে কয়েকটি নতুন প্রয়োগকৌশল ছোট মাপে শুরু করা হয়েছিল। এই কৌশলগুলি সাধারণ মানুষজন ব্যবহার করত এবং সেজন্যই ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই এককে আমরা ঐ সকল প্রয়োগকৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা করব। আমরা দেখব, এই ঘটনাটি এবং আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক

পরিবর্তনগুলি সামন্ততন্ত্রকে পুঁজিবাদে রূপান্তরের এবং ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপে যেভাবে ঘটেছিল, ভারতে বিজ্ঞানের তেমন অগ্রগতি ঘটেনি কেন, একক ৫-এ আমরা সেকথা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলাম। ইউরোপীয় সমাজের যেসব বৈশিষ্ট্য সেখানে বিজ্ঞানের বিকাশে সাহায্য করেছিল, বর্তমান এককে সেগুলির বিবরণ দিয়ে আমরা বিশ্লেষণটিকে সম্পূর্ণ করব। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে আমরা আর একবার বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি দীর্ঘ যুগের পর্যালোচনা করব। আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব সেই সামন্ততন্ত্রের যার মধ্যে নিহিত ছিল পুঁজিবাদে রূপান্তরের বীজ; তারপরে বর্ণনা দেব পুনর্জাগরণ এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিপ্লবের, যেগুলির পরিণামে আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। আপনারা যদি ইউরোপীয় সমাজের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চান, তাহলে কলাবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের বনিয়াদী পাঠ্যক্রম সম্বন্ধীয় একক ৭, ৮ ও ৯ দেখতে পারেন।

আমরা এও দেখতে পাই যে শিল্পবিপ্লব কাঁচামাল তথা উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য বিরাট চাহিদার সৃষ্টি করে। এর পরিণামে নূতন শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি ভারতসহ বহু পশ্চাৎপদ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এর পরের এককে আমরা ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের বিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পরে আপনার নিম্নোক্তগুলি করতে পারা উচিত :

- সামন্ততান্ত্রিক যুগে ইউরোপীয় সমাজে বিজ্ঞান ও প্রয়োগকৌশলের বিকাশ বর্ণনা করা এবং এগুলি কীভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রূপান্তরের কারণ হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা।
- রেনেসাঁ বা নবজাগরণের দ্বারা সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার তজ্জনিত বিকাশের বিবরণ দেওয়া।
- নবজাগরণোত্তর যুগে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশগুলির পরিলেখ বর্ণনা করা।
- ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুগটিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের তুলনা করা এবং ইউরোপীয় সমাজের সেসব বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবে সাহায্য করেছিল।
- শিল্পবিপ্লবের উৎসস্বরূপ প্রয়োগিক উদ্ভাবনসমূহের, শিল্পবিপ্লবের ফলাফলের এবং তৎপরবর্তী প্রধান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিগুলির বর্ণনা দেওয়া।

৬.২ মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রয়োগকৌশল

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ফ্র্যাংক, গথ্, ম্যাগিয়ার, ভ্যান্ডাল, স্লাভ প্রভৃতি বর্বর জাতিগোষ্ঠীগুলির আক্রমণ এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে ক্রীতদাসেরা বিদ্রোহ করতে এবং নিজেদের মুক্ত করতে পারে। কিন্তু স্বাধীন হয়েও ক্রীতদাসেরা বিশেষ কিছু করতে পারেনি কারণ নিজেদের জন্য খাদ্যোৎপাদনের মতো প্রয়োজনীয় জমি তাদের ছিল না। রোমানরা যদিও সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জয় করে

সুদূর ইংল্যান্ড পর্যন্ত এসেছিল (চিত্র ৩.১৮), কৃষিজমি ছিল খুবই সীমিত। পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল ঘন বনে আবৃত এবং মাটিও ছিল কর্দমপ্রধান ও ভারি। এমন জমিকে কৃষিকর্মে ব্যবহার করার মতো চাষের যন্ত্রপাতি ও প্রয়োগকৌশল রোমানদের ছিল না। এর পরিণামে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক অভাব দেখা দিল এবং তার ফলে উৎপন্ন হল অসন্তোষ। অর্থাৎ ক্রীতদাস সমাজের ভাঙন তার নিজের সংকট ও অভাবের ফলে ত্বরান্বিত হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই যে পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে ক্রীতদাসেরা ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছিল এবং তাদের জায়গা নিচ্ছিল ভূমিদাসেরা।

দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের বহু অংশে একটি নূতন উৎপাদনব্যবস্থা এবং একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হল সামন্ততন্ত্র। এবার দেখা যাক, এই নূতন সমাজ কেমন ছিল এবং এই সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের চরিত্র কী ছিল।

৬.২.১ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ভূমি এবং গ্রাম ছিল এর অর্থনৈতিক একক। আঞ্চলিক কৃষিজ উৎপাদন এবং বিচ্ছিন্ন কুটিরশিল্পের উপরে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল। গ্রামগুলিতে কৃষক বা ভূমিদাসের জমি ও কৃষিকর্মে অংশ ছিল। কিন্তু রাজস্ব, কর ও সামন্তসেবার আকারে তাদের উৎপাদন ও শ্রমের একাংশ সামন্তপ্রভুদের হাতে তুলে দিতে তারা বাধ্য ছিল। সাধারণত এক বা ততোধিক গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রামের জমি সামন্তপ্রভুর অধিকারে থাকত। ভূমিদাসরা তাদের সামন্তপ্রভুর সকল ভার বহন করতে দায়বদ্ধ ছিল এবং যে জমিতে তারা কাজ করত তা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার অনুমতি তাদের ছিল না।

সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্তসেবা সম্বন্ধে এই দায়বদ্ধতা অর্থাৎ বলপ্রয়োগে বা বলের সুবাদে প্রচলিত প্রথার দ্বারা শ্রম আদায় করে নেওয়া। পৌরাণিক যুগের ক্রীতদাসদের সঙ্গে ভূমিদাসদের পার্থক্য ছিল এই যে, প্রথমোক্তেরা তাদের প্রভুদের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু শেষোক্তেরা ছিল স্বাধীন মানুষ এবং তাদের জমিচাষের সুরক্ষিত অধিকার ছিল। ভূমিদাসেরা নামে স্বাধীন হলেও তাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশি ভালো ছিল না। তাদের উপরে সামাজিক চাপ অবশ্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এই সামন্ততন্ত্র ইউরোপে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

দশম শতাব্দী থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে ইউরোপে সাধারণত মধ্যযুগ আখ্যা দেওয়া হয়। এই যুগে চার্চ ছিল ক্ষমতার কেন্দ্র। সমস্ত খ্রিস্টীয় জগতের পক্ষে কর্তৃত্বের সাধারণ ভিত্তিও ছিল চার্চে নিহিত। মননশীলতার স্ফুরণেরও একটি যন্ত্র ছিল চার্চ। মননশীল ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিই ছিলেন চার্চের অঙ্গীভূত। তাই চার্চ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যাজকরা যাতে ধর্মীয় বিশ্বাসের পক্ষ সমর্থন করতে এবং ধর্মপ্রচার করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাদের চিন্তা করার ও লেখার প্রশিক্ষণ দিতে হত। প্রথমে এই প্রয়োজন মেটাতেই ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই যুগে ১১৬০ সালে ফ্রান্সের প্যারী শহরে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টির পত্তন হয়। একে অনুসরণ করে ব্রিটেনে ১১৬৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১২০৯ সালে কেম্ব্রিজ

সমাধি থেকে যিশু খ্রিস্টের উত্থানের স্মৃতিতে ইস্টার একটি খ্রিস্টীয় পর্বোৎসব। এটি রবিবারে পড়ে, কিন্তু তারিখটি প্রতি বৎসরে পরিবর্তিত হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এর পরে এল ইতালির পাদুয়া (১২২২) ও নেপল্‌সের (১২২৪), চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাহার (১৩৪৭) এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল যাজকদের প্রশিক্ষণ। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মূল মাধ্যম ছিল কেবল বক্তৃতা ও বিতর্ক, কারণ বই তখনও ছিল দুষ্প্রাপ্য। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, পাটিগণিত, তর্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব। কার্যত যেটুকু বিজ্ঞান শেখানো হত, তার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। পাটিগণিতে কেবল সংখ্যার সম্বন্ধেই শেখানো হত, জ্যামিতিতে শেখানো হত কেবল ইউক্লিডের প্রথম তিনটি গ্রন্থ, এবং পঞ্জিকা-পরিচয় ও ইস্টারের তারিখ গণনার বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞান অগ্রসর হত না। প্রাকৃতিক জগৎ বা প্রায়োগিক কলাকৌশলের সঙ্গে সামান্যই যোগাযোগ ছিল; তবে আর কিছু না হলেও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা এবং তর্কশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহে উৎসাহ দেওয়া হত। আমরা জানি, নিজগুণেই শিক্ষা মানবীয় বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় কর্মীদের একটি বিশেষ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল রক্ষণশীলতার দুর্গ। তা সত্ত্বেও তারা অন্যদের সৃজনশীল চিন্তার সংস্পর্শে এসেছিল, বিশেষত প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার এবং কিছু পরিমাণে আরবীয়, ভারতীয় ও চৈনিক চিন্তাধারার। এর পরিণামে একটি মননশীল আবহাওয়া গড়ে ওঠে, যা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বিকাশ ও আবিষ্কারগুলির পক্ষে ভালো হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবু মধ্যযুগে শিক্ষা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ‘বৈজ্ঞানিক’ অনুসন্ধান যাকে বলা চলে, তা মাত্র যাজকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হত এবং তা করা হত যে কোনও রকমের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপালনের জন্য। বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে অবিরাম বিতর্ক চলত, কিন্তু যুক্তিও ব্যবহৃত হত স্বর্গীয় চিন্তাধারা, দৈবলব্ধ জ্ঞান এবং খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই। এবারে আমরা মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক কৃতিগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করব।

মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান

প্রকৃতিবিজ্ঞানে মধ্যযুগীয় কৃতিগুলির সংক্ষিপ্তসার আমরা কয়েক পঙ্‌ক্তিতে লিখতে পারি। এগুলিকে বলা যায় প্রকৃতিবিজ্ঞান ও খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে কয়েকটি টীকা, বাজপাখি ও ঈগলের মতো শিকারী পাখিদের উপরে একটি গবেষণাগ্রন্থ, ইব্‌ন্‌-অল্‌-হাইথামের আলোকতত্ত্বের কিছু উন্নতি এবং অ্যারিস্টোটলের ধারণাগুলির কিছু সমালোচনা। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবীয় বীজগণিত ও ভারতীয় সংখ্যামালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং টলেমির ‘আলমাজেস্ট’ অনুদিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবীয় অবদানের বাইরে বড় একটা অগ্রসর হতে পারেননি, যদিও তাঁরা অল্প কয়েকটি তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ সংযোজন করেছিলেন। ত্রিকোণমিতি ও যন্ত্রনির্মাণে তাঁদের কিছু অবদান ছিল। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনও আমূল সংস্কার ঘটেনি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য বিশপ রবার্ট গ্রোসেটেস্ট (১১৬৮-১২৫৩) ছিলেন মধ্যযুগের এক পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। ইনি বিজ্ঞানকে ধর্মীয় তত্ত্বগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়ার উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। আলোক নিয়ে তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন এবং আলোককে দৈব জ্যোতি বলে মনে করতেন। মধ্যযুগে এরকম বিজ্ঞানী আরও ছিলেন।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যাঁরা সংশয় প্রকাশ করতেন, ধর্মদ্রোহের জন্য তাঁদের নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ধর্মযাজকদের মতো মধ্যস্থ ব্যক্তি ছাড়াই মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারে, এ ধারণাটিও ধর্মদ্রোহ বলে বিবেচিত হত। মধ্যযুগ ছিল অন্ধবিশ্বাস ও নিগড়বদ্ধ চিন্তার যুগ। এছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক চরিত্রের দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজও ছিল একটি চলৎশক্তিহীন সমাজ। এরকম অবস্থায় মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের সীমিত অবদানের কারণ বোঝা যায়। বস্তুত এরকম বিজ্ঞানের কাছে সেযুগ যা দাবি করেছিল, তার বেশি এই বিজ্ঞানের কাছে আশা করা অযৌক্তিক।

তবে প্রায়োগিক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ অবশ্যই লৌহযুগের দাস সমাজের চেয়ে উন্নততর ছিল। বস্তুত মধ্যযুগের সূচনা থেকেই প্রায়োগিক উদ্ভাবনের তাগিদ বর্তমান ছিল। এটি এসেছিল জমির উন্নততর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থেকে। এখানেই কৃষক ও কারিগর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের কৌশলগুলির প্রয়োগ ও উন্নতিবিধান করতে পেরেছিল। শ্রমিক হিসাবে ক্রীতদাসদের আর না পাওয়ায় এবং গ্রামাঞ্চলে আবাদী জমির বিস্তার ঘটায় মধ্যযুগের অধিকাংশ সময়েই শ্রমিকের দীর্ঘস্থায়ী অভাব ছিল। তাই মানবীয় শ্রমের বিকল্পে যান্ত্রিক উপায়ের অনুসন্ধান করা হল। শ্রমিকের অভাবের ফলে পশু, বায়ু ও জলের শক্তি ব্যবহারের সূচনা হল। তাই আমরা দেখি, মধ্যযুগের ইউরোপে বহু প্রায়োগিক বিকাশ ঘটেছিল, যদিও মনে হয় সেগুলির অধিকাংশই এসেছিল প্রাচ্য থেকে, বিশেষত চীন থেকে। এই বিকাশগুলি কী ছিল, তা দেখা যাক। কিন্তু তার আগে একটি অনুশীলনী উত্তরের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

অনুশীলনী ১

নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলির ফলে প্রায়োগিক বিকাশ ঘটেছিল এবং কোনগুলি মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বল্পতার জন্য দায়ী ছিল? প্রতিটি উক্তির পাশে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 'প্র' এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'স্ব' লিখুন।

(ক) আবাদী জমির বিস্তার। ☐

(খ) ধর্মীয় বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কেবল যাজকরাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতেন। ☐

(গ) ক্রীতদাসদের অনুপস্থিতিতে শ্রমিকের অভাব। ☐

(ঘ) ভূমিদাসদের দ্বারা জমির আরও ভালো ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। ☐

(ঙ) ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ বা তার বিরুদ্ধে কিছু বলাকে ধর্মদ্রোহ হিসাবে গণ্য করা হত। ☐

ঘোড়ার কলার বা গলবন্ধনী, ঘড়ি, কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, বারুদ, কাগজ ও মুদ্রণশিল্পের মতো বহু জিনিসই সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে উদ্ভাবিত হয়নি। এগুলির অধিকাংশই খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম কয়েকটি শতাব্দীতে চীনে প্রচলিত ছিল। এই প্রগতিগুলি সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন, কারণ এই কৌশলগুলির মধ্যে কয়েকটির ব্যবহার ইউরোপে এমন একটি বিপ্লবের সূচনা করে, সামন্ততন্ত্রের ভাঙনে যার অবদান ছিল। ঘোড়ার গলবন্ধনী এবং চক্র বা কলগুলি (mill) হল শক্তিকে ব্যবহারের প্রকৃষ্টতর পদ্ধতি। ঘোড়ার গলবন্ধনীর উৎপত্তি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর চীনে এবং এটি ইউরোপে পৌঁছেছিল একাদশ শতাব্দীতে। এটির ব্যবহারের ফলে ঘোড়ার ভারটানার এবং দীর্ঘতর সময় কাজ করার সামর্থ্য বহুগুণে বর্ধিত হল। লাঙ্গল টানার কাজে বলদের জায়গা নিল ঘোড়া এবং অধিকতর পরিমাণে জমি চাষ করা সম্ভব হল (চিত্র ৬.১)।

(ক)

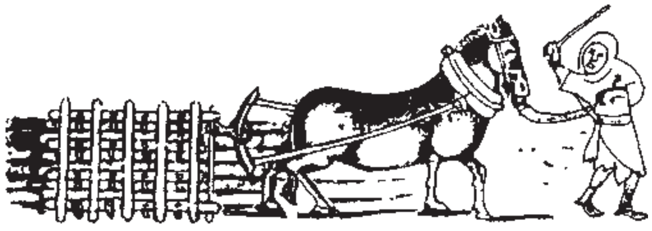

(খ)

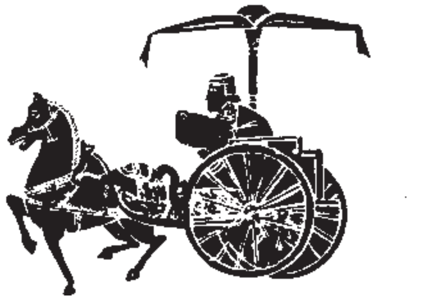

চিত্র ৬.১ : (ক) ইংল্যান্ডে চতুর্দশ শতাব্দীতে ঘোড়ার গলবন্ধনীর ব্যবহার। (খ) উন্নততর গলবন্ধনী ঘোড়ার ভারটানার ক্ষমতায় প্রভূত পরিবর্তন ঘটাল।

জলচক্র (ওয়াটার মিল) উদ্ভাবিত হয়েছিল ক্ল্যাসিক্যাল যুগে। কিন্তু মাত্র মধ্যযুগেই তার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। জলচক্র ও বায়ুচক্র প্রকৃতিকে যান্ত্রিক কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই কলগুলি শস্যভাঙা, তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা এবং কুয়া থেকে জল তোলায় ব্যবহৃত হয়ে কৃষিতে সাহায্য করল। এগুলি হাপর-চালানো, লোহা-পেটাই বা কাঠচেরার কাজেও ব্যবহৃত হত। এই কলগুলি এমন জনপ্রিয় হল যে প্রত্যেক সামন্তপ্রভুর এলাকাতেই অন্তত একটি কল ও একজন কলচালক দেখা যেত। বায়ুচক্র ও জলচক্র নির্মাণের ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অধিকাংশ গ্রামীণ কারিগরের দক্ষতার সীমার বাইরে ছিল। তাই গড়ে উঠল কলনির্মাতাদের পেশাটি। এরা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কল বানাত এবং মেরামত করত। এই লোকগুলিই ছিল ইউরোপের প্রথম কারিগর যারা গিয়ারের নির্মাণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে সবকিছু জানত। যান্ত্রিক ঘড়ি ও হাতঘড়ির বিকাশেও তাদের হাত ছিল।

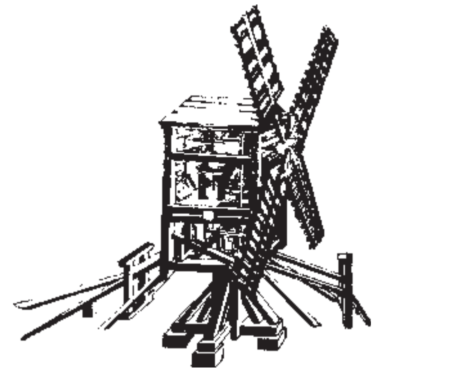

চিত্র ৬.২ : বায়ুচক্র

নৌ-চালনার ক্ষেত্রে দুটি আবিষ্কার হল দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বা কম্পাস এবং পশ্চাদ্দেশীয় হাল বা স্টার্নপোস্ট রাডার। মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রার উপরে এগুলির প্রভূত প্রভাব পড়েছিল (চিত্র ৬.৩)। আগেকার সামুদ্রিক বাণিজ্য-পথগুলি নানা দেশের সমুদ্রোপকূল বরাবর চলত (একক ৪-এর চিত্র ৪.১১ দেখুন)। এই দুটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মহাসাগরগুলি বাণিজ্য, অভিযান এমনকি যুদ্ধের জন্যও প্রথমবার উন্মুক্ত হয়ে গেল। দূর সমুদ্রে নৌচালনার জন্য প্রয়োজন হল নক্ষত্রের অবস্থান, অক্ষাংশ প্রভৃতির নিখুঁত মানচিত্র এবং এর ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলের পরবর্তী বিকাশ উৎসাহ পেল। দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের সমস্যাটিও জরুরি হয়ে উঠল। কম্পাস ও অন্যান্য নৌচালনযন্ত্রের আবশ্যকতা এক নূতন দক্ষ শিল্পের আবির্ভাব ঘটাল।

ইউরোপীয়রা অন্য যে উদ্ভাবিত বস্তুগুলিকে ব্যবহার ও উন্নত করেছিল, সেগুলি হল লেনস্ বা পরকলা এবং চশমা। এর ফলে আলোকতত্ত্বের পরবর্তী গবেষণা গতি পেল এবং—আগেই যা উল্লেখ করা হয়েছে—ইবন-অল্-হাইথামের আলোকতত্ত্বেও কিছু অবদান ঘটল। চশমার চাহিদা থেকে উদ্ভব হল পরকলা ঘষার ও চশমা নির্মাণের পেশার।

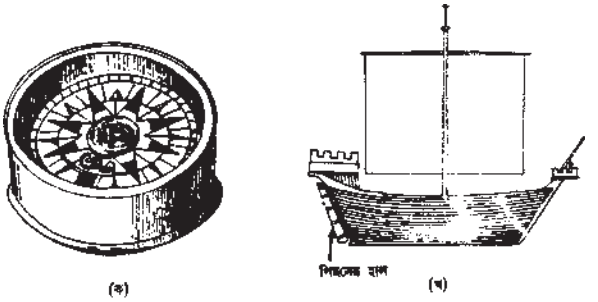

চিত্র ৬.৩ : (ক) নাবিকের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। (খ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর নৌকার পিছন দিকে (স্টার্ন) একটি হাল দেখা যাচ্ছে।

আরবীয়দের মাধ্যমে গন্ধদ্রব্য ও তৈলের পাতন সম্বন্ধে ইউরোপে ইতিপূর্বেই জানা ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল অ্যালকোহলের পাতন, যার ফলে গড়ে উঠল প্রথম বৈজ্ঞানিক শিল্প—সুরাপাতনকারীদের শিল্প—এবং আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হল।

প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে আসা সব কটি আবিষ্কারের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে বারুদের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। কামান ও বন্দুকে বারুদের ব্যবহার ক্ষমতার ভারসাম্যে বিশাল পরিবর্তন ঘটাল। বারুদ তৈয়ারি করা, তার বিস্ফোরণ, কামান থেকে গোলা ছোঁড়া ও তার পরবর্তী গতিপথ বিজ্ঞানে বহু ব্যবহারিক সমস্যা এনে দিল। এই সমস্যাগুলির সমাধান এবং আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যাগুলি বহু শতাব্দী ধরে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানীদের মনোযোগ অধিকার করে রেখেছিল এবং পরিণামে বলবিদ্যা ও গতিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছিল। বারুদ তৈয়ারির জন্য শোরাকে সতর্কভাবে পৃথক ও বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হল এবং এর ফলে দ্রবণ ও কেলাসনের গবেষণা শুরু হল। শোরা বারুদের বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে। তাই সাধারণ আগুনের জন্য বায়ুর প্রয়োজন হলেও বারুদের বিস্ফোরণে বায়ুর প্রয়োজন নেই। বারুদের বিস্ফোরণ সম্বন্ধে গবেষণা থেকে দহনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস সৃষ্ট হল। এই প্রয়াসগুলি পরবর্তীকালে শ্বসনের গবেষণায় বিস্তারলাভ করল—শ্বসন প্রাণিদেহে খাদ্যকে শক্তিতে পরিণত করার জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে। এই ব্যাখ্যাগুলি সে সময়ে সহজসাধ্য ছিল না এবং মধ্যযুগীয় রসায়নবিদ্‌দের মৌলিকতাকে সর্বাধিক বিব্রত করেছে।

প্রাচ্য থেকে আসা অন্য দুটি প্রায়োগিক উদ্ভাবন তাদের উৎসস্থলের তুলনায় প্রতীচ্যেই অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছিল। এগুলি হল কাগজ ও মুদ্রণের আবিষ্কার। সাক্ষরতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লেখার জন্য পার্চমেন্টের চেয়ে সস্তা কোনও উপকরণের প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠল। প্রথম উৎকৃষ্ট কাগজের উপাদান হিসাবে পাওয়া গেল ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। কাগজ এত ভালো ও সস্তা হয়ে উঠল যে এর বর্ধিত যোগানের ফলে নকলনবিশদের আপেক্ষিক অভাব দেখা দিল। মুদ্রণের সাফল্যে এর যথেষ্ট অবদান আছে। মুদ্রণ আদতে একাদশ শতাব্দীর একটি চৈনিক আবিষ্কার।

বিচ্ছিন্ন ধাতুর হরফ দিয়ে মুদ্রণ প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে কোরিয়ানদের দ্বারা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে এর ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে—প্রথমে উপাসনার বিষয়বস্তু এবং পরে বই ছাপার জন্য। নূতন, সস্তা, মুদ্রিত বইগুলি পঠনপাঠনের উন্নতি ঘটায় এবং অধিকতর সংখ্যক মানুষের পক্ষে শিক্ষাকে সহজলভ্য করে। আমরা দেখব যে এটি নবজাগরণের সময়ে বিরাট প্রায়োগিক, বৈজ্ঞানিক তথা সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হয়েছিল।

এককথায়, উল্লিখিত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ কতকগুলি ছোট ছোট প্রায়োগিক পরিবর্তন ঘটেছিল। নবজাগরণ ও শিল্পবিপ্লবের আলোচনায় যাওয়ার আগে মধ্যযুগের শেষভাগের অর্থনীতি ও ধ্যানধারণায় এসব প্রায়োগিক প্রগতির প্রভাবের মূল্যায়ন করা যাক। এর প্রয়োজন আছে, কারণ সামন্ততন্ত্রে তার স্বীয় রূপান্তরের বীজ নিহিত ছিল।

৬.২.২ মধ্যযুগীয় অর্থনীতির রূপান্তর

নূতন কৌশলগুলির ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, তাই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ল। বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল এবং উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থা সেবিষয়ে সাহায্য করল। বস্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ, সুরা এবং যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য লোহার মতো অন্য জিনিসগুলির উৎপাদনও বর্ধিত হওয়ায় বাণিজ্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্য যত বাড়তে থাকল, কৃষক ও শহরের কারিগরদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য বণিকদের মুনাফার আকারে তত বেশি অর্থ এনে দিতে লাগল। বর্ধিত মুনাফার ফলে আরও পণ্যদ্রব্যের এবং জমি থেকে বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। উন্নত প্রয়োগকৌশল, পরিবহণের উন্নততর ব্যবস্থা এবং বৃহৎ বাজারের দরুন বিক্রয়ার্থে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। ফলে সামন্ততন্ত্রের ভিতরে একটি বাণিজ্যিক ও নাগরিক শিল্পোৎপাদনের অর্থনীতি বাড়তে থাকল। এই পরিবর্তনগুলি স্থানীয় গ্রামীণ স্তরে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

যদিও গ্রামাঞ্চলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকদের আংশিক সময়ের কাজ ছিল, বাজারের উপরে আধিপত্য ছিল শহরবাসী বণিকদের। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বণিকেরা এত বিত্তশালী ও শক্তিশালী হয়ে উঠল যে বাণিজ্যে তারা একচেটিয়া স্থান অধিকার করল। তারা গিল্ড্ বা সঙ্ঘ গঠন করে তাদের অবস্থার সুযোগে সস্তায় পণ্যদ্রব্য কিনত এবং সেগুলিকে বিরাট লাভে বিক্রয় করত। বাজারের বিস্তার হতে থাকলে বণিকেরা বাণিজ্যপথগুলিতে যাতায়াতের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা চাইল। সেগুলি নানা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারীর মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং সেসব এলাকা নিজস্ব আইন ও বিধিনিষেধের অধীনে থাকত। সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও নব্য-ধনী বণিকশ্রেণীর মধ্যে কর্তৃত্বের সংঘাত চলছিল। ক্রমশ বণিকেরা সুবিধা করে নিতে থাকল। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে তারা অর্থনীতির রূপান্তর ঘটাতে শুরু করল। ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলক সেবার ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন যার বৈশিষ্ট্য, সেই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছিল এমন এক অর্থনীতিতে যেখানে কারিগর ও ভাড়াটে শ্রমজীবীদের দ্বারা পণ্যবস্তুর উৎপাদন এবং মূল্যপরিশোধে অর্থদান আধিপত্য লাভ করল।

এই অর্থনৈতিক, প্রায়োগিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির সঙ্গে এসেছিল চার্চের পরিবর্তনগুলি। এ পর্যন্ত চার্চ ছিল সর্বশক্তিমান। শিক্ষায়, এমনকি সাক্ষরতায় তার একাধিপত্য ছিল। শহরের উদীয়মান বণিক ও কারিগরেরা সামন্ততান্ত্রিক ধারাকে আশঙ্কিত করতে থাকলে চার্চের পরাক্রম সম্বন্ধেও সংশয়ের সূচনা হল। ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে চার্চ তাদের দমন করার চেষ্টা করেছিল। তবে মধ্যযুগের শেষ দুটি শতকে রোমক চার্চ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কয়েক স্থানে রাজারা রোমের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করতে শুরু করলেন। এবিষয়ে তাঁরা বণিকদের সাহায্য পেয়েছিলেন, যদিও গ্রামীণ অভিজাত সম্প্রদায় তখনও রক্ষণশীল চার্চের অনুকূলে ছিলেন। এভাবে চার্চের ঐক্য বিপন্ন হতে আরম্ভ করল। ১৩৭৮ থেকে ১৪১৮ সালের মধ্যে খ্রিস্টীয় চার্চ দু-তিনজন পোপের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। চার্চগুলির সাধারণ পরিষদটিকে অধিকতর কর্তৃত্ব দিতে হল। চার্চের সংস্কারের জন্য বড় বড় আন্দোলন আরম্ভ হল এবং শীঘ্রই পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

এটা পরিষ্কার যে পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা নাগাদ ইউরোপীয় সমাজ সাধারণভাবে বড় বড় পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল। নবজাগরণের পূর্ণ স্ফূরণের মঞ্চ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। নবজাগরণের দ্বারা আনীত পরিবর্তনগুলি এবং কীভাবে সেগুলি বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বিকাশের রূপ নির্ধারণ করল, আমরা পরবর্তী পরিচ্ছদে তা বর্ণনা করব।

অনুশীলনী—২

আমরা, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ভাঙনের জন্য দায়ী বিষয়গুলির তালিকা দিচ্ছি। নিম্নলিখিত উক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ করার জন্য শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(১) উন্নততর প্রয়োগকৌশলের ফলে ——— -এর উৎপাদন বাড়ল। উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বাজারগুলির বৃদ্ধির ফলে ——— যথেষ্ট প্রসারিত হল। এটি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির আঞ্চলিক ——— চরিত্রকে ধ্বংস করল।

(২) বণিকেরা বাজারগুলির উপরে আধিপত্য বিস্তার করল এবং বিশাল ——— তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলল। তারা ——— -দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল এবং ক্রমে জয়লাভ করতে থাকল।

(৩) বিক্রয়ের জন্য পণ্যের উৎপাদন এবং ——— দিয়ে তার দাম দেওয়া আধিপত্য লাভ করল এবং ——— -দের বাধ্যতামূলক সেবাভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে প্রতিস্থাপিত করল।

আমরা উপরে দেখেছি যে মধ্যযুগের শেষার্ধে শুরু-হওয়া প্রায়োগিক উন্নতিগুলির ফলে কৃষিজ ও অন্যান্য দ্রব্যের অধিকতর উদ্বৃত্ত সহজপ্রাপ্য হল। এতে বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার শুরু হল। জাহাজশিল্প ও নৌচালনার উন্নতির ফলেও বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। এর পরিণামে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পণ্যোৎপাদন ও অর্থবিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন ঘটল। বস্তুত এইসব পরিবর্তনের ফলে এক অনড় বংশানুক্রমিক মর্যাদাভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে শ্রম ও পণ্যের ক্রয়বিক্রয়-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের আন্দোলন গড়ে উঠল। নবজাগরণ (রেনেসাঁ) এবং সংস্কার (রিফর্মেশন) উক্ত আন্দোলনেরই দুটি দিক। আমরা এখন দেখব এই আন্দোলনটি কী ছিল এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশগুলির উপরে তার অভিঘাত সংক্ষেপে বিচার করব।

৬.৩ নবজাগরণ (১৪৪০-১৫৪০)

নবজাগরণ (রেনেসাঁ) ছিল একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন। এটি অতীতের সঙ্গে এক অভিপ্রেত ও সুস্পষ্ট সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দেয়। এটি অর্থনীতি, স্থাপত্য, শিল্প ও চিন্তার মধ্যযুগীয় আকারগুলিকে মুছে ফেলল। সেগুলির জায়গায় এল একটি নূতন সংস্কৃতি, অর্থনীতিতে যা পুঁজিবাদী, শিল্পে ও সাহিত্যে ক্ল্যাসিক্যালধর্মী এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানসম্মত। ভূস্বামী ও চার্চের আধিপত্যাধীন সামন্ততন্ত্র স্থান করে দিল জাতি-রাষ্ট্রগুলিকে, যেখানে কোনও রাজা বা রাজকুমার নূতন বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করলেন। ফলে এঁদের চার্চের উপরে আর নির্ভর করতে হল না। অর্থনীতিতে আবার সজীবতা আসায় অন্ধকার যুগের হতাশা এবং অন্ধবিশ্বাসের যুগের উদ্যমহীনতার জায়গায় এল বাস্তব উপভোগের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিয়ে চিহ্নিত এক আশার যুগ। পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে অর্থ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এমনকী অর্থার্জন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হল। সৎপথে উৎপাদন বা বাণিজ্য, নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন, নূতন খনির খনন, বিদেশীদের লুণ্ঠন অথবা সুদের বিনিময়ে ঋণদান—যে কোনও পদ্ধতি কার্যকর হলেই, অর্থার্জনের পক্ষে উত্তম বলে বিবেচিত হল।

নবজাগরণ ছিল ইউরোপের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের আন্দোলন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিতে শুরু হয়ে এটি সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। এর বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনার মাধ্যমে প্রকাশিত ক্ল্যাসিক্যাল প্রভাবের প্রয়োগবাদী পুনরভ্যুদয়।

এই পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় এখন আর কারিগর ও কারুকর্মীরা ক্ল্যাসিক্যাল যুগ বা মধ্যযুগের মতো ঘৃণিত রইলেন না, কারণ অর্থের আয় ও ব্যয় উভয়ের জন্যই তাঁরা অপরিহার্য ছিলেন। বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, সুতাকাটা, কাচনির্মাণ, খনির কাজ, ধাতুকর্ম ইত্যাদির মতো ব্যবহারিক কারুশিল্প মর্যাদা পেল। এর ফলে প্রথমদিকে কারিগরদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটল। কিন্তু পরে সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ বণিক ও পুঁজিবাদী উৎপাদকেরা উৎপাদনকে ক্রমাগত অধিক নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন। ফলে কারিগর ও কৃষক উভয়েই বেতনভুক্ শ্রমিকের স্তরে নেমে গেল।

মননশীলতার দিক থেকে নবজাগরণ ছিল এমন সব পণ্ডিত ও শিল্পীদের একটি ক্ষুদ্র, সচেতন ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অবদান, যাঁরা মধ্যযুগীয় জীবন ও চিন্তার সম্পূর্ণ ধারাটির বিরোধিতায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। নবজাগরণ কারিগর ও পণ্ডিতদের প্রথাগুলির মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত করেছিল। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্মী ও ভাবুকদের এই মিলনে বিজ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির মঞ্চও প্রস্তুত হল। এই যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কী কী পরিবর্তন হল, তা এবার দেখা যাক।

৬.৩.১ নবজাগরণের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি ছিল বর্ণনা ও সমালোচনার পর্যায়। প্রথমে শুরু হল প্রাচীন, প্রধানত গ্রীক জ্ঞানের অনুসন্ধান। পণ্ডিতেরা প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের চিন্তার মূল আকার তথা ডেমোক্রিটাস ও আর্কিমিডিসের চিন্তাধারারও সম্মুখীন হলেন। এরপর এল প্রাচীন চিন্তানায়কদের দ্বন্দ্বে আহ্বানের পালা। এই সময়েই চারুশিল্প ও প্রযুক্তিও সমৃদ্ধ হল এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বস্তুগত ভিত্তির ব্যবস্থা করল।

চারুশিল্প

সমাজে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মতো দৃষ্টিগোচর চারুশিল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করল। বিজ্ঞানের বিকাশে এগুলির প্রভাব ছিল গভীর। যেমন, চিত্রশিল্পীদের জ্যামিতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে তাঁরা ত্রিমাত্রিক আকারকে দ্বিমাত্রিকে প্রকাশ করতে পারেন। এজন্য তাঁরা বহু যান্ত্রিক ও আলোকতাত্ত্বিক সহায়তাও গ্রহণ করতেন। বাস্তবানুগ জীবনসদৃশ চিত্রাঙ্কনের জন্য নিসর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হত এবং এভাবে ভূবিদ্যা ও জীববৃত্তান্তের (ন্যাচারাল হিস্ট্রী) ভিত্তি স্থাপিত হল। মানুষের শারীরস্থানও (অ্যানাটমি) অত্যন্ত বিশদভাবে অধীত হল।

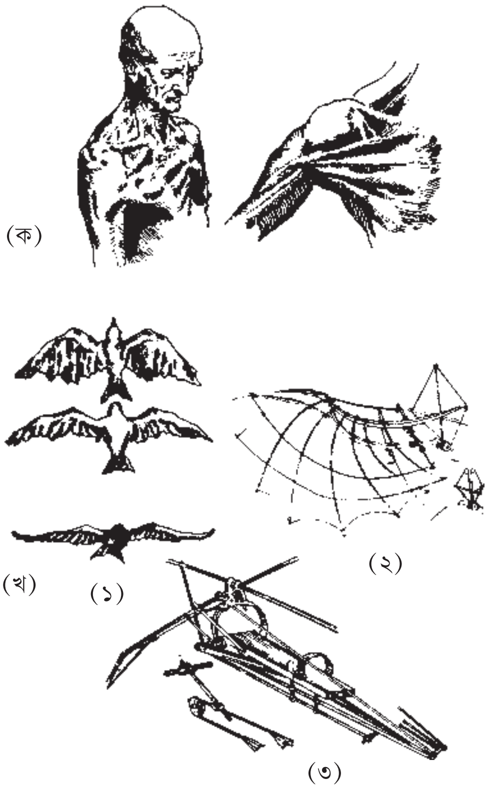

চিত্র ৬.৪ : লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কয়েকটি নকশা। (ক) পেশীসমূহের শারীরস্থানীয় বিবরণ। (খ) লিওনার্দো প্রথম উড্ডয়ন যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন—তিনি বহু বছর পাখিদের ওড়া পর্যবেক্ষণ করেন (১) একটি আদি উড্ডয়ন যন্ত্র—হাতের ক্র্যাংকের (২) সঙ্গে আঁকশি দিয়ে যুক্ত কাঠের পাখা (৩) উড্ডয়ন যন্ত্র।

নবজাগরণের যুগে চারুশিল্পী, স্থপতি ও এন্‌জিনিয়ারদের বৃত্তি স্বতন্ত্র ছিল না। চারুশিল্পীরা অসামরিক এবং সামরিক এন্‌জিনিয়ারও ছিলেন। তাঁরা মূর্তি নির্মাণ করতে, গির্জা বানাতে, বিলের জলনিকাশ করতে, এমনকি একটি নগর অবরোধ করতেও পারতেন। নবজাগরণের প্রখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর মনোরম চিত্র 'মোনালিসা'র জন্য আমাদের সকলের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু মানব শারীরস্থান, উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা যন্ত্রপাতি ও সামরিক সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে গবেষণায় তাঁর অবদানের কথা আমাদের মধ্যে অল্প লোকেরই জানা থাকতে পারে (চিত্র ৬.৪)। তাঁর চিত্রগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি ধাতুকর্মী এবং সৌধ ও সেতু-নির্মাতা কারিগরদের কাজকর্মেরও আগ্রহী পর্যবেক্ষক ছিলেন।

চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যা

বিশেষত ইতালিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিকিৎসাবিদ্যার ফ্যাকাল্টিগুলিই প্রথম সর্বব্যাপী কুসংস্কার ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। চিকিৎসকেরা চারুশিল্পী, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও এন্‌জিনিয়ারদের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করতেন। এই যোগাযোগের ফলে ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবরণধর্মী, শারীরস্থানীয় (অ্যানাটমিক্যাল) ও যান্ত্রিক ব্যাপারে আগ্রহ লাভ করে। মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে, সন্ধান করে ও মেপে দেখা হল এবং একটি অত্যধিক জটিল যন্ত্র হিসাবে তাকে ব্যাখ্যা করা হল। নূতন শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা ও রোগবিদ্যা (প্যাথোলজি) প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হল। দেহরস (হিউমার) ও মূলবস্তু (এলিমেন্ট্‌) সম্বন্ধে যে ক্ল্যাসিক্যাল ধারণাগুলির কথা আপনারা একক ৩-এ পড়েছেন, সেগুলির আধিপত্য এভাবে ভাঙতে শুরু হল।

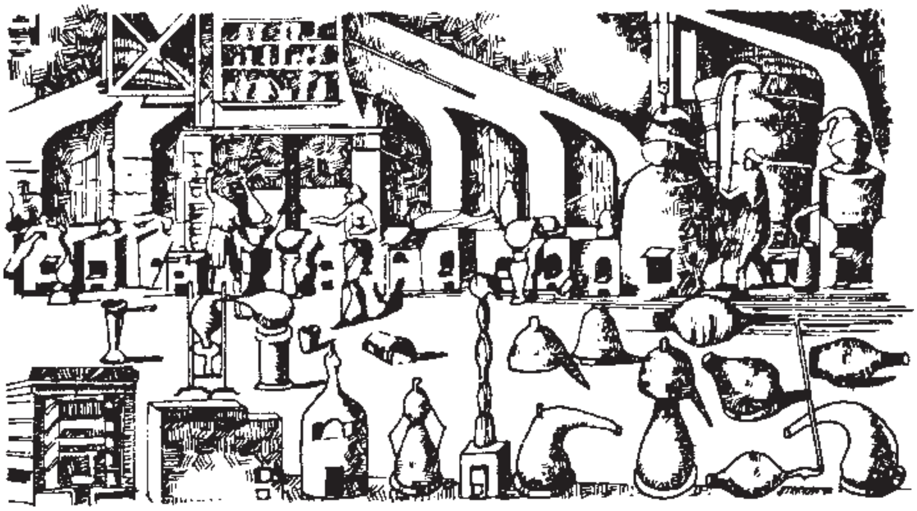

চিত্র ৬.৫ : অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগার।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে নবজাগরণের সর্বাধিক অগ্রগতি ঘটেছিল খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও রসায়নে। ধাতুর চাহিদার ফলে নূতন খনি খনিত হল। পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খনির কাজ বড় মাপের কাজ হয়ে দাঁড়াল। খনি যত গভীর হতে লাগল, জলনিকাশী এবং উত্তোলক যন্ত্রপাতি ততো অপরিহার্য হয়ে উঠল। ফলে বলবিদ্যা ও ঔদকবিদ্যার সূত্রগুলি সম্বন্ধে নূতন আগ্রহ উৎপন্ন হল।

লৌহ, তামা, দস্তা, বিসমাথ, কোবাল্ট ইত্যাদির মতো ধাতুগুলির বিগলন, নাড়াচাড়া ও পৃথকীকরণের ফলে জারণ, বিজারণ, পাতন ও সঙ্করীকরণের সঙ্গে জড়িত রসায়নের একটি সাধারণ তত্ত্বের উদ্ভব হল। এই প্রথম চিকিৎসায় ঔষধ হিসাবে ধাতব যৌগের প্রয়োগ ঘটল। বস্ত্র ও চর্মশিল্পের উন্নতিকল্পে এবং উত্তম মৃৎপাত্র নির্মাণের জন্য ফটকিরি ও মৃত্তিকার মতো অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চালানো হল। নবজাগরণের সমাপ্তি নাগাদ চুল্লী, বকযন্ত্র, পাতনযন্ত্র ও তুলাদণ্ড নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার যে আকার ধারণ করেছিল, আধুনিক কাল পর্যন্ত তা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে (চিত্র ৬.৫)।

নৌচালনা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

আগেই বলেছি যে, মধ্যযুগের শেষ নাগাদ স্থলপথে ও সমুদ্রপথে বড় মাত্রায় বাণিজ্য আরম্ভ হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ তুর্কেরা স্থলের বাণিজ্যপথগুলির উপরে একাধিপত্য লাভ করল। সুতরাং বাণিজ্যের জন্য নূতন নূতন সমুদ্রপথের অনুসন্ধান চলতে লাগল। বিরাট বিরাট সমুদ্রযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। আমরা সকলেই এক পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার কথা জানি, যিনি আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ১৪৯৭ সালে ভারতে পৌঁছান। প্রায় একই সময়ে ভারতে পৌঁছানোর আশায় অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্র দিয়ে পশ্চিমমুখে একটি বিরাট ও দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা পরিকল্পিত হয়। কপর্দকহীন নাবিক হওয়া সত্ত্বেও কলম্বাস নামে এক অনুপ্রাণিত দুঃসাহসিক ব্যক্তি এই যাত্রার জন্য পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইংরেজ ও ফরাসী রাজসভার সাহায্যলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতে পৌঁছেছেন ভেবে ১৪৯২ সালে তিনি একটি মহাদেশে গিয়ে উপস্থিত হন। পরে যার নাম হয় আমেরিকা। এই সমুদ্রযাত্রাগুলির সঙ্গে জড়িত দুঃসাহস, সাধারণ উত্তেজনা এবং শেষ পর্যন্ত বিরাট লাভের প্রত্যাশায় নূতন জাহাজ ও নৌচালনার যন্ত্র নির্মাণে প্রভূত উৎসাহ জাগাল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহ বলিষ্ঠভাবে পুনঃসঞ্চারিত হল।

কোপারনিকাসের বিপ্লব

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সব ঘটনার ঠিক মাঝখানে প্রাচীন চিন্তার সম্পূর্ণ রীতির সঙ্গে প্রথম বড় ধরনের বিচ্ছেদ ঘটল। এটি ছিল কোপারনিকাসের গবেষণা—পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলির নিজ নিজ অক্ষের উপরে আবর্তন এবং কেন্দ্রে অবস্থিত স্থির সূর্যের চারিদিকে তাদের গতি সম্পর্কে তিনি একটি পরিষ্কার ও বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। এই প্রতিরূপ বা মডেলটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনাকে সহজ ও নির্ভুলতর করল। কোপারনিকাসের প্রতিরূপটি সম্বন্ধে একক ৯-এ আরও পড়বেন। একক ৩ এবং ৪-এ যা দেখেছি, বহু শতাব্দী পূর্বে অ্যারিস্টার্কাসের মতো গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এরকম একটি প্রতিরূপেরই প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত ধারণাগুলির বিপরীত হওয়ায় এটিকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কোপারনিকাসের এই কাজটি ১৫৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুর বছরেই প্রকাশিত হয়। তাঁর গ্রন্থটি যদিও সীমিত মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাঁর প্রতিরূপটির বিরুদ্ধে আপত্তিও ওঠে, তবু তাঁর কাজটি গ্যালিলিওর গবেষণাকে যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়। পরে পরিচ্ছেদ ৬.৪-এ গ্যালিলিওর কাজ সম্পর্কে বলব।

চিত্র ৬.৬ : নিকোলাস কোপারনিকাস

আমরা যাকে এখন বিজ্ঞানবিপ্লব বলি, এটি ছিল তার প্রথম দশা। এই দশায় পুরাতন চিন্তাধারাগুলি অপ্রতুল প্রমাণিত হচ্ছিল। পুরাতন ধারণাগুলিকে বর্জন করে নবজাগরণের প্রবক্তারা পরবর্তী শতাব্দীগুলির নূতন ধারণাগুলির জন্য জমি পরিষ্কার করেছিলেন। প্রায়োগিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নবজাগরণ ভবিষ্যৎ বিকাশগুলির প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করেছিল। এখন থেকে বিজ্ঞান লাভজনক উদ্যোগে, বাণিজ্য ও যুদ্ধে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। পরবর্তী কালে বিজ্ঞান তার সেবাকে শিল্পোৎপাদন, কৃষি, এমনকি চিকিৎসাবিদ্যায় প্রসারিত করে দিতে পেরেছিল।

অনুশীলনী—৩

১) নবজাগরণের সময়ের পাঁচটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করুন।

....

....

....

....

....

২) কোপারনিকাসের বিপ্লবটি কী ছিল?

....

....

....

....

....

৬.৪ নবজাগরণোত্তর যুগে বিজ্ঞান (১৫৪০-১৭৬০)

আমরা উপরে দেখেছি উন্নত প্রয়োগকৌশল এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য কীভাবে বহু দেশে বিরাট সমুদ্রযাত্রাগুলির সূত্রপাত করে। মশলা, রৌপ্য, পশুরোম, চিনির জন্য ইক্ষুচাষ, ক্রীতদাস, সোনা এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য এগুলি করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে কলম্বাস যে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, তার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শেষ পর্যন্ত এর ফলে অনেক ইউরোপীয় আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা জমি পরিষ্কার ও বসতিস্থাপন করেন এবং আফ্রিকার মানুষদের কঠিন শ্রম শোষণ করে চিনির জন্য আখের চাষ এবং তামাকচাষ শুরু করেন। আফ্রিকার মানুষদের জোর করে পশ্চিমগামী জাহাজে তুলে নূতন দেশে নিয়ে এসে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হত। ক্রীতদাস হিসাবে মানুষের অপহরণ, বিক্রয় এবং শোষণ নিদারুণ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি নির্লজ্জের মতো এ কাজ করা হত কারণ নূতন উপনিবেশগুলি থেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করা যেত। ইউরোপে জাহাজশিল্পে, খনিতে ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করার মতো অর্থ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

এই ঘটনা বণিকশ্রেণীকে প্রভূত শক্তিশালী করে এবং তারা পরবর্তী দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে নিজ নিজ অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ও ভূস্বামীদের হাত থেকে তাদের এলাকার উপরে কর্তৃত্ব অধিকার করে। সামাজিক অসন্তোষ, কৃষকবিদ্রোহ, ধর্মীয় যুদ্ধ এবং উপনিবেশ অধিকারের প্রতিযোগিতা, সব কিছুই ইউরোপের কোনও কোনও অঞ্চলে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত করায় ভূমিকা গ্রহণ করছিল। উৎপাদনের একটি মুখ্য পদ্ধতিরূপে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের এক নূতন পদ্ধতি—পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পদ্ধতি।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সময়টিতে বিজ্ঞানে প্রথম বিরাট সাফল্যগুলির মধ্যে ছিল নূতন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি। নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশসহ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি 'বিজ্ঞানবিপ্লব' হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়োগিক দিক থেকে সময়টি ছিল কোনও বৈপ্লবিক উদ্ভাবন ছাড়াই বিজ্ঞানের নিয়ত অগ্রগতির কাল। লৌহের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিণামে নূতন মারুত-চুল্লী বা ব্লাস্ট ফার্নেসের বিকাশ ঘটে। লৌহ বিগলনের জন্য কাঠের অপ্রতুলতার ফলে কয়লার বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয়। তখন থেকে শিল্পকেন্দ্রগুলি কয়লাখনি অঞ্চলের দিকে সরে যেতে থাকে। ফলে সীমাবদ্ধ সম্পদের চাহিদা বাড়ায় নূতন সম্পদ ও প্রয়োগকৌশলগুলির সন্ধান বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এর ফলে পরিবর্তন ও অভিনবত্ব সম্বন্ধে মনোভাবেরও বদল ঘটে এবং সেগুলিকে আর পরিহার করতে পারা যায়নি। স্মরণ করতে পারেন, নিয়মনিষ্ঠ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নূতন ধারণা ও পরিবর্তনগুলিকে বাধা দেওয়া হত।

এই আবহাওয়াতেই ইউরোপীয় বিজ্ঞান সুপরিণত হয়। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম সংস্থা গ্রেসাম কলেজ ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে স্থাপিত হয়। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, সৌরজগৎ সম্বন্ধে কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক প্রতিরূপ বা মডেল জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণীগুলির উন্নতি ঘটায়। তত্ত্বটিতে যার অভাব ছিল, তা হল গ্রহগুলির কক্ষের সঠিক পরিমাপ। একাজ করেন দুজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১) এবং যোহান কেপ্লার (Johannes Kepler, ১৫৭১-১৬৩০)। ব্রাহে বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রের দ্বারা নক্ষত্র এবং গ্রহগুলির অবস্থানের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ছবিগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁর ফলাফলগুলি নিয়ে কেপ্লার তাত্ত্বিক গবেষণা করেন। কেপ্লার দেখেন, কেবল কক্ষগুলিকে উপবৃত্তাকার বলে ধরে নিলেই এই পর্যবেক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এভাবে তিনি বৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা থেকে সরে আসেন। গ্রহগুলির গতি সম্বন্ধে কেপ্লারের সূত্র সঠিক বৃত্তাকার গতিবিষয়ক প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারাকে মারাত্মক আঘাত করে। এঁদের কাজের আরও বিস্তারিত বিবরণ আপনারা একক ৯-এ দেখতে পাবেন।

এই সময় নাগাদ আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনরূপে প্রমাণিত হয়। পাদুয়ায় পদার্থবিদ্যা ও সামরিক এন্‌জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক গ্যালিলেও গ্যালিলেই-এর (Galileo Galilei, ১৫৬৪-১৬৪২) হাতে এসে এটি বিজ্ঞানে বিপ্লবের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। গ্যালিলেও দেখতে পেলেন, চন্দ্র সম্পূর্ণ গোলাকার ও মসৃণ উপগ্রহ নয়; বরং এখানে শৈলশিরা ও উপত্যকা বর্তমান। তিনি আরও লক্ষ্য করেন, চন্দ্রের মতো তিনটি উপগ্রহ বৃহস্পতি গ্রহটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়, মোটামুটি যেমন পৃথিবীর আবর্তন সম্বন্ধে কোপারনিকাস প্রস্তাব করেছিলেন। এক মাসের মধ্যে ১৬১০ খিষ্টাব্দে গ্যালিলেও তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি Siderius Nuntius (নক্ষত্রের দূত) গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে, কারণ পৃথিবীকে ঘিরে জ্যোতিষ্কগুলির আবর্তন সম্বন্ধে দুহাজার বছরের প্রাচীন প্রতিরূপটি এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ে। এতকাল বিশ্বের স্বীকৃত মত ছিল, ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি মানুষ পৃথিবীতে বাস করে বলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে—এমন বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। এই মতের বিরুদ্ধে গ্যালিলেওর গ্রন্থটি যুদ্ধ ঘোষণা করল।

চিত্র ৬.৭ : গ্যালিলেও গ্যালিলেই।

গ্যালিলেওর আরও বিশদ কাজকর্ম ১৬৩২ সালে Dialogue concerning the Two Chief Systems of the World, the Ptolemaic and the Copernican নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। বস্তুত এটি তিনি পোপকে উৎসর্গ করেন। এতে তিনি প্রাচীন টলেমীয় মহাজাগতিক তত্ত্বকে (Ptolemaic cosmology) সমালোচনা ও উপহাস করেছিলেন। গ্যালিলেওর প্রতিকূল ধারণাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। পৃথিবী ও গ্রহগুলির গতিবিষয়ক পুঁথিগত বিচারমাত্রের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বিপন্ন বলে মনে করা হয়েছিল। একটি বিষয়ে প্রতিকূলতাকে অবহেলা করলে এমন আরও অনেক বিরুদ্ধতার উন্মেষ ঘটতে পারে। নূতন জ্ঞান চার্চের স্থায়িত্ব এবং সমাজব্যবস্থাকেও বিপন্ন করল। এর পরিণামে অবিলম্বে চার্চের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হল, যার ফলে গ্যালিলেওর বিচার হল। তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে নিজের উক্তি প্রত্যাহারে বাধ্য করা হল।

অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও তত্ত্বের দ্বন্দ্বকে গ্যালিলেওর বিচার নাটকীয় করে তোলে। গ্যালিলেও যে বছর মারা যান, ঘটনাচক্রে সে বছরেই নিউটনের জন্ম হয়। আমরা পরে দেখব, নিউটন গ্যালিলেওর বৈজ্ঞানিক ধারার অনুসরণ করেন। মহাকাশের গ্রহ অথবা পৃথিবীপৃষ্ঠের বস্তু—যাই হোক না কেন, সকল বস্তুরই গতি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তিনি দিয়েছিলেন। এ থেকে দেখা যায়, সেযুগের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক ধারাকে দমন করা আর চার্চের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। ইতিপূর্বে যদিও বিশ্ব সম্বন্ধে অ্যারিস্টোটলীয় মতবাদের বিরোধিতা এবং কোপারনিকান তত্ত্বের সমর্থন করার জন্য জিওর্দানো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়েছিল এবং ক্যাম্পানেল্লাকে (১৫৬৮-১৬৩৯) বহু বছর কারারুদ্ধ রাখা হয়েছিল, কিন্তু গ্যালিলেওকে তাঁর এক বন্ধুর প্রাসাদে নামমাত্র বন্দীজীবন যাপন করতে হয়। নিউটনের সময় নাগাদ বিজ্ঞানে চার্চের হস্তক্ষেপ মোটামুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

চার্চের দ্বারা বিচার এবং অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও গ্যালিলেও থেমে যাননি। কোপারনিকাসের প্রস্তাবিত তন্ত্র কীভাবে আছে, তা তিনি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। এর জন্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল, পৃথিবীর আবর্তন কেন বিপরীতমুখী শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে না এবং কোনও বস্তু বাতাসে নিক্ষিপ্ত হলে কেন পিছনে পড়ে থাকে না। এ থেকে গতিশীল বস্তুর সম্বন্ধে গুরুতর গবেষণা শুরু হয়। সতর্কভাবে সম্পাদিত পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে গ্যালিলেও বস্তুর গতির একটি গাণিতিক ব্যাখ্যার সূত্র প্রণয়নে সক্ষম হলেন। তাঁর জীবনের এই প্রধান কাজটি তাঁর Dialogue on Two New Sciences গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সকল স্বীকৃত মতবাদ সম্বন্ধে গ্যালিলেও প্রশ্ন তুলেছিলেন। এটি তিনি করেছিলেন নূতন পদ্ধতিটি অবলম্বন করে—পরীক্ষা-নির্ভর পদ্ধতি। গ্যালিলেওর পরীক্ষা যখন এমন ফলাফল দিল যা তিনি আশা করেননি, তখন তিনি এসব ফলাফলকে বর্জন করলেন না। বরং তিনি তাঁর নিজ যুক্তিগুলিকে আবার প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। এটিই হল পরীক্ষাশ্রয়ী বিজ্ঞানের পরিচয়চিহ্ন।

গ্যালিলেও ও কেপ্লার বস্তুর গতি সম্বন্ধে গাণিতিক ব্যাখ্যার সূত্র দিতে পেরেছিলেন, কারণ নবজাগরণের সময়ে বিকশিত নব্য গণিতে তাঁরা ছিলেন সুদক্ষ। প্রাচীন মনীষী ও আরবদের নিকট থেকে গৃহীত বীজগণিত, জ্যামিতি ও দশমিক পদ্ধতি এবং নেপিয়ার (১৫৫০-১৬১৭) কর্তৃক প্রবর্তিত লগারিদম্ (logarithm) জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনাকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিল। চল্লিশ বছর পরে কেপ্লারের পর্যবেক্ষণীয় সূত্রগুলিকে নিউটনের ব্রহ্মাণ্ডীয় মহাকর্ষবাদে গ্যালিলেওর ব্যাখ্যাগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। আমরা অচিরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এই যুগে বিজ্ঞানে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিকাশও ঘটেছিল। এই প্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে চুম্বকত্বের সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) কর্তৃক মানবদেহে রক্ত-সংবহন আবিষ্কার। এ থেকে একক ৩-এ বর্ণিত গ্যালেনের ধারণাগুলির সঙ্গে আরও একবার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছিল। একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হল এবং যন্ত্রপাতিতে যেমন থাকে, তার অনুরূপ পাম্প ও ভাল্‌ভের নীতি থেকে মানবদেহের বিশ্লেষণ করা হল। এর ফলে এক নূতন ধরণের পরীক্ষানির্ভর শারীরস্থান ও শারীরবিদ্যার উৎপত্তি ঘটল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ঘটনাগুলি ক্রিয়াকলাপের এমন এক বিস্ফোরণ ঘটায়, যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করে। সেযুগে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের দুটি প্রধান কেন্দ্র ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে স্থিতিশীল সরকারের উদ্ভব এবিষয়ে সাহায্য করেছিল।

ব্রিটেনে বণিকেরা ভূস্বামীদের সঙ্গে একটি মীমাংসায় পৌঁছাল, যাতে রাজা হয়ে গেলেন নিয়মতান্ত্রিক নৃপতি। অর্থনীতিতে বণিকদেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, দক্ষ কারিগরদের মধ্য থেকে উৎপাদনকারীদের এক নূতন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটছিল। বিগত যুগের রাজকুলের অনুগ্রহনির্ভর সভাসদবর্গ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতবর্গের স্থান অধিকার করতে লাগলেন স্বাধীন বৃত্তির মানুষেরা। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বণিক, ভূস্বামী, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং বেশ কিছু ধর্মযাজক। নিজের অর্থেই তাঁরা বিজ্ঞানচর্চার ব্যয় নির্বাহ করতেন। এঁদের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকল, আলোচনা ও ভাববিনিময়ের জন্য মিলিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিল।

এভাবেই গড়ে উঠল প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসমিতিগুলি—রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন (১৬৬২) এবং ফরাসী রয়্যাল আকাদমি (১৬৬৬)। পাম্প চালনা ও ঔদকবিদ্যা (হাইড্রলিকস্‌), আগ্নেয়াস্ত্রক্ষেপণবিদ্যা ও নৌচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালীন আশু প্রায়োগিক সমস্যাগুলির সমাধানে মনোনিবেশ করার কর্তব্যে সমিতিগুলি ব্রতী হয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, বিজ্ঞানে অনুসন্ধানের দ্বারা সব বিষয়েই উন্নতি ঘটানো সম্ভব। অবশ্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। এগুলির সঙ্গে ক্রমপ্রসারী বাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাসমুদ্রে নৌচালনার জন্য যার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশগুলির পরিণামে এল ব্রহ্মাণ্ডের নিউটন-প্রদত্ত নূতন গাণিতিক ব্যাখ্যাটি। বিজ্ঞানের এটি এক প্রধান সাফল্য।

চিত্র ৬.৮ : আইজাক নিউটন

সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বপ্রধান সাফল্য ছিল বলবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্রতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করা। এই তন্ত্রটি বিশ্বজনীন সূত্র ও তত্ত্বগুলির সাহায্যে জ্যোতিষ্কগুলির গতি তথা পৃথিবীপৃষ্ঠে বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হল। বহু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলবিদ্যার এই সম্পূর্ণ আকারটি আবিষ্কারের জন্য কাজ করেছিলেন; এঁদের মধ্যে ছিলেন গ্যালিলেও, কেপ্‌লার, দেকার্তে, হুক, হাইগেন্‌স্‌, হ্যালি, রেন প্রভৃতি বিজ্ঞানের তৎকালীন প্রায় সকল প্রখ্যাত ব্যক্তি। এই দিকপালদের কাজের অনুসরণেই গবেষণা করে নিউটন শেষ পর্যন্ত তাঁর

ব্রহ্মাণ্ডীয় মহাকর্ষবাদ প্রমাণিত করেন এবং সেটিকে তাঁর De Philosophiae Naturalis Principia Mathematica গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

নিউটনের ব্রহ্মাণ্ডীয় মহাকর্ষবাদ সমস্ত ভরবিশিষ্ট কণা বা বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা সেগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠে, সূর্যে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও স্থানেই থাকুক না কেন। বর্তমানে আমাদের কাছে নিউটনীয় বলবিদ্যা নামে পরিচিত এই তত্ত্বটি ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুর গতি অর্থাৎ কীভাবে তারা চলাচল করে সেবিষয়ে একটি সুসংলগ্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে। নিউটনীয় বলবিদ্যা ব্যবহার করে যে কোনও গতিশীল বস্তুর গতিপথ নির্ণয় করা সম্ভব, যদি তার উপরে ক্রিয়া করছে এমন সমস্ত বলই জানা থাকে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র সকল বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে নিউটনের গতিসূত্রগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। নিউটনের কাজের তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক পরিণাম হয়েছিল এই যে, অত্যল্প পর্যবেক্ষণ করেও চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান অনেক বেশি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হল। বর্তমানে ব্যবহৃত এবং আগামী শতাব্দীগুলিতেও ব্যবহার্য বহু প্রকার যন্ত্র ও গঠনকাঠামোর পরিকল্পনাতেও এই তত্ত্বটি ভিত্তিস্বরূপ হয়েছে।

কোপারনিকাস অ্যারিস্টোটলীয় বিশ্বদর্শনের যে রূপান্তরের সূচনা ঘটিয়েছিলেন, নিউটনের মহাকর্ষবাদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান তার অন্তিম দশার দ্যোতক। নিউটন ব্রহ্মাণ্ডের এমন এক গতিশীল দৃশ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে বস্তুগুলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তথাপি কোনও দৈব পরিকল্পনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। তাঁর বিশ্ব একটি সরল সূত্রানুসারে চলছিল, কিন্তু তবুও তাকে সৃষ্টি করতে এবং গতিশীল করতে দৈব হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। গ্রহগুলি কেন একই পথে ঘুরে চলেছে, তাঁর তত্ত্বে তার কোনও কারণ দর্শানো হয়নি। তিনি স্বীকার করলেন, সৃষ্টির সূচনায় এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল। নিউটন অনুভব করলেন যে তিনি দৈব পরিকল্পনা উদঘাটন করেছেন; তিনি এর বেশি কোনও প্রশ্ন করতে চাইলেন না। নবজাগরণ বা রেনেসাঁয় সমালোচনার দশাটি নিউটনের সময় নাগাদ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক নূতন সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস চলছিল। নিউটনের কাজকর্ম বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে এই সন্ধির ভিত্তিস্বরূপ হয়েছিল। যতদিন না ডারউইন ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সন্ধিকে বিপর্যস্ত করে দিলেন, ততদিন পর্যন্ত এটি অব্যাহত রইল।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিকাশ ঘটেছিল, যথা—আলোকবিদ্যা ও আলোকতত্ত্বে, যেগুলি দূরবীক্ষণের দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অণুবীক্ষণের দ্বারা জীববিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বহুলাংশে প্রতিসরণ বোঝবার প্রয়াসগুলি থেকেই সপ্তদশ শতাব্দীতে আলোকবিদ্যার বিকাশ ঘটে। সমকালেই আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তত্ত্বগুলি প্রস্তাবিত হয়। অন্য একটি বিকাশের ক্ষেত্র ছিল গ্যাসের যান্ত্রিক ধর্মসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বা গ্যাসবিদ্যা (pneumatics)। শূন্য বা ভ্যাকুয়মের প্রশ্নটিরও গুরুত্ব ছিল। শূন্যতার প্রকৃত উৎপাদন এবং তার জন্য বায়ুপাম্পের ব্যবহার রবার্ট বয়েলকে বায়ুর চালচলন অনুসন্ধানে প্রণোদিত করে; কাজেই গ্যাসসূত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী কাজটি এরই পরিণাম। সেযুগের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষানির্ভর পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন বয়েলের এক সহকর্মী রবার্ট হুক। স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত হলেও বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ বিস্তৃত ছিল।

অণুবীক্ষণ উদ্ভাবনের ফলে জীববিদ্যার জগতে প্রভূত অগ্রগতি দেখা যায়। ছোট ছোট প্রাণীকে পর্যবেক্ষণ করা হল এবং বৃহত্তর প্রাণীগুলির শারীরস্থান সম্বন্ধে ধারণা আরও শোধিত হল। রসায়নে ফসফরাসের মতো নূতন নূতন পদার্থ আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হল এবং বিসমাথ ও প্ল্যাটিনামের মতো নূতন ধাতুগুলি আবিষ্কৃত হল।

অনুশীলনী—৪

নিচে দেওয়া সারণীর প্রথম কলমে তালিকাভুক্ত নবজাগরণোত্তর যুগের বিজ্ঞানীদের নামের সঙ্গে দ্বিতীয় কলমে তালিকাভুক্ত তাঁদের কাজগুলি সঠিকভাবে মিলিয়ে দিন।

১	২
(ক) টাইকো ব্রাহে	(১) লগারিদম সারণীর বিকাশ ঘটান।
(খ) যোহান কেপ্লার	(২) গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করেন।
(গ) গ্যালিলেও গ্যালিলেই	(৩) গ্রহের গতিসূত্রগুলি আবিষ্কার করেন।
(ঘ) জন্ নেপিয়ার	(৪) গ্যাসসূত্রগুলি বিবৃত করেন।
(ঙ) উইলিয়ম হার্ভে	(৫) সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের প্রতিরূপ বা মডেল প্রতিষ্ঠা করেন; বস্তুর গতির গাণিতিক বর্ণনা দেন।
(চ) আইজাক নিউটন	(৬) পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের সূত্র আবিষ্কার করেন।
(ছ) রবার্ট বয়েল	(৭) রক্তসংবহন আবিষ্কার করেন।
(জ) রবার্ট হুক	(৮) ব্রহ্মাণ্ডীয় মহাকর্ষবাদ বিবৃত করেন।

আমরা দেখেছি, এভাবে বিজ্ঞানবিপ্লবের এই যুগে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিদ্যার মতো বহুক্ষেত্রে পথিকৃৎ অগ্রগতি ঘটেছিল। আরও যেসব ক্রিয়াকলাপ অন্য অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করেছিল, সেগুলির জন্যও মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল। ইউরোপে সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিও বিজ্ঞানের প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল। ইউরোপীয় সমাজের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানে বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশে সাহায্য করেছিল, সেগুলি আমরা এবারে আলোচনা করব।

৬.৪.১ ইউরোপে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল কেন

পিছন দিকে পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে নূতন বিজ্ঞানের বিকাশের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, বিজ্ঞানের জন্ম কেন, কখন এবং কোথায় হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে এটি শিল্পবাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনকে খুব কাছাকাছি অনুসরণ করেছে। প্রসারমান বাণিজ্য ও সফল সমুদ্রযাত্রা থেকে পাওয়া মুনাফাকে নূতন নূতন কাজকর্মে বিনিয়োগ করায় বুদ্ধিজীবীয় প্রয়াসের একটি আবহাওয়া উৎপন্ন হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ধনতন্ত্রের জন্মকে খুব কাছাকাছি অনুসরণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বণিক ও ভদ্রলোকেরা উৎপাদকদের এক অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীর সমৃদ্ধিলাভের জমি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। এঁরাই পরের শতাব্দীতে প্রথাগত উৎপাদনকৌশলগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন এবং সেগুলির আমূল পরিবর্তনসাধন করেছিলেন। রাষ্ট্রনীতির মতো বিজ্ঞানেও প্রচলিত প্রথা থেকে বিচ্ছেদের অর্থ ছিল এপর্যন্ত অজ্ঞাত ক্ষেত্রগুলিতে বিচরণের সাহস করা। নূতন বিজ্ঞানীদের আগ্রহের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অংশই আর খুব দূর ছিল না, কোনও বৃত্তিই খুব অবজ্ঞেয় রইল না। বিজ্ঞানীরা যে পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করেছিলেন, বিজ্ঞানসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গবেষণাপত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, এতেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য হয়েছিল।

চার্চের অভ্যন্তরীণ কলহ, বণিকশ্রেণীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ এবং সাধারণভাবে তার কর্তৃত্ব ক্ষয়ের ফলেও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। সূচনায় মনে হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধে চার্চের প্রতিরোধ ছিল বেশ শক্তিশালী। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল গ্যালিলেওর বিচারে এবং ব্রুনোর প্রাণদণ্ডে—যে ব্রুনো এই ধর্মবিরুদ্ধ উক্তি করেছিলেন যে আকাশে আমাদের বিশ্বের মতো অন্যান্য বিশ্ব থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নূতন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাফল্য ছিল অপ্রতিরোধ্য।

আগে যেমন বলেছি, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা সন্ধির অনুসন্ধান চলছিল। তাই বিজ্ঞান ও ধর্মের সহাবস্থানের জন্য পথ ও উপায় অনুসন্ধান করা হল। এর ভিত্তি ছিল, বিজ্ঞানের উচিত কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারগুলি নিয়ে আলোচনা করা; অন্য যে বিষয়গুলির প্রকৃতি আধ্যাত্মিক বা নান্দনিক, বিজ্ঞানের উচিত সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখা। এভাবে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কলাবিদ্যা এবং মানববিদ্যার মধ্যে একটা কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্ট হল, যা আমরা আজও দেখি। পক্ষান্তরে, নিউটনের সময় থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরা অধিকতর স্বাধীনতায় এবং ধর্মের দিক থেকে কার্যত কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম হলেন। আমরা যেমন দেখেছি, ব্যবহারিক উপকারিতার সঙ্গে, ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে অথবা বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংযোগ ঘটে, তা দেখার জন্য বিজ্ঞানসমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন বস্তু নির্মাণ বা উৎপাদন করছিলেন যে ব্যক্তিরা এবং যেসব পদার্থ নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে সেগুলির ধর্ম সম্বন্ধে বুঝতে চাইছিলেন যে বিজ্ঞানীরা, এঁদের একত্রে কাজ করার ফলেও এযুগে বিজ্ঞানের সাফল্য ঘটেছিল। এর কারণ ছিল, প্রভূত মুনাফার উৎস হওয়ায় কায়িক শ্রমকে অধিকতর সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সনাতন ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যে অনড় স্তরানুক্রমিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ নিজের স্থান জানত, তার থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্ব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এখন এটি ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিশ্ব, যেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজের পথ নির্মাণ করে নিচ্ছিল।

ইউরোপে এই চমকপ্রদ ঘটনাগুলির দুটি দিক ছিল। ক্রমপ্রসারী উৎপাদন ও বাণিজ্য এবং তার ফলে বাজার সন্ধানের পরিণামে ইউরোপীয়রা এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে প্রবেশ করল। উপনিবেশগুলির সৃষ্টি হল এবং সেগুলির সম্পদ ইউরোপীয় দেশগুলিতে আসতে শুরু করল; এতে এসব দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অনেক উন্নতি ঘটল। অন্যদিকে এটা ছিল উপনিবেশের মানুষদের পক্ষে দুর্ভাগ্য; তাদের কারুশিল্প ও শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল এবং শাসকদেশে রপ্তানির জন্য তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যবহৃত হল। ভারতকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাধীনে আনার বিষয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা সুবিদিত। আমাদের দেশ ও এদেশের মানুষের ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে ভারতে চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার উৎস নিহিত। এই বিষয়ে একক ৭-এ আমরা আরও আলোচনা করব।

আমরা এখন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কাছাকাছি সময়ের একটি প্রধান ঘটনা অর্থাৎ ইউরোপে বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনে **শিল্পবিপ্লব** সম্বন্ধে আপনাদের বলব। ব্যাপক মাত্রায় বাষ্পচালিত যন্ত্র ব্যবহারের সামর্থ্য থেকেই এর উদ্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে উৎপাদনের পদ্ধতি ও ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। পরিণামে এটি সামাজিক গঠনেও গভীর পরিবর্তন নিয়ে এল।

৬.৫ শিল্পবিপ্লব (১৭৬০-১৮৩০) এবং তারপর

প্রথমে আমরা এই যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব, যাতে

বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার আরও অগ্রগতির মঞ্চ তৈয়ারি হয়ে গিয়েছিল। উৎপাদন, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক, এমনকি রাজকীয় বিধিনিষেধও ভেসে গিয়েছিল। তীব্রতম রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিজীবীয় সংগ্রামের পরেই শুধু বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তাদের উদ্ভাবিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার জয় হয়েছিল।

ব্রিটেনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা ভেঙে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছিল। সারা বিশ্বে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ক্রমবিস্তারী বাজারের দৌলতে তারা মুনাফার জন্য শিল্পোৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারত। বাজারের প্রসার, উৎপাদনের উপরে বিধিনিষেধ থেকে ক্রমবর্ধমান মুক্তি এবং লাভজনক উদ্যোগে বিনিয়োগের সুযোগবৃদ্ধির ফলে বিরাট বিরাট প্রায়োগিক উদ্ভাবনের উপযুক্ত সময় এসে গেল।

তাই দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পণ্য উৎপাদনের মন্থর ও ক্রমিক পরিবর্তনের স্থানে এল এক দ্রুত পরিবর্তন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বিপ্লব থেকে উদ্ভূত পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের নূতন পদ্ধতিগুলি এখন মানুষের অভিজ্ঞতার সর্বক্ষেত্রেই বিস্তারিত হল। নূতন যন্ত্রকৌশল সৃজনেও সেগুলির প্রয়োগের ফলে উৎপাদনপদ্ধতিতে বিরাট রূপান্তর ঘটল। একেই আমরা শিল্পবিপ্লব বলি। কারুশিল্পীরা হলেন শিল্পবিপ্লবের স্থপতি। কারিগরেরা তাঁদের স্বল্প সঞ্চিত বা ঋণ-করা পুঁজি নিয়ে এই প্রথম উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্ষুদ্র কারুশিল্পীদের উৎপাদনের উপরে বণিকদের কর্তৃত্বও ভাঙতে থাকল।

শিল্পবিপ্লব এসেছিল মুখ্যত শিল্পের বিকাশ থেকে—তাও আবার সে সময়ের প্রধান শিল্প অর্থাৎ

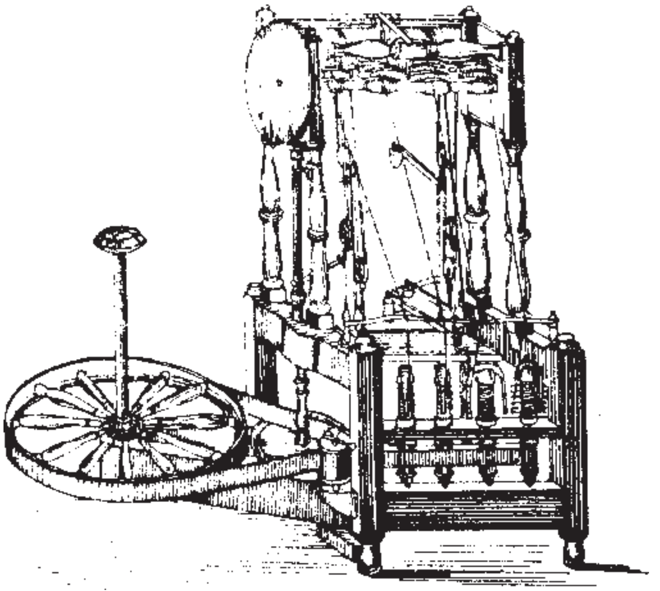

চিত্র ৬.৯ : একটি সুতাকাটার কল। পুরাতন চরকার তুলনায় অনেক দ্রুততর সুতা কাটতে এবং অনেক মজবুত সুতা উৎপাদন করতে পারত। অতীতে তুলার সঙ্গে যে শণ মেশানো হত, তার পরিবর্তে এটি কেবল তুলা দিয়েই বস্ত্রবয়ন সম্ভব করেছিল।

বস্ত্রশিল্পে। বস্ত্রের চাহিদা যেমন বাড়ছিল, তার পূরণের জন্য তত দ্রুত পুরাতন শিল্পটি বিস্তারলাভ করতে পারছিল না। এছাড়া ১৭৫০ সাল নাগাদ শিল্পকে এক নূতন তন্তু অর্থাৎ তুলার মোকাবিলা করতে হল।

আগে কার্পাসবস্ত্র ভারত থেকে আমদানি করা হত। ভারত থেকে ব্রিটেনে কার্পাসবস্ত্রের আমদানি নিষিদ্ধ হলে সুতিবস্ত্রের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভূত উদ্দীপনা পেল। কার্পাসতুলার ব্যবহারের জন্য নূতন শিল্পকৌশলের প্রয়োজন হল। এবারে শেষ পর্যন্ত এই তুলাশিল্পে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্র ব্যবহারের সীমাহীন সুযোগ ঘটল। বহু দশক ধরে যে প্রায়োগিক পরিবর্তনগুলি ঘটে আসছিল, সেগুলি থেকে সুতাকাটার ও বস্ত্রবয়নের জন্য কয়েকটি যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ধারণাটি এল। হাতে যেসব কাজ করা হত, সেগুলির পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহারে কায়িক শ্রম অনেক হ্রাস পেল (চিত্র ৬.৯)।

চিত্র ৬.১০ : শিল্প উৎপাদন-এতে একজন কর্মী একই সরল কাজের পুনরাবৃত্তি করে। এই নকশাটিতে জনৈক কর্মী সারিবদ্ধ টেবিলগুলির উপরে ব্লকগুলি বসাচ্ছে এবং চাকার উপরে স্থাপিত টেবিলগুলি লাইনপাতা পথে কারখানার ছাঁচে-ফেলা, ঢালাই-করা ও অন্যান্য কাজের ঘরগুলি দিয়ে যাচ্ছে।

বস্ত্রশিল্প অন্যান্য শিল্পেরও বিকাশের বিষয়ে পথ দেখাল। বস্ত্রশিল্পের ও বস্ত্র পরিমার্জনের যন্ত্রপাতির বাজার লৌহ ও রাসায়নিক শিল্পগুলিকে উদ্দীপনা যোগাল। এইসব শিল্পের জন্য কয়লার ক্রমবর্ধমান সরবরাহের প্রয়োজন হল, যার ফলে খনিশিল্প ও পরিবহণে নূতন নূতন বিকাশের আবশ্যকতা দেখা দিল। কয়লা অঞ্চলগুলিকে ঘিরে নূতন যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ ঘটল। অবশ্য বস্ত্রশিল্পে শক্তির জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহারই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিশ্বে জটিল শিল্পব্যবস্থা সৃষ্টি করল। এটি বস্ত্র উৎপাদনে এতখানি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাল যে পণ্যবস্তুর উৎপাদন ২০ বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেল। খনিশিল্প, ধাতুশিল্প, এমনকি কৃষির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকীকরণের ধারণাটির দ্রুত বিস্তার ঘটল। আকস্মিক বিরাট পরিবর্তন ঘটানোর বিষয়ে এর সম্ভাবনার দিকে অচিরে সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। গগনচুম্বী লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অনুসন্ধান তীব্রতর হল। বাণিজ্য চালানোর জন্য যানবাহন ও যোগাযোগের সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন বহুদিন ধরেই খনিতে এবং তারপরে, ইতিমধ্যে গড়ে-ওঠা 'কারখানা'গুলিতে যন্ত্র

হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এখন বহুদূর পথে ভারী মাল বহনের জন্য এটিকে রেলের উপরে বসানো হল। এইভাবে রেলপথ শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করল এবং বাষ্পীয় পোতগুলি শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করতে ও উৎপাদিত পণ্য দূরদেশে বিতরণ করতে থাকল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন উৎপাদনের পথ খুলে গিয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তেমনি হল যোগাযোগ ব্যবস্থার। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের মতো দূর অতীতেও কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে বার্তা পাঠাতে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু এখন বহু দূরেও ব্যবসাবাণিজ্য চালানো একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে টেলিগ্রাফের সফল উদ্ভাবন এটিকে সুনিশ্চিত করল। শীঘ্রই একদেশ থেকে অন্যদেশে শহরগুলির মধ্যে দ্রুততর যোগাযোগের জন্য তার পাতা হল। ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে তার-যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ১৮৬৬ সাল নাগাদ অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে সমুদ্রতলে কেব্‌ল্‌-এর আকারে তার পাতা হল। শিল্পবিপ্লবের সূচনার একশো বছরের মধ্যেই কারখানা শহরগুলি গজিয়ে উঠল এবং এমনকি গ্রামদেশেরও রূপ বদলে গেল। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি নূতন শিল্পসমৃদ্ধ দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জীবনেও সার্বিক রূপান্তর ঘটল।

উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে সেগুলি বাসগৃহ থেকে বিশেষভাবে নির্মিত কারখানা (ফ্যাক্টরি) নামে বাড়িগুলিতে সরে গেল; এর ফলে ঘটল কর্মপদ্ধতির পুনর্গঠন, বিশেষত 'শ্রমবিভাজন'। এর অর্থ, একটি জটিল কর্মপদ্ধতিকে সরলতর ভাগে বিভক্ত করা হল এবং কোনও ব্যক্তি তার কর্মস্থলে মাত্র দু-একটি অতি সরল কাজ করতে থাকল। এভাবে মাথাপিছু উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু এতে সেই সঙ্গেই বৈচিত্র্যহীন কাজের জন্য মানুষের বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল, মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেল এবং বস্তুত মানুষ যন্ত্রের মতো কাজ করতে বাধ্য হল (চিত্র ৬.১০)।

আজকাল জানা আছে, সাধারণত শিল্পায়ন কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে কৃষির তুলনায় বহুগুণে অধিক উদ্বৃত্ত উৎপাদন করায়। অধিকতর উদ্বৃত্ত থেকে অধিকতর মুনাফা উৎপন্ন হয়। সুতরাং মূলধন আরও অনেক দ্রুততর বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং অধিকতর উৎপাদনের জন্য আরও যন্ত্র লাগানোর কাজে তাকে ব্যবহার করা যায়। অতএব উৎপাদনকে সর্বপ্রকারে বহুগুণে বর্ধিত করার প্রবণতা থাকে। যা উৎপন্ন হয়, তাকে অবশ্যই বিক্রয় করতে হবে; কাজেই বাজারও সর্বসময়ে প্রসারিত করতেই হবে। কিন্তু উৎপাদিত বস্তু ক্রয়ের জন্য দেশের ভিতরের বাজারেও ক্রেতাদের অর্থ থাকতেই হবে। এর থেকে উভয়সংকট সৃষ্ট হয়—মুনাফা যথাসম্ভব বাড়াতে হবে, কিন্তু শ্রমিকেরা যদি উৎপন্ন বস্তু কিনতে না পারে, তবে কী হবে? লাভে শ্রমিকের অংশ নির্ধারণের কোনও নিরাপদ সূত্র বা ফর্মুলা নেই; এজন্য এরকম একটি ব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রবণতা থাকে।

সকল দেশেই শিল্পায়নের আদি ইতিহাস থেকে দেখা যায়, শ্রমিকেরা কীভাবে শোষিত হয়েছিল, কীভাবে শ্রমিকদের শক্তির শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়েছিল যাতে যন্ত্রগুলির ঘূর্ণনে বিশাল মুনাফা উৎপন্ন হয়, এবং কত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় শ্রমিকদের বাস করতে হয়েছিল। এ থেকে উৎপন্ন হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতিকল্পে শ্রমিকদের সংগ্রাম।

শিল্পায়নের আরও একটি দিক ছিল। উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পেল। পণ্যবস্তু যেহেতু বিরাট মাত্রায় উৎপাদিত হল, সাধারণ বা ওভারহেড ব্যয় সেই অণুপাতে বৃদ্ধি পেল না। কাজেই শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সস্তা হয়ে গেল। ফলে দেশের পণ্যসামগ্রী উপনিবেশগুলির বাজার ছেয়ে ফেলল এবং

স্থানীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। যেখানে শিল্পোৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় ভালোমতো দাঁড়াতে পারেনি, ঔপনিবেশিক সরকারগুলি সেক্ষেত্রে আমদানি-করা বস্তুগুলির বিক্রয় সুনিশ্চিত করার জন্য নিজেদের সীমা অতিক্রম করে তাদের কর্তৃত্বক্ষমতাকে ব্যবহার করত।

অনুশীলনী—৫

(১) নিম্নলিখিত প্রায়োগিক উদ্ভাবনের মধ্যে কোন তিনটি থেকে শিল্পবিপ্লবের উদ্ভব হয়েছিল? সঠিক উত্তরগুলিকে চিহ্নিত করুন।

(ক) যান্ত্রিক ঘড়ি

(খ) সুতাকাটা ও বয়নের যান্ত্রিক সরঞ্জাম

(গ) বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার

(ঘ) টেলিগ্রাফ

(ঙ) খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি।

(২) শিল্পবিপ্লবের ফলাফল বিষয়ে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না ঠিক, প্রদত্ত প্রকোষ্ঠগুলিতে তা লিখুন। ভুল উক্তির ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটিও প্রদত্ত স্থানে লিখুন।

(ক) সম্পূর্ণ গ্রামদেশ পরিবর্তন করে কারখানা শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। ☐

(খ) শ্রমবিভাজনের ফলে শ্রমিকদের কর্মপরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল। ☐

(গ) নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপনের অর্থ হয়েছিল, উপনিবেশগুলিতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে সেগুলি বিক্রয় করা। ☐

(ঘ) শিল্পায়নের ফলে শ্রমিকদের শোষণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ☐

(ঙ) ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বহুদূরের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ সুগম করার জন্য টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়েছিল। ☐

....

....

....

....

....

....

....

....

বলা যায়, শিল্পবিপ্লবে বিজ্ঞানের কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, কিন্তু প্রয়োগবিদ্যার ছিল। পক্ষান্তরে, যন্ত্রপাতির প্রয়োগবিদ্যাসম্মত জ্ঞান ও নক্‌শা বিজ্ঞানের উপরে, বিশেষত গতি, বল, শক্তি, ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিউটনের ধারণাগুলির উপরে নির্ভর করত। শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্রবস্তুস্বরূপ যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন কারখানায়, রেলপথে ও বাষ্পচালিত জাহাজে ব্যবহৃত হত, তাও অনেকখানি নির্ভর করেছিল তাপের প্রকৃতি এবং চাপ পরিবর্তনে গ্যাসের আচরণের সঠিক উপলব্ধির উপরে। আকরিকগুলির বিশোধন, ছাঁচের সাহায্যে লৌহ থেকে যন্ত্রাংশের নির্মাণ এবং বস্ত্র ছাপানোর কাজ রসায়নের বিকাশে উদ্দীপনা যোগাল। শিল্পবিপ্লবের সময় নাগাদ জোসেফ প্রিস্ট্‌লির (১৭৩৩-১৮০৪) দ্বারা অক্সিজেন আবিষ্কৃত হল। দহন সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষাগুলির ভিত্তিতে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী অঁতোয়ান নিউরেঁ লাভোয়াসিয়ে (Antoine Leurent Lavoisier, ১৭৪৩-১৭৯৪) রসায়নের যুক্তিবাদী ও মাত্রিক গবেষণার জন্য একটি তত্ত্বীয় পরিকাঠামোর প্রবর্তন করলেন। কয়েক দশক পরে জন ডাল্টন (১৭৬৬-১৮৪৪) পরমাণু তত্ত্বের প্রস্তাব করলেন।

অন্য বিজ্ঞানগুলিও গতি লাভ করল—শিল্পবিপ্লবের পরের দশকগুলিতে আবিষ্কৃত উদ্ভাবনগুলির বা নূতন সূত্রগুলির তালিকাটি সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। দুই তড়িতাধানের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বল সম্বন্ধে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কুলম্বের সূত্রের আবিষ্কার থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বেতারতরঙ্গের আবিষ্কার এবং বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবন পর্যন্ত এই তালিকার মধ্যে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুই পাস্তুরের ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার এবং জীবাণুকে রোগের কারণ বিবেচনায় তাঁর তত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যাকে প্রভূত বলশালী করেছিল। এর ফলে গোমহিষের অ্যান্‌থ্রাক্‌স্‌ এবং মানুষের জলাতঙ্কের মতো রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। পাস্তুর এটাও দেখিয়েছিলেন যে, এপ্রকার বহু জীবাণুই খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং মদ্য ও সিরকার (ভিনেগার) মতো বস্তুগুলি প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ বিশেষ জীবাণু নির্বাচন করা সম্ভব। এই আবিষ্কারই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি বা শিল্পীয় অণুজীববিদ্যার ভিত্তি যা আজ আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের মতো বহু মূল্যবান ঔষধ সুলভে পেতে সমর্থ করেছে। এই আবিষ্কার জৈব গ্যাস, শক্তিপ্রদায়ী অ্যালকোহল (পাওয়ার অ্যালকোহল) প্রভৃতি জালানির বিকল্প উৎসগুলির অনুসন্ধানও সম্ভব করেছে। কিন্তু পাস্তুরের সর্বাধিক অর্থপূর্ণ অবদান বোধ হয় এই যে, সযত্নে পরিকল্পিত পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনের ধারণার বিরুদ্ধে নিশ্চায়ক প্রমাণ দিয়েছিলেন; তাঁর প্রকল্প ছিল, জীব কেবল জীব থেকেই উদ্ভূত হতে পারে, অজীব পদার্থ থেকে নয়। আপনারা কী বিশ্বাস করতে পারেন, প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশের, এমনকি কিছু বিজ্ঞানীরও ধারণা ছিল যে জীবন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হতে পারে?

চিত্র ৬.১১ : লুই পাস্তুর

এরই কাছাকাছি সময়ে একটি প্রধান অবদানরূপে এসেছিল চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-৮২) জৈব অভিব্যক্তি বিষয়ে বৈপ্লবিক মতবাদ। এপর্যন্ত বিশ্বাস করা হত, জীবনের প্রতিটি আকার বিশেষ করে ও পৃথক ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল এবং সেভাবে সৃষ্টির পারম্পর্যে তার একটি বিশিষ্ট আসন ও ক্রিয়া ছিল। সযত্ন পর্যবেক্ষণ ও শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে ডারউইন কয়েকটি সরলতর জীব থেকে জীবনের বিভিন্ন আকারের অভিব্যক্তি

সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব গঠন করেন। পর্যায় ৩-এ আপনারা ডারউইনের কাজ সম্বন্ধে আরও পড়বেন। ডারউইনের কাজ অ্যারিস্টোটলের দর্শনের শেষ যৌক্তিকতাকে নাশ করল এবং এর সঙ্গে চার্চের দ্বন্দ্ব আজও চলছে।

সর্বসাকুল্যে আমরা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কয়েকটি প্রধান বিকাশের পরিলেখ দিয়েছি। এই যুগে পুঁজিবাদ পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও সুপরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অতিকথাগুলিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সেগুলির জায়গায় এনেছিল নিরীক্ষিত বা পরীক্ষিত ঘটনাবলির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ। এইভাবে বিজ্ঞান শিল্পবিপ্লবকে বিরাট উচ্চতায় বহন করে নিতে এবং তাকে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে বিস্তারিত করতে সাহায্য করেছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিল্পায়নের অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকৃত। অবশ্য যেসব দেশ সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল, সেগুলির অধিকাংশে এখনও এই বিপ্লব ঘটে ওঠেনি।

চিত্র ৬.১২ : চার্লস ডারউইন

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিষয়রূপে বিজ্ঞানশিক্ষার সূচনা হয়। অবশ্য এর সুদূরপ্রসারী বিস্তার ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বহু দেশে বৈজ্ঞানিক আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত ঘটে। শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞান পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমরা অচিরে বিচার করে দেখতে পাব, শিল্পবিপ্লব যদি বিজ্ঞানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে, বিজ্ঞানও সেই বিপ্লবের কয়েকটি লক্ষণ বহন করে।

দুর্ভাগ্যের কথা, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এসব বিকাশ উপনিবেশের উপরে তাদের আধিপত্যকে আরও বলিষ্ঠ বা প্রসারিত করে। শিল্পবিপ্লবের প্রায় সমকালে ভারত ঔপনিবেশিক প্রভাবের অধীনে এসেছিল এবং এর সকল কুফল আমরা ভোগ করেছি। আমাদের শিল্পকে দমন করে রাখা হয়; আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যথাসম্ভব পাঠিয়ে দেওয়া হত ইংল্যান্ডে এবং সেখানের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি আমাদের বাজারের উপরেই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হত। একই সময়ে সমাজজীবনে ভাঙন ও চরম দারিদ্র শুরু হয়। যদিও প্রতীচ্যে বিজ্ঞানের দুর্নিবার বৃদ্ধি ঘটেছিল, আমাদের শিক্ষা ও গবেষণা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল। এভাবে ভারত অর্থনৈতিক বিকাশের দৌড়ে অন্তত একশো বছর পিছিয়ে পড়ল। বৈজ্ঞানিক প্রগতির আন্তর্জাতিক হার সুউচ্চ হওয়ায় এই বিয়োগান্তক ঘটনার মোটামুটি অর্থ হল, আমরা যদি নিজেদের টেনে তোলার জন্য অসাধারণ ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করি তবে হয়তো চিরদিনই আমাদের প্রতীচ্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতে পারে। পরবর্তী এককে আমরা সেবিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

আপনাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হত যদি আমরা বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কটির অনুসন্ধানে রত থাকতাম। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা শাখা ও তাদের বিশেষ ভূমিকার আলোচনা ব্যতীত এমন অনুসন্ধানে আমরা সুবিচার করতে পারব না। পরবর্তী এককগুলির মাধ্যমে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি ও শিল্পের সমস্যাগুলি পাঠ করে আপনারা বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে আরম্ভ করবেন।

৬.৬ সারাংশ

এই এককটিতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এক দীর্ঘ যুগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। এটি হল সেই গুরুতর পরিবর্তনগুলির যুগ যেগুলির ফলে ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছিল। এই এককে আমরা যা পড়েছি, তার সারাংশ করা যাক।

- বদ্ধস্রোত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিধিনিয়মনিষ্ঠ চিন্তাধারা মধ্যযুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের অর্থপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটতে দেয়নি। অবশ্য কৃষিজমির প্রসার এবং মজুরের অভাবের সময়ে তার অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যবহারের প্রয়োজনে বহু প্রায়োগিক বিকাশ ঘটেছিল।
- উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে এসেছিল বাণিজ্য যা আরও উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছিল। ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলক সেবাভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক স্তরানুক্রমিক সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে এমন একটি বাণিজ্যভিত্তিক সমাজকে স্থান করে দিল, যেখানে পণ্যবস্তুর উৎপাদন ও অর্থ দিয়ে মূল্য পরিশোধ প্রাধান্যলাভ করল।
- নবজাগরণ বা রেনেসাঁর পরিচয়চিহ্ন হল, মধ্যযুগীয় চিন্তার সমালোচনা ও বর্জন। কোপারনিকাসের বিপ্লব এযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ঘটনা।
- নবজাগরণোত্তর যুগে বিজ্ঞানের একটি নূতন পদ্ধতির আবির্ভাব দেখা গেল—পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পদ্ধতি। এই যুগে বিজ্ঞানে পর পর কয়েকটি পথিকৃৎ অগ্রগতি ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিল গ্যালিলেও, হার্ভে ও নিউটনের কাজগুলি। এই নূতন পদ্ধতিটি অন্য অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করে দিল।
- গ্রেট ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব উৎপাদনপদ্ধতিগুলিকে আমূল পরিবর্তিত করে দিল। এর সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তর সম্পূর্ণ হল। সমাজগঠনেও তদনুসারে পরিবর্তন ঘটল। অনড় বংশানুক্রমিক মর্যাদাসহ সামন্ততান্ত্রিক স্তরানুক্রমিক সমাজব্যবস্থা ব্যক্তির উদ্যোগ ও আর্থিক মর্যাদাকে স্থান ছেড়ে দিল। এই যুগে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সুপরিণত হয়ে উঠল এবং এখন থেকে আর পিছনে ফিরে দেখার কিছু রইল না।

৬.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। নিম্নে তালিকাবদ্ধ প্রায়োগিক উদ্ভাবনগুলির প্রত্যেকটির যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক পরিণাম মধ্যযুগীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটিয়েছিল, দুই-এক পঙক্তিতে সেগুলি বর্ণনা করুন।

(ক) ঘোড়ার গলবন্ধনী বা কলার ....

....

(খ) বায়ুচক্র ও জলচক্র ....

....

(গ) দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (কম্পাস) এবং জাহাজের পশ্চাদ্দেশীয় হাল ....

....

(ঘ) বারুদ ....

....

(ঙ) কাগজ ও মুদ্রণ ....

....

২। নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সাহায্য করেছিল, এরকম অন্তত তিনটি ঘটনা সম্বন্ধে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

৩। নিম্নলিখিত সারণীতে আমরা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের এমন কতকগুলি লক্ষণের তুলনা করেছি, যেগুলি যথাক্রমে ইউরোপে ও ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়তা অথবা প্রতিবন্ধকতা করেছে। নিচের শূন্যস্থানগুলিতে উভয় সমাজের অনুরূপ লক্ষণগুলি বর্ণনা করুন। আপনাকে আরও একবার পরিচ্ছেদ ৫.৪ দেখে নিতে হতে পারে।

ইউরোপীয় সমাজ	ভারতীয় সমাজ
(ক) তীব্র দ্বন্দ্বের পরে স্তরানুক্রমিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এমন এক বাতাবরণকে স্থান ছেড়ে দিল যাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আর্থিক মর্যাদার মূল্য ছিল। এটি চিন্তা ও কর্মের অধিকতর স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করল।	....
(খ)	প্রাচীনপন্থী ধর্মযাজকদের পরাক্রম সমাজে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তার শ্বাসরোধ করেছিল।
(গ) কায়িক শ্রম অধিকতর সামাজিক মর্যাদা অর্জন করল। যে কারিগর ও কারুকর্মীরা উৎপাদন করত, তারা বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে সমস্তরে মেলামেশা করত।	....
(ঘ)	জ্ঞান অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৪। একদিকে ক্ল্যাসিক্যাল ও মধ্যযুগের বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে নবজাগরণোত্তর কালের বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?

....

....

....

....

৬.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। (ক) প্র (খ) স্ব (গ) প্র (ঘ) প্র (ঙ) স্ব।

২। (১) পণ্য, বাণিজ্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ

(২) মুনাফা, সামন্তপ্রভু

(৩) অর্থ, ভূমিদাস।

৩। (১) মানব শারীরস্থান (অ্যানটমি) চর্চা; ত্রিমাত্রিক চিত্রকে দ্বিমাত্রিকে প্রকাশ করা; প্রকৃতির বিশদ পর্যবেক্ষণ; খনির কাজে পাম্পিং ও ঔদক (হাইড্রলিক) যন্ত্রপাতি; নূতন জাহাজ এবং নৌচালনার যন্ত্রাদি নির্মাণ; কোপারনিকাসের বিপ্লব।

(২) কোপারনিকাস সৌরজগতের একটি প্রতিরূপের প্রস্তাব করেছিলেন, যার কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত এবং পৃথিবীসহ সকল গ্রহ তার চারিপাশে আবর্তন করছে। এটি বৈপ্লবিক ছিল, কারণ এই প্রতিরূপটি প্রাচীন পৃথিবীকেন্দ্রিক প্রতিরূপকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিল।

৪। (ক) (২)

(খ) (৩)

(গ) (৫)

(ঘ) (১)

(ঙ) (৭)

(চ) (৮)

(ছ) (৪)

(জ) (৬)

৫। (১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

(২) (ক) স (সঠিক)

(খ) ভু (ভুল)

(গ) ভু

(ঘ) স

(ঙ) স

(খ) উল্টো, এর ফলে শ্রমিকদের বৈচিত্র্যহীন কর্মজনিত বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেল এবং কাজে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেল—বস্তুত তারা যন্ত্রের মতো হয়ে গেল।

(গ) উপনিবেশগুলি কাঁচামাল সরবরাহ করত এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির উৎপাদিত বস্তুগুলির বাজার হিসাবে কাজ করত।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। (ক) আরও বেশি একর জমি চাষ করা সম্ভব হল এবং এর ফলে বাণিজ্যের জন্য উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য পাওয়া গেল।

(খ) কৃষি, লোহা-পেটাই বা কাঠ-চেরাইয়ে এবং মজুরের অভাব পূরণে সাহায্য করল।

(গ) মহাসমুদ্রগুলিকে সমুদ্রযাত্রার জন্য উন্মুক্ত করে দিল এবং তার ফলে দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্যবৃদ্ধির পরিণামে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও নৌচালনার যন্ত্রপাতির শিল্পের বিকাশ ঘটল।

(ঘ) রসায়ন, বলবিদ্যা ও শ্বসন সম্বন্ধে চর্চার সূচনা ঘটল।

(ঙ) সাক্ষরতা বিস্তারে সাহায্য করল এবং মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করল।

২। (ক) প্রযুক্তিবিদ, কারিগর ও কারুশিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা ব্যবহারিক শিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল।

(খ) পণ্ডিতেরা মধ্যযুগীয় চিন্তার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে এবং তার বিরোধিতা করতে লাগলেন।

(গ) বিদ্বজ্জন ও কারিগরদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

(ঘ) পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গণনা বিজ্ঞানের নূতন পদ্ধতি হয়ে দাঁড়াল।

৩। (ক) সামাজিক বিন্যাস ছিল স্থায়ী। জনসমষ্টির মধ্যে সাধারণভাবে সন্তোষ ছিল এবং পরিবর্তনের জন্য কোনও দাবি সোচ্চার ছিল না।

(খ) পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈয়ারি করা হল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানে আর কোনও ধর্মীয় হস্তক্ষেপ ছিল না।

(গ) সমাজের শিক্ষিত লোকেরা কায়িক শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না—শেষোক্তদের সম্মানার্হ মনে করা হত না।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান ও তথ্যকে মুদ্রণ সর্বসাধারণের পক্ষে সহজপ্রাপ্য করে দিল।

৪। বিজ্ঞানের পূর্বেকার কাজকর্মের অধিকাংশই ছিল চারিপাশের জগৎ সম্বন্ধে অনুমানভিত্তিক। নবজাগরণের পরে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও গণনা এবং তৎসহ নিজ অনুমানগুলিকে প্রশ্ন ও সংশোধন করার ইচ্ছা—এগুলি হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞানের নূতন পদ্ধতি।

একক ৭ □ ঔপনিবেশিক ও আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান

গঠন

৭.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৭.২ ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান

৭.২.১ ঔপনিবেশিক ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

৭.২.২ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব

৭.৩ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিজ্ঞান

৭.৪ আমরা কী শিখেছি

৭.৫ সারাংশ

৭.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৭.৭ উত্তরমালা

৭.১ প্রস্তাবনা

একক ৬-এ আমরা দেখেছি, শিল্পবিপ্লবের ফলে কাঁচামালের এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্যের জন্য বাজারের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন শিল্পযোজিত দেশগুলি তাদের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়েছিল এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশরা ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যথেষ্ট দীর্ঘ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার—যার সম্বন্ধে আপনারা ২ থেকে ৫ পর্যন্ত এককে পড়েছেন—উপনিবেশ-স্থাপয়িতাদের নির্মম শোষণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরেই শুধু আমরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারী হই এবং বিজ্ঞানকে আমাদের দেশবাসীর কল্যাণে সচেতনভাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

এই এককে আমরা ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের পরিলেখ বর্ণনা করব। এছাড়া আগের এককগুলিতে যা শিখেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও আমাদের সমাজ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পরে আপনাদের এসব কাজ করতে পারা উচিত :

- ঔপনিবেশিক ভারতে মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক বিকাশগুলির পরিলেখ বর্ণনা করা এবং সেগুলির স্বল্পতার কারণ বিশ্লেষণ করা।
- স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশের উপরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করা।
- স্বাধীনতার পরে এদেশের সমস্যাগুলি এবং তাদের সমাধানের জন্য আমাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা।
- আমাদের সামাজিক পটভূমিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করা।

৭.২ ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান

৫ এবং ৬ এককে আমরা দেখেছি, ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপ বিজ্ঞান ও পার্থিব প্রগতিতে ভারতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে। উপনিবেশগুলিতে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণাকে অনুন্নত রাখা হয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উন্মেষে উপনিবেশগুলির উপরে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রাবল্য লাভ করেছিল।

হল্যান্ড, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রগতিশীল বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি ভারতে রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্বে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবচেয়ে শক্তিশালী বাণিজ্যিক সংস্থা হয়ে দাঁড়ায়। এরই পরিণামে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে এ ছিল এক অত্যন্ত উদ্দীপক সময়—নতুন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়তর হচ্ছিল। উপনিবেশের স্থাপয়িতরা ভারত, তার জনগণ ও সম্পদসমূহ সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের প্রযুক্তিগত প্রথাগুলির মধ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে যা সর্বোত্তম এবং নিজেদের নিয়োগকর্তাদের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হতে পারে, যেসব তাঁরা অবিকল লিখে গেছেন। একথাও শাসকেরা অচিরেই বুঝেছিলেন যে বিজিত অঞ্চলগুলির ভূগোল, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। সাম্রাজ্যগঠনে বিজ্ঞানের ভূমিকা ও গুরুত্ব তাঁরা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেন। ঔপনিবেশিককালে ভারতে মুষ্টিমেয় যে বৈজ্ঞানিক বিকাশগুলি ঘটেছিল, এখন সেগুলি দেখা যাক। এগুলির সংখ্যা কেন এত কম ছিল, তাও আমরা বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

এই যুগের প্রথম দশায় একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য ছিল, ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা একই সঙ্গে বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার কাজে হাত লাগাতেন এবং প্রত্যেক বিজ্ঞানী প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একাধারে উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী, ভৌগোলিক ও শিক্ষাবিদ্—সব কটির সমন্বয়। ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানীরা ছিলেন দক্ষ তথ্যসংগ্রাহক। কিন্তু বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হত ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির উপরে, যেখানে বহু উপনিবেশ থেকে তথ্য এসে পৌঁছাত। ব্রিটিশেরা উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং ভৌগোলিক

সমীক্ষাগুলিতে এই আশায় অর্থ বিনিয়োগ করেছিল যে, সেগুলি থেকে প্রত্যক্ষ ও প্রভূত অর্থনতিক ও সামরিক সুবিধা পাওয়া যাবে। চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে এরকম সম্ভাবনা না থাকায় এগুলি অবহেলিত হয়েছিল। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে গবেষণার প্রশ্নই ছিল না, কারণ এই বিষয়গুলি শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত, যাতে ব্রিটিশেরা উৎসাহ দিতে চায়নি। ভারত বিবেচিত হয়েছিল শুধুমাত্র কাঁচামালের উৎস হিসেবে এবং ব্রিটেনে উৎপাদিত সূচ, কলমের নিব ও পেনসিল থেকে জুতো, কাপড়চোপড় ও ঔষধপত্র পর্যন্ত সবরকম সামগ্রীর চমৎকার বাজার হিসেবে।

যাই হোক, কয়েকটি বিজ্ঞানসংস্থা ও সংগ্রহশালার স্থাপনা ছিল একটি যথাযথ পদক্ষেপ। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ ছিল দুর্বল এবং সেজন্যই কোনও বৈজ্ঞানিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না, বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য কোনও গবেষণাপত্রিকাও ছিল না। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের জনৈক বিচারক উইলিয়াম জোন্স এবং শহরের অন্য কয়েকজন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী এই অভাব বুঝেছিলেন এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। শীঘ্রই এই সমিতিটি ভারতে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। একে অনুসরণ করে আসে এগ্রিকাল্চারাল-হর্টিকাল্চারাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (১৮১৭), ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি (১৮২৩), ম্যাড্রাস লিটার‍্যারি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক সোসাইটি (১৮১৮) এবং এশিয়াটিক সোসাইটির মুম্বাই শাখা (১৮২৯)। এই সংস্থাগুলি অমূল্য অবদান রেখে গেছে, বিশেষ করে তাদের গবেষণাপত্রিকাগুলির মাধ্যমে—সেগুলি উৎকর্ষে ছিল ইউরোপীয় পত্রিকাগুলির সমকক্ষ।

১৮৫৮ সলে ব্রিটিশরাজ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষার কার্যকলাপ তার মধ্যেই প্রাথমিক দশা অতিক্রম করেছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল, তাকে সুদৃঢ় করার সমস্যাই তখন বড় ছিল। এজন্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল এবং সরকার সমীক্ষার সংস্থাগুলিকে প্রসারিত করেছিল। ত্রিকোণমিতি, ভূ-সংস্থান এবং রাজস্ব বিষয়ে সমীক্ষার যে শাখাগুলি এপর্যন্ত পৃথক পৃথক বিভাগ হিসাবে ছিল, ১৮৭৮ সালে সেগুলিকে একত্র করা হয়। স্বভাবত রাজস্ব সমীক্ষা প্রাধান্য পায়। অনুরূপভাবে, প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক উপকারিতার জন্য ভূবিদ্যার সমীক্ষাও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে। জিওলজিক্যাল সার্ভে বা সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতো কোনও সংস্থা কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার সমীক্ষার জন্য গড়ে ওঠেনি।

নানা বৈজ্ঞানিক বিভাগ ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ফলে বিশেষ কর্মীগোষ্ঠী বা ক্যাডারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও পুরানো হল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস—মূলত সামরিক বাহিনীর সেবার জন্যই এটিকে গঠন ও পালন করা হয়েছিল। সবচেয়ে বিশৃঙ্খল ছিল কৃষিবিভাগ। কৃষি থেকেই সর্বাধিক রাজস্ব পাওয়া গেলেও এর উন্নতির সমস্যাগুলি অত্যন্ত জটিল ছিল এবং সরকার কৃষিকে বেসরকারী কৃষিসমিতিগুলির হাতেই রেখে দেয়। বহুকাল পরে ১৯০৬ সালে ইন্ডিয়ান এগ্রিকাল্চারাল সার্ভিস সংগঠিত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বাধার জন্য এটি এক সম্বন্ধ ও সুসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিভাগ হয়ে উঠতে পারেনি। যে অল্প কয়েকটি শাখার সামরিক বা তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল, সেগুলি বিকশিত হতে

পেরেছিল। কিন্তু মোটের উপরে প্রচেষ্টাগুলি বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। গবেষণাপত্র অপেক্ষা ব্যবহারিক ফললাভই সরকারের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। বিভিন্ন স্তরে অত্যধিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ফলে ঔপনিবেশীয় বিজ্ঞানীরা সর্বদাই নিশ্চিতভাবে সরকারী মতানুযায়ী চলতেন।

শিক্ষাপ্রণালীতে বিজ্ঞানের কোনও অগ্রাধিকার ছিল না। ১৮১৩ সালের সনদে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা ও প্রসারের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এবিষয়ে সহানুভূতি না থাকায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারের আহ্বান অন্তত অংশত নিষ্ফল পবিত্র অভিলাষই রয়ে গেল। ১৮৩৫ সালে মেক্‌লে বিদেশী ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম করতে সফল হন। অধিকন্তু, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিতৃষ্মার ফলে পাঠ্যক্রম হয়ে যায় বিশুদ্ধ সাহিত্যধর্মী। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশ তাই বিলম্বিত হল। মুষ্টিমেয় চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়, কিন্তু সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্রিটেনে শিক্ষিত চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের জন্য সহকারী সরবরাহ করা। ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেকালে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল এবং অন্যান্য দেশ থেকে বিদ্বজ্জনকে আকর্ষণ করে আনত। মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম বিদ্যাচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলিও অনুরূপ ছিল। কিন্তু এসব প্রথা লোপ পেয়ে যায়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ের বিশ্ববিদ্যালগুলি স্থাপিত হয় অল্পবিস্তর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারায়।

যাই হোক, মাত্র ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞানশিক্ষায় কিছু আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করে। ১৮৭৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের ব্রিটিশ ইতিহাসের পরিবর্তে ভূগোল ও প্রাথমিক পদার্থবিদ্যায় পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিজ্ঞান বিষয়ে উপাধি প্রথম দেওয়া হয় মুম্বাইয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বি. এ.' পাঠ্যক্রমকে দুটি শাখায় ভাগ করে—সাহিত্যবিষয়ক A পাঠ্যক্রম এবং বিজ্ঞানবিষয়ক B পাঠ্যক্রম। সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটি হল, ঔপনিবেশিক শিক্ষার লক্ষ্য ছাত্রদের মানসিক মুক্তি বা অনুসন্ধিৎসু মনোভাব গঠনের দিকে ছিল না। বইয়ে লেখা বা শেখানো বিষয় নিস্ক্রিয়ভাবে গ্রহণের দিকেই বরং উৎসাহ দেওয়া হত। বইগুলি ছিল ইংরাজিতে এবং এগুলির অধিকাংশই বিদেশে লিখিত ও মুদ্রিত হত। এগুলিতে ব্রিটিশ সংস্কৃতির রূপই বর্ণিত হত। এভাবে প্রদত্ত শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বহুলাংশে আপন সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ঘটত। শিক্ষার এই পরিবেশ এছাড়াও সুনিশ্চিত করে দিত উদ্যোগের অবলুপ্তি এবং নির্বিচারে উর্ধ্বতনদের আদেশ গ্রহণ করা, যা যথার্থই শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এবং শিক্ষকেরা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার মডেলকেই আদর্শ মনে করে বহুলাংশে তার অনুকরণে প্রয়াসী হতেন, যদিও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে।

অনুশীলনী—১

ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সত্য না মিথ্যা, তা নির্দিষ্ট স্থানে লিখুন। মিথ্যা উক্তিগুলি সংশোধন করে সঠিক উত্তর লিখুন।

(ক) উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও ভূগোলের সমীক্ষাগুলি করা হয়েছিল ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্র প্রণয়নের জন্য। ☐

(খ) ভারতের শিল্পের বিকাশের জন্য পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। ☐

(গ) কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সমিতি গড়ে উঠেছিল এবং এগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য গবেষণাপত্রিকা প্রকাশ করে। ☐

(ঘ) কেবল সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য ব্রিটিশ নাগরিকদের সেবার জন্য চিকিৎসাবিদ্যায় মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। ☐

(ঙ) কৃষির সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রীতিবদ্ধ ও সুপরিচালিত প্রচেষ্টা ছিল। ☐

(চ) কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানশিক্ষার পাঠ্যক্রম চালু করেছিল। ☐

(ছ) বিদ্যালয়স্তরেও বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। ☐

(জ) ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা এবং উদ্ভাবনী চিন্তার উন্মেষ ঘটানো। ☐

আমরা এতক্ষণ দেখলাম, ব্রিটিশেরা প্রধানত ভারতের উপরে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব শক্তিশালী করতে আগ্রহী ছিল। তারা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সম্পূর্ণ শোষণ করেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি নামমাত্র বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো গঠন করেছিল। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং কৃষির মতো অন্য যেসব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তাদের কাছে আবশ্যক ছিল না, সেগুলিতে কোনও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এই ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, বৈজ্ঞানিক প্রথা এবং শিক্ষাব্যবস্থা, সবই বিনষ্ট হয়। তার জায়গায় আসে দাস মনোভাবের প্রথা এবং এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা পরিকল্পিত হয়েছিল মুক্ত ও সৃজনী অনুসন্ধানের মানসিকতা উন্মেষের পরিবর্তে বশ্যতার উৎপাদন ঘটাতে।

ঔপনিবেশিক ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মর্যাদাও এর তুলনায় বিশেষ ভালো ছিল না। দেখা যাক, তা কেমন ছিল।

৭.২.১ ঔপনিবেশিক ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার অভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বহুকাল পর্যন্ত কেবল সরকারী ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং গবেষণা যুক্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা অনুসৃত অর্থনীতির সঙ্গে। ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা নিযুক্ত কোনও বিজ্ঞানী শুধুমাত্র নতুন অর্থনৈতিক সম্পদের আবিষ্কারই নয়, তার ব্যবহারিক প্রয়োগেও সাহায্য করবেন বলে অনুমিত হত। কৃষিতে পরীক্ষামূলক খামার, নতুন নতুন প্রকারের উদ্ভিদের প্রবর্তন এবং বাণিজ্যিক শস্যসম্পর্কিত নানা সমস্যার উপরে জোর দিয়ে মুখ্যত বাগিচা (plantation) গবেষণাই করা হত। এই শস্যগুলি প্রধানত ছিল তুলা, নীল, তামাক ও চা, যার সবটুকুই ব্রিটেনে রপ্তানি হত। এর পরে এল ভূবিদ্যাবিষয়ক সমীক্ষা—উদ্দেশ্য ছিল কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানির জন্য খনিজ সম্পদের আহরণ। আরেকটি মনোযোগের বিষয় ছিল স্বাস্থ্য। তার উপরেই সামরিক বাহিনী, বাগিচা মালিক এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক অধিবাসীর জীবনরক্ষা নির্ভর করত।

প্রতিকূল অবস্থা এবং সরকারের কবোষ্ণ মনোভাব সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্ম এই সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া ও মশার সম্পর্ক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। ম্যাক্‌নামারা কলেরার উপরে কাজ করেন। হ্যাফ্‌কিন্‌ প্লেগ সম্বন্ধে এবং রজার্স কালাজ্বর বিষয়ে কাজ করেন। বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী রবার্ট কখ্‌ কলকাতায় আসেন কলেরা বিষয়ে কাজ করার জন্য। মুম্বাই, চেন্নাই, কুনুর, কসৌলী ও মুক্তেশ্বরে রোগজীবাণুবিদ্যার পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। রোগজীবাণুবিদ্যার গবেষণায় এই পরিবর্তনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুফল ঘটে। এর পরিণামে চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা ও ব্যক্তিগত চিকিৎসাপেশা বৃদ্ধি পায় এবং ঔষধশিল্পের বিরাট অগ্রগতি হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কার অথবা এমনকি গ্রাম ও শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থার মতো রোগপ্রতিরোধী পদ্ধতিগুলিও অবহেলিত রয়ে গিয়েছিল। এদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত বিদেশীয় ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রয়াসে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে।

ব্রিটিশ কাজকর্মের কিছু প্রতিক্রিয়া স্থানীয় জনগণ, বিশেষত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দেয়—এঁরা ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চাকরির আশায় ছিলেন। কয়েকজন ভারতীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট বৈজ্ঞানিক সমিতি বা সংস্থাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। তবে তাঁরা প্রায়ই স্বতন্ত্র পরিচয়ের সন্ধান করতেন এবং নিজস্ব কিছু প্রতিষ্ঠান, আর্থিক বৃত্তি ও সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করেন। যথাযথ বিজ্ঞানশিক্ষা প্রার্থনা করে আমহার্স্টকে লেখা রামমোহন রায়ের আবেদনপত্রটি সকলের অবগতিতে আসে। মুম্বাইয়ে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী ও হরি কেশবজী পাঠারে, দিল্লিতে মাস্টার রামচন্দর, মধ্যপ্রদেশে শুভাজী বাপু ও ওঁকার ভাট জোশী এবং কলকাতায় অক্ষয় দত্ত ভারতীয় ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করার বিষয়ে কাজ করেন।

ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্ষেত্রদুটি প্রথমেই নির্বাচিত হয়েছিল, কারণ এই ক্ষেত্রগুলিতে পৌরাণিক অতিকথাগুলি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে বিবেচিত হত। যেমন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার রচয়িতা ব্যাস ক্ষীরসাগরও অমৃতসিন্ধুর কথা বলেছেন। এটি এখনও জনপ্রিয় অতিকথার অংশবিশেষ এবং ঐসব ব্যক্তি এটিকে আক্রমণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওঁকার ভাট ব্যাখ্যা করেন যে ব্যাস কবিমাত্র, বিজ্ঞানী নন এবং তাঁর আগ্রহ ছিল কেবল ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন, তাই তিনি যা কল্পনা করেছেন তাই লিখেছেন। এমনকি প্রধানত জীবনের রোম্যান্সে উৎসর্গীকৃত উর্দু কবিরাও পশ্চিম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কথা বিদিত ছিলেন। যথা, হালি ও গালিব বাষ্প ও বয়লার শক্তির উপরে নির্ভরশীল পশ্চিমী সভ্যতার সুকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলির পরবর্তী যুক্তিসম্মত পদক্ষেপ ছিল আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ধিষ্ণু আগ্রহকে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক আকার দেওয়া।

১৮৬৪ সালে সৈয়দ আহমেদ খান আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের আহ্বান জানান। চার বৎসর পরে সৈয়দ ইমদাদ আলী বিহার সায়েন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিগুলি ক্রমশ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৮৭৬ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার ইন্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে এবং কোনও সরকারী সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে। মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিকল্পনাটি বেশ উচ্চাভিলাষী ছিল। এর লক্ষ্য ছিল মৌলিক গবেষণা তথা বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করা। ধীরে ধীরে এই সংস্থা আলোকবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, আলোকবিক্ষেপণ, চুম্বকবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মুম্বাইয়ে জামসেদ্‌জী টাটা বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এর পরিণামে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব শতাব্দীর সূচনায় ভারতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা ছিল। এমনটি বিশেষ করে হয়েছিল যখন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতালাভের আন্দোলন আরম্ভ হয়। পরের অনুচ্ছেদে আমরা বৈজ্ঞানিক বিকাশের উপরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু আরও পড়বার আগে একটি অনুশীলনীর উত্তর লিখুন না কেন?

অনুশীলনী—২

ক. ঔপনিবেশিক ভারতে নিম্নলিখিত প্রতিটি বিষয়ের গবেষণায় উৎসাহদানের উদ্দেশ্য কী ছিল, দু-এক পঙ্‌ক্তিতে লিখুন :

(১) উদ্ভিদবিদ্যা

....

....

(২) ভূবিদ্যা, ভূগোল

....

....

(৩) চিকিৎসাবিদ্যা

....

....

খ. নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বিজ্ঞানের বিকাশে ভারতীয়দের অবদান বর্ণনা করে? সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে দাগ দিন।

(১) গবেষণা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং সমিতি স্থাপনে প্রভূত সংগঠিত প্রয়াস ছিল। ☐

(২) এখানে ওখানে কিছু চেষ্টা ছিল এবং মৌলিক গবেষণা তথা বিজ্ঞানের লোকপ্রিয়তা প্রসারের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ☐

(৩) বিজ্ঞানের বিকাশে ভারতীয় অবদান ছিল প্রায় নগণ্য। ☐

(৪) উপরের কোনোটিই নয়। ☐

৭.২.২ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক নাগাদ ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য প্রথম আন্দোলন দেখা দেয়। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে যেমন স্বায়ত্বশাসনের দাবি উঠল, তেমনি অর্থনৈতিক ফাঁসজনিত নৈরাশ্য থেকে মূর্ত হল কেবল ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য তাদের ক্রমাগত আগ্রহ। এই স্বদেশী আন্দোলন আরও প্রেরণা জোগাল :

(১) বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসঙ্গে জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষার প্রসারে,

(২) দেশের শিল্পায়নে।

১৯০৪ সালে অ্যাসোসিয়শেন ফর দি অ্যাড্‌ভান্সমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অফ ইন্ডিয়ান্‌স্ গঠিত হল। উদ্দেশ্য ছিল, উপযুক্ত ছাত্রদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প শেখার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে পাঠানো।

আগেই বলা হয়েছে, ঔপনিবেশিক ভারতে আবহাওয়া উচ্চশিক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল না, গবেষণার পক্ষে তা ততোধিক। ভারতীয়দের কেবল অধস্তন পদেই নেওয়া হত। এমনকি যাঁরা বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদেরও সমান পদমর্যাদার ইউরোপীয়দের চেয়ে কম বেতন দেওয়া হত। বিজ্ঞানের এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন। প্রথম বিশিষ্ট ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তিন বৎসর এই কম বেতন নিতে অস্বীকার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গবেষণার কোনও সুযোগসুবিধা দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর গবেষণাকে নিছক ব্যক্তিগত কাজ বলে বিবেচনা করেন। জগদীশচন্দ্র বসু আরও একভাবেও প্রথাভঙ্গ করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম আন্তর্বিভাগীয় গবেষণা শুরু করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে শুরু করলেও বৈদ্যুতিক সাড়া সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল তাঁকে উদ্ভিদ-শারীরবিদ্যায় নিয়ে যায়। ব্রিটেনের বিজ্ঞানীমহলে স্থান ও স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক অর্থহীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে কম কঠিন ছিল না। তাঁর অধ্যবসায় তাঁকে জয়ী করেছিল।

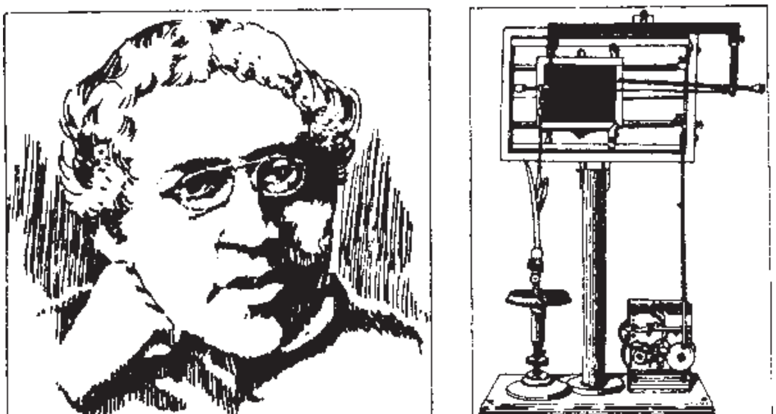

(ক) (খ)

চিত্র ৭.১ : (ক) জগদীশচন্দ্র বসু; (খ) ক্রেস্‌কোগ্রাফ। জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত বহু যন্ত্রের অন্যতম। এটি ক্ষুদ্র চলনকে ১০,০০০,০০০ গুণ বাড়িয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপতে পারত।

অন্য একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও অনুরূপ ক্লেশ ভোগ করেছিলেন। রসায়নে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি নিয়ে ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে তাঁকে এক বৎসর বেকার থাকতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। বরাবর তাঁকে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসেই থাকতে হয়েছিল। ১৯০৩ সালে প্রমথনাথ বসুকে অতিক্রম করে তাঁর চেয়ে দশ বৎসরের কনিষ্ঠ টি. হল্যান্ডকে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর করা হলে পদত্যাগ করাই প্রমথনাথের কাছে বাঞ্ছনীয় হয়েছিল।

চিত্র ৭.২ : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে এই সমস্যাগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮৮৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার তৃতীয় অধিবেশনে প্রায়োগিক শিক্ষার প্রশ্নটি বিবেচনা করে এবং তখন থেকে প্রতি বৎসরই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায়োগিক শিক্ষার নামে সরকার যে কেবল কিছু নিম্নস্তরের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কে. টি. তেলাঙ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসেরও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। "সবচেয়ে মেধাবী এবং বিশেষত এদেশীয় ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের কাজকর্মের ক্ষেত্রগুলিতে কাজের সুযোগ করে দিয়ে ভারতে এক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবৃত্তি প্রবর্তনের জন্য" সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে ১৮৯৩ সালে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। শিক্ষা, কৃষি বা খনিবিদ্যা—যাই হোক না কেন, কংগ্রেস তার প্রশস্ত পরিধির মধ্যে কয়েকটি সমস্যার আলোচনা করেছিল।

এই যুগের ক্রিয়াকলাপের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। একটি হল, স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় সমস্ত প্রবক্তা জাপানকে দেখতেন প্রেরণার এক মুখ্য উৎস হিসাবে। এশিয়ার একটি প্রাণবন্ত শিল্পশক্তি হিসাবে জাপানের উত্থান এবং তার পরে ১৯০৪-১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার সামরিক জয় ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছিল। অপর বৈশিষ্ট্য হল, প্রায়ই তাঁদের মধ্যে পুরানো ঐতিহ্যের পুনরভ্যুদয়ের প্রবণতা দেখা যেত। সুদূর অতীত হয়তো হারানো অহংবোধ পুনরুদ্ধারে অথবা নিজ ব্যক্তিত্ব পুনঃস্থাপনে কাজে লাগে। ভূবিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু, যাঁর উল্লেখ আগে করা হয়েছে, এই মূলের অনুসন্ধানেই তিন খণ্ডে A Hisotry of Hindu Civilization বইটি লেখেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর নির্মিত যন্ত্রগুলির কুঞ্চনগ্রাফ ও শোষণগ্রাফের মতো সংস্কৃত নাম দেন। যাঁরা বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করায় ব্রতী ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই এটি দেখানোর প্রবণতা ছিল যে পশ্চিমী বিজ্ঞানের যা কিছু ভালো তা প্রাচীন ভারতেও বর্তমান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ডারউইন সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হয়েছে ডারউইনবাদের সঙ্গো গীতার লিখনের তুলনা করে। বি. কে. সরকার পরবর্তীকালে "সঠিক বিজ্ঞানে হিন্দুদের কৃতিত্ব" সম্বন্ধে বই লেখেন। এসকল বিজ্ঞানী শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তার জন্য যেসব সাংস্কৃতিক বাধা অতিক্রমের প্রয়োজন ছিল, সেগুলি তাঁরা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা শুধু এটুকুই দেখাতে

উদ্ভিদদেহ কীভাবে সংকুচিত হয়ে উদ্দীপনার জবাব দেয়, তা কুঞ্চনগ্রাফ যন্ত্রে দেখা যায়। উদ্ভিদের দ্বারা জল বা অন্য কোনও তরলের শোষণ শোষণগ্রাফে পরীক্ষা করা যায়।

চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতীয় নীতিবোধ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মূল্যবোধের মধ্যে সঙ্গতি আছে এবং এগুলি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত নয়। এমন অবস্থায় আমাদের বুদ্ধিগত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সঠিকভাবে বোঝা সহজ ছিল না। শিক্ষা ও সমাজজীবন উভয়ক্ষেত্রেই পুরোপুরি ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের জন্য এই কাজ আরও কঠিন ছিল।

চিত্র ৭.৩ : নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সি. ভি. রমন

এতৎসত্ত্বেও এইসব প্রচেষ্টার এক তীব্র উদ্দীপক প্রভাব ছিল। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তৎকালীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শুধুমাত্র কলেজগুলির অনুমোদন ছাড়াও শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে অনুমতি দেওয়া হয়। এর সুযোগ নিয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি. ভি. রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কে. এস. কৃষ্মনের মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সেখানে পড়াতেন। বরাবর আর্থিক সচ্ছলতা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও এই কলেজই এমন একদল পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ্ তৈরি করেছিল, যাঁরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। উচ্চবেতনভোগী ইউরোপীয়রা নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও অনেক সরকারী বিজ্ঞানসংস্থার অবদান এই তুলনায় নগণ্য।

ভারতকে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে নিয়ে আসেন অনেকে। জগদীশচন্দ্র বসু দেখান, সূচ-ফোটানো, তাপ প্রভৃতির মতো নানাপ্রকার উদ্দীপনার প্রয়োগে প্রাণী ও উদ্ভিদের কলায় বৈদ্যুতিক সাড়া দেখা দেয়। এর আগেও আমরা তাঁর গবেষণার উল্লেখ করেছি। সংখ্যাতত্ত্বে স্বজ্ঞাসম্পন্ন প্রতিভাধর গাণিতিক এস. রামানুজনের প্রভূত অবদান আছে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় কয়েকটি বিরল ভারতীয় খনিজ দ্রব্য বিশ্লেষণ করেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্স্ প্রতিষ্ঠা করেন—দেশীয় রাসায়নিক ভেষজশিল্পের ক্ষেত্রে এটি এক অগ্রণী ও পথিকৃৎ সংস্থা। আলোকবিক্ষেপণ সম্বন্ধে গবেষণা করে সি. ভি. রমন ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান। কে. এস. কৃষ্মন ধাতুর বৈদ্যুতিক রোধ সম্বন্ধে তত্ত্বীয় গবেষণা করেন। আইনস্টাইনের সাহচর্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৌলিক কণা সম্বন্ধে গবেষণার ফলে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান নামে পরিচিত তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়। ডি. এন. ওয়াদিয়া ভূবিদ্যায়, বীরবল সাহনী প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রাশিবিজ্ঞানে এবং এস. এস. ভাটনগর রসায়নে গবেষণা করেন। ব্যক্তিগত অবদান ছাড়াও এই বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল শিক্ষাদান ও গবেষণা

চিত্র ৭.৪ : এস. রামানুজন

পরিচালনার ক্ষেত্রে। বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যথা, বোস ইন্‌স্টিটিউট (১৯১৭), শীলা ধর ইন্‌স্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স (১৯৩৬), বীরবল সাহনী ইন্‌স্টিটিউট অফ প্যালিওবটানি ইত্যাদি। এতে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা আরও বেগবান হয়।

যাতে সারা দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ঘটানো যায়, তার জন্য প্রথম থেকেই একটি বার্ষিক বিজ্ঞানসভার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এপর্যন্ত শুধুমাত্র স্যানিটারি কন্‌ফারেন্স বা এগ্রিকাল্‌চারাল কন্‌ফারেন্সের মতো অনিয়মিত ও বিশুদ্ধ সরকারী সম্মেলনেই তা সম্ভব হয়েছিল। এজন্যই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে ১৯১৪ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়।

চিত্র ৭.৫ : সত্যেন্দ্রনাথ বসু

চিত্র ৭.৬ : বীরবল সাহনী

চিত্র ৭.৭ : মেঘনাদ সাহা

- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে বলিষ্ঠতর বেগ এবং অধিকতর রীতিবদ্ধ দিকনির্দেশ দেওয়া,
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে বলিষ্ঠতর বেগ এবং অধিকতর রীতিবদ্ধ দিকনির্দেশ দেওয়া,
- দেশের বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞানসংস্থা এবং বিজ্ঞানে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগের বৃদ্ধি ঘটানো,
- বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

তখন থেকে এই উদ্দেশ্যগুলি বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সকল বিভাগে কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের বৃহত্তম সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) শেষদিকে সরকার উপলব্ধি করেন, ভারতকে অবশ্যই বিজ্ঞান ও শিল্পে আরও স্বনির্ভর হতে হবে। ব্রিটেনের উপরে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিষয়ে ভারতের নির্ভর কমাতে কোনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা পরীক্ষা করার জন্য ১৯১৬ সালে সরকার একটি ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন নিয়োগ করেন। এ থেকে পাওয়া সুপারিশগুলির পরিসর প্রশস্ত ছিল এবং শিল্পবিকাশের বহু দিক এগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটিই বাস্তবে কার্যে পরিণত হয়েছিল। অন্য অনেক সম্মেলন ও সমিতিরও অনুরূপ পরিণতি ঘটেছিল। ভারতীয়রা নতুন বৈজ্ঞানিক সংস্থা শুরু করার

বা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের অনুরোধ জানালেই সরকার অর্থের অপ্রতুলতা অথবা চাহিদার অভাবের অজুহাত দিতেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে প্রায়ই ঘটতো স্বার্থের সংঘাত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, আরও বিকাশ সম্বন্ধে বিতর্কই ছিল এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। গান্ধীজী যখন কুটিরশিল্পের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নানা রকমের মন্তব্য শোনা গেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এক আবশ্যকীয় শর্ত হল প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রথাগত শিল্পগুলির মাধ্যমে সাধারণ অগ্রগতি। কিন্তু মেঘনাদ সাহা এবং তাঁর Science and Culture পত্রিকার গোষ্ঠী অর্থনৈতিক বিকাশের গান্ধীবাদী পথের বিরোধিতা করলেন এবং বৃহৎ শিল্প স্থাপনাকে সমর্থন জানালেন। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষা অর্থনীতি ও পার্থিব প্রগতির ব্যাপারে মানুষের জন্য বিজ্ঞানের বিশাল সম্ভাবনার আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছিল। জাতীয় নেতৃত্ব বৃহৎ শিল্পস্থাপন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে ঘুরে যাচ্ছিলেন—দুটিই দাঁড়িয়ে ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তির উপরে। মেঘনাদ সাহার পরামর্শে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় পরিকল্পনা ও শিল্পায়নকে কংগ্রেসের কর্মসূচীর শীর্ষস্থানীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। এর ফল হল ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির গঠন। এই সমিতি ঊনত্রিশটি উপসমিতি নিয়োগ করেছিল। এর মধ্যে অনেকগুলিই সেচ, শিল্প, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে কাজ করত। প্রায়োগিক শিক্ষাসংক্রান্ত উপসমিতিটি মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে কাজ করত। অন্য সদস্যরা ছিলেন বীরবল সাহনী, জে. সি. ঘোষ, জে. এন. মুখার্জী, এন. আর. ধর, নাজির আহমেদ, এস. এস. ভাটনগর এবং এ. এইচ. পাণ্ডেয়। কর্মী ও যন্ত্রপাতির পরিকাঠামো প্রায়োগিক কর্মী প্রশিক্ষণের পক্ষে কতটা পর্যাপ্ত, তা নির্ণয়ের জন্য উপসমিতিটির সে সময়ে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) লাগায় এবং ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সরাসরি সমুদ্রপথে ছেদ ঘটায় ঔপনিবেশিক সরকারের প্রয়োজন হল ভারতে অধিকতর শিল্পক্ষমতা বিকাশের অনুমতি দেওয়ার। সুতরাং একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংগঠন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনুভূত হল এবং এর পরিণামে ১৯৪২ সালে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড্ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চের প্রতিষ্ঠা ঘটল। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সরকার রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি এ. ভি. হিলকে আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯৪৪ সালে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন যাতে ভারতে গবেষণার প্রতিবন্ধক হিসাবে নানা সমস্যা শনাক্ত করা হয়েছিল। এসব ঘটনা বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়ে নীতিনির্ণয়ে ও ব্যবস্থাপনায় ভারতীয়. বিজ্ঞানীদের অধিকতর সুযোগ করে দিল। বস্তুত এই ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞাননীতি এবং সমগ্র জাতীয় পুনর্গঠনের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে আরও পড়ার আগে এই ধারণাগুলিকে দৃঢ় করে নিতে একটি অনুশীলনীর সমাধানে ইচ্ছুক হতে পারেন।

অনুশীলনী—৩

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবের সারাংশ নিচের উক্তিগুলিতে দেওয়া হয়েছে। এগুলিতে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞানশিক্ষা ও শিল্পায়নের উন্নতিবিধানের প্রেরণা এসেছিল ————— আন্দোলনটি থেকে।

(খ) ব্যক্তিগতভাবে ————— -দের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তবে সামগ্রিক আবহাওয়া ঔপনিবেশিক ভারতে ————— এবং ————— -র বৃদ্ধির পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না।

(গ) স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা এটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং শিক্ষা, ————, খনিবিদ্যা অথবা — — — — -তে মান উন্নয়নের দাবি জানিয়েছিলেন।

(ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হতে এবং বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেতে আরও বিকাশের বিষয়ে একটি বিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ————— এবং জাতীয় ————— -র পথ বেছে নেওয়া হল।

(ঙ) বিদ্যমান পরিকাঠামোগুলির পর্যালোচনা, সমস্যাগুলি শনাক্ত করা এবং সেগুলি সমাধানের পথ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়। এসব প্রচেষ্টাই স্বাধীন ভারতের ————— এবং জাতীয় পুনর্গঠনেরও ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।

ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এখানে একপক্ষীয় বাণিজ্যিক পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশী প্রশাসনের অধীনে বিজ্ঞানের অভ্যুত্থান আশা করা নিরর্থক ছিল। এমন অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কাজে লাগানোর এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য ভৌম (field) বিজ্ঞানগুলির বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু গবেষণার কোনও সুষম বিকাশ ঘটেনি। শিল্পের বিকাশ ঘটতে না দেওয়ায় তার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি বিজ্ঞানেরও যথাযথ প্রগতি হতে পারেনি। একক ৬-এ দেখেছি, উদ্ভাবনী ধারণাগুলিকে প্রকাশ করার এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রাণবন্ততা ও প্রাচুর্যের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য প্রতিকূল অবস্থায় কিছু বিজ্ঞানী ব্যক্তিগতভাবে সফল হয়েছিলেন। এটি বিশেষ করে ঘটেছিল এমন এক বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন এবং সংগ্রামের প্রভাবে, যা সমাজের মুক্তি ও রূপান্তরের শপথ নিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। এখন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

৭.৩ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিজ্ঞান

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল, জার্মানী, ইতালী ও জাপান তখন পরাজিত হয়েছে এবং ফ্রান্স অত্যন্ত ক্ষীণবল হয়ে পড়েছে; এমনকি ইংল্যান্ডও প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার অর্থনীতি

প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই যে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি পৃথিবীকে শাসন করে আসছিল এবং সর্বত্র দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছিল, কোথাও মানুষকে দমিয়ে রাখার মতো অবস্থা তাদের আর ছিল না। উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রামও অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় একে একে একশোর বেশি দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। মহাসমর পুরানো রীতিকে চূর্ণ করে দিয়েছিল এবং সুযোগ ও সমস্যার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গুচ্ছ নিয়ে এক নতুন পৃথিবী জন্মগ্রহণ করেছিল।

যে দেশগুলি সদ্য স্বাধীন হয়েছিল, তাদের প্রচণ্ড সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যাতে তাদের সমস্ত দেশবাসীর জন্য জীবনধারণের পক্ষে সহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। অন্যদিকে পুরাতন শাসক দেশগুলিকে তাদের পূর্বতন উপনিবেশগুলির সম্পদ ক্রমাগত শোষণ করে যাওয়ার উপায় ও পদ্ধতি ভাবতে হচ্ছিল। এর প্রয়োজন ছিল তাদের বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলির উচ্চ মুনাফা অব্যাহত রাখার জন্য, যাতে স্বদেশবাসীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অপেক্ষাকৃত উচ্চ মান বজায় রাখা যায়।

উভয় গোষ্ঠীর দেশেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করতে হয়েছিল। একমাত্র পার্থক্য ছিল, বিকাশশীল দেশগুলিকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছিল—তাদের এমন প্রতিষ্ঠান বা লোকজন প্রায় ছিলই না, যারা প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় নিয়োজিত হতে পারে। অপরদিকে উন্নত বা বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠতর বনিয়াদ ছিল। যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রকবিদ্যা ও পারমাণবিক বোমার বিকাশে, রাডার ও যোগাযোগব্যবস্থায় প্রযোজ্য ইলেক্‌ট্রনিক্‌স, বিমান, ডুবোজাহাজ ও অন্যান্য সমরসরঞ্জামের উন্নত নকশায় বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও পূর্বাপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই বনিয়াদকে বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলি পুরাতন গৌরব ও শক্তির পুনরুদ্ধারে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। অন্যকথায়, আমাদের বিকাশের জন্য সংগ্রাম এবং ওদের প্রভুত্বের জন্য যুদ্ধ একই মুদ্রার দুই পিঠ। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক বিনিশ্চায়ক ভূমিকা আছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সচেতনতা ছিল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে একটি পদক্ষেপমাত্র। আমাদের নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগুলি কোনও বিদেশী সরকার বা তাদের বাণিজ্যিক শরিকদের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আমাদেরই নিতে হবে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য হবে জনগণের সেবা ও খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো। এজন্যই অর্থনৈতিক বিকাশকে আমরা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারিনি, ছাড়তে পারিনি বিশুদ্ধ লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বেসরকারী শিল্প ও বাণিজ্যের হাতে, কারণ শেষোক্তদের প্রবণতা হল আমাদের সামাজিক পরিস্থিতিতে যা প্রয়োজন তার পরিবর্তে যে বস্তুকে বিক্রয় করা যায় তাই উৎপাদন

করা। সুতরাং বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল আমাদের অর্থনীতিকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা যাতে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজন পূরণ করা যায়।

এই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিনিশ্চায়ক ভূমিকা ছিল এবং তা ১৯৫৮ সালে লোকসভায় গৃহীত 'বৈজ্ঞানিক নীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে' পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই সিদ্ধান্তটির খসড়া করেছিলেন। সিদ্ধান্তের ভাষায় :

> "আধুনিক যুগে জাতীয় সমৃদ্ধির চাবিকাঠিটি হল—জনগণের উৎসাহ ছাড়াও—প্রযুক্তিবিদ্যা, কাঁচামাল ও মূলধন এই তিন বিষয়ের কার্যকর মিলন। এগুলির মধ্যে প্রথমটি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বস্তুত নতুন বৈজ্ঞানিক কৌশল সৃজনে ও অবলম্বনে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব পূরণ করা এবং মূলধনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যেতে পারে। কিন্তু কেবল বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ থেকেই প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটতে পারে।"

স্বাধীনতার সময় থেকে, বিশেষত ঐ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হওয়ার পরে শিক্ষা ও গবেষণার উভয়ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিরাট প্রসার ঘটেছে। ১৯৪৭ সালের অবস্থা থেকে আজকের অবস্থা অনেক ভিন্ন। আমাদের এখন প্রায় একশো পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়, ছটি ইন্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেক্নোলজি, প্রায় আটশোটি এন্জিনিয়ারিং কলেজ এবং একশো দশটি মেডিক্যাল কলেজ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনে কয়েকশো বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এবং বেসরকারী শিল্পেও গবেষণা ও বিকাশ ইউনিট রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখায় গবেষণা হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ গবেষণা ও কৃষিতে আমাদের বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট সাফল্য সুবিদিত।

গবেষণায় নিয়োজিত অর্থের পরিমাণও চল্লিশ বৎসর পূর্বের তুলনায় বিশালভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিবিদ্যার সামনের সারিতে থাকার জন্য এই অর্থ যথেষ্ট নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া বিশ্বের অবশিষ্ট দেশগুলির গবেষণার জন্য অর্থব্যয়ের ৯৮% বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলি তথা পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ব্যয় করে। সমস্ত উন্নতশীল দেশ একত্রে মাত্র ২% অর্থ ব্যয় করে। এতে ভারতের অংশ $^{১}/_{২}$% হতে পারে। বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে উন্নততর সুযোগসুবিধা, বিজ্ঞানজগতের অধিকতর সুযোগ এবং জীবনযাত্রার উচ্চতর মান থাকায় আমাদের প্রতিভাধর যুবসম্প্রদায়ের একটি মোটামুটি বড় অংশ ঐসব দেশে পাড়ি দেয়। ফলে এরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করে জাতীয় বিকাশে কোনও সাহায্য করতে পারে না। কাজেই এখনও নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন উন্নত বা বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলি থেকেই আসে। অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে একটি নতুন ঘটনা হচ্ছে সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা। মার্কিনরা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের অস্ত্র পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করায় এর সূচনা হয়েছিল। তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিক বোমার বিকাশ ঘটিয়েছে, যার এক-একটি পুরানো দিনের দশ লক্ষ টন বিস্ফোরকের সমতুল্য। বোমাগুলি বহন করে পৃথিবীর অপর গোলার্ধের কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এরকম ক্ষেপণাস্ত্র এখন তাদের আছে। প্রতিটি আক্রামক অস্ত্র একটি নতুন

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। অন্য দেশে সামরিক ঘাঁটি অধিকারের প্রতিযোগিতাও চলছে। পারমাণবিক অস্ত্রগুলির একটি বিপজ্জনক দিক হল, ভুলক্রমেও এগুলি নিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে এবং সমগ্র মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে। তাই দেখতে পাই, রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কারো নিরাপত্তারই উন্নতি হয়নি। বস্তুত অন্য অনেক দেশ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েছে, কেননা এক দেশের অস্ত্রের সমকক্ষ অস্ত্র অন্য একটি দেশকেও রাখতে হচ্ছে। হিসাব করে দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি বৎসর সমরসম্ভারের পিছনে এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই অর্থের প্রায় ২০% ব্যয় করে বিকাশশীল দেশগুলি এবং এর অনেকটাই যায় বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির অস্ত্রবিপণন প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অস্ত্র কিনতে।

একবার কল্পনা করুন, এত বিশাল পরিমাণ অর্থ—যা মানুষের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ—বৎসরের পর বৎসর অপচয় হয়ে চলেছে। স্বভাবত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ “নিরাপত্তা” খাতে চালিত হয়। অন্য দিকে অনুন্নত দেশগুলির জনগণ এখনও বহুলাংশে নিরক্ষর এবং খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধপত্র ইত্যাদির মতো জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি থেকে বঞ্চিত। বলা হয়, অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে অল্পসংখ্যক বিপণন প্রতিষ্ঠান বিপুল মুনাফা করছে এবং মতলব হচ্ছে উন্নতিশীল দেশগুলির সম্পদ শোষণ করে বিদেশের ঋণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমরকৌশল নীতির উপরে তাদের নির্ভরশীলতা বর্ধিত করা। অস্ত্রগুলি যত জটিল, উন্নত দেশগুলির উপরে আমাদের নির্ভরশীলতাও তত অধিক।

এই অবস্থা অবশ্যই সুখকরও নয়, সুস্থিতও নয়। বিজ্ঞানের ক্ষমতা এখন এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে যে তার সুফলগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে আনতে হলে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জাতীয় প্রচেষ্টার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন।

আপনাদের জন্য একটি অনুশীলনী দিয়ে এখন এই আলোচনা শেষ করছি।

অনুশীলনী—৪

যে তিনটি উক্তিতে আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলিতে দাগ দিন।

(ক) সতর্কভাবে প্রণীত একটি বিজ্ঞাননীতি অবলম্বন করা। ☐

(খ) তরুণ বিজ্ঞানীদের বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে পাড়ি দিতে দেওয়া। ☐

(গ) শিক্ষা ও গবেষণা, উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার। ☐

(ঘ) গবেষণায় বর্ধিত অর্থবরাদ্দ। ☐

(ঙ) সম্পদগুলিকে অস্ত্রক্রয়ে নিয়োজিত করা। ☐

৭.৪ আমরা কী শিখেছি

এপর্যন্ত পর্যায় ১ ও ২-এ যে আলোচনা করেছি, তা থেকে আমাদের সামাজিক পটভূমিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিহ্নিত করা যায়।

১। জ্ঞান একটিই এবং এর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা অংশের মধ্যে সম্পর্ক আছে। অবশ্য আমরা বিজ্ঞানশিক্ষাকে সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার শিক্ষা থেকে পৃথক করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পরিচ্ছেদ ৫.২.১ এবং ৬.৪.১-এ উল্লিখিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগুলি দিয়ে এটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার এটি এক অবাঞ্ছিত অঙ্গ। এর ফলে অংশগুলি কীভাবে পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করে, তার একীভূত দৃশ্য, অথবা আরও বিশেষ করে, আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিজ্ঞানের ভূমিকা কী এবং আর্থসামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মনীতিগুলি কীভাবে বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে, সেসব কথা মানুষের গোচরে আসতে পারে না।

বহু বৎসর ধরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞান নিজে থেকেই ভালো। এটা ততদিনই চলেছিল যতদিন না সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে বিজ্ঞান ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, কীভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বিস্তার করা যায়, কীভাবে মানুষের দমন বা গণহত্যার জন্য যুদ্ধ লাগাতে বিমান, এমনকি আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানেরও অপপ্রয়োগ করা যায়। বিজ্ঞানকে কল্যাণকর করতে হলে তাকে মানবীয় অবস্থার উন্নতি ও উত্থানের কাজে সহায়তার মতো আকার দিতে হবে।

২। একক ৬-এ আমরা দেখেছি যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের এবং মার্কিন সমাজের প্রয়োজন অনুসারে ও তারই প্রসঙ্গে। সেখানে বিকাশপ্রাপ্ত ধারণাগুলির সব কটিই আমাদের ভারতীয় সমাজের উপযোগী কিনা, তা আমাদের সযত্নে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। যথা, প্রায় সব যান্ত্রিকীকরণই শ্রমের উৎপাদনশক্তি বাড়ায় অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক দিয়ে অল্পসংখ্যক লোকের সাহায্যে অধিক উৎপাদন ঘটায়। এটি শ্রমের ব্যবহার কমাবার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইউরোপীয় দেশগুলির মতো যে দেশে শ্রমিকের স্বল্পতা আছে, তার পক্ষে উপযোগী। আমাদের মতো জনবহুল দেশে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উপরে যান্ত্রিকীকরণের ফল কী হবে? জনগণের কর্মসংস্থান ও তৎসম্পর্কিত ক্রয়ক্ষমতার নিশ্চয়তাবিধান না করলে পশ্চিমী জগতে যেমন ঘটেছে তার অন্ধ অনুকরণে যান্ত্রিকীকরণের ফল আমাদের স্বার্থের বিশেষ অনুকূল না হতে পারে।

যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ উৎপাদনের শ্রমসংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাস করতে পারে এবং তার ফলে মুনাফার বৃদ্ধি হতে পারে; কিন্তু যেদেশে লোকসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দরিদ্র, সেখানে এর সামাজিক ভার অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। স্পষ্টতই একটি সতর্ক ও সাবধানী নীতির প্রয়োজন আছে। কৃষিতে এর একটি বাস্তব উদাহরণ বর্তমান। অযান্ত্রিক কৃষি স্বাভাবিক অবস্থায় ৫% থেকে ১০% উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে, যাতে শহরগুলির জনগণকে খাওয়ানো যায়। যান্ত্রিকীকরণে জমি থেকে উৎপাদন বাড়ে না। যা ঘটে তা হল, অল্পতর সংখ্যক লোক, ধরুন ৫%, প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তের সবটুকু উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু তখন অবশিষ্ট গ্রামীণ জনগণ কী করবে? যদি তারা কর্মহীন ও দরিদ্রতর হয়ে পড়ে, উৎপন্ন খাদ্য কিনতে তারা সক্ষম না হতে পারে। এর উত্তর হল, কর্মসংস্থানের অন্যান্য পথ খুলে দেওয়া। এর অর্থ, কৃষি বা শিল্পে যান্ত্রিকীকরণের প্রকৃত সুবিধা নিতে হলে সতর্ক ও বহুমুখী পরিকল্পনার প্রয়োজন।

৩। কোনও সংস্থার—ধরুন, একটি কারখানার—"দক্ষতা" একটি বিতর্কিত ধারণা। আমরা একক ৬-এ দেখেছি, ইতিহাসের ধারায় রয়েছে মুনাফাকে সর্বাধিক বৃদ্ধি করাই কারখানার মালিকের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং

সে উৎপাদন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের বিশ্লেষণ করে। জিনিসগুলি সম্বন্ধে তার পরিকল্পনায় সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনার কোনও স্থান ছিল না। যেমন, "উচ্চ-দক্ষতা"র ভিত্তিতে গড়ে তোলা কোনও কোনও কারখানা থেকে পরিবেশের ভয়ঙ্কর দূষণ ঘটেছে—ধোঁয়া, ঝুল এবং কারখানাগুলি থেকে বেরিয়ে সেগুলির চারিপাশে জমে ওঠা যত রকমের নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত বা অ্যাসিডযুক্ত জল দিয়ে।

পশ্চিমের মতো শিল্পায়নের উচ্চমানে না পৌঁছালেও ভারতে আজ এমন অবস্থা দেখি। ইউরোপ বা আমেরিকায়, যেখানে শিল্পায়ন আরও অনেক বেশি, সেখানে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ও ডেট্রয়েটের মতো সম্পূর্ণ শহরটিই ধোঁয়াটে কুয়াশার প্রায়ই ঢাকা পড়ে কালো হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, মৃত্তিকার অবনতি বা সম্পদ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা না করে ভালো মুনাফার জন্য পৃথিবীর বিরল সম্পদগুলি খনন ও বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই মুনাফাসর্বস্ব তথাকথিত "দক্ষতা"র ফলে সামাজিক সমস্যাগুলি প্রায়ই তীব্রতর হয়েছে। বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলি থেকে আসা কোনও ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যাখ্যা নির্বিচারে ব্যবহার করে আমাদের সমস্যাগুলিকে জটিলতর করা আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে।

৪। এমন অন্য অনেক ধারণাই আছে, যেগুলিকে আমাদের পরিস্থিতিতে গ্রহণের আগে পরীক্ষা ও পরিমার্জন করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। একটি হচ্ছে 'মাত্রিক অর্থনীতি' (economy of scale) যার অর্থ—পণ্যসামগ্রী বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করলে উপরিব্যয় আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় অধিক মুনাফা করা যায়। অতীতে যখন শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে বিশেষত উপনিবেশগুলির বাজার ও রপ্তানির বাজার আরও সহজপ্রাপ্য ছিল, তখন এই ধারণা ভালোই ছিল। বর্তমানে সামাজিক প্রয়োজনগুলি যত সীমিতই হোক না কেন, সেগুলিকে বিবেচনায় আনতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে নিজ দেশবাসীর যা সত্বর প্রয়োজন, মানুষ ও যন্ত্রের সেগুলিই উৎপাদন করা উচিত। রপ্তানির বাজার পাওয়া গেলেও নিজেদের প্রয়োজন অবহেলা করে উৎপাদনকে সেই বাজারমুখী করা অবিমিশ্র কল্যাণকর নয়।

৫। সাধারণের আরও একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, যে কেউ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করলেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অবাধে পেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত এমন সব বস্তুর উৎপাদনে বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহার করা হয়, যেগুলি হয় অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, না-হয় কোনও বিশেষ প্রকারের সুবিধালাভের জন্য দরদস্তুর করতে ব্যবহৃত হয়। আপনারা সংবাদপত্রে পড়ে থাকবেন যে সমরসরঞ্জাম, সুপার-কম্পিউটার এবং অন্যান্য আধুনিক জটিল প্রযুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন শর্তাধীনে বিকাশশীল দেশগুলিকে দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিবিদ্যাগত তথ্যগুলি বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক গোপনীয়তার মধ্যে সুরক্ষিত হয়। এমনকি বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির প্রয়োগশালায় যেসব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যতদিন সম্ভব সেগুলিকেও গোপন রাখা হয়।

তাই আমরা দেখতে পাই, উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করার পরেও ঔপনিবেশিকতার জোয়াল সম্পূর্ণ চলে যায়নি। বিকাশশীল দেশগুলিকে মোটামুটি বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির স্বার্থ অনুযায়ী চলতে বাধ্য করার যন্ত্র হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পাঠ্যক্রমের শেষ পর্যায়ে আমরা এই

আলোচনার পুনরারম্ভ করব এবং কীভাবে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে জাতীয় কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারি, তা সন্ধান করব।

৭.৫ সারাংশ

এই এককে আমরা ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-উত্তর বিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি। নতুন শিল্পায়িত দেশগুলি কাঁচামাল ও উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বাজারের সন্ধানে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক জোয়ালের অধীনে যায়। পরবর্তীকালে এর দ্বারা ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ প্রভাবিত হয়। এখন এই এককের প্রধান বিষয়গুলির সারাংশ দেওয়া যাক :

- উপনিবেশ-স্থাপয়িতারা কেবল ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ শোষণেই আগ্রহী ছিল। তাই বিজ্ঞানের উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদির মতো কয়েকটি শাখার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু ভারতের সুপ্রাচীন বৈজ্ঞানিক প্রথা ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয়দের অনগ্রসর রাখতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা সমস্ত সৃজনশীল চিন্তার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছিল।
- স্থানীয় জনগণ এর উত্তরে কয়েকটি নিজস্ব বিজ্ঞানসংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যেগুলি বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করার কাজ করতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলন এই কাজে আরও প্রেরণা দেয়। কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী তাঁদের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এদেশের সকল লোকের হিতে প্রয়োগ করার বিষয়ে এক সচেতন চিন্তার উদ্ভব ঘটে।
- এই মনোভাব স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে অবলম্বিত নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের কার্যকর ব্যবহারের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবু এখনও কয়েকটি দিক রয়েছে যেখানে সতর্ক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমাদের সামাজিক পরিবেশ বিবেচনায় না এনে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানে পশ্চিমী ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ। বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ্যার তথ্য আমাদের থেকে গোপন রেখে আমাদের উপরে প্রভুত্ব করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমাদের জড়িত করে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির কৌশলের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে। বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির সমপর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের এখনও বহুদূর যেতে হবে।

৭.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ এত অল্প ছিল কেন, তা চার-পাঁচ পঙ্ক্তিতে লিখুন।

....

....

....

....

....

২। বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির ভূমিকার এমন দুটি দিক তালিকায় লিখুন, যেগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আমাদের বিকাশকে ব্যাহত করে।

....

....

....

....

....

৩। আমাদের সামাজিক পরিবেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ তিনটি পথ আমাদের দেশ অবলম্বন করবে বলে আপনি আশা করেন? আপনার পছন্দগুলিতে দাগ দিন।

(ক) শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ অর্থ বৃদ্ধি করা। ☐

(খ) সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে তরুণ বিজ্ঞানীদের বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে পাড়ি দেওয়া বন্ধ করা। ☐

(গ) অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেওয়া। ☐

(ঘ) জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সর্বব্যাপী শিক্ষায় উৎসাহ দান করা। ☐

(ঙ) বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলির ধারণা বা পদ্ধতিগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করা। ☐

৭.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১। (ক) সত্য (খ) মিথ্যা (গ) সত্য (ঙ) মিথ্যা (চ) সত্য (ছ) মিথ্যা (জ) মিথ্যা

(খ), (ঙ), (ছ), (জ) : প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঠিক উল্‌টো হবে, যেমন পাঠ্যপুস্তকে দেখতে পারেন।

২। ক : (১) যুক্তরাজ্যে রপ্তানির জন্য তুলা, চা ও নীলের মতো বাণিজ্যিক শস্যের নতুন প্রকারগুলি উৎপাদনের সমস্যা সমাধানের জন্য।

(২) খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলি শোষণের জন্য।

(৩) উপনিবেশকারীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য।

খ : (২)

৩। (ক) স্বদেশী

(খ) বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা

(গ) কৃষি, চিকিৎসাবিদ্যা

(ঘ) শিল্পায়ন, পরিকল্পনা

(ঙ) বৈজ্ঞানিক নীতি

৪। (ক) ✓ (খ) × (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) ×

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

১। ঔপনিবেশিকদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যথাসম্ভব শোষণ করা এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্য ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করা। ভারতের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা সরক্ষণ করতে অথবা ভারতে বিজ্ঞান, শিক্ষা বা পার্থিব বিষয়ে কোনও বিকাশ ঘটাতে তারা আদৌ আগ্রহী ছিল না।

২। (ক) অনুন্নত দেশগুলির উপরে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করবার এবং তাদের বাধ্য রাখার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার।

(খ) প্রচুর মুনাফা করার এবং বৈদেশিক ঋণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সামরিক কৌশলের নীতির উপরে দরিদ্র দেশগুলির নির্ভর বাড়ানোর জন্য অস্ত্র প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দেওয়া।

৩। (ক) ✓ (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) ×

একক ৮ □ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকৃতি

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৮.২ বিজ্ঞান : এর বিভিন্ন দিক

৮.৩ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

৮.৩.১ পর্যবেক্ষণ

৮.৩.২ প্রকল্প

৮.৩.৩ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

৮.৩.৪ বৈজ্ঞানিক সূত্র, প্রতিরূপ এবং তত্ত্ব

৮.৩.৫ কয়েকটি উদাহরণ

৮.৪ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি

৮.৫ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

৮.৬ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু চিন্তাভাবনা

৮.৭ সারাংশ

৮.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

৮.৯ উত্তরমালা

৮.১ প্রস্তাবনা

আধুনিককালে আমাদের জীবনে এমন একটি দিক্‌ও নেই যার উপরে বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েনি। বহু দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং ছায়াপথ সম্বন্ধে আমাদের অবাক বিস্ময় বিজ্ঞানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা লাভ করে। এর সঙ্গে বিজ্ঞান আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলেও দৃষ্টিপাত করে। চারুশিল্প, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব যে কোন বিষয়েই হোক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আগ্রহবিহীন দর্শক নয়। মানুষের জীবনে বার্ধক্য ও পরমায়ু, ব্যথা এবং আনন্দ, কর্মক্ষেত্র এবং অবসর যাপন, যুদ্ধ ও শান্তি সকল বিষয়ই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অর্থলাভ করেছে।

আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব যেহেতু ক্রমশঃ বিস্তৃতি পেয়েছে, তাই বিজ্ঞান এখন সাধারণ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন কিংবা গণিতের অঙ্কের সমাধান অপেক্ষা অধিক অর্থ বহন করে। শ্রমশিল্পে এবং কৃষিতে

উৎপাদন বৃদ্ধি করার পদ্ধতি জানা, উন্নততর যন্ত্রপাতি, বস্তুসামগ্রী কিংবা ঔষধ আবিষ্কার করার মধ্যেই বিজ্ঞানের পরিধি আজ সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান আজ তার চেয়েও বেশি কিছু।

'বিজ্ঞান' কথাটির অর্থ হল বিভিন্ন প্রকার ধ্যানধারণা, বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করার একটি পথ। এর ভিতরে নিহিত আছে পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টি, বিচারশক্তি, স্বজ্ঞা (intuition), সুনিয়মিত কার্যপ্রণালী এবং সৃষ্টির প্রেরণা। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের এক বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি হয় যা আমাদের বিশাল অজ্ঞানতার পরিধি সম্বন্ধে সচেতন করে; তথাপি আমাদের এই মানসিকতা পারিপার্শ্বিক জগতের রহস্য উন্মোচনে মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত আশাবাদী। বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে এনে দেয় এমন এক সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন যা পূর্বপরিকল্পিত ধারণা ব্যতীতই আমাদের সত্যকে অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করে।

বিজ্ঞানের কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, অথবা সেই জ্ঞানের অর্থ নির্ণয় করি, যার সাহায্যে প্রকৃতিকে বা কিছু অংশে মনুষ্য প্রজাতিকে বোঝা সম্ভব? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি কী? এই ধারণাগুলির পূর্ণ উপলব্ধি অত্যন্ত জরুরি কারণ জীবনের বহু ক্ষেত্রে, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের সংকট সমাধানের ক্ষেত্রেও এসব ধারণার প্রয়োগ দেখা যায়। সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছুটা তলিয়ে আলোচনা করব। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলির উপরে একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই এককটি শেষ হবে। কিন্তু আলোচনার এখানেই শেষ নয়। এই এককে যে ধারণাগুলি উপস্থাপিত করা হল পরবর্তী এককে তার প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যাবে।

উদ্দেশ্য

এই এককটির পাঠ সম্পূর্ণ হলে আপনি

- বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবয়ব কী দিয়ে গঠিত তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি রূপরেখা এবং প্রতিটি পদ্ধতির কার্যপ্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করতে পারবেন।

৮.২ বিজ্ঞান : এর বিভিন্ন দিক্

বিজ্ঞান একই সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা। ব্যক্তি বিশেষের প্রবলভাবে সৃজনকার্যে জড়িত থাকা বিজ্ঞানের একটি সাধারণ ঘটনা। একই সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি সামাজিক অবস্থার এবং প্রয়োজনের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। অন্য দিকে, বিজ্ঞান সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এর অর্থ হল, বিজ্ঞান সামাজিক পরিবর্তনের এক মাধ্যম।

জীবন এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা একাধারে বিস্ময় ও কৌতূহলবোধ এবং অন্যদিকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অনন্তকাল ধরে এই দুই আদিম

প্রবৃত্তি মানুষের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞান মানুষের চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ার ফলে তার ওপরেও এই প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব পড়ে। কোনও একজন বিশেষ বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে এই দুইটি উদ্দেশ্যের যে-কোনো একটি অধিকতর প্রভাবশালী হতে পারে। সমাজ উভয়দিক থেকেই সুফল লাভ করে—আমাদের চারিপার্শ্বের পৃথিবীর সম্বন্ধে আরও বেশি জানা ও তার উপর আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে।

বর্তমানে যা যা জানা গেছে, তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যেই দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই কারণে বিজ্ঞানকে আধুনিক বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে মনুষ্য প্রজাতির সৃষ্টির সময় থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বিরাজমান। বিজ্ঞানের ঐতিহ্য মনুষ্য প্রজাতির প্রারম্ভ থেকে বজায় থেকেছে। 'বিজ্ঞান' নামটি সৃষ্টি হবার কিংবা সাধারণ বোধবুদ্ধি এবং চিরাচরিত জ্ঞানের থেকে ভিন্ন এক 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'র উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই এই ঐতিহ্যের অস্তিত্ব ছিল। আমরা দেখেছি যে এই ঐতিহ্যের প্রারম্ভিক কর্ণধার ছিলেন জ্যোতিষীরা, পুরোহিতেরা, যাদুকর এবং কারিগরেরা এবং বলাই বাহুল্য পরবর্তীকালে অপ-রসায়নবিদ্যার। প্রকৃতপক্ষে, সমাজের চরিত্র পরিবর্তন এবং ইতিহাসের যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের সামনে যেসব প্রশ্ন জাগে এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা অনেকটাই বদলে গেছে। এর ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও পরিবর্তিত হয়েছে।

কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে তৈরি বিজ্ঞানের জগৎ? যে জগতকে বিজ্ঞান বর্ণনা করে—যে মহাবিশ্বকে বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে—সে হল আমাদের চারিপার্শ্বের প্রকৃতি, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগৎ। বিজ্ঞানের পরিধির ভিতরে যেমন আছে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব, তেমনই আছে সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ। বিজ্ঞানকে বিশ্বের সঙ্গে নূতন ধরনের জ্ঞানের, নূতন সব এলাকায়, নূতন মাত্রার যোগসূত্র স্থাপনের এক মাধ্যম হিসাবে ধরা যায়।

এই যোগসূত্রগুলি আমরা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করি? আমাদের অনুভূতিই এ কাজে আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু আমাদের অনুভূতির পাল্লা সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, বহুদূরের বস্তু কিংবা অতি ক্ষুদ্র বস্তু আমরা দেখতে পাই না, অতি মৃদু কিংবা অত্যন্ত প্রবল শব্দ আমরা শুনতে পাই না। এছাড়া অন্যান্য সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন চিত্র ৮.১ দেখলে বোঝা যাবে যে আমাদের উপলব্ধি অনেক সময়ই আপেক্ষিক। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভূতির সীমাবদ্ধতা আমরা অনেকটা কাটাতে পেরেছি। উদাহরণ হিসাবে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে, বস্তুর আকৃতির ক্ষুদ্রতা কিংবা দূরত্বের সাপেক্ষে আমাদের চোখের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণকে রোধ করতে পারেনি। যে পরমাণু এবং অতিদূরের গ্রহ নক্ষত্র, সাধারণভাবে খালি চোখে দেখা যায় না, তাও এখন দেখতে পাওয়া সম্ভব। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয় এমন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। যেমন, ৮.১ নং চিত্রে একটি থার্মোমিটার B গেলাসের জলের উষ্মতা সর্বদাই ঠিকমত দেখাবে, যদিও আমাদের আঙ্গুলে তা গরম কিংবা ঠাণ্ডা বোধ হতে পারে।

চিত্র ৮.১ : যদি কিছু সময়ের জন্য এক হাতের একটি আঙ্গুল গরম জলে ডোবানো হয় (গেলাস A) এবং অন্য হাতের অপর একটি আঙ্গুল শীতল জলে (গেলাস C) ডোবানো হয়, এবং তারপর এই দুইটি আঙ্গুল গেলাস B-তে ঈষৎ উষ্ম জলে ডোবানো হল, তাহলে, যে আঙ্গুল ঠাণ্ডা জলে ছিল সেটিতে B গেলাসের জল গরম ঠেকবে এবং যে আঙ্গুল গরম জলে ছিল তাতে B গেলাসের জল ঠাণ্ডা বোধ হবে।

নতুন ‘শব্দ’, নতুন ‘আলো’ নতুন ‘মহাশূন্য’ এবং বিভিন্ন নতুন ‘যোগসূত্র’, আধুনিক বিজ্ঞান এই নিয়েই তৈরি। প্রকৃতির পর্যবেক্ষক অথবা চারিপার্শ্বে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে আমাদের ভূমিকার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির সীমাকে ছাড়িয়ে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা আমাদের যেন প্রাকৃতিক জগতের খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে। এর ফলে মনে হয় সমগ্র পৃথিবী ও নিজেদের জীবনের ওপরে যেন মানুষের একটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্ম হয়েছে।

অজানা জগতের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে ও তাকে আমাদের জ্ঞানের জগতের অন্তর্ভুক্ত করতে বিজ্ঞান সর্বদা আমাদের সাহায্য করে। নিত্যনতুন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ধিত করে। উদাহরণস্বরূপ— মানুষ অতীতে চাঁদে অবতরণ করেছিল এবং তারপর মঙ্গলগ্রহে যন্ত্রপাতি নামানোর জন্য নতুন গবেষণাও সফল হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন, মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ ও গঠন অনুসন্ধানের

উপায়ও আজ আমাদের নাগালের মধ্যে। আমরা যত নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, তত আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল প্রয়োজনগুলি ছাড়াও, আজকের এই জটিল পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যেমন— মানুষের কঠোর একঘেয়ে পরিশ্রম কমানোর জন্য উন্নততর উৎপাদনের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির আরও উন্নত ব্যবস্থা। আদিম মানবের খাদ্য ও আশ্রয় সংগ্রহের প্রয়োজন অপেক্ষা এই জটিল প্রয়োজনগুলি বিজ্ঞানের সামনে অনেক বড় রকমের সমস্যা সমাধানের দাবি রাখে। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা বিজ্ঞানের এমন নতুন নতুন ক্ষেত্রে উপনীত হই যার সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক ধরাণা খুব পরিষ্কার কিংবা সুগঠিত নয়। যাই হোক্, উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা এই নতুন ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারি। এজন্যই বিজ্ঞানচর্চা আসলে জ্ঞানের এক অন্তহীন অনুসন্ধান এবং এক নিরন্তর প্রয়াস।

বিজ্ঞানের অর্থ হল পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানের অনুসন্ধান, এটিকে বোঝার প্রচেষ্টা। অজানা সম্বন্ধে মানুষ সর্বদাই নানা অনুমান করে এসেছে। যখনই প্রকৃত জ্ঞান কোনো অজানা ক্ষেত্র সম্বন্ধে অনুমানের স্থান নিয়েছে, তখনই সেই ক্ষেত্রটি বিজ্ঞানের একটি অংশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা যদি আমরা বুঝতে না পারি, আমরা অনেক সময়ে তার একটি অলৌকিক অর্থ দেবার চেষ্টা করি। বিজ্ঞান প্রকৃত ঘটনা এবং কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে সবরকমের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে অলৌকিকত্ব দূরীভূত করে।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কলেবর প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত। সুবিধার জন্য এই সকল ক্ষেত্রগুলিকে আমরা জীবনবিজ্ঞান, ভেষজ বিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, কারিগরী বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছি। তথাপি এই সকল ক্ষেত্রগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, জীবনবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন জীবের কোষ তো বটেই, তার অন্তর্গত অণু-পরমাণু পর্যন্ত পৌঁছায়। এইভাবে জীবনবিজ্ঞান রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সঙ্গে জড়িত। অন্য দিকে জীবনবিজ্ঞান, বিশেষত উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে বনরক্ষণবিদ্যা এবং কৃষিবিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। এর অর্থ জলবায়ু ও মাটির সঙ্গে তথা ভূগোল ও ভূতত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে জীবনবিজ্ঞানের সম্পর্ক। ফলে আমরা দেখি যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিষয়গুলি মূল জায়গাতে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত।

উপরন্তু, প্রায়শই দেখা গেছে যে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে কিংবা কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি আনতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশ দূষণের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞান, গণিত , সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বৈজ্ঞানিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, আমরা যদি জৈবগ্যাস, বাতাস বা সৌরশক্তির মতো কোনো অফুরান শক্তির উৎসের অনুসন্ধান এবং সেই ধরনের শক্তির ব্যবহার করতে চাই তখন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থেকে বৈজ্ঞানিকদের তাদের জ্ঞান একত্র করে কাজে অগ্রসর হতে হয়। তদুপরি, গত কয়েক দশক যাবৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সীমারেখাগুলি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে।

রাসায়নিক বিক্রিয়া, জৈবিক প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সবকিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজকাল একই পদ্ধতির সাহায্যে চলে এবং একই সাধারণ তত্ত্বের ওপর এদের ভিত্তি।

অনুশীলনী—১

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সত্য না অসত্য? পাশের ছোট বাক্সে আপনার উত্তর লিখুন :

(ক) বিজ্ঞান আমাদের চারিপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসন্ধানে সাহায্য করে ফলে আমাদের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ☐

(খ) বিজ্ঞানের জগৎ অতি অদ্ভুত এবং এর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই। ☐

(গ) বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র উপলব্ধি করি না, আমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য নিয়ন্ত্রণও করি। ☐

(ঘ) প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভয়, বিস্ময় এবং অলৌকিকত্বের ধারণা দূরীভূত করার জন্য বিজ্ঞান কিছুই করেনি। ☐

(ঙ) যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ অনুভূতির দ্বারা হয়, এবং ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ব্যক্তিনির্ভর, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এক এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক এক রকমের হবে। ☐

৮.৩ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আমরা পূর্বে দেখেছি যে বিজ্ঞান হল প্রকৃতিকে বোঝার ও তাকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নেওয়ার একটি প্রচেষ্টা।

পূর্বেকার এককগুলিতে আমরা দেখেছি যে এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমরা প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং একটি সুপরিস্ফুট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আধার সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখা যাক্, এই জ্ঞান কী উপায়ে আহরণ করা হয়েছে? বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের কী কোনো বিশেষ পদ্ধতি আছে? যদি তাই হয়, তাহলে যে উপায়ে আমরা সাধারণভাবে আমাদের চারিপাশের পৃথিবীকে উপলব্ধি করি তার থেকে এই পদ্ধতির পার্থক্য কী? প্রথম প্রশ্নের উত্তর—হ্যাঁ। ১নং এককে আপনি পড়েছেন যে বিজ্ঞানের একটি 'পদ্ধতি' আছে। পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প, পরীক্ষা, তত্ত্ব ও সূত্র ইত্যাদি যে কথাগুলি ১নং এককে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও আপনার পরিচিত। এইসব বিভিন্ন মানসিক ও ভৌত প্রক্রিয়া নিয়েই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াগুলির প্রতিটি এখন আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখব।

৮.৩.১ পর্যবেক্ষণ

আমরা সবাই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেককিছু জানতে পারি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন ও ঘ্রাণ থেকে যে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় তার সবটাই সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ—আমরা দেখি যে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়; একটি বলকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তা নীচে নেমে আসে। কৃষক প্রায়ই বীজ বপনের সময় জলে ডুবিয়ে ভালো বীজ ও নষ্ট বীজ পৃথক করে নেয়। ভালো বীজগুলি জলে ডুবে যায় এবং নষ্ট বীজগুলি ভেসে ওঠে, এই পর্যবেক্ষণই কৃষককে কোন্ বীজ ভালো কোন্‌টি খারাপ এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, একটি ডিম ভালো না পচা তা একটি জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়লেই বোঝা যায়। পচা ডিম সর্বদা ভাসতে থাকবে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ সন্দেহাতীতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্রকরগণও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের চারিপাশের পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজ নিজ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির সাহায্য নিয়ে, এই পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে, তাঁরা চিত্রকলা সৃষ্টি করেন। কিন্তু এগুলিকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বলা চলে না।

সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠে বিজ্ঞানের জগতে আমরা কোনো ঘটনা কীভাবে এবং কেন ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করি। সুতরাং কী কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কীভাবে তা করতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। উপরন্তু বৈজ্ঞানিক যে পর্যবেক্ষণগুলি করবেন তা তাঁর ভাবপ্রবণতা বা ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে, সঠিক হতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনার কাছে ব্যক্তিনির্ভর প্রতিক্রিয়াকে নতিস্বীকার করতে হবে। এই দিক দিয়ে একজন বৈজ্ঞানিক কোনো চিত্রকর বা কোনো সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা।

অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণের ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই বিষয়ে বিখ্যাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন্ যা বলেছেন তা স্মরণ রাখা ভালো—'ভুল তত্ত্বের দ্বারা বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হয়, ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ জনিত ক্ষতির তুলনায় তা নগণ্য'। অপ্রচুর পর্যবেক্ষণ একইভাবে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ—ভূকেন্দ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকগণ বহু বছর ধরে বলতে চেয়েছিলেন যে কোপারনিকাসের প্রকল্প সত্য নয়। তাঁরা এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে তাই যদি হত, তাহলে শুক্রগ্রহের (যা পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে অবস্থিত একটি গ্রহ) চাঁদের মতো কলা দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু যেহেতু ঐ সময়ে শুক্রগ্রহের কলা দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়নি তাই কোপারনিকাসের জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্ত বলে মনে করা হল। যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ শুক্রগ্রহের কলা সত্যই চোখে দেখতে পেল, তখন কোপারনিকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই আপাত সত্য যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হল।

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্বন্ধে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোনও একটি স্থানে বৃষ্টিপাতের ধরন নিরীক্ষণ করার জন্য বহু বছর ধরে প্রতি মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা যেতে পারে। মানুষের সৃষ্ট প্রক্রিয়াগুলির উপরেও পর্যবেক্ষণ করা চলে। যেমন—কোনো একটি যন্ত্রের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে, কিংবা নতুন যন্ত্র তৈরি করতে হলে, ঐ ধরনের যন্ত্রের নক্‌শা ও কার্যপ্রণালীর উপর পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অনুরূপভাবে, নানা বস্তুর সংমিশ্রণে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন তন্তু কিংবা রবারের ক্ষেত্রে, তারা কতটা ধকল সহ্য করতে পারে, কিংবা তারা কতটা অগ্নিনিরোধক, ইত্যাদি ধর্ম পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সামাজিক ঘটনাবলীও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। কোনো একটি বিশেষ এলাকাতে কিংবা সমাজের কোনো

বিশেষ ক্ষেত্রে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার করে দেখার জন্য ব্যক্তি বিশেষের জমির মালিকানা, মাসিক আয়, শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য সযত্নে পরিকল্পিত পরীক্ষা বা সমীক্ষার সাহায্যে 'সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী' এসব পর্যবেক্ষণ চালানো হয়।

এই বাঁধাধরা পর্যবেক্ষণগুলিকে এবারে সাজিয়ে নেওয়া হয়; অর্থাৎ সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে তালিকার বা লেখচিত্রের মাধ্যমে সযত্নে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যগুলির ভিতরে কোনো নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা আছে কিনা তা দেখাই এর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষণ, উপাত্ত, তথ্য এবং সংখ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রচুর প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি ছোট করে দেখলে চলবে না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং তার উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।

৮.৩.২ প্রকল্প

পরবর্তী পদক্ষেপ হল প্রকল্প নির্মাণ করা। প্রকল্প হল যে যে বস্তুর ওপরে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তার সম্বন্ধে যুক্তিভিত্তিক একটি বিবৃতি। যে যে প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয় এটি তার উত্তর দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। ১নং এককে আপনি প্রকল্পের একটি উদাহরণ পেয়েছেন, যেটি হল ফুলের প্রতি মৌমাছি আকৃষ্ট হয় ফুলের রং এর জন্য, না ফুলের মধুর জন্য, নাকি উভয়েরই জন্য (চিত্র ১.৪)? অন্যান্য উদাহরণ হতে পারে—গাছের বৃদ্ধির জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন বা, পৃথিবীর আকর্ষণেই একটি বস্তু মাটিতে পড়ে। যে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তার সম্বন্ধে সকল প্রকার পর্যবেক্ষণ একত্র করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়। এই প্রকল্পের দ্বারা ঘটনাগুলির জানা চরিত্র ব্যাখ্যা করার অথবা অজানা কিন্তু সম্ভাব্য চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব সংকেত জ্ঞাপনের চেষ্টা করা হয়। একটি প্রকল্পকে আমরা যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত একটি অনুমান হিসাবে বর্ণনা করতে পারি। একটি প্রকল্প নির্মাণ করতে আমরা আরোহী ও অবরোহী তর্ক শাস্ত্রের যে-কোনোটির সাহায্য নিতে পারি।

আরোহী তর্কশাস্ত্র কাকে বলে? যদি কোনো ঘটনার কোনো বস্তুর বা কোনো অবস্থার একটি বিশেষ অংশের সরাসরি প্রমাণ আমাদের কাছে মজুত থাকে, এবং তার ওপরে ভিত্তি করে আমরা সম্পূর্ণ ঘটনাবলী, বা সমগ্র বস্তুমণ্ডলী এবং সকল প্রকার অবস্থার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহলে বলা যাবে আমরা আরোহী তর্কশাস্ত্র ব্যবহার করছি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমরা যদি জানি যে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কোনও দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, আমরা আরোহী প্রথায় এই প্রকল্প তৈরি করব যে ঐ একই সময়ে জনসংখ্যা পুনরায় দ্বিগুণ হবে। আবার, যদি একটি ক্ষুদ্র বাল্‌বের আলোর সাহায্যে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত ইত্যাদি সরল আকৃতির কিছু বস্তুর ছায়া দেওয়ালে ফেলা হয়, সেই ছায়া নিরীক্ষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আলোক রশ্মি সরলরেখায় চলে। এই সিদ্ধান্ত চিন্তার জগতে একটি বড় মাপের উত্তরণ এবং এটি আরোহণভিত্তিক একটি সর্বব্যাপী সাধারণ বিবৃতি। আরোহী তর্কশাস্ত্র আমাদের ভুল পথেও পরিচালিত

করে। উদাহরণস্বরূপ—একটি বাগানে কেবলমাত্র লাল গোলাপ দেখে— 'সকল গোলাপ ফুলের রংই লাল', এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক। অতএব আপনি বুঝতেই পারছেন যে আরোহী বিবৃতিগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা খুবই কমবেশি হতে পারে। যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া আপনি যে-কোনো সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না। উপরন্তু, এই সিদ্ধান্তগুলি কতটা নির্ভরযোগ্য তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অবরোহী তর্কশাস্ত্র বিদ্যাকে আরোহণের বিপরীত হিসাবে দেখা যেতে পারে। এখানে যুক্তিগুলি অনেক সোজাসুজি ভাবে উপস্থাপিত হয়। যদি আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর বস্তু, ঘটনাবলী কিংবা অবস্থার সম্বন্ধে কোনো একটি প্রকৃত তথ্য জানতে পারি, যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা সেই শ্রেণীভুক্ত একটি বিশেষ বস্তু, একটি বিশেষ ঘটনা কিংবা একটি বিশেষ অবস্থার সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। অবরোহণের উদাহরণ—গোলাপ ফুলের যেকোনো রং হতে পারে, অতএব কিছু কিছু গোলাপের রং লাল। সকল প্রকার পাখির ডানা আছে, অতএব চড়াই পাখিরও ডানা থাকবে। রসায়ন শাস্ত্রে অবরোহী তর্কশাস্ত্রের প্রভূত প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ—যদি একটি শ্রেণীর রাসায়নিক লবণের মধ্যে কোনো বিশেষ ধর্ম ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়, আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে এই শ্রেণীভুক্ত যে-কোনো লবণের মধ্যে একই ধর্ম কিংবা আচরণ দেখতে পাওয়া যাবে। আপনি বলতে পারেন যে অবরোহণও আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে, কারণ উপরের উদাহরণগুলিতে চড়াই যে একটি পাখি বা একটি রাসায়নিক লবণ যে বিশেষ একটি শ্রেণীভুক্ত তাই বা কী উপায়ে জানা সম্ভব? এই ধরনের অবরোহী সিদ্ধান্ত মেনে নেবার আগে এই সকল তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে হবে।

এইভাবে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে জানা থেকে অজানার জগতে। এর সঙ্গে অবশ্য কিছু পরিমাণ ঝুঁকি ও সন্দেহও মিশ্রিত থাকে। সুতরাং উভয়প্রকার যুক্তিবাদ থেকে উদ্ভূত প্রকল্প মেনে নেওয়ার আগে সেটিকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। প্রকল্পটি যাচাই করে দেখার মতো বিশেষভাবে পরিকল্পিত পরীক্ষার আয়োজন করাই হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি প্রধান কাজ।

৮.৩.৩ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বলতে বোঝায় কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা এক অবস্থা যেখানে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভিতরে বিশেষ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ চালানো যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে অনুকরণ করাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর জটিল চরিত্রকে সরল করে নিয়ে এক এক ধাপ এগিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা অনেকেই সাইকেলের চাকার টিউবে হাওয়া ভরবার জন্যে সাইকেলের পাম্প ব্যবহার করেছি। পিষ্টনের ওপর চাপ দিয়ে আমরা টিউবে হাওয়া প্রবেশ করাই। (চিত্র ৮.২ দেখুন) চিত্রে দেখা যাচ্ছে, পিষ্টনের ওপরে চাপ দেওয়ার ফলে বাতাসের আয়তন হ্রাস পাচ্ছে, তার ফলে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাকার ভিতরে বাতাস ঠেলে ঢোকানো হচ্ছে। অনুরূপভাবে, যদি আমরা একটি বেলুন আংশিকভাবে বায়ুপূর্ণ করে রৌদ্রে ফেলে রাখি, বেলুনের

ভিতরের হাওয়া গরম হয়ে প্রসারিত হবে এবং বেলুন আরও ফুলে উঠবে। এই ঘটনাগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে একটি গ্যাসের আয়তন তার চাপ ও উষ্মতা উভয়ের ওপরেই নির্ভর করে।

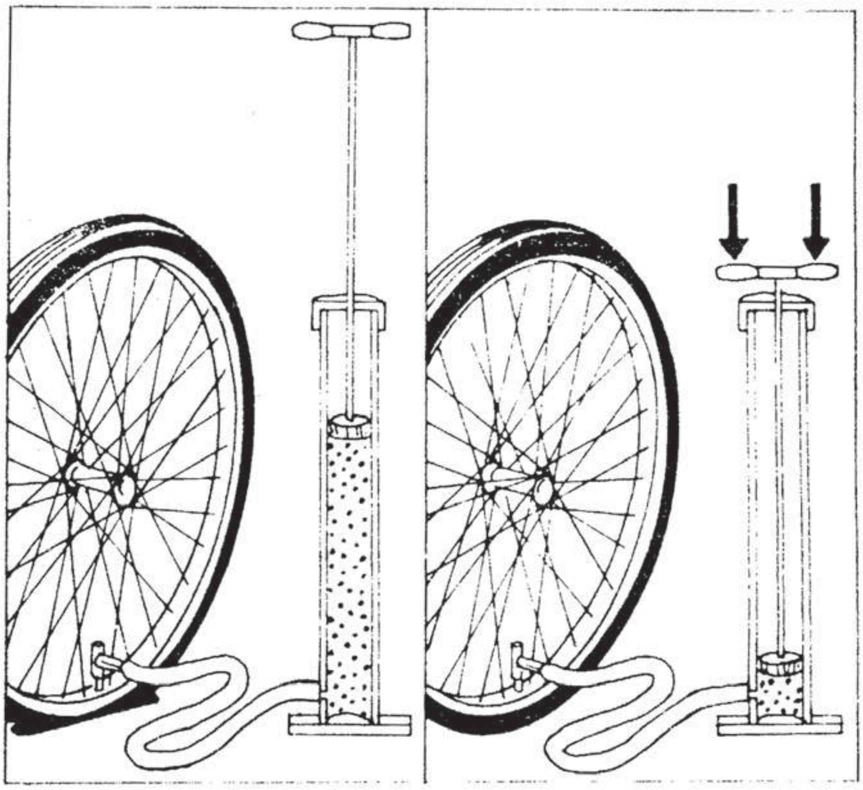

চিত্র ৮.২ : সাইকেলের পাম্পে বাতাসের আয়তন কমিয়ে চাপ বৃদ্ধি।

এখন আমরা যদি জানতে চাই চাপ এবং উষ্মতার নির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফলে আয়তন ঠিক কত পরিমাণে পরিবর্তিত হয় তবে আমাদের দুইটি ধাপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে হবে। প্রথম পর্যায়ে আমরা উষ্মতা স্থির রেখে চাপের সঙ্গে আয়তনের পরিবর্তন লক্ষ্য করব। দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্যাসটিকে স্থির চাপে রেখে উষ্মতার পরিবর্তনের ফলে আয়তনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হবে। রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) এবং জে.এ.সি. চার্লস (J.A.C. Charles) নামে দুই বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষাগুলি করেছিলেন। তাঁরা চাপ ও উষ্মতার সঙ্গে গ্যাসের আয়তন পরিবর্তনের সঠিক গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন। এই গাণিতিক সম্পর্কগুলি বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের নাম অনুসারে বয়েলের সূত্র এবং চার্লসের সূত্র নামে পরিচিত।

কোনও ঘটনা অত্যন্ত সুবেদী যন্ত্রের সাহায্যে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন, জীবকোষের গঠন সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আজকাল জীববিজ্ঞানীরা ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। কোনো কোনো সময়ে মন্দ উদ্দেশ্যেও

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯৪৫ সালে জাপানের দুইটি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল কেবলমাত্র ধ্বংস ডেকে আনবার জন্য নয়। বৈজ্ঞানিকগণ এও দেখতে চেয়েছিলেন এর ফলে কীভাবে বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে, আগুন কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি কীভাবে মানুষের আঘাত ও মৃত্যুর কারণ হয়।

বহু বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। সর্বাপেক্ষা অধিক তথ্য সংগ্রহ এবং দ্ব্যর্থহীন ফলাফল পাবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত চাতুর্য ও যত্নের সঙ্গে পরিকল্পিত হয়। এই পরীক্ষাগুলির ফলই প্রমাণ করে কোনো একটি প্রকল্প সত্য অথবা অসত্য। পরীক্ষালবদ্ধ ফল ব্যাখ্যা করবার জন্য কোনো কোনো সময়ে একটি প্রকল্প সরাসরি নাকচ করে নূতন একটি প্রকল্প গঠন করতে হয়। আবার অনেক সময় কোনো একটি প্রকল্পকে আরও নিখুঁত করা কিংবা সেটি কিছুটা পরিবর্তন করার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করে।

যন্ত্রপাতি (apparatus)

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ যেসব পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলিকে আরও প্রসারিত ও সঠিক করার জন্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা শব্দ ধরার যন্ত্র মাইক্রোফোনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কোনো জিনিস অথবা ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিতভাবে নাড়াচাড়া করবার জন্যেও বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ—তরল পদার্থ পরিশোধন করার জন্য পাতন যন্ত্র, জীববিদ্যাসংক্রান্ত নমুনাগুলি স্থির উষ্ণতায় সংরক্ষণের জন্য ইন্‌কিউবেটর (incubator, কৃত্রিম উপায়ে ডিম বা শাবককে গরম রাখার যন্ত্র) ব্যবহৃত হয় প্রচুর পরিমাণ তথ্য ধরে রাখা, জটিল গণনা করা, শিল্পজাত দ্রব্যাদির নক্‌শা প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজের জন্য কম্‌পিউটর যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা নিজেদের কাজ করার একপ্রস্থ হাতিয়ার উদ্ভাবন করেছেন, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'যন্ত্রপাতি' বলা হয়। এর কিছু কিছু সাধারণ জীবন থেকে সংগ্রহ করে বিশেষভাবে ব্যবহার করার জন্যে বানিয়ে নেওয়া, যেমন—দাঁড়িপাল্লা, সাঁড়াশী, চীনামাটির মুচি (crucible)। অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত অধিকাংশ বস্তু আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাই, একটি টেলিভিশন সেটের প্রধান অংশ হল একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, যার নাম **'ক্যাথোড রশ্মি নল'** (Cathode-ray tube) যা প্রথম তৈরি করা হয়েছিল একটি ইলেক্‌ট্রনের ভর মাপার জন্যে। আমরা যে প্রেসার কুকার সচরাচর ব্যবহার করি, তা হল অটোক্লেভ্ নামক একটি যন্ত্রের এক বিশেষ সংস্করণ। এই যন্ত্রটি জীবনবিজ্ঞানীরা অতি উচ্চচাপে বাষ্পের দ্বারা জীবাণুনাশ করবার কাজে ব্যবহার করতেন।

৮.৩.৪ বৈজ্ঞানিক সূত্র, প্রতিরূপ এবং তত্ত্ব

পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল থেকে প্রচুর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঞ্চয় হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শুধুমাত্র এই ফলাফলগুলিরই একটি তালিকা নয়। ফলাফলগুলি একত্রিত করে যুক্তিসঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব কিংবা সূত্রের আকারে ফলাফলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। সাধারণত অনেকগুলি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফলের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় তাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় 'সূত্র' বলে। একটি প্রকল্পকে তখনই 'সূত্র' হিসাবে মেনে নেওয়া

হয়, যখন তা প্রভূত পরিমাণ পরীক্ষালবদ্ধ ফলাফলের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং তার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের উদাহরণ হল—

(ক) গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেপ্লারের সূত্রগুলি সূর্যের চারিধারে গ্রহের গতিবিধির পর্যবেক্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রগুলি হল :

(১) গ্রহগুলি সূর্যের চারিপাশে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে এবং সূর্য উপবৃত্তের দুইটি নাভিকেন্দ্রের একটিতে অবস্থিত থাকে।

(২) সূর্য ও কোনো গ্রহের সংযোগকারী সরলরেখা নির্দিষ্ট সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

(৩) সূর্যের চারিধারে নিজের কক্ষপথে একবার পূর্ণ পরিক্রমণের সময়কালের বর্গ সূর্য থেকে গ্রহের গড় দূরত্বের ত্রিঘাতের (cube) সমান।

চিত্র ৮.৩-এর সাহায্যে আপনি এই সূত্রগুলি আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন।

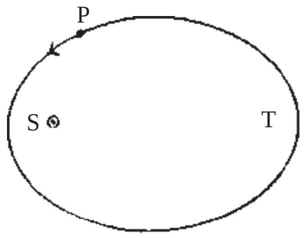

(ক)

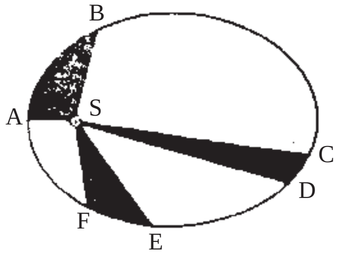

(খ)

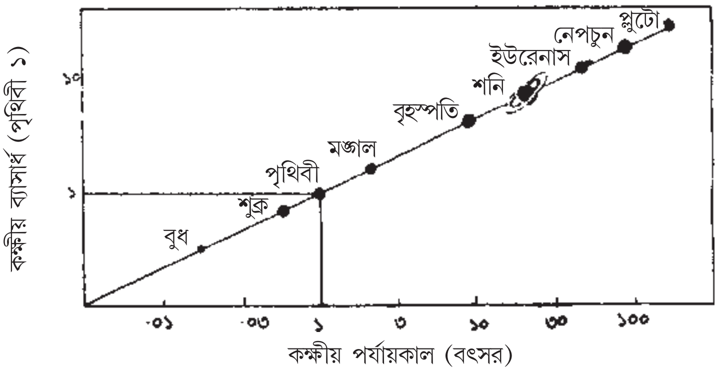

(গ)

চিত্র ৮.৩ : গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেপ্লারের সূত্র। (ক) প্রথম সূত্র : একটি গ্রহ (P) সূর্য (S)-কে দুইটি নাভির যে-কোনো একটিতে রেখে সূর্যের চারিধারে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। (খ) দ্বিতীয় সূত্র : একটি গ্রহের B বিন্দু থেকে A বিন্দুতে যেতে যে সময় লাগে তা ঐ গ্রহের F বিন্দু থেকে E বিন্দুতে যাবার সময় এবং D বিন্দু থেকে C বিন্দুতে যাবার সময়ের সমান। চিত্রে ছায়াঙ্কিত ASB, ESF, CSD ক্ষেত্রফলগুলি সমান। (গ) তৃতীয় সূত্র : একটি গ্রহের কক্ষপথের দৈর্ঘ্যের মাপ এবং সূর্যের চারিধারে একবার পূর্ণ আবর্তন করতে গ্রহের যে সময় লাগে, এই দুইটির মধ্যে সুস্পষ্ট গাণিতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সূর্যের থেকে যে গ্রহের দূরত্ব যত বেশি, সেই গ্রহের নিজের কক্ষপথে পূর্ণ পরিক্রমা করতে তত বেশি সময় লাগে।

(খ) রসায়নবিদ্যার একটি মূল সূত্রে বলা হয়—'সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় কোনো পদার্থের রাসায়নিক গঠন সর্বদা এক হবে।' উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মৌল দুটি ১ : ৮ অনুপাতে যুক্ত হয়ে জল সৃষ্টি করে, অর্থাৎ জলে ওজন অনুযায়ী প্রতি এক অংশ হাইড্রোজেনের সঙ্গো আট অংশ অক্সিজেন যুক্ত হয়। একে বলা হয়—'রাসায়নিক গঠনের স্থিরতার সূত্র'।

(গ) তাপ কোনো শীতল বস্তু থেকে উষ্ম বস্তুর দিকে নিজে নিজে প্রবাহিত হয় না। এ হল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র।

আপনি আগেই নিউটনের বিশ্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সঙ্গো পরিচিত হয়েছেন; এটা আমরা ৬নং এককে সংক্ষেপে বিবৃত করেছি। দুইটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল কীভাবে তাদের ভরের ও বস্তু দুইটির ভিতরের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে, এই সূত্রে তাই বলা হয়েছে। এই একটি বিবৃতি যে কেবলমাত্র গ্রহের গতিবিধিই বর্ণনা করে তা নয়, উপর দিকে একটি বল ছুঁড়ে দিলে কেন তা মাটির দিকে নেমে আসে তাও ব্যাখ্যা করে। এর অর্থ হল—নানা প্রকার বস্তুর গতিবিধি ক্ষেত্রে এই একই সূত্র প্রযোজ্য।

কোনো নতুন পরীক্ষার দ্বারা যখনই কোনো সূত্র ভ্রান্ত বলে মনে হয়, তখন সেটি এই গরমিল ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন প্রকল্প, নতুন ঘটনাবলী এবং নতুন প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করবার অনুপ্রেরণা জোগায়।

বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে আপনি আরও দুটি শব্দের সঙ্গো পরিচিত হবেন। এগুলি হল প্রতিরূপ (model) ও তত্ত্ব। কোনো বস্তু, ঘটনাবলী কিংবা কোন অবস্থার অনুকরণ করার জন্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রায়ই প্রতিরূপ

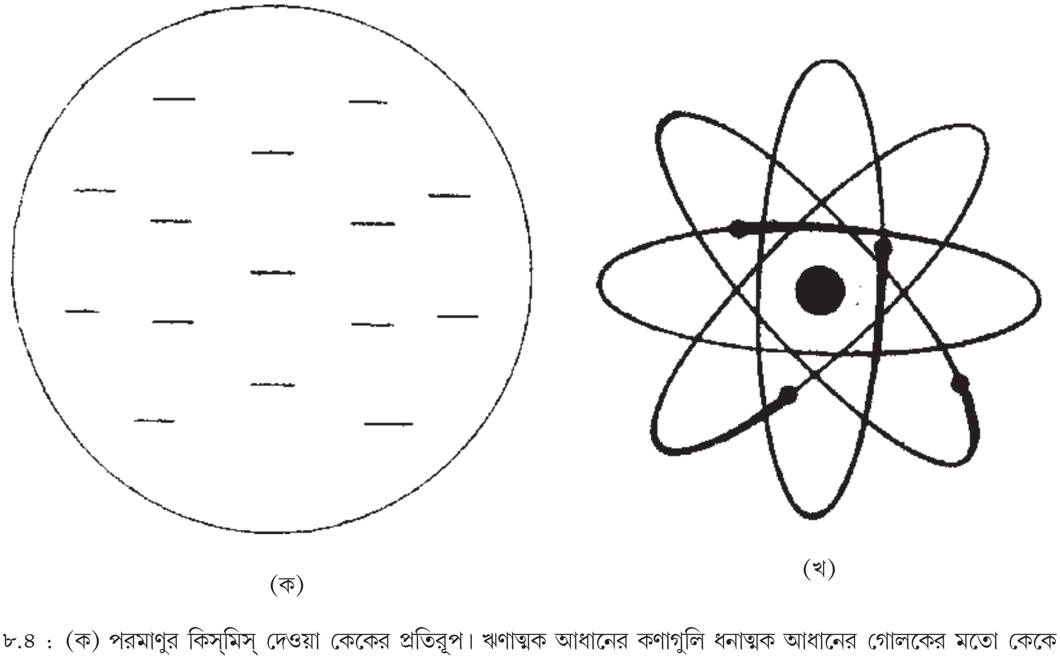

(ক) (খ)

চিত্র ৮.৪ : (ক) পরমাণুর কিস্‌মিস্ দেওয়া কেকের প্রতিরূপ। ঋণাত্মক আধানের কণাগুলি ধনাত্মক আধানের গোলকের মতো কেকে কিস্‌মিসের মতো বসানো আছে। (খ) পরমাণুর সৌরজগতের মতো প্রতিরূপ।

সৃষ্টি করেন। যে বস্তুটি নিয়ে কাজ চলছে, প্রতিরূপ হল তার ধর্ম, আচরণ, বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে গঠিত এক কৃত্রিম বস্তু। উদাহরণস্বরূপ—মানুষের হৃদযন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করার জন্য একটি যান্ত্রিক পাম্পের প্রতিরূপ ব্যবহার করা হয়। প্রথমদিকে একটি পরমাণুর প্রতিরূপ ছিল কিস্‌মিস্ দেওয়া কেকের মতো যা চিত্র ৮.৪ (ক)-তে দেখানো হয়েছে। পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করে সৌরজগতের আকৃতির মতো একটি পরমাণুর প্রতিরূপ তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে কোনো অবস্থার প্রতিরূপ বানাতে হলে আপনি একটি শব্দ, একটি চিত্র, একটি সূত্র অথবা একটি চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন। যে বস্তুটির চরিত্র বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, প্রতিরূপটি যেন তার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারে। একটি নতুন, অজানা এবং জটিল বস্তু, অবস্থা কিংবা ঘটনার একটি সহজতর এবং সুপরিচিত চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রতিরূপ বিশেষ জরুরি।

বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রকার বস্তু সামগ্রী, ঘটনাবলী, অবস্থা এবং তন্ত্রের ধর্ম ও আচরণ সম্বন্ধে যেসব পরীক্ষালব্ধ তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিকে সঠিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি সাধারণ বিবৃতি দেওয়া হলে তাকে বলে 'তত্ত্ব'। ৬নং এককে আপনি ডারউইনের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব সংক্ষেপে পড়েছেন। সেখানে ব্যাখ্যা করা আছে কীভাবে সরল এককোষী প্রাণী থেকে আরম্ভ করে নানা বৈচিত্র্যের অজস্র প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ১০ নং এককে আপনি পড়বেন কীভাবে নক্ষত্রের জন্ম হয়, কীভাবেই বা তাদের ক্রমবিকাশ এবং মৃত্যু ঘটে।

একটি সূত্র কিংবা একটি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারে। নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৮৪৫ সালের ভিতরে সব কয়টি গ্রহের কক্ষপথ সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হয়েছিল। ইউরেনাস্ ছাড়া আর সব কয়টি গ্রহকে পূর্ব নির্ণীত পথে চলতে দেখা গেছে। কেম্ব্রিজে অ্যাডামস্ (Adams) এবং প্যারিসে লেভেরিয়ার (Leverrier) কারণ খুঁজতে গিয়ে বললেন, ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতি, এর থেকে আরও বাইরের দিকে অন্য কোনো গ্রহের উপস্থিতির জন্য হতে পারে। নিউটনের বিশ্বজনীন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র ব্যবহার করে তাঁরা ঐ গ্রহের আকার এবং সঠিক কক্ষপথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তারপরে, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর বার্লিন মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ্ গ্যালে ঠিক পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই নেপচুন গ্রহকে দেখতে পেলেন। প্রকৃতপক্ষে, একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হলে, বহু যত্ন সহকারে এমন একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রস্তাব করতে হয় যাতে নতুন তত্ত্বটি সঠিক হলে ঐ পরীক্ষা থেকে বিশেষ কিছু ফলাফল পাওয়া যায়। এই উপায়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গৃহীত বা বর্জিত হয়।

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তার সারাংশ হল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একটি শৃঙ্খল। নীচে এটি দেখানো হল :

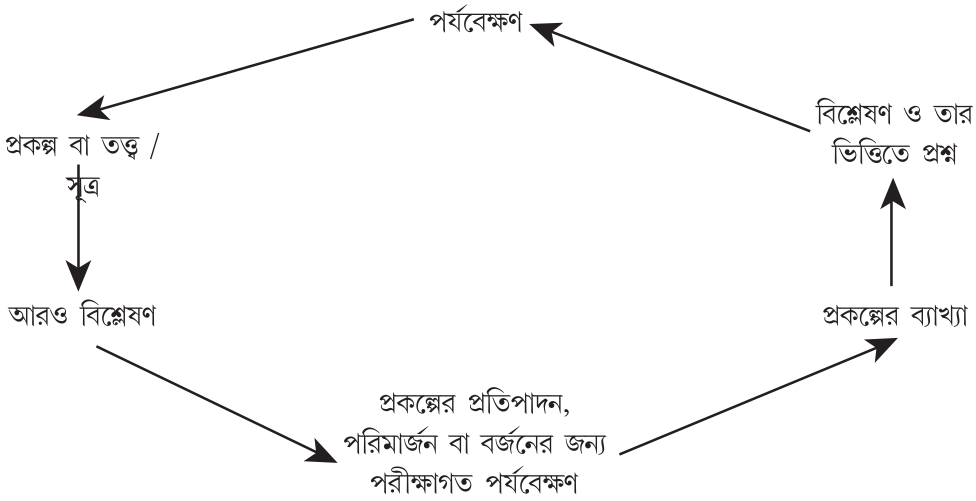

চিত্র ৮.৫ : বিজ্ঞানের পদ্ধতি

৮.৩.৫ কয়েকটি উদাহরণ

এই অংশে আমরা উপরে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কয়েকটি বাস্তব উদাহরণের উল্লেখ করব।

উদাহরণ—১

এটা সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে গাছেরা সূর্যালোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল থেকে নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দেয়। রামধনুর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এমন সাতটি দৃশ্য রং দিয়ে সূর্যালোক তৈরি। এখন আমরা যে প্রশ্নটি করতে চাই তা হল, এই খাদ্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে সব রং-এর আলো কি সমান প্রভাব ফেলে, নাকি একটি বিশেষ কোনো রং এর আলো অন্য রং-এর চেয়ে বেশি কার্যকরী হয়? এইভাবে আমরা একগুচ্ছ প্রকল্প খাড়া করতে পারি—

(ক) সব রং-এর আলো সমান প্রভাব ফেলে।

(খ) কোনো একটি বিশেষ রং-এর আলো অন্যগুলির অপেক্ষা বেশি কার্যকরী।

এর পরের ধাপ হল, এই প্রকল্পগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজন করা। অতি সহজেই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ঝাঁঝি (Hydrilla) নামে এক জলজ উদ্ভিদের তিনটি ছোট ডাল নেওয়া হল, তাদের আলাদাভাবে তিনটি পাত্রে জলে নিমজ্জিত করা হল এবং প্রতিটি পাত্র বেলজারের সাহায্যে ঢেকে দেওয়া হল। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি ৮.৬ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। তারপর বেলজারগুলি সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের সেলোফেন কাগজে ঢেকে সবকটিকে বাইরে সূর্যালোকে রেখে দেওয়া হল, এইভাবে প্রতিটি ডাল একটি বিশেষ রং-এর আলো পেতে থাকে। আমরা ধরে নিতে পারি প্রতিটি ডাল সমপরিমাণ সূর্যালোক পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে বেলজারের জলের মধ্যে থেকে

অক্সিজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ বের হচ্ছে। যে হারে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ বের হয়, তার থেকে বোঝা যায় কী হারে উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করছে।

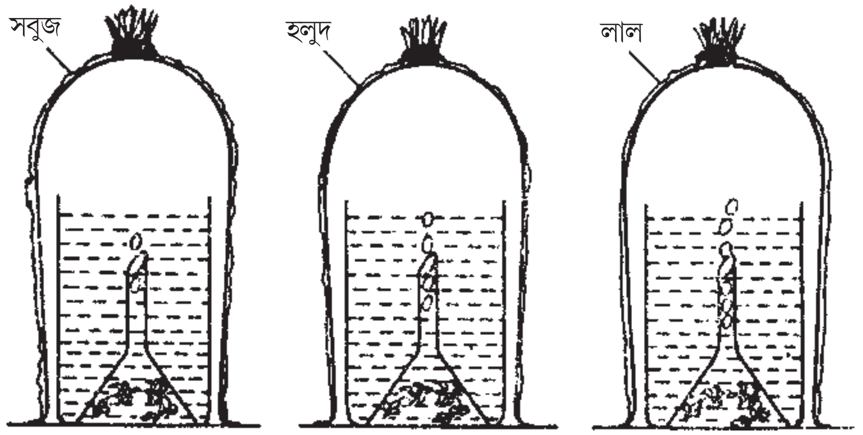

চিত্র ৮.৬ : সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কোনও একটি বিশেষ রং-এর আলোকরশ্মি অন্য রং-এর আলোর থেকে অধিকতর প্রভাবশালী কিনা তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা।

এই পরীক্ষাটিতে চারটি বিষয় আছে যা পরিবর্তিত হতে পারে : তিনটি ডালে প্রভেদ থাকতে পারে; প্রতিটি বেলজারে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং এক একটি ডাল যে রং-এর আলো পাচ্ছে তা ভিন্ন হতে পারে। এই বিষয়গুলির ভিতরে যে-কোনো একটির প্রভাব পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমাদের অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির রাখতে হবে। অতএব, আমরা যদি বিভিন্ন প্রকার আলোর রং-এর প্রভাব দেখতে চাই, তিনটি পাত্রের ডালগুলি, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং জলের পরিমাণ সম্পূর্ণ এক রাখতে হবে। একই গাছ থেকে আমরা একরকমের তিনটি ডাল নিতে পারি এবং বেলজার তিনটির আয়তন এক বলে আমরা ধরে নিতে পারি প্রতিটিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এক। প্রতিটি বেলজারে যাতে একই পরিমাণ জল থাকে, আমরা সে ব্যবস্থাও করতে পারি। এখন যদি তিনটি বেলজারে যে হারে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ নির্গত হচ্ছে তার হার আলাদা আলাদা হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে আপতিত আলোর রং-এর পার্থক্যের জন্যই এটি হচ্ছে। এই পরীক্ষাটিতে দেখা যায় যে, তিনটি ডালের ভিতরে যে ডালটি লাল রং-এর আলো পাচ্ছে, সেই বেলজারে গ্যাসের নির্গমনের হার সর্বাধিক।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করবার প্রক্রিয়াতে সবুজ ও হলুদ রং-এর আলোর তুলনায় লাল রং-এর আলো অধিকতর কার্যকরী। পরীক্ষালব্ধ এই ফলাফল প্রথম প্রকল্পটি বর্জন করে এবং দ্বিতীয়টি আংশিকভাবে প্রমাণ করে। কমলা, নীল প্রভৃতি অন্যান্য রঙের আলো লাল আলোর চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে কিনা তা দেখার জন্য এই পরীক্ষাটি আমরা চালিয়ে যেতে পারি।

আমরা এখানে বলে রাখতে চাই যে এটি একটি অতি সরল পরীক্ষা-ব্যবস্থা। সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে অত্যন্ত উন্নতমানের যন্ত্রাদি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একই ধরনের পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন।

উদাহরণ—২

এই উদাহরণটি আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে গ্রহণ করেছি। সপ্তদশ শতাব্দীতে খনিশ্রমিক এবং কূপখননকারী মজদুরেরা দেখেছিলেন যে সাধারণ হস্তচালিত পাম্পের সাহায্যে ৩২ ফুটের অধিক উচ্চতায় জল তোলা সম্ভব নয়। গ্যালিলিও মনে করেছিলেন যে, এর চেয়ে বেশি উচ্চতার জলস্তম্ভ নিজের ওজন সহ্য করতে পারে না। ওঁর ছাত্র টরিচেলি (১৬০৮-৪৭) অপর একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা করলেন—পাম্পের জল উঁচুতে ওঠার মূল কারণ হল বায়ুমণ্ডলের বাতাসের চাপ। তিনি এই কারণ দেখালেন যে, যদি কেবলমাত্র বায়ুমণ্ডলীয় চাপই জল উঁচুতে ওঠার কারণ হয়, তাহলে অন্য যে-কোনো তরল পদার্থও একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত উঠবে। তিনি অঙ্ক কষে বের করলেন যে পারদের এরূপ একটি স্তম্ভ ৩০ ইঞ্চি উচ্চতা পর্যন্ত উঠবে। এটা যাচাই করে দেখার জন্যে উনি একটি সহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন—একটি চওড়া পাত্রে পারদ রাখা হল এবং একটি পারদপূর্ণ কাঁচের লম্বা নল ঐ চওড়া পাত্রটিতে উপুড় করে রাখা হল। দেখা গেল, পারদস্তম্ভটি ৩০ ইঞ্চির বেশি উচ্চতায় উঠছে না। এর ফলে টরিচেলির অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এইভাবে ব্যারোমিটার আবিষ্কৃত হল। এই যন্ত্রটির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপা যায়।

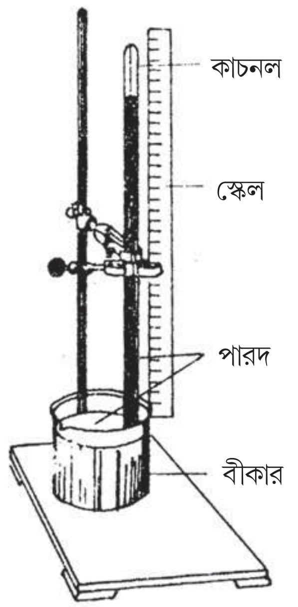

চিত্র ৮.৭ : ব্যারোমিটার (বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মাপবার যন্ত্র)

আমরা জানি যে উঁচু পাহাড়ের ওপর বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমুদ্রতলের চাপের চেয়ে কম। টরিচেলির প্রকল্প সঠিক কিনা দেখার জন্য বিজ্ঞানী পাস্‌কাল্ ব্যারোমিটার যন্ত্রটিকে পাহাড়ের ওপর নিয়ে দেখলেন পারদের উচ্চতা কমে যাচ্ছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে অপেক্ষাকৃত কম বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কম উচ্চতার পারদস্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে। এর ফলে টরিচেলির ব্যাখ্যার সত্যতা আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হল।

উদাহরণ—৩

এই উদাহরণটি রসায়নশাস্ত্র থেকে নেওয়া। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে একটি মোমবাতি জ্বালালে তা আলো দেয়, কিছু পরিমাণ তাপ দেয়, অবশেষে যা থেকে যায় তাহল সামান্য পরিমাণ মোম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অনেকটা পদার্থই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তা নয়। এই ধরনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে অতি অল্প পরিমাণ পদার্থ (প্রায় ১০$^{-১২}$ গ্রাম, অর্থাৎ এক গ্রামের এক কোটি ভাগের একলক্ষ ভাগ) শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বাকি অংশ অন্য ধরনের পদার্থের আকার ধারণ করে। এর সত্যতা কীভাবে পরীক্ষা করে দেখব?

এর জন্য আমরা একটি অতি সহজ পরীক্ষা করব (চিত্র ৮.৮)। একটি পাত্রে একটি ছোট মোমবাতি রাখা হল। এবং পাত্রটিতে কিছু পরিমাণ জল ঢালা হল। বেলজার দিয়ে মোমবাতিটিকে ঢেকে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটির ওজন নেওয়া হল। তারপরে মোমবাতিতে অগ্নিসংযোগ করে তা বেলজারের ভিতরে জ্বলতে দেওয়া হল। মোমবাতিটি নিভে গেলে সমগ্র যন্ত্রটি ঠাণ্ডা করে পুনরায় ওজন নেওয়া হল। দেখা গেল যে পূর্বেকার ওজনের

সঙ্গে পরের ওজনের বিশেষ পার্থক্য নেই। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে কিছু পরিমাণ মোম ক্ষয় হয়েছে। তাহলে ভেবে দেখতে হবে, পুড়ে যাওয়া মোম এবং বাতিটির সলতের কী হল?

যত্ন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে বেলজারের ভিতরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলীয় বাষ্প এবং কিছু পরিমাণ ভুসো কালি জমা হয়েছে। অপর যে বস্তুটি তৈরি হয় তাহল কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা আমরা চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু পাত্রের জলে একটু চুনের জল মেশালে আমরা কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখতে পারব। দেখা যাবে যে চুনের জল ঘোলাটে হয়ে গেছে। এর কারণ হল, যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়েছে, চুনের জল তা শোষণ করে সাদা রং-এর এমন একটি পদার্থ তৈরি করেছে, যা জলে দ্রবীভূত হয় না।

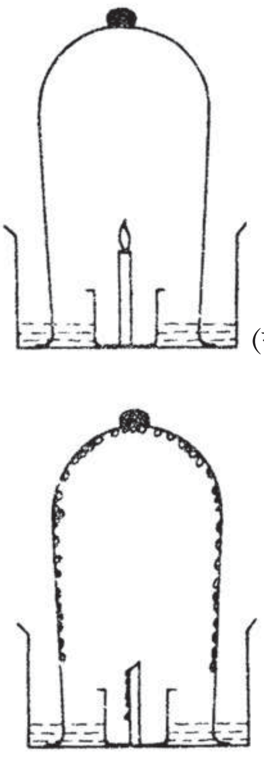
(ক)
(খ)

চিত্র ৮.৮ : ভরের সংরক্ষণ সূত্র যাচাই করার পরীক্ষা

প্রকৃতপক্ষে, যখন একটি মোমবাতি জ্বলে তখন জল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় এবং কিছু মোম না-পোড়া অবস্থায় থেকে যায়। যেটুকু পদার্থ এই প্রক্রিয়াতে ক্ষয় হয় তা এত কম যে তা ধরাই সম্ভব নয়, কারণ আজকাল সবচেয়ে সুবেদী যে দাঁড়িপাল্লা পাওয়া যায় তা কেবলমাত্র $১০^{-৬}$ অথবা $১০^{-৭}$ গ্রাম পর্যন্ত মাপতে পারে (প্রায় এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ)। অতএব, কার্যক্ষেত্রে সবসময়েই পদার্থের মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। এর ফলে আমরা এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে রসায়নশাস্ত্রে 'ভরের সংরক্ষণ সূত্র' হিসাবে গণ্য করতে পারি।

৮.৫ নং চিত্রে কয়েকটি প্রক্রিয়ার যে পর্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে তা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প নির্মাণে কার্যকরী। তবে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিককেই যে এই একই ধারায় চলতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। সাধারণত একই সময়ে, একাধিক বৈজ্ঞানিক এই কর্মধারার বিভিন্ন ধাপে কাজ চালাতে থাকেন। কোনো নবাগত বৈজ্ঞানিক কর্মধারার যে-কোনও ধাপে কাজ শুরু করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, মেন্থা (Mentha) নামে একটি সাধারণ উদ্ভিদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে একদল বৈজ্ঞানিক দেখলেন এটির মধ্যে মেন্থল নামক একটি পরিচিত পদার্থ থাকে। এই বস্তুটি আমরা পেপারমিন্ট বড়ি, কোনো কোনো দাঁতের মাজন, কাশির সিরাপ প্রভৃতিতে প্রায়ই পেয়ে থাকি। এখন, অপর একদল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন কী পরিবেশে মেন্থা উদ্ভিদের চাষ করলে তা থেকে অধিক পরিমাণ মেন্থল উৎপন্ন করা সম্ভব; বছরের কোন্ সময়ে ফসল তুললে উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হবে, ইত্যাদি। এই দুই দল বৈজ্ঞানিকের কাজ শুধু ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ। কোন্ তৃতীয় বৈজ্ঞানিকের দল দেখতে চাইতে পারেন কী উপায়ে উদ্ভিদের দেহের ভিতরে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগে মেন্থলের সংশ্লেষণ হয় এবং এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তাঁরা একটি তত্ত্ব খাড়া করতে পারেন। এই তিন দল বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ পৃথক পৃথকভাবে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে এমনকি ভিন্ন ভিন্ন সময়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন, যদিও নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা একে অন্যের ফলাফল ব্যবহার করতে পারেন।

অন্যথায়, একদল বৈজ্ঞানিক অনেক বছর ধরে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির শৃঙ্খলের এক একটি অংশের উপর পরীক্ষা চালাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা হয়তো পরিবেশ দূষণের ওপর নজর রাখছেন অথবা মৌসুমী বায়ুর পূর্বাভাসের ওপর কাজ করছেন। ফলে বৈজ্ঞানিকগণের একই দলে কেউ কেউ বাতাসের গতিবেগ, উষ্মতা এবং আর্দ্রতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবেন। অন্যদের কেউ হয়তো এই তথ্য ব্যবহার করে কোনো তাত্ত্বিক প্রতিরূপ (মডেল) তৈরি করার চেষ্টা করবেন। আবার ঐ দলেরই অন্য বিজ্ঞানীরা হয়তো এই প্রতিরূপ সঠিক না ভুল তা প্রমাণ করার জন্যে বিস্তারিত পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ চালিয়ে যাবেন।

অতএব আমরা দেখি যে বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের কাজকর্ম বিভিন্ন উপায়ে পরিচালনা করে থাকেন। কেউ কেউ তথ্য, উপাত্ত, ঘটনা পরম্পরা ও সংখ্যাবলী সংগ্রহে ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারেন। কেউ হয়তো পরীক্ষার পরিকল্পনায় অধিকতর পারদর্শী কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ততটা সক্ষম নন। এমন অনেক উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক থাকতে পারেন যাঁরা অন্যের সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করে যুক্তি ও গণিতের প্রয়োগে নতুন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন অথচ আধুনিক গবেষণাগারের সাধারণ যন্ত্রও চিনতে পারবেন না। এইসব ধরনের বৈজ্ঞানিকদেরই সার্থক অবদান থাকতে পারে। কিন্তু এককভাবে কোন্ বৈজ্ঞানিক কী করলেন, অথবা কীভাবে করলেন, তার দ্বারা বিজ্ঞান গঠিত হয় না। সব বৈজ্ঞানিকের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা দিয়েই সৃষ্টি হয় বিজ্ঞান।

সংক্ষেপে, আইনষ্টাইনের কয়েকটি কথায় বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বর্ণনা করা যায়। শোনা যায় তিনি বলেছিলেন—'যদি আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সারমর্ম জানতে চান, তবে কোন্ বিজ্ঞানী কী বলছেন তা শুনবেন না; উনি কী করছেন তা প্রত্যক্ষ করুন।' এর সাথে আমরা যোগ করতে পারি—ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক কী কাজ করছেন তা লক্ষ্য করুন। বিজ্ঞানের কাজকর্ম বলতে নানা ধরনের কর্ম তৎপরতা বোঝায়।

অনুশীলনী—২

নিচের উদাহরণে কোনও একটি রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ওষুধের ক্ষমতার উপরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার বর্ণনা হল। ৮.৫ নং চিত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতির যে বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি দেখানো হয়েছে তার ভিতর থেকে এখানকার প্রতিটি বিবৃতি কোন্ প্রক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে তা শনাক্ত করুন। অনেকগুলি বিবৃতি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে মনোযোগ সহকারে সেগুলি পড়ে দেখুন, তারপর ফাঁকা জায়গাতে আপনার উত্তর লিখুন।

(ক) কোনো একটি নির্দিষ্ট রোগের জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ একটি পাত্রে X নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ আকস্মিকভাবে চল্‌কে পড়ল। এতে পাত্রের সব জীবাণু মারা পড়ল।

....

(খ) কোনো কোনো অসুখের জন্য X নামক ওষুধ প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে?

....

(গ) ফলাফল থেকে দেখা গেছে ১নং দলের রোগীদের প্রায় ৩০ শতাংশ রোগী চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগমুক্ত হয় না। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন চিকিৎসাধীন রোগীর মধ্যে ৭০ জন রোগী চিকিৎসার ফলে রোগমুক্ত হয়। অন্যদিকে ২নং দলের ভিতরে শতকরা ২০ জন রোগী বিনা চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়েছে। অতএব যে ৭০ জনের রোগমুক্তি

ঘটল, হয়তো তার ভিতরে ২০ জন বিনা চিকিৎসাতেই অসুখের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। সুতরাং শতকরা ৭০ ভাগ রোগী থেকে ২০ শতাংশ রোগী বাদ দিলে মাত্র ৫০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী।

....

(ঘ) X ওষুধটি কী মনুষ্য প্রজাতিকে এই রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে? হ্যাঁ অথবা না

....

(ঙ) একদল ইঁদুর নমুনা হিসাবে নেওয়া হল, যাদের প্রত্যেকের শরীরে একই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। ঐ দলের অর্ধেক সংখ্যক ইঁদুরকে (১নং শ্রেণী) ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল এবং অন্য অর্ধেক সংখ্যক ইঁদুরকে (২নং শ্রেণী) বিনা চিকিৎসায় রাখা হল। প্রথম শ্রেণীর প্রতিটি ইঁদুরের ওপর আগে থেকে স্থির করা কিছুটা ওষুধ প্রয়োগ করা হল। ১নং শ্রেণীতে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসাধীন কয়েকটি ইঁদুর সুস্থ হয়ে উঠল কিংবা মারা গেল এবং ২নং শ্রেণীতে বিনা চিকিৎসায় কয়টি ইঁদুর সুস্থ হয়েছে অথবা মারা গেছে, এই দুই এর তুলনা করা হল। দেখা গেল যে, ১নং শ্রেণীতে সুস্থ হয়ে ওঠা ইঁদুরের সংখ্যা ২নং শ্রেণীর ইঁদুরের তুলনায় অনেক বেশি। একই ধরনের পরীক্ষা পুনরায় করা হল গিনিপিগের ক্ষেত্রে, এবং অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন এলাকার অনেক মানুষের একটি নমুনার উপরে।

....

উপরের উদাহরণগুলি থেকে আপনি বুঝতে পারছেন, যে সকল বস্তু, ঘটনাবলী এবং অবস্থা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়, তার জন্য যে কারিগরী বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়, কিংবা এইসব গবেষণা থেকে যে ফল পাওয়া যায় তাদের ভিতরে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তথাপি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে অবয়ব তার একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এখন আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি এবং যে যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অন্যপ্রকার জ্ঞান থেকে আলাদা করা যায় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব। প্রকৃতপক্ষে এই বৈশিষ্ট্যগুলির মূল কারণ হল বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে প্রকল্পের সত্যতা যাচাই। এর পরিচিতি আপনি একটু আগেই লাভ করেছেন।

৮.৪ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি

আমরা দেখেছি, মানব জাতির অন্যান্য উদ্যম থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা করা যায় না। মানব জাতির ইতিহাসে গত কয়েক হাজার বছরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে গত কয়েক শত বছরেই বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অগ্রগতি দেখতে পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই সুবিশাল ভাণ্ডারের পরিধি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কণা থেকে আরম্ভ করে গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডলী সমন্বয়ে গড়া বিশাল মহাবিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। উদ্ভিদ এবং প্রাণী, স্বাস্থ্য ও রোগ, খাদ্য ও ঔষধ, এমনকি প্রাণ, কীভাবে মানুষের মন কাজ করে, অথবা এই মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ কোথায়, এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য গবেষণা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে।

আমরা আগেই বলেছি যে—দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে, কর্মমুখর জীবনে অবসর সৃষ্টি করার জন্যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ও দ্রুততর করার প্রয়োজনে আমরা বিজ্ঞানকে বারে বারে

ব্যবহার করেছি। শক্তিকে আমরা নানা রূপে কাজে লাগাতে পেরেছি। বেঁচে থাকার জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির ওপরে নির্ভরশীল স্থলচর প্রাণী হিসেবে জীবন আরম্ভ করে মানব জাতি আজ এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেখানে কোনো বাধাই তার অনতিক্রম্য নয়। পৃথিবীর প্রতিটি কোণায়, বিশাল স্থলভূমিতে, গভীর সমুদ্রের নিচে এবং অত্যুচ্চ পর্বত শিখরে আমরা বিচরণ করছি। আমাদের দৃষ্টি এখন আরও উপরের দিকে, যা শুধু সৌরজগতের মধ্যেই নিবন্ধ নয়, তারও পিছনে মহাশূন্যের দিকেও প্রসারিত। মহাশূন্যে মানুষের যাত্রা এক অসাধারণ উদ্যম, যা সবে মাত্র শুরু হয়েছে।

নানা ধরনের এসব উদ্যোগ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তোলে। ফলে বিজ্ঞান কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না। এটি একটি গতিময় এবং চলমান প্রক্রিয়া। এটি একটি চিরবর্ধিষ্ণু উদ্যোগ, যা কোনোদিন শেষ হবে না। এর কারণ হল, বিজ্ঞানে কোনও একটি চরম সত্য নেই যেখানে পৌঁছে গেলে সকল বৈজ্ঞানিক অবসর গ্রহণ করতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—এটি কখনও সম্পূর্ণ হয় না। আমরা এই জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চয় যত বেশি বৃদ্ধি করি, প্রকৃতির অজানা রহস্যগুলি সম্বন্ধে আরও বেশি প্রশ্ন ওঠে। ফলে অনবরত নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়। নতুন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার জন্যে পুরাতন তত্ত্বগুলি যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিকগণ নতুন তত্ত্ব খাড়া করেন। বিজ্ঞানের কর্মীরা কোনো অবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বা অন্তিম বলে দাবি করতে পারেন না।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে বিজ্ঞান স্থিতিশীল নয়। আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলতে পারি যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়। বিজ্ঞানে কোনো বিষয়ই প্রশ্নাতীত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যেসব বিজ্ঞানী বৈপ্লবিক তথ্য প্রমাণ এবং যুক্তির সাহায্যে চালু তত্ত্বগুলির পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং নূতন তত্ত্বের দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চালান তাঁরা সর্বাধিক সম্মানিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়েন। এই অর্থে বিজ্ঞান হল একটি স্ব-সংশোধক উদ্যোগ অর্থাৎ পরিবর্তনের রাস্তা বিজ্ঞানের সামনে সর্বদাই খোলা রয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের প্রস্তাবিত বহু প্রকল্পই পরে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, মুক্ত অনুসন্ধানের ধ্যানধারণা থেকেই বিজ্ঞানের জন্ম এবং বিজ্ঞান এই ধারণাতেই সমর্পিত, যার ফলে যে-কোনো প্রকল্প, তা যতই অদ্ভুত হোক্ না কেন, তার যোগ্যতা বিচারের অধিকার রাখে। ফলে বিজ্ঞান কোনো মতবাদমূলক শাস্ত্র নয়। পূর্বে গৃহীত কোনো ধারণা বা মতবাদ যদি সতর্ক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তবে বিজ্ঞান তা সমর্থন করবার জন্য অযৌক্তিকভাবে জোর দেয় না। কোন্ কোন্ ধারণা ভুল তা প্রমাণ করতে করতেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। বিজ্ঞানের এমন কোনো মহাযাজক নেই যাঁকে প্রশ্ন করা চলে না। প্রশ্ন না করে কোনো মতবাদ চালু আছে বলেই গ্রহণ করে নেওয়া, বিজ্ঞানের জগতে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়।

সাধারণভাবে মেনে নেবার আগে বিজ্ঞানীসমাজ যে-কোনো নতুন আবিষ্কার, পরিলক্ষিত তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যা আলোচনার মাধ্যমে, যত্নসহকারে চুলচেরা বিচার করে, যাচাই করে নেন। এই অর্থে বৈজ্ঞানিক ‘সত্য’গুলি আসলে মতৈক্যের ভিত্তিতেই সত্য এবং এগুলি সর্বদাই পরীক্ষাভিত্তিক। মতৈক্যে পৌঁছাতে সযত্নে বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের নতুন কোনো তথ্য যদি এই ‘সত্যের’ বিরোধী হয় তবে বিজ্ঞানীরা সর্বদাই তাঁদের তত্ত্ব খতিয়ে দেখতে প্রস্তুত থাকেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বশেষ কিন্তু একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল—এটি নৈর্ব্যক্তিক। যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গেলে কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল যেকেউ যে-কোনোখানে পুনরাবৃত্তি করে তার সত্য প্রতিপাদন করতে পারেন। বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে-কোনো বিবৃতির যা চরম পরীক্ষা, অর্থাৎ এটিকে প্রাকৃতিক জগতের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হবে, তার সম্পর্ক আছে। বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে প্রিয় অথচ ভ্রান্ত ধারণার চেয়ে বিজ্ঞান কঠোর সত্যকে বেশি পছন্দ করে। যে-কোনো নতুন ধারণা গৃহীত হতে হলে তার সমর্থনে উচ্চমানের সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে। কোনো মতবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করতে বছরের পর বছর, এমনকি কয়েকশত বছর লেগে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত যে তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বা প্রকৃতিতে লক্ষিত ঘটনা মেলে না তাকে কোনো শক্তিশালী যুক্তি, কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত বা তার নান্দনিক আবেদন, কিছুই বাঁচাতে পারে না। ৬ নং এককে যা পড়েছেন তার থেকে আপনার মনে থাকতে পারে যে, বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের এই বৈশিষ্ট্যই সৌরজগৎ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল্-এর মতবাদ খণ্ডন করে দিয়েছিল। এই নৈর্ব্যক্তিকতা বিজ্ঞানের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা বিজ্ঞানের কঠোর তথ্য কোনো বিশেষ বৈজ্ঞানিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভরশীল নয় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ যতবার ইচ্ছা পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। যে অভিজ্ঞতায় কেবল নির্বাচিত কয়েকজনেরই প্রবেশাধিকার আছে, বিজ্ঞান কখনই তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়ায় না।

অনুশীলনী—৩

নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির ভিতরে কোন্ দুইটি বিজ্ঞানের চরিত্র জ্ঞাপন করে না? সেই দুইটির পাশে একটি করে ক্রস (×) চিহ্ন দিন। বাকি বিবৃতিগুলি উপরে আলোচিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোন্ কোন্ চরিত্রগুলি বর্ণিত করে? পাশের ফাঁকা জায়গায় আপনার উত্তর লিখুন।

(ক) বিজ্ঞান একদিন এই মহাবিশ্বের সম্বন্ধে সবকিছু জানতে আমাদের সাহায্য করবে।

....

(খ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নবিদ্‌রা করতেন যে, যখন একটি ধাতু পুড়ে যায় তখন ফ্লজিস্টন নামের একটি বস্তু নির্গত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হল যে পুড়ে যাবার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তার ওজন আসল ধাতুর ওজনের চেয়ে বেশি। ফ্লজিস্টন তত্ত্বের সমর্থকরা এই বলে ব্যাখ্যা করলেন যে ফ্লজিস্টন ঋণাত্মক ওজন-বিশিষ্ট পদার্থ। বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধাতুর অক্সাইড নামে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। এইভাবে ফ্লজিস্টন তত্ত্বকে বাতিল করা হল।

....

(গ) জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ দাবী করলেন যে তিনি সুদূর মহাবিশ্বে একটি নতুন নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের দল এই পর্যবেক্ষণ সমর্থন করতে পারলেন না। তবুও পূর্বেকার জ্যোতির্বিদের কথা বিশ্বাস করা হল কারণ, জ্যোতির্বিদ্যার জগতে তিনি বিরাট বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য ছিলেন।

....

(ঘ) আমরা সকলেই পাস্তুরাইজ্ করা দুধের সাথে পরিচিত। এর অর্থ হল—দুধকে অতি উচ্চ উষ্ণতা পর্যন্ত উত্তপ্ত করে তার ভিতরের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা হয়। এর মূলে রয়েছে লুই পাস্তুরের একটি বিখ্যাত পরীক্ষা, যার সাহায্যে তিনি দেখিয়েছিলেন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। পাস্তুর জল ফুটিয়ে তা জীবাণুমুক্ত করে একটি ফ্লাস্‌কে ভরে তার মুখ সীল করে রেখেছিলেন। বেশ অনেক দিন বাদে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে যখন ঐ জল পরীক্ষা করে দেখা হল তখন তাতে কোনো জীবাণু পাওয়া গেল

না। যদি জলের ভিতরে নিজে থেকেই জীবাণু সৃষ্টি হত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। বিভিন্ন গবেষণাগারে পাস্তুরের পরীক্ষাগুলি বারবার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে প্রাণী কেবল প্রাণী থেকেই সৃষ্ট হয়।

....

(ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত এই চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল যে পরমাণু বিভাজ্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পরীক্ষণবিদ্ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে পরমাণু ইলেক্ট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন কণার দ্বারা গঠিত। ইদানীং আরও অনেক মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে।

....

৮.৫ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই একই চরিত্র দেখা যায় যে-কোনো সমস্যা সমাধান করবার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে, সে সমস্যা বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত, যাই হোক্ না কেন। বিজ্ঞানের এই গুণগুলি এক বিশেষ মানসিকতাকে বোঝায় যা মূলত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এগুলি উপলব্ধি করেছেন এমন যে-কোনও ব্যক্তিই আয়ত্ত করতে পারেন। সুতরাং গবেষণাগারে এবং দৈনন্দিন জীবনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে এবং বাস্তবিক সেটাই হওয়া উচিত।

পুনরাবৃত্তি মনে হলেও আমরা কোন সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুনর্বার আলোচনা করব। কোনও একটি সমস্যার সম্মুখীন হলে তার প্রতি আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী কী হওয়া উচিত? প্রথমত আমাদের সম্পূর্ণ খোলা মনে, পূর্ব গঠিত কোন ধারণা, খেয়াল কিংবা সংস্কার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে অগ্রসর হতে হবে। তারপর দেখতে হবে আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ যেন বাইরে থেকে আসা কোনো চাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করব? বিশ্লেষণ করার সময়ে আমরা সব দিক্ থেকে সমস্যাটি বিচার করব, এর সাথে জড়িত সব বিষয় বিবেচনা করব, সম্ভাব্য সব রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব এবং সমস্যা-সংক্রান্ত সব উপাত্ত ও তথ্য একত্র করব। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করার প্রবণতা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। চুলচেরা বিচার না করে, শুধু বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে অন্ধের মতো কোনো মতবাদ আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্লেষণের ভিত্তি হওয়া উচিত বস্তুবাদী এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাভাবনা, যার পরে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। কোনো অবস্থাতেই আমরা অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে ধাবিত হব না। যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ না থাকলে আমরা কোনো মতবাদের সামান্যীকরণ (generalisation) পরিহার করব।

এছাড়া, ঐ বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্তই হল শেষ কথা, এমন ভাবা চলবে না। যদি এমন কোনো নতুন ঘটনা বা তথ্য প্রমাণ প্রকাশিত হয়, যা আমাদের ফলাফলকে পরিবর্তিত করতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই আমাদের সিদ্ধান্ত সংশোধন করতে প্রস্তুত থাকব। আমাদের মনোভাব হবে নমনীয়

এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনো ব্যাপারেই কোনো গোঁড়ামি থাকা চলবে না। যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতি কিংবা অন্যকথায় জীবনযাত্রার ধারা হিসাবে গ্রহণ করতে চাই, তাহলে কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং মৌলিক সততা—এই গুণগুলিও আমাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত করতে হবে।

উপর্যুক্ত ধারণাগুলি সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব। গঠনমূলক প্রকল্পে অনেক সামাজিক সমস্যা দেখা যায়, যেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকারী শ্রমশিল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের সমস্যাটি ধরে নেওয়া যাক্। এই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে, কারিগরী দিকগুলি ছাড়া সামাজিক দিকগুলি নিয়েও চিন্তা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ—ঐ এলাকা কতটা ঘনবসতিপূর্ণ, বাস্তুচ্যুত লোকজনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কি হবে, চারিপাশের পরিবেশের উপর এই শ্রমশিল্পটির প্রভাব কী হবে, কীভাবে এবং কোথায় বর্জ্য পদার্থগুলি সরিয়ে ফেলা যাবে, যদি দুর্ঘটনাক্রমে কোনো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় সেক্ষেত্রে বাতাসের প্রবাহ কোন্‌দিকে থাকে, শ্রমিকগণ কোথায় বসবাস করবেন, কোন্ কোন্ শ্রমশিল্পগত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, ইত্যাদি। আমরা যদি এই সবরকম দিক্ বিবেচনা না করি, সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে ভালোমন্দ দিকগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যাচাই না করি, তাহলে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ভূপাল গ্যাস-দুর্ঘটনার মতো দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব না। এই ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে, যেমন—একটি পরমাণুকেন্দ্রিক শক্তিচুল্লী স্থাপন, বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, কিংবা আরও অন্যান্য শ্রমশিল্পসংক্রান্ত প্রকল্প যেগুলি একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে সযত্ন পরিকল্পনার দ্বারাই কার্যকরী করা সম্ভব।

এই দৃষ্টিভঙ্গী সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ—এক সময় ‘ছাত্র আন্দোলনের মূলে রয়েছে প্রথম প্রজন্মের ছাত্রেরা, যাদের পিতামাতা অশিক্ষিত।’ এই প্রচলিত মতবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই ধরনের ছাত্রদের সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা হল এবং তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে এই ধারণা ভুল। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা পরিশ্রমের সর্বাধিক ফল লাভ করার জন্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করে থাকি। যেমন, যদি আপনাকে কোনো শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে তিন জন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হয়, আপনি আপনার শহরে ঘোরার পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরি করতে পারেন যাতে আপনার অর্থ ও সময়ের সর্বাধিক সাশ্রয় হয়। বিভিন্ন দোকানে দাম এবং গুণাবলী যাচাই করে গৃহিণীরা তাঁদের মাসিক কেনাকাটাকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ করেন। যে দোকানে সস্তায় জিনিস পাওয়া যায় তা যদি অনেক দূরে হয়, তাহলে তাঁদের একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ জিনিস কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যাতে সেই দোকানে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত গাড়িভাড়া পুষিয়ে যায়।

যখন ভিন্নস্থানে বসবাসকারী, ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন সামাজিক অভ্যাসের মানুষ পরস্পরের সম্বন্ধে একপেশে খারাপ ধারণা পোষণ করেন, তখনই সমাজে প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। আপনি হয়তো অত্যন্ত অল্প প্রমাণের ভিত্তিতে গঠিত এই ধরনের একপেশে মতামতের পরিচয় পেয়ে থাকবেন, যেমন, ‘উত্তর ভারতের লোক অতি রুক্ষ স্বভাবের’, ‘দক্ষিণ ভারতীয়েরা দুর্বল হয়’, ‘গোর্খারা খুব সাহসী’, ‘পাঞ্জাবীরা খুব গুরুপাক খাবার খায়’, তপশিলী জাতের লোকেরা বুদ্ধিহীন’, ‘গরিব লোক মাত্রেই অসৎ’—

ইত্যাদি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি বৈজ্ঞানিক হত তাহলে এইসব ধারণা মনে স্থান পেত না, কারণ, তথ্যপ্রমাণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গেছে এগুলি আদৌ সত্য নয়।

প্রায়ই দেখা যায়, সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক কারণে মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই চালাচ্ছে। যদি মানুষ অন্ধের মতো অন্যের ছড়ানো গুজবে বিশ্বাস না করে, কিংবা যারা আমাদের মধ্যে ঘৃণার বীজবপন করতে চায় তাদের কথা না শোনে, তাহলে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়। কেউ যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক ব্যবহার করে এসব ঘটনার পেছনে আর্থিক উন্নয়নের অসাম্য, দাঙ্গাবাধানোর কায়েমী স্বার্থের ভূমিকা প্রভৃতি যেসব সত্য ও মৌলিক কারণ লুকিয়ে থাকে সেগুলি পরীক্ষা করেন তবে তিনি কখনই এরকম অপরাধে সামিল হবেন না। বরং, তিনি সর্বদা এই দুঃখজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

আমাদের নিজেদের জীবনেও সমস্যা সমাধান করার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুইদল মানুষের মধ্যে গোলমাল বেধে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হয়, তবে তাঁরা আবেগতাড়িত না হয়ে, অথবা 'আমি যা বলছি তাই ঠিক, আপনি যা বলছেন, তা ভুল' এই ধরনের গোঁড়ামিকে আঁকড়ে না থেকে, একজায়গায় মিলিত হয়ে নিজেদের সমস্যাগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে বাস্তব চিন্তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন। একইভাবে, জীবনে চলার পথে কোনো সময়ে যদি আমরা সাফল্য অর্জন করতে না পারি এবং সমস্যার সম্মুখীন হই, আমাদের কখনই ভগ্নমনোরথ কিংবা অদৃষ্টবাদী হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে আমরা কোথায় ভুল হয়েছে তা খুঁজে বার করবার জন্যে একটি ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারি, সন্ধানী প্রশ্ন তুলে তার উত্তর খুঁজে বের করতে পারি, এবং একটা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে পারি। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে নানা সমস্যা আমাদের চারিপাশে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আমাদের চিন্তাভাবনা ও জীবন যাপনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিলে তা আমাদের এই সমস্যাগুলির সমাধানে সাহায্য করবে।

এই আলোচনার মোট কথা এই যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার অর্থ একদিকে গোঁড়া চিন্তাধারা ও ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে অসহায় বোধ, হতাশা, আত্মবিশ্বাসের অভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। আমরা যদি কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা, আত্মবিশ্বাস, মানসিক উদারতা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, নমনীয়তা ও সর্বোপরি নম্রতার ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করি তবে তা আমাদের কাছে মঙ্গলজনক হবে। যদি এই প্রচেষ্টায় আমরা আংশিকভাবেও সফল হই, তাহলে বুঝতে হবে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সারমর্ম গ্রহণ করতে পেরেছি।

অনুশীলনী—৪

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলির ভিতরে আপনি কোন্ কোন্ প্রতিক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করবেন এবং কোন্‌গুলিকে অবৈজ্ঞানিক বলবেন? প্রতিটি বিবৃতির পাশে 'বৈ' (বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতির জন্য) অথবা 'অ' (অবৈজ্ঞানিক পরিস্থিতির জন্য) চিহ্ন দিন।

(ক) জনৈক ব্যক্তি এসে আপনাকে বললেন যে গতরাত্রে তিনি একটি উজ্জ্বল আলোক বিন্দুকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে দেখেছেন। আপনি—

(১) ঐ ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করলেন এবং অপর একব্যক্তিকে গিয়ে জানালেন যে আপনিও ঐ আলো দেখেছেন।

....

(২) ঐ ব্যক্তিকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে প্রকৃত ঘটনা কী হতে পারে তা বার করতে চেষ্টা করলেন।

....

(খ) আপনি কোনো সংস্থায় কাজ করেন এবং আপনার অধস্তন কিছু ব্যক্তি আপনার কাছে এসে তাদের একজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাল।

(১) আপনি সোজাসুজি ঐ ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলেন।

....

(২) ব্যক্তিটিকে আপনি পছন্দ করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশের প্রতি আপনি কোনো গুরুত্ব দিলেন না।

....

(৩) অনুসন্ধান করে, প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে তারপর আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

....

(গ) আপনার পরিবারে একটি শিশু অত্যন্ত অসুস্থ এবং মৃতপ্রায় হয়েছেন। আপনি—

(১) বিশ্বাস করবেন যে এটি ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং এ বিষয়ে আপনার কিছুই করবার নেই।

....

(২) শিশুটিকে ওঝার কাছে নিয়ে গেলেন এই ভেবে যে তিনি শিশুটিকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।

....

(৩) শিশুটিকে সঠিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।

....

(৪) রোগের রক্ষণগুলি বর্ণনা করে কোনো হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এলেন।

....

৮.৬ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু চিন্তাভাবনা

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলেছি এবং আপনি নিজেও হয়তো আরও অনেক কিছু জেনে থাকবেন। এখন বিজ্ঞানের চরিত্র নিয়ে, একক উদ্যোগে করা বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়ে এবং বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাক্।

আমরা দেখেছি যে কয়েক হাজার বছরের মতো অল্প সময়ের ভিতরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভাণ্ডার অসাধারণভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে। এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা আশ্চর্য সব কাজ করতে সক্ষম হয়েছি, যেমন—আকাশে ওড়া, চাঁদে অবতরণ করা, বেতারের সাহায্যে বহুদূরে ছবি প্রেরণ করা, কোনো কোনো দেশে মানুষের গড় আয়ু বাড়িয়ে ৭০ বছর কিংবা তার চেয়েও বেশি করা, ইত্যাদি। বিজ্ঞান মানুষকে ব্যাপক ধ্বংসকার্যে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতাও দিয়েছে। বিজ্ঞানের এই ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন প্রকারে তা ব্যবহার করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে আছে—শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক, প্রভৃতিরা।

বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের অপর একটি দিক আছে যা সৃষ্টিধর্মী। নতুন তথ্য সর্বদাই আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, মৌলিক কণার সম্বন্ধে অথবা প্রাণীর শরীরে জিন্ ও ক্রোমোসোমের চরিত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ বৈজ্ঞানিক সর্বদা পরিশ্রম করে চলেছেন। বিশালাকার যন্ত্রের সাহায্যে কেউ তন্ন তন্ন করে আকাশ নিরীক্ষণ করছেন, কিংবা অতি ক্ষুদ্র কণার একটির সঙ্গে আর একটির সংঘর্ষ ঘটাচ্ছেন। আবার কেউ হয়তো কাগজ কলম নিয়ে বহুবিধ পর্যবেক্ষণের ফলাফল একত্র করে, প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলি, অতি সরল বিবৃতির আকারে প্রকাশ করে তত্ত্ব খাড়া করছেন। যদি প্রথমশ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রধানত যুক্তি এবং বিচারশক্তি ব্যবহার করে থাকেন, সৃষ্টিধর্মী বৈজ্ঞানিকগণ তার সঙ্গে ব্যবহার করেন তাঁদের কল্পনাশক্তি ও স্বজ্ঞা (intuition)। এও সত্য যে, অনেক বৈজ্ঞানিক একই সঙ্গে উভয় প্রকার কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন, কেননা, এই দুইটি ভাগের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না।

আমরা দেখেছি যে অজানা জগতের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের যে সংগ্রাম তাকে সত্যানুসন্ধান বলা যায়। এটা বুঝে নিতে হবে যে এর ফলাফল প্রকাশভঙ্গিতে অতি সুন্দর—এবং অজানা জগতের যে দিক্‌গুলি উন্মোচিত হয় তার সম্ভাবনায় মনমুগ্ধকর। কোনো কোনো দার্শনিকের মতে সত্য ও সৌন্দর্য একই জিনিস। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি খুবই সত্য যে, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষাভিত্তিক কাজের জন্ম হয়েছে কোনো সমীকরণের প্রতিসাম্য অথবা সরল সৌন্দর্যের বিবেচনা থেকে। কোনো নতুন চিত্র অঙ্কন করে জনৈক চিত্রকর, কিংবা কোনো নতুন রাগ সৃষ্টি করে একজন সঙ্গীতজ্ঞ যতটা রোমাঞ্চ অনুভব করেন, সৃষ্টিধর্মী বৈজ্ঞানিক তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার থেকে নতুন ফল লাভ করে, কিংবা বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য একটি সরল সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে ততটাই রোমাঞ্চিত হন। বিজ্ঞানচর্চার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিধর্মী কাজে কবির অভিজ্ঞতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এও দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, যদিও বিজ্ঞানের কার্যকলাপ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞানীরা নানা রকমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন, তবুও এইসব পদ্ধতির মধ্যে কিছু সাধারণ চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই অর্থে আমরা 'বিজ্ঞানের পদ্ধতি'র কথা বলতে পারি এবং আমরা যদি যে মনোভাব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় তার কথা বিবেচনা করি, তবে তাকে বিজ্ঞানের মানসিকতা বলা যায়। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অন্যতম কর্ণধার জওহরলাল নেহেরু

'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' কথাটি পছন্দ করতেন, কারণ এই শব্দটি সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। কিছু ব্যাপক অনুসন্ধানের পদ্ধতি ব্যবহার করে, কিংবা বিশেষ, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমস্যার মোকাবিলা করে যদি কোনো সুবিশাল বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ সফল হয়ে থাকে, তাহলে এগুলি ভালো করে বিচার করে দেখা উচিত, যাতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর সুফল পাওয়া যায়।

আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে 'নৈর্ব্যক্তিকতা' (objectivity) হল বৈজ্ঞানিক মানসিকতার এমনই একটি বৈশিষ্ট্য, যার অর্থ একটি সমস্যা সমাধানের দিকে খোলা মন নিয়ে, ফলাফলের উপর ব্যক্তিগত খেয়াল, পছন্দ-অপছন্দ অথবা পূর্বের কোনো সংস্কারকে প্রভাব ফেলতে না দিয়ে অগ্রসর হওয়া। অন্যদিকে এর অপর অর্থ হল, আমাদের সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যেন সামাজিক চাপ কিংবা সমস্যাটির সম্বন্ধে আগে মতপ্রকাশ করেছেন এমন কোনো বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্, ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন করার জন্য ৫০০০ একর জমি খালি করা প্রয়োজন। জমিটির ব্যবহারের ধরন এভাবে পরিবর্তন করলে পরিবেশের ওপর, এবং বর্তমানে ঐ এলাকাতে বসবাসকারী জনগণের ওপর এর কী কী প্রভাব পড়বে, বৈজ্ঞানিকগণকে তা সমীক্ষা করে দেখতে বলা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না। আবার সচেতনভাবে বিবেচনা না করে জমি খালি করাকে সমর্থন করা, বা রাজনৈতিক নেতা বা স্থায়ী জনসাধারণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করাও বিজ্ঞানীদের উচিত নয়। অনবদ্য সততা হল বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে নৈর্ব্যক্তিকতার একটি অঙ্গ। অবশ্যই তার অর্থ এই নয় যে জমির ব্যবহারের এই পরিবর্তন জনগণের যে সমস্যা এমনকি ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে, সেগুলি সমীক্ষা করার সময়ে বিবেচনা করা হবে না, কিংবা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময়ে সেগুলিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে না।

বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নমনীয় হতে হবে এবং একটি দৃষ্টিভঙ্গী সফল না হলে সেটি পরিত্যাগ করে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার মানসিকতা বজায় রাখতে হবে। সকল প্রকার অস্তিত্বের সার কথা হল পরিবর্তন এবং পরিবর্তন কখনই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের অগ্রদূত এবং যে সমাজ সংস্কারমুক্ত এবং পরিবর্তন-অন্বেষী, সেখানেই বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিই মূল ভূমিকা পালন করে, কেননা সব বিশ্লেষণ পদ্ধতির এই দুটিই হল মূল হাতিয়ার। কিন্তু প্রতিটি সমস্যার সমাধানে এর সাথে সাথে কল্পনা ও অনুমানেরও সাহায্য নেওয়া হয়।

এখানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাসূচক কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং তা কখনই চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হবে না। এর কারণ হল আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে জীবনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা দূরীভূত হয়ে যতই জ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করে, আমাদের বুদ্ধিমত্তার সামনে আরও নতুন প্রশ্ন উপস্থিত হয় অথবা অজ্ঞতার আর একটি নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন প্রতিপন্ন হল যে বস্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ও ফাঁকা জায়গার সমন্বয়ে গঠিত, তখন

আমরা পরমাণু ও মৌলের কথা বলেছি। পরমাণুর অভ্যন্তর একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখা গেল সেগুলি ইলেক্ট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত। আরও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই কণাগুলির কয়েকটির ভিতরে আরও মৌলিক কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

এইভাবে বিজ্ঞানের জগতে অন্বেষণ চলেছে। বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চয় তার ফলে দ্রুত বেড়ে চলেছে, কিন্তু অগ্রগতির প্রতিটি ধাপ নতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে দিচ্ছে। এই কারণে বৈজ্ঞানিকগণ অন্ধবিশ্বাসী হতে পারেন না, সর্বদাই নূতন নূতন এলাকায় তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে যান। বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞানের জগতে সর্বাপেক্ষা আধুনিক যে জ্ঞান তাই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত হয়। যদি বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডার কোনো বিশেষ সমস্যার উত্তর দিতে না পারে, তাহলে এ বলা চলে না যে, একজন অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি এ বিষয়ে যা বলছেন তা বিশ্বাস করে নিতে হবে। যদি কর্কটরোগের (ক্যানসার) চিকিৎসা আবিষ্কৃত না হয়ে থাকে, তাহলে কোনো হাতুড়ে চিকিৎসক কিংবা ওঝা এই রোগ নিরাময় করতে পারবেন না। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের প্রতি গভীর বিশ্বাস হল সভ্যতার একটি প্রতীক।

এও আমাদের জানা উচিত যে বিজ্ঞান ছাড়াও জ্ঞানের অন্য অনেক জগৎ রয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, স্বভাব, স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের শরীর ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে জ্ঞানের খুব কাছাকাছি পৌঁছায়। দলবদ্ধ অবস্থায় ও নিজ বাসস্থানে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। ইতিহাস, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, এসবই জ্ঞানভান্ডারের পরিধির মধ্যে পড়ে। কোনো একটি জগতের জ্ঞানের মধ্যে অন্য জগতের জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটে। অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা অনেকটাই জড়িত থাকে। এই বাস্তব সত্যের জন্য, অতি শক্তিশালী জ্ঞানের জগতে যে বৈজ্ঞানিকের অবাধ গতিবিধি, তিনি যেহেতু একই সঙ্গে একজন নাগরিক, তাঁকেও সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

জ্ঞানের বহু প্রকার দিক আছে বলেই সেগুলি একত্র করে একটি শাস্ত্র প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যার নাম হতে পারে 'তত্ত্ববিদ্যা', কিংবা 'বিশ্ববিদ্যা'। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পুরাতন উপনিবেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষ অপুষ্টিজনিত রোগ, কুস্বাস্থ্য, পানীয় জলের এবং আবর্জনা-নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে বাঁচার, আশ্রয়ের অভাব এসব সহ্য করে বেঁচে থাকেন। বিজ্ঞানের কার্যকরী ব্যবহার তাঁদের এই মর্মান্তিক বঞ্চনা দূর করতে পারে। কিন্তু তার জন্য বৈজ্ঞানিকদের থাকতে হবে সামাজিক সচেতনতা এবং সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন আনার একটি মানসিকতা।

কেউ কেউ বলেন বিজ্ঞানকে অধ্যাত্মবাদের সাথে যুক্ত করতে হবে। এখন অধ্যাত্মবাদের অর্থ যদি হয় ভালো ও মন্দ, সত্য ও অসত্য, সামাজিক ন্যায় এবং নগ্ন মুনাফাবাজী, দুর্নীতি ও সততার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, তবে কেউ এই বিবৃতিটির বিরোধিতা করতে পারবেন না। কিন্তু অধ্যাত্মবাদকে যদি কেউ কিছু মতবাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মেনে নেওয়া, জ্ঞানান্বেষণে বাধাদান এবং অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস হিসাবে দেখেন, তাহলে অবশ্যই উপরের বিবৃতিটি সত্য নয়। ভিত্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস এবং অজ্ঞতার

মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিমার্জিত হয়ে উঠেছে।

৮.৭ সারাংশ

- এই এককটিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কিছু কিছু দিক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল নৈর্ব্যক্তিক, চিরবর্ধিষ্ণু, পরিবর্তন সাপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত। এটি কোনোদিনই সম্পূর্ণ হয় না।
- বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলি, যেমন নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ, প্রকল্পের সত্যতা প্রতিপাদন ও প্রয়োজনমত তার সংশোধন, এসব বিষয়ে আমরা কিছুটা ধারণা দিয়েছি।
- আমাদের চারিপাশের জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কীভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং তার সাহায্যে কীভাবে আমরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারি, তাও আমরা দেখিয়েছি।

৮.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) যত্নসহকারে চিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিচের ফাঁকা জায়গায় তার উত্তর লিখুন :

(ক) ৮.৯নং চিত্রের কেকের কেটে নেওয়া অংশটি কোথায়?

....

....

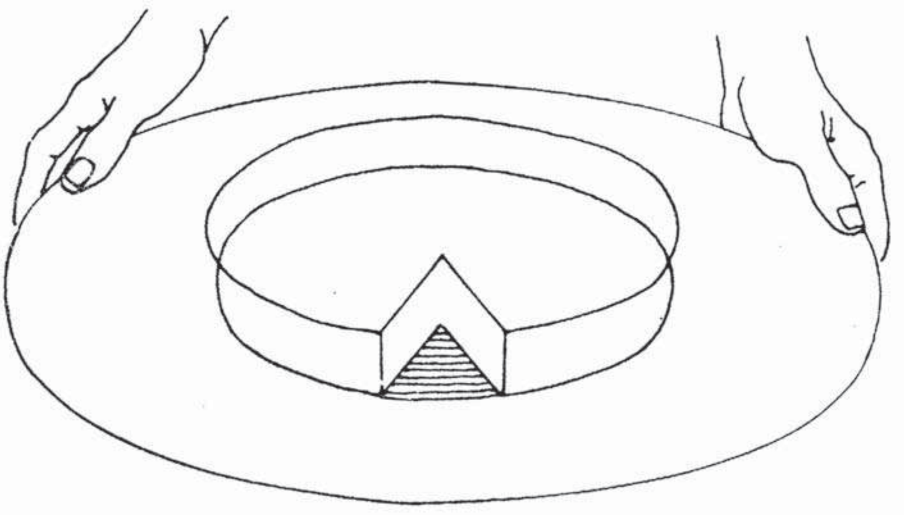

চিত্র ৮.৯

(খ) ৮.১০নং চিত্রে লোকটির কাছে দ্রবণের স্বাদ কেমন লাগবে?

....

....

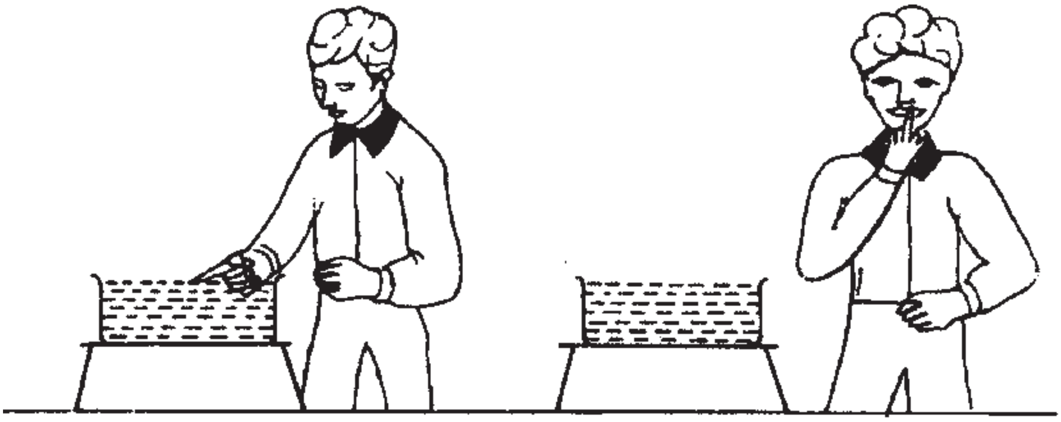

চিত্র ৮.১০

(গ) ৮.১১নং চিত্রে কোন্ দূরত্বটি অধিক, AB কিংবা AC?

....

....

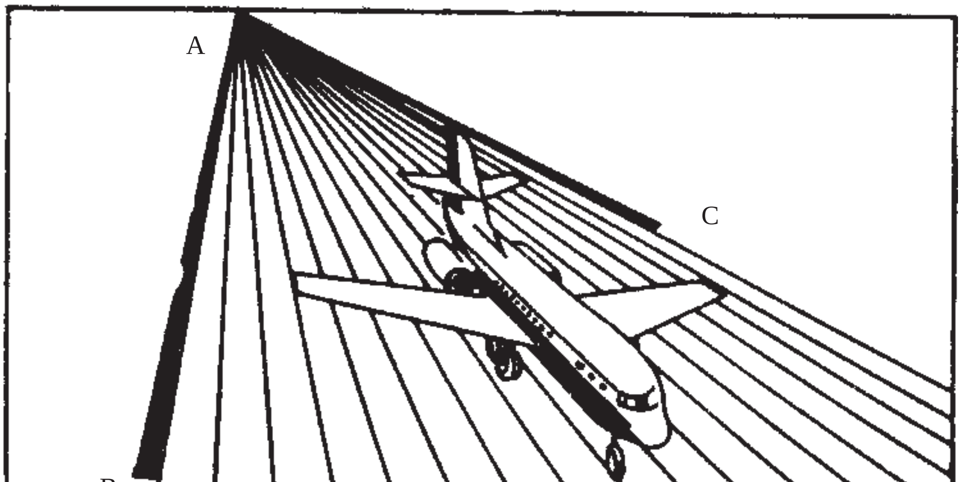

চিত্র ৮.১১

(ঘ) ৮.১২নং চিত্রের (ক) ও (খ) অংশে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের কী পার্থক্য আছে?

....

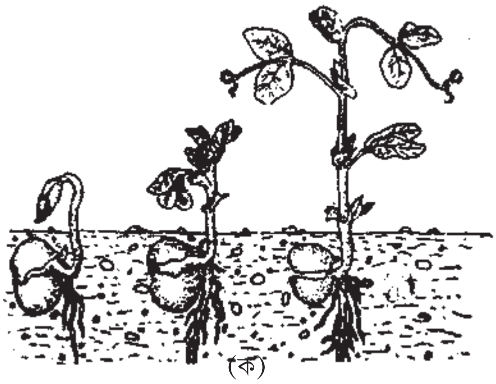

(ক)

(খ)

চিত্র ৮.১২

(২) নিচের পর্যবেক্ষণগুলির প্রতিটির ওপর ভিত্তি করে অন্তত একটি করে প্রকল্প ফাঁকা জায়গায় লিখুন :

(ক) কিছু গাছকে একটি অন্ধকার বন্ধ ঘরে রাখা হল যেখানে কোনো আলো পৌঁছাতে পারে না। কয়েক দিনের ভিতরে গাছগুলি শুকিয়ে মরে গেল।

....

....

....

(খ) একটি ধান উৎপাদনকারী এলাকাতে কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করে দেখা গেল যে জুলাই-আগস্ট মাসে যখন ধানের বীজ বপন প্রক্রিয়া পুরোদমে চলে, তখন শিশুমৃত্যুর হার সর্বাধিক। এই সময়কালের ভিতরে যেসব শিশুর জন্ম হয় তাদের শতকরা ৪০% হয় জন্মের একমাসের ভিতরে মারা যায় অথবা মৃত অবস্থায় জন্ম নেয়।

....

....

....

(গ) দেখা গেছে যে বিভিন্ন অঞ্চলের বহুরূপী গিরগিটি ও মথ (Moth) বিভিন্ন রং-এর হয়।

....

....

....

(৩) (ক) ৮.১৩নং চিত্রে অঙ্কিত সব বৃত্তই চিত্রের নীচের ডানদিকের কোণায় অবস্থিত এই প্রকল্পটির সত্যতা যাচাই করে আপনার উত্তর লিখুন।

....

....

....

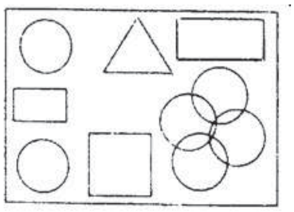

চিত্র ৮.১৩

(খ) এই প্রকল্পটির সত্যতা যাচাই করবার জন্য একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করুন : বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী মায়েদের তুলনায় অশিক্ষিতা মায়েদের অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মলাভ করে।

....

....

....

(৪) নিচে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি থেকে আপনি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন তা ফাঁকা জায়গায় লিখুন :

(ক) একটি সাদা ফুলের বৃন্তকে দুইভাগে বিভক্ত করা হল (৮.১৪ নং চিত্র)। বৃন্তের একটি ভাগ রঙিন জলপূর্ণ গেলাসে রাখা হল এবং অপর ভাগটি রাখা হল একটি সাধারণ জলের গেলাসে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে, ফুলের একদিক রঙিন হয়ে উঠেছে।

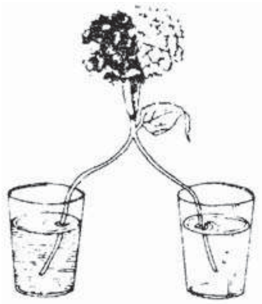

চিত্র ৮.১৪

....

....

....

(খ) নিউমোনিয়ার জীবাণু বাহক কিছুটা সিরাম (রক্তের জলীয় অংশ) নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত একদল ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করানো হল এবং সেগুলি প্রত্যেকে কিছুদিন বাদে মারা গেল। একই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ফোটানোর পরে অন্য একদল ইঁদুরের শরীরে ঢোকানো হল। দেখা গেল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি ইঁদুরেরও মৃত্যু হয়নি। (৮.১৫ নং চিত্র দেখুন)

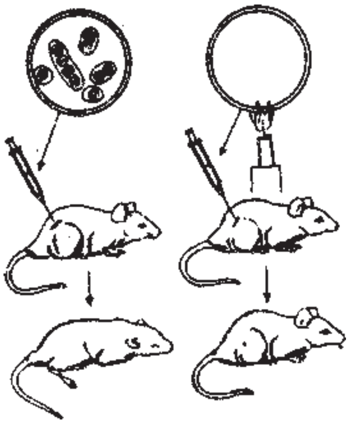

চিত্র ৮.১৫

....

....

....

(গ) তেলে রান্না করা হয়েছে এমন কোনো সবজীর থেকে কাপড়ে যে হলুদের দাগ লেগে যায়, তা সাধারণ জলে ধুয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হলে দাগটি থেকে যায়। যদি কাপড়টি সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ছায়াতে শুকানো যায়, তাহলেও দাগটি থেকে যাবে। কিন্তু সাবানে ধোওয়ার পরে যদি কাপড়টি রৌদ্রে মেলে দেওয়া হয়, দাগ অদৃশ্য হয়ে যাবে।

....

....

....

৮.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী :

(১) (ক) সত্য (খ) অসত্য (গ) সত্য (ঘ) অসত্য (ঙ) অসত্য

(২) (ক) পর্যবেক্ষণ (খ) তত্ত্ব (গ) ফলাফল বিশ্লেষণ (ঘ) প্রশ্ন ও প্রকল্প (ঙ) পরীক্ষা পরিচালনা

(৩) (ক) ×

(খ) নৈর্ব্যক্তিক এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ

(গ) ×

(ঘ) নৈর্ব্যক্তিক

(ঙ) কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ নয়, পরিবর্তনের পথ সর্বদাই খোলা

(৪) (ক) (১) অ (২) বৈ

(খ) (১) অ (২) অ (৩) বৈ

(গ) (১) অ (২) অ (৩) বৈ (৪) অ

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী—

(১) (ক) চিত্রটিকে উল্‌টো করে ধরুন।

(খ) লোকটি দ্রবণের স্বাদ সম্বন্ধে কিছু বলতে অক্ষম কারণ তিনি যে আঙ্গুলটি দ্রবণে ডুবিয়েছেন, সেই আঙ্গুলটি জিভে ঠেকাননি।

(গ) দুইটির দৈর্ঘ্য সমান, আপনি মেপে দেখতে পারেন।

(ঘ) (ক) চিত্রে বীজপত্র ভূমির নীচে থাকে। (খ) চিত্রে বীজপত্র ভূমির উপরে উঠে আসে।

এইসব উদাহরণে আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে প্রতিটি পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত যত্নসহকারে করা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনার যে উপলব্ধি হচ্ছে তার ওপরে নির্ভর না করে মাপ নিয়ে দেখা উচিৎ। এছাড়া, পর্যবেক্ষণ সঠিক হতে হবে।

(২) (ক) (১) উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন।

(খ) (১) গর্ভবতী মায়েরা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন।

(২) পিঠ বাঁকিয়ে, হাঁটু গেড়ে, সারাদিন ধরে মায়েরা যে বীজবপন করেন তাতে, তাঁদের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে।

(গ) (১) শত্রুর কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য বহুরূপী গিরগিটি কিংবা মথ চারিপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায়।

(২) পারিপার্শ্বিক পরিবেশই বহুরূপী গিরগিটি বা মথের দেহের রং পরিবর্তন করে।

(৩) (ক) অন্যান্য জায়গার তুলনায় নীচের ডানদিকে অনেক বেশি সংখ্যক বৃত্ত আছে।

(খ) অশিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী মায়েদের একটি বিশাল নমুনা নিতে হবে যার মধ্যে বিভিন্ন আর্থসামাজিক পশ্চাৎপট, বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম ও জাতির প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারে সন্তান সংখ্যা দেখে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আপনি এই উত্তরে কিছু সংযোজন করতে পারেন।

(৪) (ক) গেলাসের জল বৃন্তের মধ্যে দিয়ে ফুলের পাপড়িতে প্রবেশ করে।

(খ) তরল পদার্থটি ফোটালে নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

(গ) সাবান বা ডিটারজেন্ট তেলকে সম্পূর্ণ গলিয়ে দেয়, এবং উজ্জ্বল সূর্যালোক কাপড় থেকে হলুদের রং পুরোপুরি বিরঞ্জন করে সাদা করে দেয়।

পাঠ উপকরণ

এফ. এস. টি.—1

পর্যায়—3

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এস. টি.—1

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
3

মহাবিশ্ব ও প্রাণের সূচনা	257
একক 9 ❑ মহাবিশ্ব এক বস্তুতন্ত্র	258
একক 10 ❑ মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন	283
একক 11 ❑ সৌরজগৎ	307
একক 12 ❑ প্রাণের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি	334
একক 13 ❑ মানুষের অভিব্যক্তি	353

তৃতীয় পর্যায় □ মহাবিশ্ব ও প্রাণের সূচনা

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনি বিজ্ঞানের ইতিহাস ও আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছেন। অষ্টম এককে আপনি বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কেও পাঠ করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, সবসময়েই আমরা সমাজে বিজ্ঞানের বিকাশের পিছনে দুটি মূল প্রেরণাশক্তির কথা বলেছি। যার একটি হল মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল আর অন্যটি তার মৌলিক প্রয়োজনবোধ। মানবসমাজের অস্তিত্বের প্রথম থেকেই মানুষ যেসব প্রশ্নে কৌতূহলী হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমরা তার কয়েকটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। মহাবিশ্ব ও প্রাণসংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলি হল—আমাদের মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি? এটি কত বড়? এর উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? প্রাণ কী? মানুষের উদ্ভব কীভাবে হল? আমরা কোথায় রয়েছি? মহাবিশ্বে আমরা কী একা?

গত কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবু বিংশ শতাব্দীতেই এ বিষয়গুলি মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে মহাবিশ্ব ও প্রাণ সম্বন্ধে জ্ঞানের এক বিপুল ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে এবং এগুলির সাহায্যেই তা সম্ভব হয়েছে। এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব ও প্রাণ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর একটি যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। আমরা এখানে এই ধারণাটিই উপস্থাপিত করব। এ প্রশ্নগুলির উত্তর আজও সহজে মেলে না। কিন্তু এগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির এই রহস্যগুলির মধ্যে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি। অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যত নতুন উত্তর খুঁজে পাই, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারও ততই সমৃদ্ধ হয়।

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সময়ের সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বস্তুতন্ত্র হিসাবে মহাবিশ্ব, তার গঠন ও মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণা কী, এগুলির বর্ণনা দিয়েই আমরা এই পর্যায়টি শুরু করব। মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানের বিভিন্ন উপায় এবং এর উৎপত্তি ও বিবর্তনের তত্ত্বগুলি এখানে বর্ণিত হবে। আমরা সৌরজগতের কিছুটা বিস্তৃত বর্ণনা দেব। সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী একেবারেই অনন্য, কেননা পৃথিবীই প্রাণের একমাত্র আশ্রয়।

প্রকৃত ও গভীর অর্থে প্রাণ মহাবিশ্বেরই একটি অংশ এবং তার মানেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যতদূর জানি, প্রাণই হল মহাবিশ্বে বস্তুর সবচেয়ে জটিল ও সুশৃঙ্খলিত সমন্বয়। মহাবিশ্বের সমগ্র ইতিহাসে প্রাণের উদ্ভব একটি মনোমুগ্ধকর ও অসাধারণ ঘটনা। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কীভাবে ঘটল, এটি বুঝতে হলে আমাদের আগে এই গ্রহের জন্মবৃত্তান্ত, এর প্রাচীন ইতিহাস ও এর বিভিন্ন পরিবর্তগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে। তারপর আমরা আলোচনা করব পৃথিবীর বুকে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন কীভাবে ঘটল। শেষে বানর-সদৃশ স্তন্যপায়ী জীব থেকে কীভাবে মানুষের অভিব্যক্তি ঘটল আমরা তা বর্ণনা করব। আমরা আশা করি, এই পর্যায়টি পড়ার পর আপনি :

- বস্তুতন্ত্র হিসাবে মহাবিশ্ব, তার গঠন ও মৌলিক উপাদানগুলিকে বুঝতে পারবেন।
- মহাবিশ্বে অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করতে পারবেন ও বস্তু কীভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করেছে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সূর্য, পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৃথিবীর আদি ইতিহাস ও পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের অভিব্যক্তির তত্ত্ব ও সাক্ষ্যপ্রমাণগুলির রূপরেখা দিতে পারবেন।

একক ৯ □ মহাবিশ্ব এক বস্তুতন্ত্র

গঠন

৯.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৯.২ ঐতিহাসিক পটভূমি

৯.২.১ প্রাচীনকালের ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব

৯.২.২ কোপারনিকাসের বিপ্লব

৯.২.৩ সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা বর্জন

৯.৩ বাস্তব মহাবিশ্ব

৯.৩.১ মহাজাগতিক দূরত্ব

৯.৩.২ সৌর পরিবার

৯.৩.৩ রাত্রির আকাশ

৯.৩.৪ ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী

৯.৩.৫ ছায়াপথের বাইরে

৯.৪ সারাংশ

৯.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৯.৬ উত্তরমালা

৯.১ প্রস্তাবনা

অষ্টম এককে আপনি বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চরিত্র সম্বন্ধে জেনেছেন। বিজ্ঞানের পদ্ধতি আমাদের প্রকৃতির বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করেছে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তন যেগুলির অন্যতম। গত কয়েক হাজার বছরে আমরা মহাবিশ্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারগুলি ঘটেছে অতি সম্প্রতি, এই বিংশ শতাব্দীতে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের কাছে এক বিশাল ও সুপ্রাচীন মহাবিশ্বের পরিচয় এনে দিয়েছে।

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যুগে যুগে কেমনভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং বস্তুতন্ত্র হিসাবে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান উপলব্ধি কী, এই এককে আমরা তা আলোচনা করব। বাস্তব মহাবিশ্ব, অর্থাৎ যে সকল বস্তু দিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত, তার সম্বন্ধে আমরা এখন যা জানি এই এককে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হবে। বিজ্ঞান আমাদের হাতে যেসব শক্তিশালী ও কার্যকরী পদ্ধতি তুলে দিয়েছে তার সাহায্যেই আমাদের পক্ষে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আধুনিকতম ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহাশূন্য থেকে আসা

আলো, তাপ ও অন্যান্য বিকিরণের বিশ্লেষণ এবং নানা সন্ধানী ও মহাকাশচারীদের মহাকাশ-সফর। মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে কোন্ কোন্ পদ্ধতি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণা কী, তা আমরা দশম এককে বর্ণনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি

- প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধি কীভাবে বদলেছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যে সব গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মহাবিশ্ব যেসব বস্তু দিয়ে গড়া, সেগুলির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী ছায়াপথের কিছু গঠন-বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

৯.২ ঐতিহাসিক পটভূমি

আকাশ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা কী ছিল তা আপনি দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ এককে মোটামুটি জেনেছেন। প্রাচীন যুগের মানুষ যে বাঁচার জন্য খাদ্যসংগ্রহ ও শিকারের উপরই নির্ভর করত, তাও আপনি পড়েছেন। খাদ্যের যোগান ঋতুর ওপর নির্ভর করে আর ঋতুর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সূর্য ও তারার গতিবিধির। সুতরাং সূর্য ও তারকারাই নিয়ন্ত্রণ করে ঋতু, খাদ্য আর উষ্ণতা। আবার চন্দ্রের গতিও নিয়ন্ত্রণ করত জোয়ার-ভাঁটা আর নানা প্রাণীর জীবনচক্র। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই আদিম মানুষ সূর্যের উদয় ও অস্ত, অমাবস্যার পর ক্ষীণচন্দ্রের আবির্ভাব ও চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করতেন। যত নির্ভুলভাবে তাঁরা সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদের অবস্থান ও গতি জানতে পারতেন তত নির্ভরযোগ্যভাবে তাঁরা বলতে পারতেন কখন শিকারে যেতে হবে, কখন গোষ্ঠীর সবাইকে একত্র করতে হবে আর কখন আরও গরম জায়গার দিকে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের টিকে থাকা অনেকটাই নির্ভর করত তাঁদের আকাশের পঞ্জিকা পড়ার ক্ষমতার ওপর (পাদটিকার মন্তব্যটি পড়ে নিন)। হাড়ের উপর চন্দ্রের কলার খোদাই করা চিত্রই এ ধরনের সবচেয়ে প্রাচীন নথি। এগুলি প্রায় ৩০,০০০ বছর পুরানো বলে মনে করা হয়।

অবশ্য আদিম মানুষের বিশ্ব বলতে ছিল হয়তো অল্প কিছুটা জমি, নদী, দূরের পাহাড় বা সমুদ্রের নীলরেখা দিয়ে ঘেরা। মাথার ওপর ছিল আকাশ, যাকে পাড়ি দিত আলোক ও উষ্ণতাদায়ী সূর্যদেবতা আর ক্ষীণতর দ্যুতির

কোন্ কোন্ তারা নির্দিষ্ট ঋতুতে সূর্যের ঠিক পূর্বে উদয় হয় বা সূর্যের ঠিক পরে অস্ত যায়। বেশ কিছু বছর ধরে তারাগুলিকে লক্ষ্য করলে এবং তাদের, গতিবিধি লিপিবদ্ধ করলে ঋতু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হতে পারে। সূর্য দিগন্তে কোথায় ওঠে তা লক্ষ্য করলে সেটা বছরের কোন্ সময় তাও বলা যায়। সুতরাং আকাশেই তো একটা বিরাট দিনপঞ্জিকা রয়েছে যা যার খুশি সেই পড়ে নিতে পারে।

আর এক অপেক্ষাকৃত গৌণ দেবতা চন্দ্র। চন্দ্রের সঙ্গে রাত্রির আকাশে জ্বলত অসংখ্য উজ্জ্বল তারা। আর এই ছোট্ট বিশ্বের বাইরে ছিল কল্পনাতীত রহস্য।

কৃষিকার্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক ঋতুতে বীজবপন ও ফসল কাটার প্রয়োজন দেখা দিল। দ্বিতীয় এককে দেখেছেন যে ব্যাবিলন ও মিশরে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সালেরও অনেক আগে সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদের নিয়মিত গতির উপর ভিত্তি করে মোটামুটি নির্ভুল দিনপঞ্জিকা তৈরি হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তা উন্নত হয়েছে, তার পরিধিও বেড়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪০০ সালের মধ্যে মানুষের চিন্তার এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের দার্শনিকরা দেবদেবীর প্রশ্ন না এনেই বিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের চারিদিকের জগতে দৃষ্টিক্ষেপ করে কতকগুলো প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর খুঁজেছিলেন, যথা—সূর্য কেন বিভিন্ন স্থানে উদিত হয়? চন্দ্রের আকৃতি বদলায় কেন? কতকগুলি তারা, পরে যেগুলিকে গ্রহ বলা হয়েছিল, অন্য তারাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কেন? মানুষের কাছে কী এগুলি কোনো বিশেষ অর্থ সূচিত করে? তবে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সুযোগ সীমিত হওয়ায় মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের তত্ত্ব বহুদিন ধরেই একটা পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণার বাইরে পৌঁছতে পারেনি। দেখা যাক্ বস্তুতন্ত্র হিসাবে মহাবিশ্বের প্রাচীন ধারণাগুলি কী ছিল।

৯.২.১ প্রাচীনকালের ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মিশরীয় ও সুমেরীয়দের প্রাচীনতম ধারণাগুলি আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। তাদের কাছে পৃথিবী ছিল সমতল ও নিরেট। দ্বিতীয় এককের ২.২.১ চিত্রে মিশরীয়দের মহাজগতের রূপ দেখানো হয়েছে। তেমনি, সুমেরীয়রা মহাবিশ্ব বলতে বুঝত টিনের তৈরি আকাশ দিয়ে ঢাকা একটা চ্যাপ্টা পৃথিবী। দুই-এর মধ্যে ছিল জ্বলন্ত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ আর তারকারা, সবই দেবতাদের নিয়ন্ত্রণে। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীকে ধরা হত সমগ্র মহাবিশ্বের মূলবস্তু হিসাবে। এছাড়া অন্যরকম ভাবার সত্যই কোনো কারণ ছিল না। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ আর তারকারা আপাতদৃষ্টিতে যেমন দেখতে, তারা সেগুলিকে ঠিক তেমনটি বলেই মেনে নিত।

পৃথিবী গোলাকৃতি

গ্রীকরা সমতল পৃথিবীর ধারণা বর্জন করেছিলেন। দার্শনিক থেল্স্ খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালেই ভেবেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকৃতি। পীথাগোরাস ও তার শিষ্যরাও পৃথিবী গোল, এই মতবাদই পোষণ করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে জাহাজ যেভাবে সমুদ্রের দিগন্তের আড়ালে ডুবে যায় অথবা চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের উপর পৃথিবীর যে গোলাকৃতি ছায়া পড়ে তাতে পৃথিবীকে গোল হতেই হবে।

অনুশীলনী—১

(ক) প্রাচীন যুগের মানুষের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের ব্যবহারিক মূল্য কী ছিল?

(খ) কোন্ কোন্ পর্যবেক্ষণের ফলে পীথাগোরাস ও তাঁর শিষ্যেরা পৃথিবী গোল বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারকা ও তারামণ্ডলগুলির মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও তারকাদের ঔজ্জ্বল্যও নিরূপণ করেছিলেন। তাঁরা তারকারাশির মধ্যে গ্রহগুলির আপাতগতি লক্ষ্য করেছিলেন, এমনকি মঙ্গলের মতো কয়েকটি গ্রহের পশ্চাদ্‌গতিও। তাঁদের আসল সমস্যাটি ছিল, পৃথিবী থেকে দূরে আকাশে অনেক উপর থেকে দেখলে গ্রহগুলির যে আসল গতিটা দেখা যাবে সেইটি বার করা, যাতে পৃথিবী থেকে যে আপাত গতিটা দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রীকরা মহাবিশ্বের যত মডেল খাড়া করেছিলেন এবার আমরা সেটি বর্ণনা করব।

টলেমীর (Ptolemy) বিশ্বচিত্র

গ্রীকরা মহাবিশ্বের যে তাত্ত্বিক মডেল খাড়া করেছিলেন তার কেন্দ্রে স্থির পৃথিবী আর তাকে ঘিরে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহেরা বৃত্তাকার কক্ষে গতিশীল। মহাবিশ্বের এই চিত্রে তারাদের ভূমিকা শুধু পশ্চাদপট হিসেবে, গ্রামের মেলায় ফটোগ্রাফার পিছনে যে ছবি-আঁকা পর্দা ঝুলিয়ে দেন, কতকটা তার মতো। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে এই ধারণাটাই কী সবচেয়ে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না? কেননা সব জ্যোতিষ্ককেই আমরা আকাশে উদয় হতে আর অস্ত যেতে দেখি কিন্তু পৃথিবী সে তুলনায় স্থির, নিরেট আর অনড়।

গ্রীকরা গ্রহদের গতিবিধি ব্যাখ্যা করতে যে সব মডেল তৈরি করেছিলেন তার বেশিরভাগেই ছিল সমকেন্দ্রিক বৃত্ত বা গোলক। তাঁদের মতে প্রত্যেকটি গ্রহ এক-একটি অদৃশ্য গোলক বা বৃত্তের সঙ্গে আটকানো, আর ওই বৃত্ত বা গোলকগুলি এক-একটি এক এক গতিতে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণশীল। তৃতীয় এককের ৩.১২ চিত্রে ইউডক্সাসের সাতাশটি গোলকের যে মডেল দেখানো হয়েছিল, সেটি হয়তো আপনার মনে থাকতে পারে।

অনেক প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা একত্র করে টলেমী তাঁর অ্যালমাজেস্ট (Almagest) গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের তেরোটি খণ্ডে টলেমীর নিজস্ব ধারণা ছাড়াও অ্যারিস্টটল, অ্যাপোলোনিয়াস, হিপারকাস প্রভৃতি পণ্ডিতদের ধারণা লিপিবদ্ধ আছে। মহাবিশ্ব সম্বন্ধে এই সম্মিলিত ধারণাকেই আমরা টলেমীয় বিশ্বচিত্র (Ptolemaic System) বলি। (তৃতীয় এককের ৩.১৪ চিত্র দেখুন।)

কেউ কেউ এই মডেলের বিপরীত মতও পোষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্যামস (Samos)-এর অ্যারিস্টারকাসের মতো, যিনি বলেছিলেন যে বিশ্বের কেন্দ্রে আছে সূর্য, পৃথিবী অন্যতম গ্রহ এবং অন্য সব গ্রহের মতো পৃথিবীও সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে ঘুরছে। তিনি এও বলেছিলেন যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় এবং তারাগুলি আছে অনেক বেশি দূরে। তাঁর ধারণাগুলি সত্য হলেও তিনি যে কী করে এইসব সত্যে উপনীত হলেন, তা আমরা জানি না। আপনি তৃতীয় এককে পড়েছেন যে অ্যারিস্টটলের মতামতের প্রচণ্ড প্রভাবে এসব ধারণা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ এককে আপনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতে যেসব সমান্তরাল উন্নতি ঘটছিল তার সম্বন্ধেও পড়েছেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অগ্রণী ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, যিনি পৃথিবীর নিজ কক্ষের

উপর আবর্তনে বিশ্বাস করতেন, তাঁর কথাও আপনি জানেন। আর্যভট্ট গ্রহণেরও একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার মধ্যে তাঁর মতবাদ বেশিদিন টিকতে পারেনি।

অনুশীলনী—২

নীচের উক্তিগুলি সত্য না মিথ্যা তা বাক্সের মধ্যে ঠিক (✓) বা ভুল (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান :

(ক) টলেমীর মতে সূর্য ছিল স্থির। ☐

(খ) ভূকেন্দ্রিক মডেলে পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে এবং বাকি সব জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘোরে বলে ধরা হত। ☐

(গ) ভূকেন্দ্রিক মডেল অনুযায়ী পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে নিশ্চল, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহেরা তার চারিদিকে পরিক্রমারত আর তারকারা আকাশের গায়ে আটকানো। ☐

(ঘ) ভূকেন্দ্রিক মডেল থেকে ভিন্ন যে মডেল অ্যারিস্টারকাস দিয়েছিলেন, তাতে সূর্য ছিল কেন্দ্রস্থলে। ☐

ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের টলেমীয় মডেল এক হাজার বছরেরও বেশিদিন ধরে অগ্রগণ্য ছিল। ইউরোপে নবজাগরণের সময় থেকে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পথ গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মানমন্দির নির্মাণ, টলেমীর যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন এবং নতুন কিছু যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনও করেছিলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাঁদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে টলেমীর তত্ত্বের বিরোধ লেগে গেল। গ্রহদের সংক্রমণ পথ যত সূক্ষ্মভাবে মাপা সম্ভব হল, তথ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে টলেমীর মডেলের ব্যবহার তত বেশি শক্ত হয়ে পড়ল।

নবজাগরণের ফলে প্রাচীন গ্রীকদের জ্ঞানভাণ্ডার ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল। নিকোলাস কোপারনিকাস নামে একজন পোল্যান্ডবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বের যেসব সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনেক দিন অবহেলিত হয়ে পড়েছিল সেগুলি নতুন করে পরীক্ষা করে দেখলেন। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রহদের আপাতদৃষ্ট গতি ব্যাখ্যা করার জন্য সেই সময় প্রচলিত টলেমীয় মডেল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রকল্প উপস্থাপিত করলেন। এই প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী প্রস্তাব ছিল এই যে বিশ্বের কেন্দ্রে আছে সূর্য, পৃথিবী নয়।

৯.২.২ কোপারনিকাসের বিপ্লব

কোপারনিকাসের মডেলে সূর্য ছিল কেন্দ্রে আর বুধ, শুক্র, প্রদক্ষিণরত চন্দ্রসমেত পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—এই ছয়টি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র বৃত্তাকার কক্ষপথে। তারারা এই মডেলেও পশ্চাদপটে একটি গোলকের গায়ে

আঁটা (৯.২ চিত্র দেখুন)। আর গ্রহগুলি সব একই আকারের। গ্রহদের আপাতগতি ব্যাখ্যা করতে কোপারনিকাসের মডেল টলেমীয় মডেলের মতোই কার্যকরী ছিল। কিন্তু যাঁরা ভূকেন্দ্রিক মডেলে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এর একটা বিরোধ লেগে গেল। এবং যতদিন না গ্যালিলিও ও কেপলারের গবেষণার ফলে সূর্যকেন্দ্রিক মডেল সত্য বলে প্রমাণিত হল ততদিন কোপারনিকাসের মডেল তেমন স্বীকৃতি লাভ করেনি।

চিত্র ৯.২ : কোপারনিকাসের মডেল

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও গ্যালিলাই যখন তাঁর ছোট্ট, অতি সাধারণ টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন, বলতে গেলে তখনই কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের মডেল প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এমনকি প্রথম কয়েক রাত আকাশ পর্যবেক্ষণ করেই গ্যালিলিও যা দেখেছিলেন তা প্রাচীনকালে বিশ্বের যে প্রশান্ত, ত্রুটিহীন, সুসংগত চিত্রটি প্রচলিত ছিল সেটিকে ধ্বংস করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। কেননা চন্দ্রকে দেখা গেল সুন্দর মসৃণ গোলক না হয়ে সেটি এবড়ো-খেবড়ো, পাহাড় আর গভীর খাদে ভরা। শনিগ্রহকে মনে হল যেন তিন ভাগে বিভক্ত। বৃহস্পতিকে বেষ্টন করে ঘুরছে চারটি চাঁদ। যেন আকাশেই রয়েছে কোপারনিকাসের মডেলের একটি ছোট সংস্করণ। আমাদের চন্দ্রের কলার মতো শুক্রগ্রহেরও কলা দেখতে পাওয়া গেল। শুক্র যখন আকাশে সূর্যের কাছাকাছি তখন তার পূর্ণ-আলোকিত কলা দেখতে পাওয়া গেল, যেটা টলেমীর মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যায় না।

কেবল কোপারনিকাসের মডেল দিয়েই এটার ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা এই মডেলে পৃথিবী থেকে শুক্রকে সূর্যের পিছন দিয়ে ঘুরে আসতে দেখা যায়। (৯.৩ চিত্র দেখুন।)

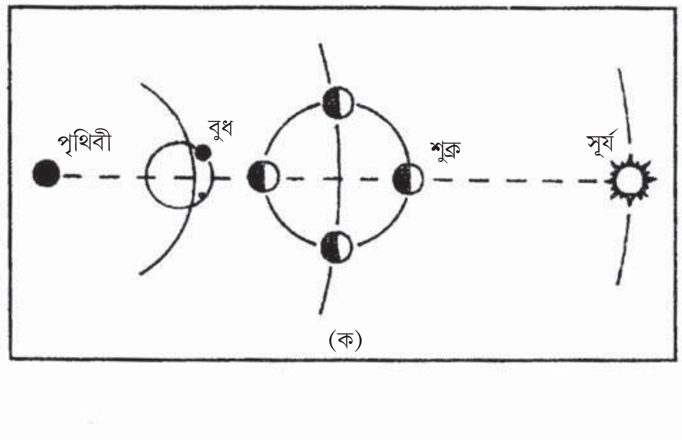

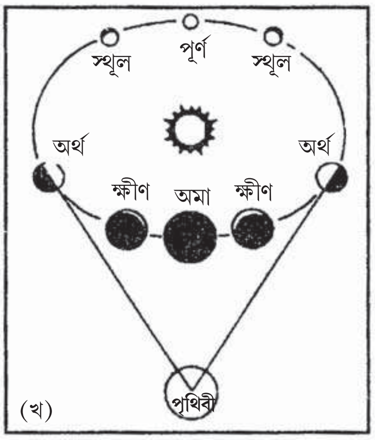

চিত্র ৯.৩ : (ক) শুক্রের কলা টলেমীয় মডেলে ব্যাখ্যা করা যায় না।
(খ) কোপারনিকাসের মডেল অনুযায়ী শুক্রের কলা।

কোপারনিকাসের মডেল বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এইসব পর্যবেক্ষণ শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছিল। এবং তার ফলে ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা একেবারেই পরিত্যক্ত হল। মজার কথা এই যে প্রাত্যহিক জীবনে পৃথিবী-কেন্দ্রিক ধারণাগুলি এখনও আমাদের সঙ্গে রয়ে গেছে। অ্যারিস্টারকাসের পর ২২০০ বছর কেটে গেছে, গ্যালিলিওর পরও কেটে গেছে প্রায় ৪০০ বছর, তবু আমাদের ভাষায় পৃথিবী যেন ঘোরে না এমন একটা ভাব থেকে গেছে। 'সূর্য ওঠা', 'সূর্য ডোবা'—এসব কথা তো আমরা এখনও বলি।

অনুশীলনী—৩

(ক) গ্রহদের গতিবিধি ব্যাখ্যা করতে কোপারনিকাসের মডেল টলেমীয় মডেলের চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল না। তাহলে প্রাথমিক বাধা সত্ত্বেও পরে এটি গৃহীত হয়েছিল কেন? উত্তরটি নীচের লাইনে লিখুন।

....

....

....

....

(খ) নীচের পর্যবেক্ষণগুলির মধ্যে কোন্ দুটির কোপারনিকাসের মডেলের সপক্ষে নিশ্চিত সাক্ষ্যপ্রমাণ বলা যায়? সে দুটির পাশের বাক্সে (✓) চিহ্ন দিন।

(i) সূর্য পূর্বে উদিত হয় ও পশ্চিমে অস্ত যায়। ☐

(ii) চন্দ্রের মতো শুক্রগ্রহের কলা দেখতে পাওয়া যায়। ☐

(iii) শনিগ্রহকে ত্রিধাবিভক্ত মনে হয়েছিল। ☐

(iv) বৃহস্পতির চারদিকে চারটি চাঁদকে ঘুরতে দেখা যায়। ☐

গ্রহের গতিসংক্রান্ত কেপলারের সূত্র

গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণগুলির প্রায় একই সময়ে ইয়োহান কেপলার (Johannes Kepler) যে গণনাকার্য করেছিলেন তার থেকে সূর্যকেন্দ্রিক মডেলের আরও সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার এমন একটা তাত্ত্বিক মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন যা গ্রহের গতিবিধিসংক্রান্ত সমস্ত পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। গ্রহগুলির অবস্থানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ করেছিলেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe)। তিনি কেপলারকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহের উপর অনুসন্ধান চালাতে বললেন। এর কারণ মঙ্গলের গতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে দেখা গিয়েছিল এবং বৃত্ত দিয়ে তৈরি কক্ষের সঙ্গে সেটা কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না। এছাড়া যে গ্রহ বৃত্তাকার কক্ষপথে চলে তার সমান দ্রুতিতে চলা উচিত। কিন্তু কেপলার দেখলেন যে গ্রহের দ্রুতি সূর্য থেকে তার দূরত্বের সঙ্গে পালটে যায়। অনেক বছর চেষ্টাচরিত্রের পর তিনি দেখলেন যে মঙ্গলগ্রহের আপাতগতির একমাত্র ব্যাখ্যা হল এই, যে মঙ্গলের কক্ষপথ একটি উপবৃত্ত (ellipse) যার একটি ফোকাসে আছে সূর্য (চিত্র ৯.৫খ)। এর ফলে বৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণাও পরিত্যক্ত হল। কেপলার শেষ পর্যন্ত তিনটি সরল সূত্রের সাহায্যে টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। এগুলিই হল গ্রহের গতিসংক্রান্ত তিনটি কেপলারের সূত্র (চিত্র ৯.৫খ দেখুন)। ৮.৩.৪ অংশে আপনি

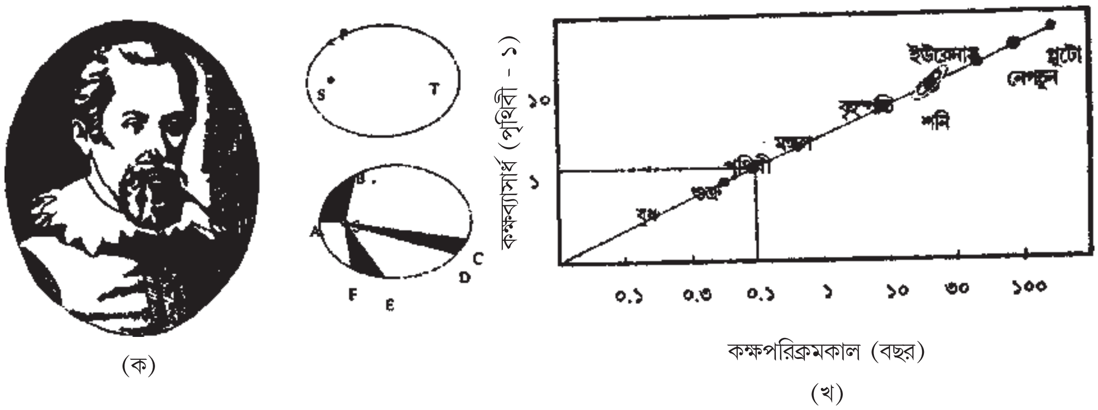

(ক) (খ)

চিত্র ৯.৫ : (ক) ইয়োহান কেপলার (খ) গতিসংক্রান্ত কেপলারের সূত্র।

এগুলির সম্বন্ধে আগেই পড়েছেন। কোপারনিকাসের মডেলের বিরুদ্ধে আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে এটির দ্বারা গ্রহগুলির গতিপথের নির্ভুল গণনা সম্ভব হয়নি। কেপলারের সূত্রের ফলে এই আপত্তি আর রইল না। পীথাগোরাস ও প্লেটোর মতবাদ অনুযায়ী জ্যোতিষ্কদের কেবলমাত্র আদর্শ বৃত্তাকার গতিপথই থাকতে পারত, যে ধারণা কোপারনিকাসও বজায় রেখেছিলেন। কেপলারের সূত্র এই মতবাদকেও খণ্ডিত করল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মোটামুটি সকলেই সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের মডেল মেনে নিয়েছিলেন। জানলে আশ্চর্য হবেন যে, পৃথিবীর গতি যখন বাস্তবে প্রমাণিত হল, তখন আর তার বিশেষ প্রয়োজনই ছিল না, কেননা ততদিনে সবাই মেনে নিয়েছেন যে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এবার দেখা যাক কী সে প্রমাণ।

তারকার লম্বন (Parallax)

৯.৬ চিত্রটি ভালো করে দেখুন। পৃথিবী যদি স্থির থাকত তাহলে পৃথিবীর একটি বিন্দু A এবং নিকটের একটি তারা C-এর সংযোগকারী সরলরেখা কখনও দিক পরিবর্তন করত না। কিন্তু পৃথিবী যদি শূন্যে স্থান পরিবর্তন করে এবং A এবং B-তে যায়, তখন এই সরলরেখাটির দিকও বদলে যাবে। তার ফলে দূরের তারাদের পশ্চাদপটে নিকটের তারাও, পৃথিবী A থেকে B-তে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন C_1 থেকে C_2 সরে গেল বলে মনে হবে। দূরের তারাদের পশ্চাদপটে নিকটের তারার এই সরে যাওয়া স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে এবং এই ঘটনাকেই বলা হয় তারকার লম্বন (parallax)। তারার আপাত-অবস্থানের এই পরিবর্তনের সময়ের সঙ্গে পর্যাবৃত্তি ঘটে। যে-কোনো একটি তারা সারা বছরের মধ্যে প্রথমে একদিকে এবং তারপর অন্যদিকে সরে যায়। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করার ফলেই এটি ঘটে।

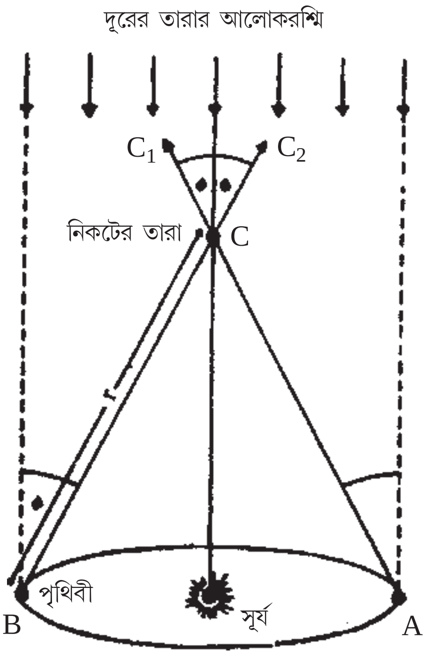

চিত্র ৯.৬ : তারকার লম্বন

তারার কৌণিক অবস্থানের এই পরিবর্তন অত্যন্ত অল্প, পরিমাণে এক সেকেন্ডেরও কম। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিডরিশ বেসেল (Friedrich Bessel) মাত্র ১৮৩৮ সালে একটি তারার লম্বন মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের নিকটতম তারকা সূর্যকে আমরা দূরের তারাদের সাপেক্ষে প্রতিদিন প্রায় ১° কোণে সরে যেতে দেখি।

অনুশীলনী—৪

যে জায়গা দেওয়া আছে তার মধ্যে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন :

(ক) গ্রহদের কক্ষপথের আকৃতি কেমন?

(খ) কেপলারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রগুলিকে সাধারণ ভাষায় লিখুন। (সঙ্কেত : একক ৮ দেখুন)

(গ) পৃথিবী যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তা কোন্ পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায়?

গ্যালিলিও তাঁর টেলিস্কোপ দিয়ে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছিলেন, যার একটি ছিল এই যে আকাশে ছায়াপথ (বা আকাশগঙ্গা) নামে যে আবছা সাদা পটি দেখতে পাওয়া যায় তা আসলে অসংখ্য তারার সমষ্টি। সে পর্যন্ত মহাবিশ্বের মডেল বলতে পরিচিত সৌরজগৎকেই বোঝাত, তারাগুলিকে আলোর বিন্দু ছাড়া আর কিছু ভাবা হয়নি। কিন্তু গ্যালিলিওর পরের যুগে যখন আরও বড় ও ভালো টেলিস্কোপ তৈরি হল, তখন সৌরজগতের বাকি গ্রহগুলি, অর্থাৎ ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো আবিষ্কৃত হল এবং তারাগুলিও আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হল।

তারকার উপর যিনি প্রথম গবেষণা করেন তিনি হলেন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel, 1738-1822)। তিনি এর আগে ইউরেনাস গ্রহও আবিষ্কার করেন। ১৭৮৫ সালে হার্শেল দেখিয়েছিলেন যে তারাগুলি শুধু সৌরজগতের পশ্চাদ্‌পট নয়, বরং সেগুলি অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এক-একটি স্বতন্ত্র বস্তু। তিনি প্রথম ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর মানচিত্র তৈরি করেন এবং দেখান যে সেটি আসলে অসংখ্য তারার একটি চ্যাপটা চাকতির অংশমাত্র। তাঁর মডেলে ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীই ছিল সারা বিশ্ব আর তার মধ্যে ছিল সৌরজগৎ। সে-যুগের টেলিস্কোপ অবশ্য খুব শক্তিশালী ছিল না। তাই দিয়ে আকাশে তারকাদের দেখাত আলোর বিন্দুর মতো। এক ধরনের ঝাপসা সাদা মেঘও দেখা যেত যেগুলিকে আমরা বলি নীহারিকা।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার পরেও মহাবিশ্বের মডেল সূর্যকেন্দ্রিকই ছিল। আমাদের সূর্য ছিল ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে আর সমস্ত তারা ও নীহারিকা সমেত এই ছায়াপথই ছিল সমগ্র মহাবিশ্ব। তবে, এই সূর্যকেন্দ্রিক মডেলকে বাতিল করতেও খুব বেশি দিন লাগেনি। যেসব পর্যবেক্ষণের ফলে এই মডেল বাতিল করা হল এবার আমরা সেগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করব।

৯.২.৩ সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা বর্জন

১৯১৮ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হার্লো শেপলী (Harlow Shapley, 1885-1972) যখন প্রথম ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর আকার ও আকৃতি মাপজোক করে দেখলেন, তখনই সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা একেবারে ভেঙে পড়ল। তাঁর মৌলিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হল যে সূর্য ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে নেই, বরং কেন্দ্র থেকে বেশকিছু দূরে আছে। কিন্তু ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীই মহাবিশ্বের সব কী না সে প্রশ্নটা থেকেই গেল। এর উত্তরটা পাওয়া গেল ১৯২৪ সালে যখন আর এক প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল (Edwin Hubble, 1889-1953) দেখালেন যে অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা নামের ঝাপসা মেঘটি মোটেই ছায়াপথের অন্তর্গত নয়। সেটি আসলে সম্পূর্ণ আলাদা একটি নক্ষত্রমণ্ডলী। এর পর শীঘ্রই অন্যকিছু নক্ষত্রমণ্ডলীকেও খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীকেই তাদের মধ্যে বৃহত্তম বলে মনে হল। এতে মানুষের অহংবোধে কিছুটা সান্ত্বনা মিলল—মহাবিশ্বের কেন্দ্র আমাদের পৃথিবী নয়, এমনকি সূর্যও নয়, তবু আমরা তো মহাবিশ্বের বৃহত্তম নক্ষত্রমণ্ডলীতে বাস করি! এই ধারণা বেশিদিন টিকল না। ওয়ালটার বাডে (Walter Baade, 1893-1959), হাবল মহাবিশ্বের যেসব ছোটখাটো ব্যাপার ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেগুলির উপর অনুসন্ধান শুরু করলেন। তিনি দেখলেন যে অন্য সব নক্ষত্রমণ্ডলীকে আমরা যত দূরে

আছে বলে মনে করেছিলাম, তাদের আসল দূরত্ব তার থেকে অনেক বেশি। ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী অন্যগুলির চেয়ে বিন্দুমাত্র বড় নয়, এটি অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটি নক্ষত্রমণ্ডলী মাত্র।

কোপারনিকাস যে বিপ্লব শুরু করেছিলেন তা এবার সম্পূর্ণ হল। প্রমাণিত হল মহাবিশ্বে আমাদের কোনো বিশেষ ঠাঁই নেই। আমরা এর কেন্দ্রেও নেই। আসলে মহাবিশ্বের কেন্দ্র, এমনকি সীমা বলতেও কিছু নেই। সত্যই, কোপারনিকাসের ধারণার গুরুত্ব কোপারনিকাস নিজে কী করেছিলেন তার জন্য যত, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জন্য।

অনুশীলনী—৫

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধি যুগে যুগে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিবৃতি নীচে উলটো-পালটাভাবে দেওয়া আছে। সেগুলির পাশে ১ থেকে ৭ সংখ্যা লিখে সেগুলিকে কালপরম্পরায় সাজান।

(ক) ছায়াপথই সমগ্র মহাবিশ্ব কিন্তু সূর্য তার কেন্দ্রে নেই।

(খ) মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র বা সীমা নেই এবং ছায়াপথ মহাবিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটি।

(গ) পৃথিবী নিরেট ও চ্যাপ্টা। তার সবচেয়ে উপরে আছে আকাশ আর তার মাঝখানে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি।

(ঘ) সূর্য আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর গ্রহেরা তাকে বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমা করে।

(ঙ) মহাবিশ্বে অনেক নক্ষত্রমণ্ডলী আছে, কিন্তু ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী তার কেন্দ্রে।

(চ) পৃথিবী গোলকাকৃতি। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে এটি নিশ্চল হয়ে আছে।

(ছ) গ্রহেরা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে কয়েকটি নিয়ম মেনে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। কিন্তু সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে।

গত চার শতাব্দীতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধি কীভাবে বদলে গিয়েছে, এ পর্যন্ত আমরা তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। এবারে আমরা বস্তুতন্ত্র হিসাবে মহাবিশ্ব, অর্থাৎ এর বাস্তব গঠন সম্পর্কে আমাদের আধুনিক ধারণা উপস্থাপিত করব। মহাবিশ্বে গ্রহ, তারকা, নক্ষত্রমণ্ডলী প্রভৃতি নানা বিচিত্ররূপে বস্তু ছড়িয়ে আছে। আমরা এখন এগুলির বর্ণনা দেব।

৯.৩ বাস্তব মহাবিশ্ব

মহাবিশ্ব প্রকৃতই বিশাল। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তা এক অজ্ঞাত অখ্যাত নক্ষত্রমণ্ডলীর এক কোণের একটি ছোট তারাকে প্রদক্ষিণরত একটি ধূলিকণার মতো। আমরা শুধু যে মহাশূন্যে একটি কণিকার মতো, তা নয়। বিশাল কালসাগরেও আমাদের অস্তিত্ব একটি মুহূর্তের জন্য। মহাবিশ্ব অতি প্রাচীনও বটে। এখন আমরা জেনেছি, মহাবিশ্বের বয়স ১৫০০ থেকে ২০০০ কোটি বছর, যেখানে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব মাত্র ২০ লক্ষ বছরের মতো। এই বিশাল ও প্রাচীন মহাবিশ্বে রয়েছে নানা ধরনের বস্তু। আসুন, আমরা দেখি কোন্ কোন্ বস্তু দিয়ে মহাবিশ্ব গড়া এবং কীভাবে সেগুলি বিন্যস্ত রয়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বাস্তব গঠনটি কেমন। আমরা অবশ্য মহাবিশ্বের রাসায়নিক সংযুক্তি বা অন্য কোনো বিশদ আলোচনার মধ্যে যাব

না। মহাবিশ্বের বিবরণ শুরু করার আগে আমরা আপনাকে মহাজাগতিক দূরত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেব যাতে পরের আলোচনা আপনার কাছে সহজবোধ্য হয়।

৯.৩.১ মহাজাগতিক দূরত্ব

আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় দিল্লি থেকে কন্যাকুমারিকার দূরত্ব কত, আপনি হয়তো বলবেন প্রায় ৩০০০ কিমি। এই প্রশ্নের আর এক ধরনের উত্তর হল, একটি ট্রেনের এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ৫০ ঘণ্টা লাগে। আমরা যদি ট্রেনের গড় গতিবেগ জানি, তো তার থেকে দূরত্বটি সম্বন্ধে আমরা বেশ ভালো ধারণা করতে পারব।

মহাবিশ্ব পরিমাপে এত বিশাল যে কিলোমিটারের মতো দূরত্বের পরিচিত একক ব্যবহার করার কোনো অর্থই হয় না। এজন্য মহাজাগতিক দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষের এককে। আলো এক বছরে যতদূর যায় তা হল এক আলোকবর্ষ। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার যায়। এই গতিবেগে আলো প্রতি সেকেন্ডে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে। এক বছরে প্রায় ৩ × ১০^{৭} বা তিন কোটি সেকেন্ড। সুতরাং এক বছরে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব

৩ × ১০^{৫} কিমি/সে × ৩ × ১০^{৭} = ৯ × ১০^{১২} কিমি বা ৯ লক্ষ কোটি কিলোমিটার

এই দূরত্বই হল এক আলোকবর্ষ। এটি সময়ের একক নয়, এটি দূরত্বের একক, বিশাল দূরত্ব মাপার একক। মহাশূন্যে দূরত্ব আর সময় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা যখনই সুদূর মহাশূন্যের দিকে তাকাই, আমরা তখনই সময়ের হিসাবে পিছনে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। যখন আমরা এক শতকোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখি, তখন তার শতকোটি বর্ষ আগের রূপটিই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। এইভাবে আলোকবর্ষের এককে কোনো দূরত্বের মান যত, ঠিক তত বছর পূর্বের দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই।

৯.৩.২ সৌর পরিবার

আসুন, এবার মহাবিশ্বের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া যাক্। আমাদের বাসস্থান পৃথিবী থেকেই শুরু করা যাক্। কর্মময় এই পৃথিবী সরস ও উর্বর। এখানে আছে নীল আকাশ, বিশাল মহাসাগর, শীতল অরণ্য, প্রাণশক্তিতে পূর্ণ এক জগৎ। এর উপরিতলকে আচ্ছাদিত রেখেছে এক বায়ুমণ্ডল, যার মধ্যে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে পারি। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উষ্মতাও প্রায় অপরিবর্তিত রাখে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরে একবার সূর্যে চারিদিকে কক্ষপথে পরিক্রমণ করে। পৃথিবী অবশ্য একা নয়। তার ভ্রমণসঙ্গী, চাঁদ পৃথিবীকে ২৭.৩৩ দিনে একবার পরিক্রমণ করে। চাঁদে অবশ্য বায়ু, জল বা প্রাণ নেই, সেটি একটি সম্পূর্ণ মৃত জগৎ। চাঁদ থেকে পৃথিবীকে এক সুন্দর নীলাভ-সাদা গ্রহ বলে মনে হয়।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী একমাত্র গ্রহ নয়। আরও আটটি গ্রহ সূর্যকে কক্ষপথে পরিক্রমণ করে। এই নয়টি গ্রহ। তাদের সব উপগ্রহ, অজস্র গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু আর সূর্যকে নিয়ে যে পরিবার, তার নাম সৌরজগৎ (১১.১ চিত্র দেখুন)। গ্রহগুলির আকারে প্রচুর বৈষম্য। দৈত্যাকার বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর এগারো গুণ, আবার ছোট্ট গ্রহ প্লুটোর ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেকেরও কম। সূর্য থেকে প্রতি গ্রহের দূরত্বও বিভিন্ন।

বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ আর সবচেয়ে দূরের গ্রহ হল প্লুটো। গ্রহগুলি পরস্পর থেকেও নানা দিক দিয়ে বিভিন্ন। যাই হোক, সৌরজগৎ নিয়ে আমরা পরে একাদশ এককে আলোচনা করব। এখন আমরা দেখব তার বাইরের মহাশূন্যে কী আছে।

৯.৩.৩ রাত্রির আকাশ

রাত্রির নির্মল আকাশে তাকালে আপনি কী দেখতে পান? প্রায় সবটাই তো ঝিকমিকে তারায় ভর্তি। হয়তো আপনি চাঁদ দেখতে পাবেন কিংবা উজ্জ্বল আলোর বিন্দুর মতো শুক্রগ্রহকে। লালচে আলোর বিন্দু মঙ্গলকেও হয়তো দেখতে পাবেন। শুক্রকে কখনও দেখা যায় ঠিক সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার আকাশে আবার কখনও বা সূর্যোদয়ের আগে ভোরবেলায়। গ্রহগুলি ছাড়া আর সব আলোর ফুট্‌কিই হল তারা। একেবারে পরিষ্কার, অন্ধকার রাত্রে আমাদের এই পৃথিবী থেকে আমরা প্রায় ছয় হাজার তারা দেখতে পাই।

তারকা ও তারামণ্ডল (Constellations)

রাত্রির আকাশ খুব মজার। তারাগুলিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় তারা যেন কয়েকটি নকশা তৈরি করেছে। আপনি হয়তো সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখেছেন। এটিকে বড় হাতা (Big Dipper) বা লাঙ্গলও (Plough) বলা হয়। এটি হল বৃহৎ ভল্লুক (Great Bear) বা আর্সা মেজর (Ursa Major) নামের উত্তর আকাশের আরও বড় একটি তারকামণ্ডলের অংশ। আমরা শিকারী, সিংহ, কুকুর, তুলাযন্ত্র প্রভৃতি নানা আকৃতির তারা নকশা দেখতে পাই। আকাশে সত্যই এসব ছবি আঁকা নেই। আমাদের কল্পনাই এগুলির জন্ম দিয়েছে। আদিযুগের জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কল্পনায় এসব তারকার নকশা এঁকে নিয়ে সেগুলির সঙ্গে কল্পনায় যে দেবদেবী, বীরপুরুষ, বস্তু বা প্রাণীর সাদৃশ্য পাওয়া যেত তার নামেই ওই তারামণ্ডলের নামকরণ করতেন (চিত্র ৯.৭ক দেখুন)।

আকাশ এই যে এক-একটি তারার নকশায় বা তারার দলে ভাগ করা, এগুলিই এক-একটি তারামণ্ডল। তারামণ্ডল হল কিছুটা অনিয়মিতভাবে ধরে নেওয়া তারার এক-একটি দল, এতে শুধু আকাশের এক-একটি অঞ্চলকেই বোঝায়। ওই অঞ্চলটুকুর মধ্যেকার সব জ্যোতিষ্ক মিলিয়েই তৈরি হয় তারামণ্ডল। আকাশের ৮৮টি তারামণ্ডলের প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট সীমা আছে। আধুনিক যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারামণ্ডলের প্রাচীন নামগুলি দিয়ে শুধু আকাশের অষ্টআশিটি অঞ্চলকেই সূচিত করেন, আগের কল্পিত চিত্রগুলিকে নয়। ৯.৭ চিত্রে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে যে উজ্জ্বল তারা ও তারামণ্ডলীকে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলির মানচিত্র দেখিয়েছি। অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকায় সময়ে সময়ে যে তারকার মানচিত্র প্রকাশিত হয়, আপনি সেগুলি দেখে রাত্রির আকাশের তারকা ও তারামণ্ডলগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারেন।

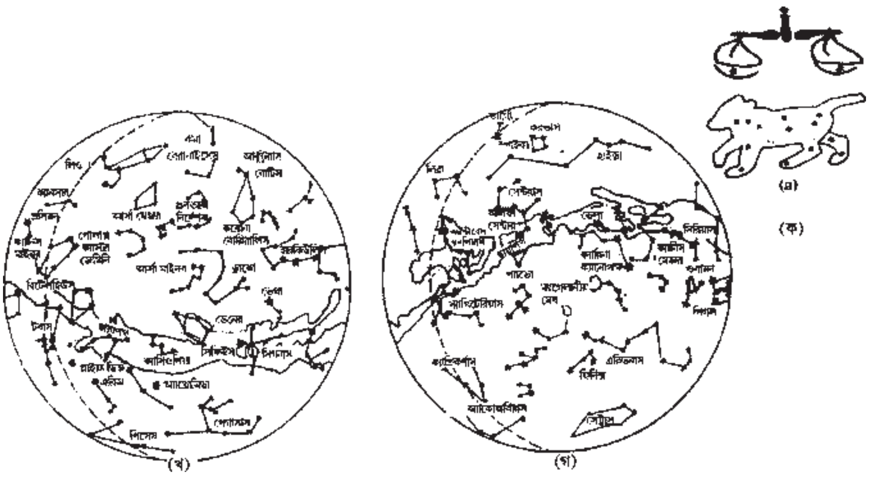

চিত্র ৯.৭ : (ক) তুলা ও বৃহৎ ভল্লুক তারামণ্ডল (খ) উত্তর গোলার্ধে ও (গ) দক্ষিণ গোলার্ধে দৃষ্ট প্রধান তারামণ্ডল ও তারকার মানচিত্র

কয়েকটি ভারতীয় নাম তারকা : Antares - জ্যেষ্ঠা, Arcturus - স্বাতী, Betelgeuse - আর্দ্রা, Canopus - অগস্ত্য, Castor A Pollux - পুনর্বসু, Deneb - ছায়াগ্নি, Procyon - ঈশান, Rigel - বাণলিঙ্গা, Sirius - লুব্ধক, Spica - চিত্রা, Vega - অভিজিৎ।

নক্ষত্রমণ্ডলী : Andromeda - উত্তরভাদ্রপদ, Aquarius - কুম্ভ, Aries - মেষ, Bootis - স্বাতী, Cancer - কর্কট, Canis Major - প্রশ্বা, Canis Minor - প্রশ্বা, Capricornus - মকর, Cassiopeia - কাশ্যপী, Cepheus - শিবি, Coma Beremices Corvus - হস্তা, Corona Borealis Libra - তুলা, Leo - সিংহ, Orion - মৃগশিরা কালপুরুষ, Pegasus - পূর্বভাদ্রপদ, Pisces - মীন, Pleiodes - কৃত্তিকা, Sagittarius - ধনু, Taurus - বৃষ, Ursa Major - সপ্তর্ষি, Ursa Minor - শিশুমার, Virgo - কন্যা।

তারকা ও তারামণ্ডলগুলি ভূপর্যটক ও নাবিকদের সহায়। প্রাচীনকালে এগুলি সমুদ্রগামী জাহাজের সাহায্যে আসত। রাত্রির পর রাত্রি দিগন্তের সাপেক্ষে তারামণ্ডলের অবস্থান লক্ষ্য করে প্রাচীনকালে নাবিকেরা জাহাজের অবস্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করতেন। আর আধুনিক যুগে মহাকাশগামী জাহাজও তারকা আর তারকামণ্ডলের সাহায্যে শূন্যে তার দিক নির্ণয় করে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ দুইটি তারাকে একটি কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে যোগ করে যদি রেখাটি আমরা বাড়িয়ে দিই, তবে আমরা পাব ধ্রুবতারাকে (Pole star)। এটি উত্তরাকাশের একটি মাঝারি ঔজ্জ্বল্যের তারা, যেটি রয়েছে প্রায় পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষের উপর। ধ্রুবতারাকে তাই একেবারে নিশ্চয় বলে মনে হয়। এর অবস্থান থেকেই আমরা ভৌগোলিক উত্তর দিক পাই। এইজন্যই প্রাচীনকালে নাবিকদের রাত্রিতে পথ দেখাতেও ধ্রুবতারা সাহায্য করত।

পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমার সঙ্গে বিভিন্ন তারামণ্ডল বছরের বিভিন্ন সময়ে দৃশ্য হয়, অদৃশ্য হয়, আবার পুনরায় দৃশ্য হয়। এজন্যই বিভিন্ন ঋতুতে দেখা যায় বিভিন্ন তারামণ্ডল। তারামণ্ডলগুলির পশ্চাদপটে গ্রহগুলির গতি লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন বছরের বিশেষ সময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ তারামণ্ডলে প্রবেশ করেছে বা তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ ও তারকার গতিবিধি মনুষ্যজীবনের ঘটনাবলী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করা হয়েছে। একাদশ এককে আমরা এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করব।

অনুশীলনী—৬

(ক) ৯.৭ (খ) চিত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে খুঁজে বার করুন।

(খ) ৯.৭ (খ) চিত্রে এ ও বি চিহ্নিত তারা দুটির মধ্যে কোন্‌টি ধ্রুবতারা?

রাত্রির নির্মেঘ আকাশে আপনি নিশ্চয়ই আকাশের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত একটি দ্যুতিময় সাদা পটি দেখে থাকবেন। এটিই হল ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা। ৯.২.২ অংশে পড়েছেন যে গ্যালিলিও এটির মধ্যেই অনেক তারা দেখতে পেয়েছিলেন। এটি আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী অর্থাৎ ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর অংশ। একটি নক্ষত্রমণ্ডলীর অর্থ গ্যাস, ধূলি ও শত শত কোটি তারার একটা বিশাল সমাবেশ। আকাশে এরকম লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে। সৌরজগৎ এবং যত তারা আমরা আকাশে দেখতে পাই তারা সবাই ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত। এখন এই ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যাক।

৯.৩.৪ ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী

আকাশের উপর বিছানো সাদা পটিটি আসলে ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি আংশিক দৃশ্যমাত্র। এই নক্ষত্রমণ্ডলীর ভিতরে থাকার ফলে আমরাই এটিকে আংশিকভাবেই দেখতে পাই। অন্য নক্ষত্রমণ্ডলীর যেমন সমগ্রটি দেখতে পাই, এটি কিন্তু তেমন দেখতে পাই না। সমগ্র ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর রূপ কল্পনা করা বা এটির আকৃতি নিরূপণ করা সহজ হয়নি। আধুনিক টেলিস্কোপে যতদূর দেখা যায়, সেরকম কয়েক ডজন দৃশ্যে চতুর্দিকে ছড়ানো এক বিরাট সংখ্যক নক্ষত্রমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা বাইরে থেকে দেখলে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীকে কেমন দেখাবে তার একটা ধারণা তৈরি করতে পেরেছেন। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর তারাগুলির দূরত্ব ও গতি সম্বন্ধে যেসব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেগুলি এই কাজে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে। ৯.৮ চিত্রে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর যে চিত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গঠন করেছেন সেটি দেখানো হয়েছে। এটি কেন্দ্রের কাছে ফুলে যাওয়া চাকা বা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো, তাই না? ছায়াপথে প্রায় দশ হাজার কোটি তারা আছে। তারাগুলি সমভাবে বিন্যস্ত নেই। একটি খুব সহজ কাজের মধ্যে দিয়ে আপনি এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

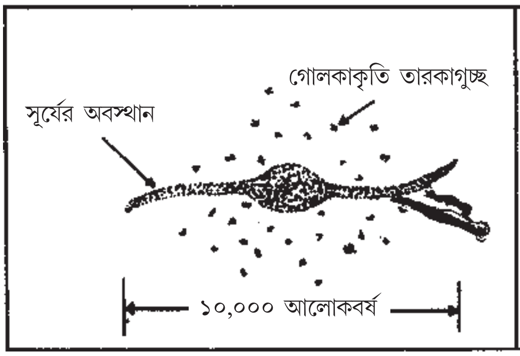

(ক)

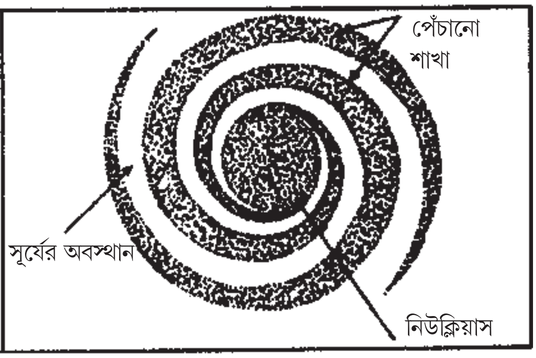

(খ)

চিত্র ৯.৮ : ছায়াপথ ক্ষেত্রমণ্ডলী (ক) পাশ থেকে দৃশ্য (খ) সামনের দৃশ্য

করে দেখুন : কার্ডবোর্ডের একটি টুকরোর মাঝখান থেকে ৫ সে.মি. বর্গ মাপের একটি অংশ কেটে বাদ দিন। এবার কার্ডবোর্ডের এই ফ্রেমটি ধরে হাত বাড়িয়ে ফ্রেমের মধ্যে কটি তারা দেখতে পাচ্ছেন তা গুনুন। আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এর পুনরাবৃত্তি করুন। আকাশের কোন অঞ্চলে কটি তারা গোনা হল তা লিখে রাখুন। এগুলি কী সমান?

আপনি দেখতে পাবেন যে আকাশে তারারা সমানভাবে বিন্যস্ত নেই। আকাশের কোনো কোনো অংশে তারাদের ঘনত্ব কিছুটা বেশি। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রের কাছাকাছি, ধনুরাশির তারামণ্ডলে তারাগুলির ঘনত্ব খুবই বেশি। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে একেবারে ধারের দিকে রয়েছে। মনে রাখুন যে যখন আপনি ছায়াপথের ধনুরাশির কাছাকাছি অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করেন তখন আসলে আপনি নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করছেন। আর যখন আপনি কালপুরুষের দিকে তাকান তখন আপনি সূর্যের নিকটবর্তী প্রান্তের দিকে দেখছেন। ৯.৮ চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী চক্রাকৃতি। আমরা যদি উপর থেকে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতে পেতাম তো এটির সামনের রূপ (চিত্র ৯.৮খ) দেখতাম। আর যদি পাশ থেকে দেখতে পেতাম তো দেখা যেত এর ধারের রূপ (চিত্র ৯.৮ক)।

এক পাশ থেকে দেখলে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর দুটি প্রধান অংশ দেখা যায়। এগুলি হল চক্র ও জ্যোতির্মণ্ডল। চক্রটির মধ্যে তারকা ছাড়াও আছে গ্যাস ও ধূলির মেঘ, যাকে আমরা বলি নীহারিকা। এর ব্যাস ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ এবং বেধ ৫০০০ আলোকবর্ষ। গ্যাস ও তারকার এই বিশাল সমাবেশ নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে। এর বিভিন্ন অংশের ঘূর্ণনের গতিও বিভিন্ন। কেন্দ্র থেকে ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে এই যে সৌরজগৎ, এটিও একইভাবে ঘুরছে। প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ কিমি গতিতে সৌরজগৎ প্রায় ২০ কোটি বছরে নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেমন সূর্যের মতো স্বতন্ত্র তারা রয়েছে, তেমনি চক্রের মধ্যে একসঙ্গে চলে এমন তারার দলও রয়েছে, যাদের আমরা বলি নক্ষত্রমণ্ডলীর তারকাগুচ্ছ (Galactic clusters)। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চক্রের মধ্যে এ ধরনের প্রায় ১০০০ নক্ষত্রমণ্ডলীয় তারকাগুচ্ছ চিহ্নিত করেছেন, যাদের প্রতিটির মধ্যে আছে ১০ থেকে ১০০০টি তারা।

নক্ষত্রমণ্ডলীর চক্রের মধ্যে দুটি প্যাঁচানো শাখা আছে। এগুলি প্রস্থে প্রায় ২৫০০ আলোকবর্ষের মতো। পাশাপাশি দুই শাখার মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১৫০০ আলোকবর্ষ। এই প্যাঁচানো শাখাগুলির মধ্যেই সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা আর গ্যাসের মেঘ জন্ম নেয়, তাই এগুলিকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। শাখাগুলির ভিতরের দিকের বলয়ে থাকে গ্যাস ও ধূলির দ্যুতিহীন মেঘ। চক্রের অন্য তারাগুলি অবশ্য কোনো বিশেষ নকশায় সাজানো নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সূর্যই রয়েছে দুটি শাখার মাঝামাঝি জায়গায় (চিত্র ৯.৮খ দেখুন)।

জ্যোতির্মণ্ডলটি বর্তুলাকার আর তার কেন্দ্রটি রয়েছে নক্ষত্রমণ্ডলীর নিউক্লিয়াসে। জ্যোতির্মণ্ডলের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তারকার এক বিরাট সমাবেশ ঘটায় নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি জায়গাটি কিছুটা স্ফীত। জ্যোতির্মণ্ডলের অন্যত্র আছে সামান্য কিছু গ্যাস, পরস্পর থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন কিছু তারা এবং প্রায় ১২০টি গোলকাকৃতি

তারকাগুচ্ছ (Galactic clusters)। প্রত্যেক গোলকাকৃতি তারকাগুচ্ছে একটা গোলকের আকৃতির আয়তনের মধ্যে দশ হাজার থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ তারা সুসংবদ্ধভাবে থাকে। দেখা গেছে যে, আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর গোলকাকৃতি অংশ অর্থাৎ জ্যোতির্মণ্ডল, চক্রটির সঙ্গে আবর্তিত হয় না।

গোলকাকৃতি তারকাগুচ্ছগুলির বিন্যাস লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে পারি যে সূর্য নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে থাকতে পারে না। কেননা সেক্ষেত্রে গোলকাকৃতি তারকাগুচ্ছগুলি সূর্যের চারিদিকে সমানভাবে বিন্যস্ত থাকত। যেহেতু তা নয়, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে সূর্য ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে নেই। এই তারকাগুচ্ছগুলির বিন্যাসের কেন্দ্র আসলে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রেই অবস্থিত।

অনুশীলনী—৭

(ক) ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধে নীচের উক্তিগুলির মধ্যে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

১. নক্ষত্রমণ্ডলী .... নিয়ে গঠিত। মহাবিশ্বের .... নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ছায়াপথ অন্যতম।

২. .... থেকে দেখলে আমরা নক্ষত্রমণ্ডলীর সামনের দৃশ্য দেখতে পাই। পাশ থেকে দেখলে আমরা দেখি ....।

৩. পাশ থেকে দেখলে নক্ষত্রমণ্ডলীর দুটি অংশ আছে বলে মনে হয়। যেগুলি হল .... ও ....।

৪. চক্রটি গ্যাস ও ধূলির মেঘ, স্বতন্ত্র এক-একটি তারা এবং .... দিয়ে তৈরি, যেগুলি নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রের চারিদিকে পরিক্রমা করে। চক্রের মধ্যে প্যাঁচানো অবস্থায় দুটি .... আছে। সূর্য প্যাঁচানো শাখা দুটির .... অবস্থিত।

৫. জ্যোতির্মণ্ডলের আকৃতি .... এর মতো। এর কেন্দ্রে আছে .... এক বিরাট সমাবেশ। অন্যত্র এটি .... ও .... দিয়ে তৈরি।

৬. একটি .... প্রায় ১০ থেকে ১০০০টি তারা থাকে। একটি .... তারকাগুচ্ছ ১০,০০০ থেকে লক্ষ লক্ষ তারার সমষ্টি।

৭. গোলকাকৃতি তারকাপুঞ্জগুলিকে দেখা যায় .... এবং নক্ষত্রমণ্ডলীয় তারকাপুঞ্জগুলি দেখা যায় নক্ষত্রমণ্ডলীয় .... মধ্যে।

(খ) ১ সে.মি. = ১০,০০০ আলোকবর্ষ, এই স্কেলে ছায়াপথের পাশের দৃশ্য অঙ্কন করুন। এই স্কেলে চক্রের ব্যাস হবে ১০ সে.মি.। চিত্রে চক্র, নিউক্লিয়াস ও সূর্যের অবস্থান দেখান।

৯.৩.৫ ছায়াপথের বাইরে

পৃথিবী ছেড়ে এবার দূরের মহাশূন্যে বেরিয়ে পড়া যাক্। সুদূর মহাশূন্যে পৌঁছিয়ে আমরা মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত অজস্র ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পাব। এগুলি আসলে এক-একটি নক্ষত্রমণ্ডলী। ৯.৩.৩ অংশে আমরা দেখেছি

যে নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির কোটি কোটি তারা, গ্যাস ও ধূলি মেঘে তৈরি। মহাবিশ্ব নক্ষত্রমণ্ডলীতে পূর্ণ। এর কতকগুলি মহাশূন্যের একাকী যাত্রী। কিন্তু বেশিরভাগই দলবদ্ধভাবে বিশাল মহাজাগতিক অন্ধকারে অসীমকাল ধরে ভেসে চলে।

নক্ষত্রমণ্ডলীর আকৃতি

সচরাচর তিনটি আকৃতির নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতে পাওয়া যায় : প্যাঁচানো, উপবৃত্তাকার ও অনিয়মিত (চিত্র ৯.৯ দেখুন)। সম্প্রতি এর কিছু পরিমার্জনা করা হয়েছে। কিন্তু সেসব সূক্ষ্ম আলোচনায় আমরা যাব না। উপবৃত্তাকার নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণের কারণ এই যে আলোকচিত্রে তাদের উপবৃত্তাকার আকৃতি দেখা যায়। এগুলি পুরাতন তারকার সমষ্টি এবং এগুলির মধ্যে সাধারণত নতুন তারা গঠন করার মতো গ্যাস বা ধূলিকণা থাকে না। আর অনিয়মিত নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যা মোট সংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ।

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

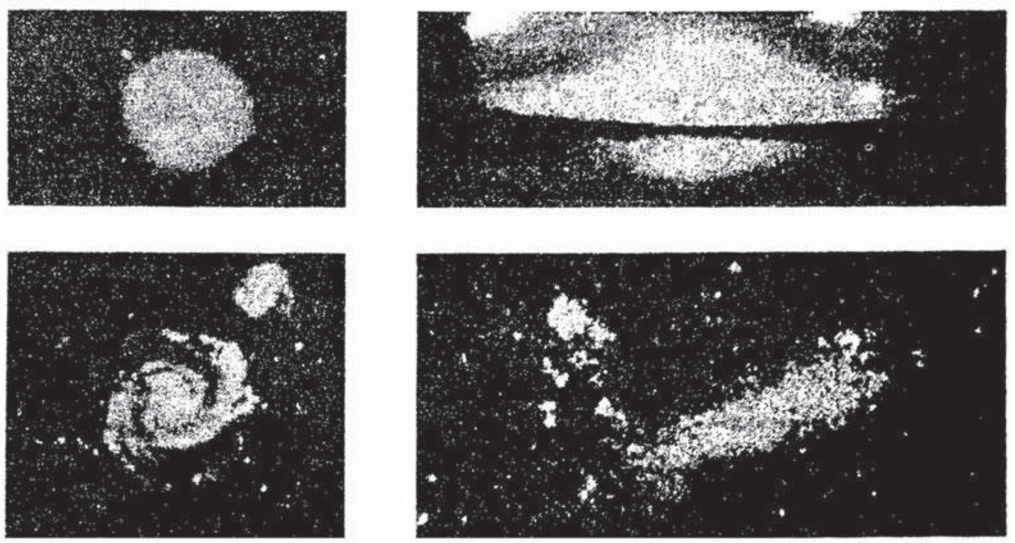

চিত্র ৯.৯ : বিভিন্ন আকৃতির নক্ষত্রমণ্ডলী; (ক) কন্যারাশির গুচ্ছের কেন্দ্রে M87 নক্ষত্রমণ্ডলী। আমাদের জানা সবচেয়ে ভারী এই নক্ষত্রমণ্ডলীর ভর সূর্যের ভরের ৩০,০০০ কোটি গুণ; (খ) প্যাঁচানো সমব্রেরো নক্ষত্রমণ্ডলীর পাশ থেকে দৃশ্য; (গ) সামনের থেকে প্যাঁচানো নক্ষত্রমণ্ডলীর দৃশ্য; (ঘ) বৃহৎ ম্যাগেলনীয় মেঘ—অনিয়মিত নক্ষত্রমণ্ডলী।

মহাশূন্যের বেশি গভীরে যাওয়ার আগে পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী যাকে 'নক্ষত্রমণ্ডলীর স্থানীয় দল' বলেন, সেটিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করা যাক। এটি প্রায় কুড়িটি নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে গঠিত, মাপে দশ লক্ষ আলোকবর্ষেরও বেশ কয়েক গুণ।

ছায়াপথের নিকটতম নক্ষত্রমণ্ডলী হল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ম্যাগেলানীয় মেঘ, দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে যেগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি অনিয়মিত আকৃতির। প্রায় ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে আছে অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলী,

যেটি খালি চোখেও দেখতে পাওয়া যায়। এটি আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর চেয়ে তিনগুণ বড় ও উজ্জ্বল আর একটি প্যাঁচানো নক্ষত্রমণ্ডলী।

মহাশূন্যের মধ্যে যতই আমরা দূরে যাব ততই লক্ষ্য করব যে নক্ষত্রমণ্ডলীর এইরকম দলবদ্ধ হওয়া, অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলী-গুচ্ছ গঠন করা খুবই সাধারণ। মহাবিশ্বে কয়েক অযুত কোটি ($১০^{১১}$) নক্ষত্রমণ্ডলী আছে যেগুলি নানারকম গুচ্ছ গঠন করে। কিছু সমৃদ্ধগুচ্ছে যেমন দশ হাজার নক্ষত্রমণ্ডলী আছে, তেমনি কয়েকটি মাত্র নক্ষত্রমণ্ডলী দিয়ে গড়া ক্ষুদ্রগুচ্ছও আছে। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলটি হল ক্ষুদ্রগুচ্ছগুলির একটি। সবচেয়ে নিকটের সমৃদ্ধগুচ্ছ হল কন্যারাশিতে প্রায় সাত কোটি আলোকবর্ষ দূরে। এটি আকৃতিতে অনিয়মিত কিন্তু আকারে বিশাল, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ৭০ লক্ষ আলোকবর্ষ বিস্তৃত। নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো তাদের গুচ্ছগুলিরও আকৃতি প্যাঁচানো, উপবৃত্তাকার বা অনিয়মিত হতে পারে।

সম্প্রতিকালে মহাবিশ্বের গঠন প্রণালীর উপলব্ধিতে একটি ধাপ যোগ হয়েছে। এমন কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে, যাতে মনে হয় যে নক্ষত্রমণ্ডলীর সমৃদ্ধ ও ক্ষুদ্র গুচ্ছগুলি মহাগুচ্ছ বা মহামণ্ডলী অর্থাৎ গুচ্ছের গুচ্ছ গঠন করে যাদের ব্যাস ২০-৩০ কোটি আলোকবর্ষ। এর একটিতে ১০০টি গুচ্ছও থাকতে পারে। স্থানীয় গুচ্ছ ও কন্যারাশির গুচ্ছ একই মহাগুচ্ছের অন্তর্গত। মহাগুচ্ছগুলি প্রায় সবই একই রকমের। এগুলি মহাশূন্যে কিছুটা সমানভাবেই ছড়িয়ে আছে। সুতরাং এর চেয়ে বড় মাত্রায় দেখলে মহাবিশ্বকে সর্বত্র একইরকম দেখায়। অর্থাৎ সর্বত্রই এর গঠন ও উপাদান একই থাকে এবং সব দিকেই মহাবিশ্বকে একইরকম দেখায়।

আমরা মহাবিশ্বের যে গঠনের বর্ণনা করেছি তা স্থিতিশীল নয়। এর পরিবর্তন ঘটেই চলেছে। নতুন তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম হচ্ছে। তারকা, নক্ষত্রমণ্ডলী ও তাদের গুচ্ছগুলি স্থান পরিবর্তন করছে। কখনও তাদের সংঘর্ষে নতুন নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্ত তারকা, নক্ষত্রমণ্ডলী, গুচ্ছ ও মহাগুচ্ছগুলি যথাসম্ভব বড় মাত্রার প্রাচীন ঘটনাবলীর কাহিনী আমাদের সামনে ধরে রেখেছে। আমরা এই সবে যে কাহিনী পড়তে শুরু করেছি।

অনুশীলনী—৮

(ক) ধরে নিন মহাবিশ্ব এক বস্তুতন্ত্র এবং আমাদের গ্রহ তার ক্ষুদ্রতম উপাংশ। এবারে নীচের বস্তুগুলিকে এমনভাবে সাজান যাতে প্রতিটি বস্তু তার আগেরটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর তালিকা দিন।

(১) পৃথিবী (২) ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী (৩) মহাগুচ্ছ (৪) সৌরজগৎ (৫) গুচ্ছ/স্থানীয় নক্ষত্রমণ্ডলীর গুচ্ছ।

(খ) নীচে দেওয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর চিত্রে প্রতিটির আকৃতি নির্ধারণ করুন।

(i) (ii) (iii)

মহাকাশযাত্রা শেষ করার আগে তারকা আর নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানের শূন্যে কী আছে সেটা দেখে নেওয়া যাক।

আন্তর্নক্ষত্র ও আন্তর্মণ্ডলী শূন্যস্থান

তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝের শূন্যস্থান একেবারেই শূন্য বলে মনে হয় তাই না? কিন্তু এটি সত্য নয়। নক্ষত্রমণ্ডলীর তারকাদের মধ্যে এবং একটি গুচ্ছের নক্ষত্রমণ্ডলীদের মধ্যে বিশাল অন্ধকারে আছে গ্যাস ও ধূলির মেঘ। গ্যাসের মেঘ প্রধানত হাইড্রোজেন পরমাণুর তৈরি যা খালি চোখে দেখাও যায় না। একমাত্র আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিই এগুলি অবস্থা ধরতে পারে। মহাজাগতিক ধূলি আরও বড় কণা দিয়ে তৈরি। এই ধূলির মেঘ তারার যে আলো প্রতিফলিত করে তা থেকেই তাদের অবস্থান জানতে পারা যায় (চিত্র ৯.১০)। দেখা যায় যে মহাজাগতিক ধূলি ও গ্যাসের মেঘ তারকার জন্মদানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। দশম এককে আপনি এ সম্বন্ধে পড়বেন।

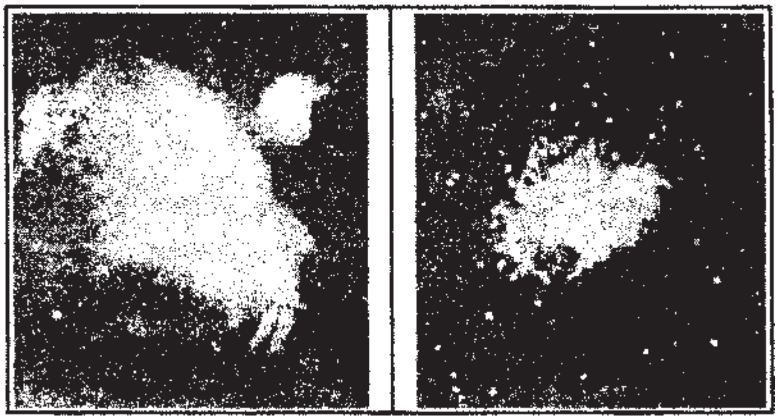

চিত্র ৯.১০ : (ক) কালপুরুষের নীহারিকা (খ) কর্কট নীহারিকা-১০৫৪ সালের একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ

মহাজাগতিক ধূলি ও গ্যাসের মেঘের মধ্যে আমরা জল, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের সাধারণ অণুর অতি সামান্য পরিমাণের সন্ধান পাই। মিথেন, মিথানল (যাকে আমরা উডস্পিরিটও বলি) ফর্মিক অ্যাসিড (যার ফলে পিঁপড়া বা মৌমাছি কামড়ালে জ্বালা করে) এবং আরও অনেক জৈব অণুও দেখতে পাওয়া যায়। জৈব অণুই হল সেই উপাদান যার থেকে পৃথিবীতে প্রাণ বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব হয়েছে। আন্তর্নক্ষত্র মহাশূন্যে এসব জৈব অণুর প্রাচুর্য থেকে মনে হয়, বোধহয় সেখানে

কোথাও প্রাণও রয়েছে, হয়তো আমাদের থেকে বিভিন্ন কোনো রূপে। হয়তো প্রাণী বলতে পৃথিবীর আমরাই একা নই।

মহাবিশ্বের আর এক বড় উপাদান হল কসমিক রশ্মি। কসমিক রশ্মি হল ইলেকট্রন, প্রোটন, হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস প্রভৃতি আহিত কণার ধারাবর্ষণ। মহাশূন্যের মধ্যে এগুলি প্রায় আলোর গতিতে ধেয়ে চলে। এই কণাগুলি মহাকাশের মধ্য দিয়ে প্রচুর শক্তিও বহন করে নিয়ে যায়।

মহাবিশ্বের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষ করে এবার দেখা যাক আমরা কী কী আবিষ্কার করলাম। মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু নক্ষত্রমণ্ডলীর বিশাল বিশাল মহাগুচ্ছে কেন্দ্রীভূত। এগুলি আকারে ১০ থেকে ২০ কোটি আলোকবর্ষ এবং প্রত্যেকটির মধ্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রমণ্ডলী আছে। নক্ষত্রমণ্ডলীগুলি সমৃদ্ধ ও ক্ষুদ্র গুচ্ছে দলবদ্ধ, তাদের আকৃতি বিভিন্ন এবং তারা নানাভাবে বিন্যস্ত। নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে আছে তারা, গ্যাস ও ধূলির মেঘ। তারাগুলি এক-একটি গুচ্ছে দলবদ্ধ থাকতে পারে অথবা সূর্যের মতো স্বতন্ত্র তারা হতে পারে, যার সৌরজগতের মতো একটি গ্রহ পরিবারও বিদ্যমান। আমাদের গ্রহ পৃথিবী সূর্যের গ্রহ পরিবারেরই একজন সদস্য।

মহাবিশ্বের বৈচিত্র্য আর বিশালত্ব কী চমক জাগায় না? আমাদের এই ছোট্ট গ্রহের বাসাটুকু মহাশূন্যের বিপুলতা আর সময়ের সীমাহীনতার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। একথা ভাবতে নিজেদের খুবই সামান্য মনে হয়। তবু আমাদের মানবজাতি তরুণ, কৌতূহলী ও সাহসী। দেশ ও কালের বিশালত্বের মধ্যে বিহ্বলতায় নিজেদের হারানোর কোনো কারণ নেই।

কার্ল সাগার (Carl Sagan) পুস্তক 'কস্‌মস্‌' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই এককটির ইতি টানব।

"যা কিছু আছে, যা কিছু ছিল আর যা কিছু থাকবে, সব নিয়েই এই মহাজগৎ...... গত কয়েক বছরে আমরা মহাজগৎ ও তার মধ্যে আমাদের স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে চমকপ্রদ ও অপ্রত্যাশিত সব আবিষ্কার করেছি। সেসব আবিষ্কারের কথা ভাবলে উল্লসিত হতে হয়। সেগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে চিন্তা করার জন্যই মানুষের উদ্ভব, উপলব্ধির মধ্যেই আছে আনন্দ এবং বাঁচার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য। আমার মনে হয়, যে মহাজগতে আমরা প্রভাতের আকাশে সামান্য ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়াই। তাকে আমরা কত ভালো করে জানি তার উপরই নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ।"

৯.৪ সারাংশ

এই এককে আমরা বস্তুতন্ত্র হিসাবে মহাবিশ্বের একটি চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে সে চিত্রটি এখন কেমন এবং মানুষ যতদিন থেকে আকাশের জ্যোতিষ্কদের লক্ষ্য করেছে এবং সেগুলি কী সে বিষয়ে চিন্তা করছে, ততদিনে এ চিত্রটি কীভাবে বদলেছে সেটিরও আলোচনা করেছি। এখন আমরা যা কিছু জানলাম তার সারসংক্ষেপ করা যাক।

- আমাদের প্রাগৈতিহাসিক ও ব্রোঞ্জযুগের পূর্বপুরুষদের কাছে পৃথিবী ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্র। অন্ধকার আকাশ তাদের কাছে ছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়ন্ত্রণে এক রহস্যজনক অঞ্চল।

- গ্রীক দার্শনিকেরা মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকগুলি মডেল খাড়া করেছিলেন। এগুলি পরে মহাবিশ্বের টমেলীয় ভূকেন্দ্রিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।
- গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তীকালের টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে কেপলার কর্তৃক সূত্রবন্ধ গ্রহদের গতিবিধির তিনটি নিয়ম মহাবিশ্বের বৈপ্লবিক সৌরকেন্দ্রিক মডেলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।
- সূর্য ছায়াপথের লক্ষ লক্ষ তারার একটি এবং ছায়াপথের কেন্দ্র থেকেও সেটি অনেক দূরে, এই আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত সৌরকেন্দ্রিক মতবাদকেও বাতিল করল।
- এখন আমরা মহাবিশ্বের সার্বিক গঠন সম্বন্ধে একটি ধারণা করতে পেরেছি। গ্রহ, তারা, নক্ষত্রমণ্ডলী, গুচ্ছ ও মহাগুচ্ছগুলি নিয়ে গতিশীল মহাবিশ্ব সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে।

৯.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. মহাবিশ্বের টলেমীয় মডেলের চেয়ে উৎকৃষ্টতর মডেলের সন্ধান করার কী প্রয়োজন ছিল। নীচের জায়গায় উত্তর লিখুন।

২. গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ কীভাবে টলেমীয় মডেলের প্রত্যাখ্যান ঘটাল তা চার-পাঁচ লাইনে ব্যাখ্যা করুন।

৩. যেসব আধুনিক পর্যবেক্ষণের ফলে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং বিপুল, কেন্দ্রহীন ও সীমাহীন মহাবিশ্ব সম্বন্ধে সমসাময়িক ধারণার উদ্ভব ঘটেছে সেগুলি ক্রমান্বয়ে লিখুন।

৪. মহাবিশ্ব সম্বন্ধে নীচের উক্তিগুলি সত্য না মিথ্যা তা চিহ্ন দিয়ে দেখান।

(ক) ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। ☐

(খ) মহাগুচ্ছগুলির চেয়েও বড় দূরত্ব নিয়ে দেখলে মহাবিশ্ব সর্বত্রই একই রকম বলে মনে হয়। ☐

(গ) তারা ও নক্ষত্রমন্ডলীদের মাঝের স্থানগুলি একেবারেই ফাঁকা। ☐

(ঘ) আমরা মহাবিশ্বের প্রান্ত দেখতে পাই। ☐

(ঙ) আন্তর্নক্ষত্র শূন্য গ্যাসের মেঘ, গুলি ও কসমিক রশ্মিতে পূর্ণ। এই অঞ্চলের বস্তুর মধ্যে জৈব অণুও দেখতে পাওয়া গেছে। ☐

(চ) মহাবিশ্ব বিশাল, আকারে শত শত কোটি আলোকবর্ষ। এটি খুবই প্রাচীন, বয়সে প্রায় ১৫০০ থেকে ২০০০ কোটি বছর। ☐

৫. নীচের ১ শ্রেণীর প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে ২ শ্রেণীতে দেওয়া বর্ণনা মিলিয়ে নিন। যে বস্তু ও বর্ণনা মেলে, সে দুটিকে তীর চিহ্ন দিয়ে যোগ করুন।

(১)	(২)
(ক) পৃথিবী	১. কয়েকটি থেকে শুরু করে কয়েক সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলীর গুচ্ছ।
(খ) সূর্য	২. একটি নকশায় সাজানো কয়েকটি তারা, যেগুলি আকাশের একটি অঞ্চলকে চিহ্ন করে।
(গ) তারামণ্ডল	৩. সূর্যপরিক্রমারত একটি ক্ষুদ্র গ্রহ।
(ঘ) ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী	৪. দশ কোটি আলোকবর্ষেরও কয়েক গুণ বিস্তৃত, কতকগুলি গুচ্ছে সমাবেশ।
(ঙ) গুচ্ছ	৫. ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত একটি তারকা।
(চ) মহাগুচ্ছ	৬. বহু শতকোটি তারকা, ধূলি ও গ্যাসের একটি নক্ষত্রমণ্ডলী।

৯.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

(ক) ঋতু পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী, দিনপঞ্জী তৈরি, শিকার করা, গোষ্ঠীকে একত্র করা, শস্যবপন করা, ফসল কাটা প্রভৃতি।

(খ) দিগন্তের আড়ালে জাহাজের ডুবে যাওয়া, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া।

অনুশীলনী—২

(ক) × (খ) × (গ) ✓ (ঘ) ✓

অনুশীলনী—৩

(ক) গ্যালিলিওর বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের পর্যবেক্ষণের ফল

(i) × (ii) ✓ (iii) × (iv) ✓

অনুশীলনী—৪

(ক) উপবৃত্তাকার

(খ) দ্বিতীয় সূত্র : গ্রহরা যখন সূর্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকে তখন দ্রুত চলে, আর যখন সূর্য থেকে দূরে থাকে তখন ধীরগতিতে চলে।

তৃতীয় সূত্র : কোনো গ্রহ সূর্য থেকে যত দূরে থাকে, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার তত বেশি সময় লাগে।

(গ) তারকার লম্বন, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ছয় মাসের ব্যবধানে দেখলে নিকটের তারাগুলির দূরের তারা পশ্চাদপটে আপাতসরণ।

অনুশীলনী—৫

(ক) ৫ (খ) ৭ (গ) ১ (ঘ) ৩ (ঙ) ৬ (চ) ২ (ছ) ৪

অনুশীলনী—৬

(ক)

সপ্তর্ষিমণ্ডল

(খ) A তারাটি ধ্রুবতারা।

অনুশীলনী—৭

(ক) ১. তারকা, গ্যাস ও ধূলির মেঘ, লক্ষ লক্ষ

২. উপর, ধারের দৃশ্য

৩. চক্র, জ্যোতির্মণ্ডল

৪. তারকার গুচ্ছ, শাখা, মাঝখানে

৫. গোলক, তারকার, অল্প পরিমাণ গ্যাস, কিছুসংখ্যক তারা ও গোলকাকৃতি তারকাগুচ্ছ

৬. নক্ষত্রমণ্ডলীয় তারকাগুচ্ছ, গোলকাকৃতি

৭. জ্যোতির্মণ্ডল, চক্রের

(খ)

১০ সেমি

অনুশীলনী—৮

(ক)

১.	পৃথিবী	সমস্ত প্রাণী, স্থল, সমুদ্র, অরণ্য প্রভৃতি।
২.	সৌরজগৎ	সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতু।
৩.	ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী	তারকা, গ্যাস ও ধূলির মেঘ।
৪.	গুচ্ছ	নক্ষত্রমণ্ডলী
৫.	মহাগুচ্ছ	নক্ষত্রমণ্ডলীর গুচ্ছ

(খ) ১. অনিয়মিত ২. উপবৃত্তাকার ৩. প্যাঁচানো

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. গ্রহদের গতিবিধির পর্যবেক্ষণ যখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হল, টলেমীয় মডেলের সাহায্যে তাদের ব্যাখ্যা করা গেল না।

২. বৃহস্পতির পরিক্রমারত উপগ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করে কোপারনিকাসের মডেলেরই একটি ছোট সংস্করণ দেখতে পাওয়া গেল। দ্বিতীয়ত টলেমীয় মতবাদ দিয়ে শুক্রের কলার ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হল, কেননা শুক্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, এটাই ছিল তার একমাত্র ব্যাখ্যা (চিত্র ৯.৩ দেখুন)।

৩. (i) সূর্য ছাড়াও আরও অনেক তারা আছে যেগুলি সৌরজগতের পশ্চাদপট নয়। তারা বিপুল মহাশূন্যে অনেক দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

(ii) সৌরজগৎ ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর অংশ। এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে রয়েছে বিশাল সংখ্যক তারা, গ্যাস ও ধূলির মেঘ।

(iii) সূর্য ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রে নেই।

(iv) আমাদের নিকটেই ছায়াপথের মতো অন্য নক্ষত্রমণ্ডলী আছে। যেমন অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলী।

(v) বিশাল মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ছায়াপথ একটি। অন্যগুলির চেয়ে এটি কিছু বেশি বড় নয়।

(vi) অনেকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলী একত্র হয়ে একটি গুচ্ছ গঠন করে। গুচ্ছগুলি আবার দৈত্যাকার মহাগুচ্ছের অংশ। মহাবিশ্বের কোনো সীমা নেই, কেন্দ্রও নেই।

৪। (ক) × (খ) ✓ (গ) × (ঘ) × (ঙ) ✓ (চ) ✓

৫। (ক) ৩ (খ) ৫ (গ) ২ (ঘ) ৬ (ঙ) ১ (চ) ৪

একক ১০ □ মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন

গঠন

১০.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১০.২ মহাবিশ্বের খোঁজখবর

দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিকিরণ

তারার আলোর সন্ধানে

তারার সুরে সুর মিলিয়ে

মহাকাশের দূত

মহাশূন্যে অনুসন্ধান

১০.৩ মহাবিশ্বের পরিচয়

তারাদের কথা

তারার জীবনবৃত্তান্ত

প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

সৃষ্টিমুহূর্তের কাছাকাছি

১০.৪ সারাংশ

১০.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১০.৬ উত্তরমালা

১০.১ প্রস্তাবনা

নবম এককে মহাবিশ্ব কী দিয়ে গড়া পাঠক তার কিছু আভাস পেয়েছেন। মহাবিশ্বের একটা নির্দিষ্ট গঠন আছে। অনেকটা দূরত্বকে একসঙ্গে করে দেখলে, মহাবিশ্ব অনেকগুলি মহাগুচ্ছের (supercluster) সমষ্টি। মহাগুচ্ছগুলি প্রতিটি আবার অনেকগুলি বৃহৎ গুচ্ছ (cluster) নিয়ে গঠিত। একটি গুচ্ছে মাত্র কয়েকটি থেকে আরম্ভ করে কয়েক সহস্র তারকামণ্ডলী থাকতে পারে। প্রতিটি তারকামণ্ডলী অনেকগুলি তারকা, গ্যাস ও ধূলির মেঘ দিয়ে তৈরি। আমাদের সূর্য আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ (Milky way) তারকামণ্ডলীর প্রায় সহস্র

কোটি তারকার মধ্যে একটি সাধারণ তারকা। একে কেন্দ্র করে ঘুরছে নয়টি গ্রহ, পৃথিবী যাদের অন্যতম। এই সব পড়তে পড়তে আপনার কী মনে হয়নি, আমরা কেমন করে মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করলাম? খালি চোখে আমরা তো আকাশে ছড়িয়ে থাকা মাত্র কয়েক সহস্র তারকাই দেখতে পাই।

এই এককে আমরা এই বিষয়ে আপনার কৌতূহল নিরসনের চেষ্টা করব। মহাবিশ্ব সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহে যে সমস্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমাদের সাহায্য করেছে, এখানে আমরা সেগুলি বর্ণনা করব। অবশ্য এই সব তথ্যই অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি না সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে মহাবিশ্বের সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যায়। সারা পৃথিবীতে বহু সহস্র বিজ্ঞানী ঠিক এই কাজটিতেই রত আছেন। এখান ওখান থেকে নানা তথ্য আহরণ করে তাঁরা রহস্যময় মহাবিশ্বের একটি সুসঙ্গত চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। আমরা এই চিত্রটিই যথাসম্ভব সরলভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। মহাবিশ্বের রহস্যের মধ্যে আমরা যত প্রবেশ করব, ততই আমরা এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হব যার সমাধান করা রীতিমতো কঠিন। তা সত্ত্বেও সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে যেটি আমরা বাকি অংশের চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারি। সেই ক্ষুদ্র অংশটি আমাদের সৌরজগৎ। পরের এককে আমরা সৌরজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- মহাবিশ্বের তথ্যানুসন্ধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করতে পারবেন এবং এই পদ্ধতিগুলি কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তারকা সম্পর্কিত বর্তমান ধারণা—তাদের দূরত্ব, ঔজ্জ্বল্য, উষ্ণতা, গতি প্রভৃতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- তারকার বিবর্তনের এক সরল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিবর্তনের চালু মতবাদগুলি সমর্থনকারী সাক্ষ্যপ্রমাণ সমেত বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.২ মহাবিশ্বের খোঁজখবর

"এখন আমার নিজের সন্দেহ এই, যে মহাবিশ্ব যতটা রহস্যময় বলে আমরা মনে করি এটি শুধু তার চেয়ে বেশি রহস্যময়ই না। মহাবিশ্বকে যতটা রহস্যময় বলে ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব এটি তার চেয়েও রহস্যময়।"

আমাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে যা মনে করি, বিখ্যাত বিজ্ঞানী হ্যালডেনের এই মন্তব্য থেকেই তা মোটামুটিভাবে বোঝা যায় মহাবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। মহাবিশ্বকে গবেষণাগারে

এনে তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় না। অন্য কোনো মহাবিশ্বের সঙ্গে এর তুলনা করা যায় না। কেননা দ্বিতীয় কোনো মহাবিশ্ব আমাদের নেই। এবং সবশেষে, যেহেতু আমরা নিজেরা এর অংশ, আমরা শুধু ভিতর থেকে মহাবিশ্বকে নিরীক্ষণ করতে পারি। এর থেকে বেরিয়ে আমরা বাইরে থেকে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না।

তাহলে আমরা কেমন করে মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করব? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই এখানে আমাদের সহায়। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত অনুশীলন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ, কেননা মহাবিশ্বের ওপর আমরা পরীক্ষা চালাতে পারি না। কিন্তু পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা মহাবিশ্ব সম্বন্ধীয় প্রচুর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারি এবং সেগুলিকে আমাদের জানা প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি। বিজ্ঞানীরা এই নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করেই মহাবিশ্ব সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব ও মডেলের প্রবর্তন করেছেন।

তত্ত্ব বা মডেলের মূল ভিত্তি হল পর্যবেক্ষণ। আপনি হয়তো জানতে চাইবেন মহাবিশ্ব সম্বন্ধীয় কোন্ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব? সেগুলি কেমন করেই বা করা যায়? আমরা এবার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেব। আমরা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির অন্তর্নিহিত মূল নীতির বিশদ আলোচনার মধ্যে যাব না। মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার্য পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির বিপুল বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হবে।

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের যতটা জানা আছে তার অধিকাংশই আমরা শিখেছি সূর্য ও অন্য তারকার থেকে আসা আলো, তাপরশ্মি, রেডিও-তরঙ্গ, এক্স, গামা রশ্মি প্রভৃতি বিকিরণের উপর গবেষণার মাধ্যমে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে ও ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে অবস্থিত জ্যোতিষীর মানমন্দিরে স্থাপিত বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এই বিকিরণ ধরতে পারা যায়। গত কয়েক দশকে আমরা আমাদের প্রতিবেশী বিশ্বে সন্ধানী (probe) পাঠাতে সক্ষম হয়েছি। অনেক মানুষও চাঁদে গিয়েছেন ও পরীক্ষার জন্য চাঁদের মাটি-পাথর নিয়ে এসেছেন। বোঝাই যায়, মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ ও সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান। এই পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করার আগে, মহাশূন্য থেকে যে বিকিরণগুলি আমাদের কাছে মহাবিশ্বের গোপন তথ্যের সন্ধান দেয়, সেগুলির কিছু বৃত্তান্ত আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করব।

১০.২.১ দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণ

আলো আমাদের জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আলো ব্যতীত আমাদের দেখার ক্ষমতা থাকে না। আলোই আমাদের জগতে লাগায় রং-এর ছোঁওয়া। আলোকে আমরা দৃশ্য বিকিরণও বলে থাকি। প্রকৃতিতে আরও অনেক বিকিরণ আছে যা আমরা দেখতে পাই না। এগুলিকে আমরা বলি অদৃশ্য বিকিরণ। অবলোহিত ও অতিবেগুনি রশ্মি, রেডিও-তরঙ্গ, এক্স ও গামা রশ্মি অদৃশ্য বিকিরণের উদাহরণ। এই রশ্মি, রেডিও-তরঙ্গ, এক্স ও গামা রশ্মি অদৃশ্য বিকিরণের উদাহরণ। এই রশ্মিগুলির সবই আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত উষ্ম বস্তুই অবলোহিত রশ্মি বিকীর্ণ করে, যার উদাহরণ আমাদের দেহ, ঘর গরম করার হিটার, তপ্ত

দিনের শেষে বাড়িঘর ও ভূপৃষ্ঠ। র‍্যাট্‌ল সাপ অবলোহিত বেশ ভালোই অনুভব করতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মি জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। আমাদের কাছে অদৃশ্য হলেও ভ্রমর এই রশ্মি দেখতে পায়। বেতার ও দূরদর্শন সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে রেডিও-তরঙ্গ বিকীর্ণ হয় এবং অ্যান্টেনার সাহায্যে আমাদের রেডিও বা টেলিভিশন যন্ত্র সেগুলি ধরতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই তরঙ্গ খুবই কাজে লাগে। এক্স রশ্মি চিকিৎসার কাজে লাগে। গামা রশ্মি পারমাণবিক বিস্ফোরণে নির্গত হয়। ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

গামা ও এক্স রশ্মি, অতিবেগুনি, দৃশ্য ও অবলোহিত রশ্মি এবং রেডিও-তরঙ্গ—এই বিকিরণগুলির সবই জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত উপযোগী। এগুলি আসলে একই বিকিরণের বিভিন্ন রূপ—যার নাম তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ। তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ শক্তির এক রূপ। তাপ, শব্দ, ঘড়ির স্প্রিং-এ সঞ্চিত শক্তি প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপের সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই পরিচিত। আমরা তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকে সাধারণত একপ্রকার তরঙ্গ হিসাবে দেখি যা শূন্যে আলোকের গতিতে সঞ্চারিত হয়। আপনার জানা তরঙ্গের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ বোধ হয় দিঘি বা সমুদ্রের জলের ঢেউ অথবা তারের উপরের ঢেউ। আপনি হয়তো বাতাসে ওড়া পর্দার উপরেও একপ্রকার তরঙ্গ দেখে থাকবেন। কারও কারও চুলও ঢেউ-খেলানো হয়। আমরা এখানে তরঙ্গ কী, বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বিশেষত্ব কী, সেসব বিশদ আলোচনায় যাব না। বিস্তারিত আলোচনার জন্য আপনি এই পর্যায়ের শেষে তালিকাভুক্ত পুস্তকগুলি দেখতে পারেন। পূর্বের বর্ণনা থেকে এটি কিন্তু খুবই পরিষ্কার যে বিভিন্ন ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের চরিত্র ঠিক এক নয়। তাহলে তাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

প্রভেদ তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এবং তার ফলে তাদের বাহিত শক্তির পরিমাণে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলতে আমরা কী বুঝি। এটি বুঝতে ১০.১ চিত্র লক্ষ্য করুন। তরঙ্গ চিত্রায়ণে এটিই সাধারণ উপায়। পরপর দুটি তরঙ্গশীর্ষ (crest) বা তরঙ্গদ্রোণীর মধ্যে দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়। এক একক মিটার। OABCD চিহ্নিত বক্ররেখাকে তরঙ্গের এক পর্যায় (cycle) বলা হয়। প্রতি সেকেন্ডে একটি তরঙ্গ যতগুলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে আমরা তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (frequency) বলি। কম্পাঙ্কের একক প্রতি সেকেন্ডে আবর্তসংখ্যা অথবা হার্ৎস (Hertz)। তরঙ্গদৈর্ঘ্য 1 ও কম্পাঙ্ক f-এর গুণফলই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ c।

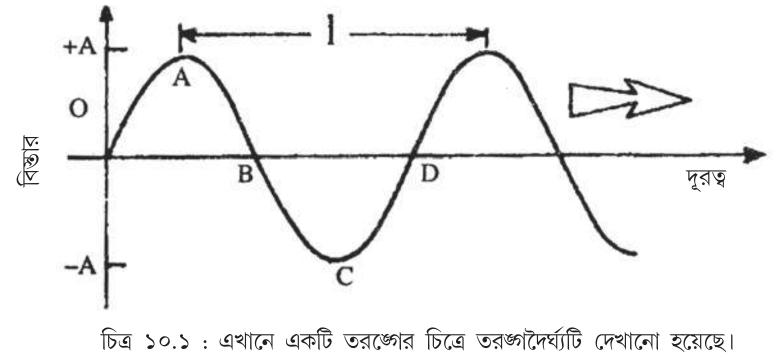

চিত্র ১০.১ : এখানে একটি তরঙ্গের চিত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি দেখানো হয়েছে।

1, f ও c এই তিনটি রাশির যে-কোনো দুইটি জানলেই তৃতীয়টি নির্ণয় করা সম্ভব। তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ অনেক সময় কণিকার মতো আচরণ করে। এই কণিকার নাম ফোটন (photon)। f কম্পাঙ্কের বিকিরণ কণিকা যে শক্তি বহন করে তা হল

$$E = hf = hc/1$$

এখানে h একটি ধ্রুব সংখ্যা, যার নাম প্লাঙ্কের ধ্রুবক। বোঝা যায় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশি বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ তত বেশি শক্তি শূন্যের মধ্য দিয়ে বহন করতে পারে। অতিবেগুনি, এক্স ও গামা রশ্মির কণিকা বিপুল পরিমাণ শক্তি বহন করে। তাই এই সব বিকিরণের ক্রমাগত আপতন খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। সৌভাগ্যবশত এই ক্ষতিকর বিকিরণগুলির অধিকাংশই পৃথিবীর বাতাবরণে শোষিত হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী সমস্ত তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকে বিন্যস্ত করলে তাকে তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী বলা হয়।

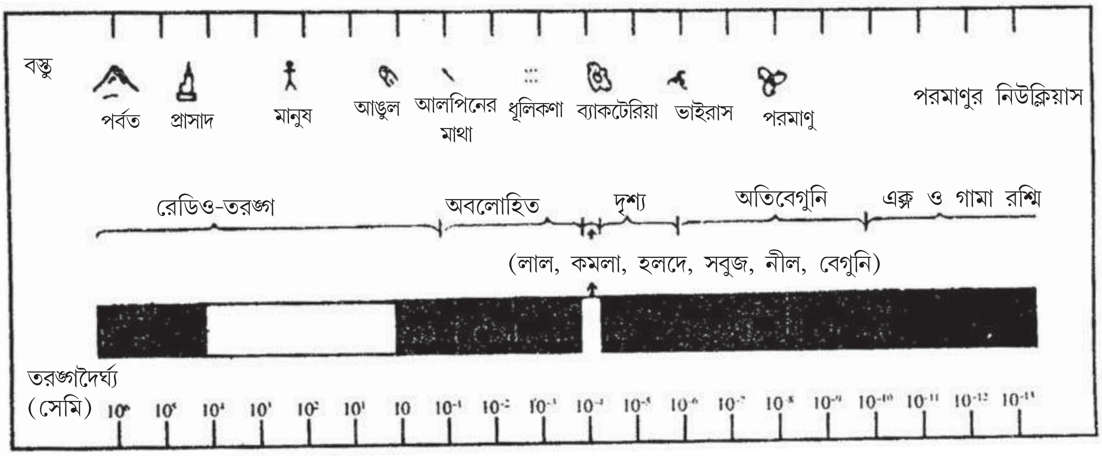

চিত্র ১০.২ : তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী : সাদা অঞ্চলগুলি রেডিও-জানালা ও দৃশ্য আলোকের জানালা (৪.০ × ১০$^{-৫}$ সেমি থেকে ৮.০ × ১০$^{-৫}$ সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য) সূচিত করছে। চিত্রে দেখানো বস্তুগুলি ও নীচের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য একই মাপের।

অনুশীলনী—১

ধরা যাক আকাশবাণীর ঘোষক বলছেন "আকাশবাণী, কলকাতা। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ব্যান্ডের ৪৫০ মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অর্থাৎ ৬৬৭ কিলো হার্ৎসে।"

(ক) রেডিওটি কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কে মেলানো আছে?

(খ) এর থেকে রেডিও-তরঙ্গের গতিবেগ কত পাওয়া যায়?

(গ) একটি রেডিও-সেটের ক্রমাঙ্কনগুলি দেখে বলুন মিডিয়াম ও শর্ট-ওয়েভ সম্প্রচারে ব্যবহৃত রেডিও-তরঙ্গগুলি কোন্ কোন্ সীমার মধ্যে থাকে।

(ঘ) সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে কী বলা যায়?

(ঙ) সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গের নাম কী?

সমস্ত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে একমাত্র আলোর প্রতি মানুষের চোখ সংবেদনশীল। অর্থাৎ শুধু দৃশ্য আলোই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। সাদা আলো অথবা সূর্যের আলো যখন প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যায় তখন, সেই আলো রামধনুর রং-এর চিরপরিচিত বর্ণালীতে ভেঙে যায়। তার রংগুলি তখন আলাদা করে দেখা যায় বেগুনি, ঘন নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল। সংজ্ঞা অনুযায়ী দৃশ্য আলোর প্রতিটি রং-এর একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে। এর মধ্যে বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম আর লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি।

মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কগুলি থেকে নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ নির্গত হয়। সমগ্র তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বর্ণালীর মধ্যে দৃশ্য আলো একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

উদাহরণস্বরূপ, দৃশ্য আলো সৌর বিকিরণের মাত্র ৪০ শতাংশ। এর বাকিটা অন্যান্য ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ। কিন্তু এই বিকিরণগুলি যখন পৃথিবীতে এসে পড়ে, দৃশ্য আলো ও রেডিও-তরঙ্গ ছাড়া বাকি সব বিকিরণই বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়। কেবলমাত্র দৃশ্য আলো ও রেডিও-তরঙ্গই বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে। এই দুই ধরনের তরঙ্গকে এইজন্যই মহাবিশ্বের দুই জানালা বলা হয়। কেবলমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে গিয়েই আমরা এই দুই জানালার বাইরের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ লক্ষ্য করতে পারি।

অনুশীলনী—২

(ক) তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কোন্ সীমার মধ্যে অবস্থিত তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়? বেগুনি ও লাল আলোর কম্পাঙ্ক কত?

(খ) কোন্ রঙ-এর আলোককণিকা অধিক শক্তি বহন করে, নীল না সবুজ?

(গ) কোন্ কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়?

তারকা থেকে আসা বিভিন্ন রকম বিকিরণের সম্বন্ধে এখন আপনার কিছুটা ধারণা হয়েছে। এবার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বিকিরণগুলির গ্রাহক হিসাবে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা দেখা যাক। আলোচনার শুরুতে আমরা দেখব, তারার আলো কীভাবে সংগৃহীত হয়।

১০.২.২ তারার আলোর সন্ধানে

যে-কোনো জ্যোতিষ্ক থেকে আসা আলো পরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল টেলিস্কোপের সাহায্যে ঐ আলো সংগ্রহ করা ও ফটোগ্রাফির কাগজে ধরে রাখা। অনেক সময় সুদূর তারকার দিকে টেলিস্কোপের নিশানা করে যে আলো ধরা পড়ে, দীর্ঘ সময় এমনকি রাতের পর রাত ধরে সেই আলোয় ফটোগ্রাফির ফিল্ম উন্মোচিত রাখতে হয়। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের সঙ্গে তারাদেরও আকাশে সরতে দেখা যায়। তাই তারার আহ্নিক গতিকে অনুসরণ করে টেলিস্কোপটিকেও ঘোরাতে হয়। এইভাবে তারার সরণের

সঙ্গে টেলিস্কোপের ঘূর্ণন ঠিক মেলাতে পারলে যেসব তারার ক্ষীণ আলো মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, সেগুলির চিত্রও ফটোগ্রাফির প্লেটে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাজাগতিক আলোর সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পদ্ধতিকে বলা হয় আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান (Optical Astronomy)।

কয়েক শতাব্দী ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্যালিলিওর যুগের সাদামাঠা লেন্সের টেলিস্কোপকে মার্জিত ও উন্নীত করে আজকের যুগে ব্যবহৃত বিশাল টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন। মানুষের হাতে তিনটি সাধারণ কাচের বস্তু—লেন্স, দর্পণ ও প্রিজম কয়েকশো বছরের মধ্যে অত্যন্ত জটিল ও শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার কথা চিন্তা করলে আমাদের কী আশ্চর্য হতে হয় না?

ককেশাস পর্বতের ওপর যে টেলিস্কোপটি আছে, সেটিই পৃথিবীর বৃহত্তম আলোকীয় টেলিস্কোপ। অ্যারিজোনা, হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়া ও চিলিতেও পাহাড়ের উপর বৃহদাকারের টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে। ভারতে যেসব জায়গায় বড় বড় আলোকীয় মানমন্দির আছে সেগুলি হল নৈনিতাল, মাউন্ট আবুর কাছে গুরুশিখর, উদয়পুর, হায়দ্রাবাদের কাছে জাপাল রঙ্গাপুর, কাভালুর ও কোদাইকানাল। প্রতি রাত্রে আরও বহুসংখ্যক ছোট টেলিস্কোপ তন্ন তন্ন করে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে এবং মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।

বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে আসা আলোক পরীক্ষা করা ছাড়াও সেগুলি সম্বন্ধে জানার আরও অন্য উপায় আছে। তার একটি হল রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞান (Radio Astronomy)। আজকাল বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কের বিকীর্ণ রেডিও-তরঙ্গের সঙ্গে অত্যন্ত সুবেদী রেডিও-টেলিস্কোপ মিলিয়ে নিয়ে জ্যোতিষ্কের উপর নিরীক্ষণ চালান। দেখা যাক এই পদ্ধতিটি কী।

১০.২.৩ তারার সুরে সুর মিলিয়ে

১৯৩২ সালে কার্ল ইয়ানস্কি (Karl Iansky) নামে এক তরুণ প্রযুক্তিবিদ নেহাৎ আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন যে তারকা থেকে রেডিও-তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়। তিনি তখন আটলান্টিক পার হয়ে আসা টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে গোলমালের (noise) উৎসটা ঠিক কোথায় সেটাই বার করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ওই বিরক্তিকর গোলমালের কারণ ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে আসা রেডিও-তরঙ্গ। জ্যোতিষ্ক থেকে বিকীর্ণ রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে সেগুলির নিরীক্ষণ, যাকে আমরা বলি রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞান, তার এখানে সূত্রপাত। রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার রেডিও-টেলিস্কোপের কাজ শূন্য থেকে রেডিও-তরঙ্গের বিকিরণ সংগ্রহ করা। উতকামন্দে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রেডিও-টেলিস্কোপ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারাই পরিকল্পিত ও স্থাপিত হয়েছে। ভারতের অন্য রেডিও-টেলিস্কোপগুলি রয়েছে গুলমার্গ, আমেদাবাদ ও বাঙ্গালোরের কাছে গৌরীবিদানুরে।

আমরা যেমন ঠিক যে সম্প্রচার কেন্দ্রটি চাই সেটি ধরার জন্য রেডিওর গ্রহণ কম্পাঙ্ক মিলিয়ে নিই, ঠিক একইভাবে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিও-তরঙ্গ ধরার জন্য রেডিও-টেলিস্কোপেরও গ্রহণ কম্পাঙ্ক মিলিয়ে নেওয়া যায়। রেডিও-টেলিস্কোপ যে শুধু অবশ্য মহাবিশ্বের দৃশ্য তুলে ধরে তাই নয়; আলোকীয় টেলিস্কোপের

তুলনায় রেডিও-টেলিস্কোপ মহাশূন্যের অনেক গভীরতর অঞ্চলের সন্ধান আমাদের কাছে এনে দেয়। রেডিও-বার্তা যেমন পৃথিবীর উপর মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যেও চলাচল করতে পারে তেমনি রেডিও-তরঙ্গ মহাশূন্যের ধূলির মেঘের মধ্যে দিয়েও সঞ্চারিত হয়। তার ফলে মহাশূন্যের যেসব অঞ্চল আলোকীয় টেলিস্কোপের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সে সব অঞ্চলের মানচিত্রও তৈরি করতে পারেন। তবে, রেডিও-টেলিস্কোপ সাধারণত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক সঙ্কীর্ণ ব্যান্ডের মধ্যেকার রেডিও-তরঙ্গাই ধরতে পারে।

রেডিও-টেলিস্কোপ ব্যবহার করে শত শত রেডিও-তরঙ্গ বিকিরণকারী জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অধিকাংশই আলোকীয় টেলিস্কোপের সাহায্যেও দেখা যায়। কিন্তু কোনো কোনো ধরনের জ্যোতিষ্ক, যেমন পালসার (Pulsar), রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পালসার হল এমন এক ধরনের তারা যা থেকে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আলো ও রেডিও-তরঙ্গের ঝলক বা পাল্‌স (Pulse) নির্গত হয়। পৃথিবী থেকে ৬০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ক্র্যাব নীহারিকার (Crab nebula) কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পালসারটি এ জাতীয় তারার উদাহরণ। প্রতি সেকেন্ডে এই পালসার ৩০ বার আলো ও রেডিও-তরঙ্গের ঝলক বিকীর্ণ করে।

রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে পরিলক্ষিত ও পরে আলোকীয় টেলিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষিত রেডিও-তরঙ্গের কিছু উৎসকে (যেমন 3C273 রেডিও-উৎস) কোয়েসার (quasar, quasi-stellar radio source-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি শত শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত তারকা-সদৃশ বস্তু। সব কোয়েসারই রেডিও-তরঙ্গের উৎস নয়। কোয়েসার থেকে আসা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ যেহেতু পৃথিবীতেও ধরতে পারা যায়, সেগুলি থেকে নিশ্চয়ই বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হচ্ছে। আকারে কোয়েসার তেমন বড় নয়, পরিমাণে তারা এক আলোক মাসের মতো। অর্থাৎ, ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলীকে যদি একটি ফুটবল মাঠ হিসাবে কল্পনা করা যায়, একটি কোয়েসার হবে বালির দানার মতো। কিন্তু সমগ্র ছায়াপথ থেকে যে শক্তি নির্গত হয় একটি কোয়েসার তার শতগুণ বেশি শক্তি বিকীর্ণ করে।

বিজ্ঞানীরা এও লক্ষ্য করেছেন যে আলোকীয় টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে কতকগুলি উপবৃত্তাকার নক্ষত্রমণ্ডলীকে নেহাত সাধারণ মনে হলেও, সেগুলি রেডিও-তরঙ্গের অত্যন্ত শক্তিশালী উৎস। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে রেডিও-নক্ষত্রমণ্ডলী। প্রায়ই দেখা যায় কোনও নক্ষত্রমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে রেডিও-তরঙ্গ নিঃসৃত হয়। এগুলির কেন্দ্রে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থের প্রচণ্ড আলোড়ন চলে এবং তার ফলেই সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রেডিও-তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়। রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে আন্তর্নক্ষত্র মহাশূন্যেও জৈব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

অনুশীলনী—৩

(ক) রেডিও-টেলিস্কোপের এমন চারটি বৈশিষ্ট্যের তালিকা দিন যা আলোকীয় টেলিস্কোপ থেকে এটির পার্থক্য সূচিত করে।

(খ) রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে কোন্ কোন্ নতুন আবিষ্কার হয়েছে?

১০.২.৪ মহাকাশের দূত

মহাকাশ থেকে আমাদের গ্রহ এই পৃথিবীতে কেবল আলো আর রেডিও-তরঙ্গই এসে পৌঁছায়, এমন নয়। কখনও কখনও উল্কার মতো অন্য বস্তুও পৃথিবীর বাতাবরণে প্রবেশ করে। যেসব জ্যোতিষ্ক থেকে তারা খসে পড়েছে সেগুলির বার্তাই তারা বহন করে আনে। আপনি আগেই পড়েছেন যে পৃথিবীর উপর সর্বদাই কসমিক রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে। এই রশ্মি আসলে ইলেকট্রন, প্রোটন ও হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের স্রোত, মহাশূন্যের মধ্যে যা প্রায় আলোকের গতিবেগের সমান অতি উচ্চ বেগে ধাবমান। কসমিক রশ্মির উৎপত্তি ও মহাশূন্যের মধ্যে তার গতি এমন এক রহস্য, বিজ্ঞানীরা এখনও যার সম্পূর্ণ সমাধান করে উঠতে পারেননি। এই সমাধান যেদিন সম্ভব হবে সেদিন আমরা আন্তর্নক্ষত্র গ্যাসের মেঘ, তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধে অনেক বেশি জানতে পারব।

১০.২.৫ মহাশূন্যে অনুসন্ধান

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অনেক সময় মহাশূন্য থেকে আসা আলো ও রেডিও-তরঙ্গাকে বিকৃত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ঝড়ের সময় রেডিও-তরঙ্গোর প্রসারে বিঘ্ন ঘটে, আবার আলোর গতিরোধ করে আকাশের মেঘ। তখন আর রেডিও-তরঙ্গ অথবা দৃশ্য আলোর সাহায্যে মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানের কয়েকটি নূতন বিকল্প পদ্ধতি তুলে দিয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মহাশূন্যে মানমন্দির

মহাকাশ যাত্রার যুগে পৃথিবীর বাতাবরণের বাইরের মহাশূন্যে টেলিস্কোপ ও ক্যামেরাসজ্জিত মানমন্দির স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মহাশূন্যে মানমন্দির কক্ষপথে ভ্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহের রূপ নিতে পারে, যেমন 'মনুষ্যহীন কক্ষীয় সৌর মানমন্দির' (Unmanned Orbitting Solar Observatories), 'কক্ষীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দির' (Orbitting Astronomical Observatory), স্কাইল্যাব, আইনস্টাইন মানমন্দির, 'অবলোহিত জ্যোতির্বিজ্ঞান উপগ্রহ' (Infra-red Astronomy Satellite, IRAS) প্রভৃতি। এমনকি চন্দ্র বা অন্য কোনো গ্রহের উপরেও মানমন্দির স্থাপন করা যেতে পারে যদি সেখানে উষ্ণতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হয়। উঁচুতে ওড়া বেলুন, রকেট ও অন্যান্য আকাশযানেও পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করার জন্য যন্ত্রপাতি রাখা হয়। এই ধরনের মানমন্দির জ্যোতিষ্ক থেকে আসা তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের অবলোহিত, অতিবেগুনি, গামা ও এক্স রশ্মি অর্থাৎ বর্ণালীর যে রশ্মিগুলি পৃথিবীর বাতাবরণকে ভেদ করে না সেগুলিকেও ধরতে ও লিপিবদ্ধ করতে পারে।

প্রতিবেশী দুনিয়ায় সফর

মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য গ্রহে আকাশযান পাঠানো, এমনকি চাঁদের বুকে মানুষ ও যন্ত্রপাতি নামানো সম্ভব হয়েছে। এই সফরগুলির ফলে সৌরজগৎ সম্বন্ধে তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অ্যাপোলো-সফরের মহাকাশচারীরা শুধু চাঁদের মাটি-পাথরের নমুনা বা চন্দ্রপৃষ্ঠের ফটোগ্রাফই আনেননি, তাঁরা ভবিষ্যতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতিও সেখানে রেখে এসেছেন।

আমাদের প্রতিবেশী গ্রহগুলি সম্বন্ধে আরও তথ্য আহরণের জন্য আমরা কিছু সন্ধানী মহাকাশযানকে (probe) সৌরজগৎ পার করে পাঠাতে পেরেছি। এই সন্ধানী মহাকাশযানগুলি বিভিন্ন গ্রহ ও তাদের বেশ কিছু উপগ্রহের নিকটবর্তী হয়েছে, এমনকি সাফল্যের সঙ্গে মঙ্গল ও শুক্রের পৃষ্ঠে আবতরণ করে সেগুলির কার্য সমাধা করেছে।

আমেরিকার মহাকাশযান পায়োনীয়ার-১০, ১৯৮৩ সালে নেপচুনের কক্ষপথ অতিক্রম করেছে। এটিই প্রথম মনুষ্য-সৃষ্ট বস্তু যা সৌরজগৎ ছেড়ে বাইরে চলে গেছে। পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ এবং সন্ধানীগুলির দ্বারা পাঠানো তথ্য—এই দুই-এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের উদ্ভব ও বিবর্তনের তত্ত্ব অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সৌরজগৎ সম্বন্ধে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা একাদশ এককে উপস্থাপিত হবে।

অনুশীলনী—৪

(ক) আইনস্টাইন মানমন্দির ও পায়োনীয়ার-১০ সন্ধানীর মধ্যে প্রভেদ কী?

(খ) মহাশূন্যের মানমন্দির এবং মহাকাশ-সন্ধানী ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বাইরে থেকে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে?

সংক্ষেপে বলা যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণে নানা ধরনের যেসব যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহার করেন এই অংশে আমরা তারই একটি সংক্ষিপ্তসার আপনাদের সামনে রেখেছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব যাতে আপনি উপলব্ধি করতে পারেন সেজন্যই এই সংক্ষিপ্তসারটি দেওয়া হয়েছে। মহাবিশ্বের জটিলতা আমাদের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। আমরা যে প্রকল্প বা তত্ত্বের প্রস্তাব করি না কেন, তা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এবং এজন্যই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের জন্য আরও নূতন ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বার করেন, যাতে তাঁরা মহাবিশ্বকে আরও ভালোভাবে জানতে পারেন এবং তাঁদের প্রকল্প ও তত্ত্বগুলিকে যাচাই করতে পারেন।

এবার আপনার পড়ার মধ্যে একটু বিরতির সময় হয়েছে। এক পেয়ালা চা বা কফি পান করুন। তারপর এ পর্যন্ত কী পড়লেন তা একটু ভেবে দেখুন।

১০.৩ মহাবিশ্বের পরিচয়

এ পর্যন্ত মহাবিশ্ব সম্পর্কিত তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হয় তা আপনি জেনেছেন। এই তথ্য প্রধানত নানা জ্যোতিষ্কের ফটোগ্রাফ এবং তাদের আলোর বর্ণালি রূপে সংরক্ষিত থাকে। মহাশূন্য থেকে আসা অন্যান্য বিকিরণও নানাভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেই মহাবিশ্ব ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে তত্ত্ব খাড়া করা হয়।

মহাবিশ্ব ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধে প্রকল্প ও তত্ত্বগুলি সবসময়েই নতুন আবিষ্কারের আলোকে পরিবর্তনসাপেক্ষ। অনেক সময়ই কোনো একটি তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হয়। এমনকি সংগৃহীত তথ্যের ভুল ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো তত্ত্বই মহাবিশ্ব সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে শতকরা একশো ভাগ মেলে না। মহাবিশ্বের যে তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট সব পর্যবেক্ষণের খুব কাছাকাছি থাকে, সেটাকেই আমরা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে স্বীকার করে নিই। এর অন্য প্রান্তে আছে কাজ-চালানো, দূরকল্পী, সব প্রকল্প। এখন আমরা তারকা, নক্ষত্রমণ্ডলী ও সমগ্র মহাবিশ্বের সম্বন্ধে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যে তত্ত্ব ও ধারণাগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি উপস্থাপিত করব। দেখা যাক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তারাদের সম্বন্ধে কতটা জানা যায়।

১০.৩.১ তারাদের কথা

আকাশের আলোকবিন্দু তারার দল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সামনে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরে। যেমন—তারকাগুলি ঠিক কোথায় আছে? তারা ঠিক কতটা উজ্জ্বল? তাদের উষ্ণতা, আকার, বয়স এসবের মান কত? তারা কী দিয়ে তৈরি? জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা তারার আলোর সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারছেন।

তারকাগুলি কোথায় আছে?

তারাদের দূরত্ব মাপতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। যেসব তারা কাছাকাছি রয়েছে তাদের দূরত্ব মাপতে তারকার লম্বন (parallax) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় (৯.৬ চিত্র দেখুন)। দূরের তারার জন্য আরও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। আমরা এগুলির বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। যেসব জ্যোতিষ্ক অনেক দূরে আছে, তাদের বর্ণালিরেখার লোহিত-চ্যুতির (red shift) পরিমাপ করে তাদের দূরত্ব মাপা হয়। নক্ষত্রমণ্ডলী বা কোয়েসারের মতো বহুদূরের বস্তু যখন আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যায় তখন তাদের আলোক বর্ণালির রেখাগুলি লালের দিকে অর্থাৎ অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যায়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই চ্যুতির পরিমাপ থেকে উপযুক্ত সূত্র ব্যবহার করে ওই বস্তুর দূরত্বের হিসাব করা যায়।

তারাদের স্বাক্ষর

তারার আলোকের বর্ণালি থেকেই তার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য পাওয়া সম্ভব। টেলিস্কোপের অভিলক্ষ্যের

(objective) সামনে যদি একটি লেন্সের আকারে প্রিজম রাখা যায়, তবে প্রত্যেকটি তারাকেই একটি রঙিন বর্ণালির মতো দেখাবে। এইবার ওই অভিলক্ষের ফোকাস-তলে ফটোগ্রাফির ফিল্ম রাখলে তারার বর্ণালির চিত্র পাওয়া যাবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে অবশ্য বর্ণালীটিকে রঙিন রামধনু বলে মনে হবে না, তিনি যা দেখবেন তা হল ১০.৪ চিত্রের মতো সাদা-কালোর একটি নকশা। প্রত্যেক তারার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত বর্ণালি আছে, সেটি যেন তার নিজস্ব স্বাক্ষর। তারার বর্ণালি থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন্ কোন্ মৌল দিয়ে তারাটি তৈরি, তার উষ্মতা কত, তারাটি কত উজ্জ্বল, কত তার গতিবেগ, ইত্যাদি।

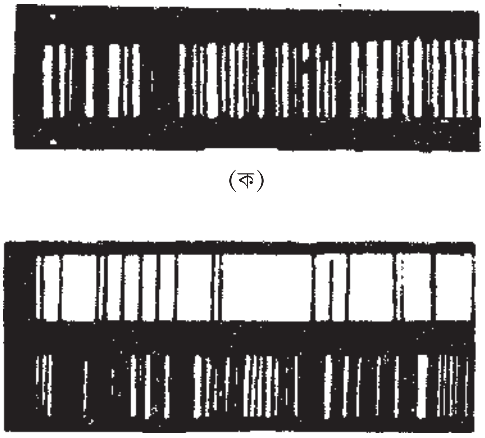
লৌহ

(ক)

(খ)

চিত্র ১০.৪ : (ক) তারার আলোর বর্ণালিতে বিভিন্ন মৌল দ্বারা উৎপন্ন রেখাগুলিকে শনাক্ত করে তার সংযুক্তি নির্ণয় করা হয়। (খ) বর্ণালিরেখা থেকে তারার উষ্মতা জানা যায়। উপরের বর্ণালিটি উষ্মতর তারার।

তারার গতি

তারাগুলি আকাশে নিশ্চল হয়ে নেই। তারা নিজ নিজ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে গতিশীল। পৃথিবী অভিমুখে বা তার বিপরীত দিকে তারার গতি সেটির বর্ণালিরেখার চ্যুতির দ্বারা সূচিত হয়। যে তারার গতি পৃথিবী অভিমুখী, তার বর্ণালিরেখা বর্ণালির বেগুনি প্রান্তের দিকে সরে যায়। আবার যে তারা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার রেখাগুলি বর্ণালির লাল প্রান্তের দিকে চ্যুত হয়। তারার গতিবেগ যত বেশি হয়, চ্যুতির মাত্রাও তত বাড়ে।

আগেই দেখেছেন, তারা অনেক রকমের হয়—নীল, হলুদ, লাল, সাধারণ মাপের বা দৈত্যাকার। কোনোটি স্পন্দনশীল (pulsating), কোনোটি আবার প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ করে। অধিকাংশ তারাই দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। চারটির মধ্যে হয়তো একটি তারাই একাকী চলনশীল। বাকিগুলির মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই যুগল-তারকা (double star) এবং অবশিষ্টাংশ হল অনেক তারার এক-একটি দল। যুগল তারকার একটি অন্যটিকে কক্ষপথে পরিক্রমণ করে। এগুলিকে যুগ্ম (binary)-ও বলা হয়। তারকাত্রয়ীর মধ্যে থাকে তিনটি তারা, যার তিনটিই পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে পারে অথবা যার দুটি তৃতীয়টির চারদিকে ঘুরতে পারে। এছাড়া আছে মাত্র কয়েক ডজন তারার আলগা গুচ্ছ থেকে শুরু করে কয়েক শত সহস্র তারার বৃহৎ গোলকাকৃতি গুচ্ছ, যার প্রতিটি তারাই অজস্র রকম গতিতে চলতে পারে।

অনুশীলনী—৫

তারকার আলোক-বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় এমন চারটি নির্দিষ্ট তথ্যের নাম লিখুন।

তারাদের দূরত্ব, বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য, গতি—এসব জানার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা (astrophysicist) আরও বেশি করে যে ধরনের প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন তা হল : তারকাগুলি কীভাবে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছল? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ফলে তারকার বিবর্তনের এক চমৎকার চিত্র পাওয়া গেছে। তারকার জন্য বিবর্তন ও মৃত্যু, সবকিছুর কাহিনী এই চিত্র থেকে জানা যায়। এখন আমরা সাধারণ তারার জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায় হিসাবেই তারাদের বৈচিত্র্য, এমনকি সাধারণ বলে মনে হয় না এমন সব তারারও ব্যাখ্যা দিতে পারি।

তারার বিবর্তন চলে শত শত কোটি বছরের এক বিশাল সময়সীমা জুড়ে। তাহলে মাত্র কয়েক দশকের পর্যবেক্ষণের দ্বারাই আমরা কী করে তারকার বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করতে পারলাম? এটা কী করে সম্ভব তা একটা সহজ তুলনা থেকে বোঝা যাবে। ধরা যাক বহির্বিশ্ব থেকে এক আগন্তুক মাত্র এক ঘণ্টার জন্য পৃথিবীতে এসে আমাদের সম্বন্ধে জানতে চান। তিনি একটা ভিড়ের জায়গায় তাঁর মহাকাশযানটি দাঁড় করিয়ে দ্রুত সেখানকার লোকজনের ভিডিও চিত্র তুলে নেবেন। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর যখন তিনি ভিডিওটেপটি চালিয়ে দেখবেন তখন তিনি লক্ষ্য করবেন যে বেশিরভাগ মানুষই প্রায় একই মাপের। কিন্তু কেউ কেউ বেশ ছোট আকারের আর কয়েকটি এত ছোট যে তাদের বয়ে বেড়াতে হয়। আবার আরও কেউ কেউ সাধারণ আকারের হলেও লাঠির সাহায্যে সামনে ঝুঁকে হাঁটেন। বুদ্ধিমান আগন্তুক বুঝে ফেলবেন যে তিনি যা দেখছেন তা আসলে বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মায় ক্ষুদ্রাকার হয়ে, বয়সের সঙ্গে বাড়ে, জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটায় কর্মব্যস্ত প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে এবং শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। যেহেতু বৃদ্ধের সংখ্যা কম, আগন্তুক বুঝতে পারবেন যে বৃদ্ধেরা শেষ পর্যন্ত মারা যান।

পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে বহির্বিশ্বের আগন্তুকের যে অবস্থা, তারাদের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবস্থাও ঠিক সেরকম। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দশ লক্ষেরও বেশি তারকার পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারাগুলির বর্ণালি তাঁরা খুঁটিয়ে দেখেছেন, সেগুলির ঔজ্জ্বল্য ও পৃষ্ঠের উষ্ণতার পরিমাপ করেছেন। এবং এসব তথ্য সযত্নে বিশ্লেষণ করে তাঁরা তারকার বিবর্তনের কাহিনী রচনা করতে পেরেছেন। আমরা এখন সেই কাহিনীই বিবৃত করব।

১০.৩.২ তারার জীবনবৃত্তান্ত

যে তারা বয়সে নবীন, তা প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাসে তৈরি বলে ভাবা হয়। সুতরাং আন্তর্নক্ষত্র মহাশূন্যে হাইড্রোজেন গ্যাসের সে অসংখ্য মেঘ ছড়িয়ে আছে সেগুলিই তারকার জন্মগ্রহণের সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান। এখন সবাই এটাই মনে করেন যে তারকার জন্মস্থান বিশাল ঘন আন্তর্নক্ষত্র গ্যাসের মেঘের অভ্যন্তরে। এমন হতে পারে যে-কোনো কারণে গ্যাসের মেঘ সংকুচিত হতে শুরু করল, যদিও এর কারণগুলি এখনও

পুরোপুরি জানা যায়নি। গ্যাসের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে এই সংকোচন তখন চলতেই থাকবে। এবং এই প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তার প্রভাব গ্যাসের মেঘের এক অতি বিশাল আয়তনের উপর গিয়ে পড়বে। মহাকর্ষ ওই মেঘকে যত ভিতর দিকে টানবে, তার অভ্যন্তরের চাপ তত বাড়বে। আবার মেঘের সংকোচনের সঙ্গে তার কেন্দ্রাঞ্চলের উষ্ণতাও যাবে বেড়ে। এই অবস্থায় এটিকে বলা হয় আদি তারকা (protostar)।

আদি তারকার অভ্যন্তরের উষ্ণতা যখন যথেষ্ট উচ্চমানে, অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়, তখন সেখানে নিউক্লিয় বিক্রিয়া শুরু হয়। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে ফিউশনের (fusion) দ্বারা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে (১০.৫ চিত্র দেখুন)। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ শক্তিও নির্গত হয়। এই শক্তি ক্রমশ তারকাদের পৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং আলো, তাপ ও অন্যান্য তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের রূপে বিকীর্ণ হয়। এই বিকিরণ একটি বহির্মুখী ঘাতও সৃষ্টি করে। যখন তারকার ভিতরের দিকে মহাকর্ষীয় টান আর বিকিরণের বহির্মুখী ঘাত তুল্যমূল্য হয় তখন তারকার সংকোচন থেমে যায় এবং তারকাটি আকার ও উষ্ণতায় এক সুস্থিত অবস্থা লাভ করে। সূর্য গত ৫ শত কোটি বছর ধরে এই সুস্থিত অবস্থায় রয়েছে। নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ফলে সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪০ কোটি টন (৪×১০^{৮} টন) হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে। আশা করা যায় যে সূর্য আরও ৫ শত কোটি বছরের মতো এই অবস্থাতেই থাকবে।

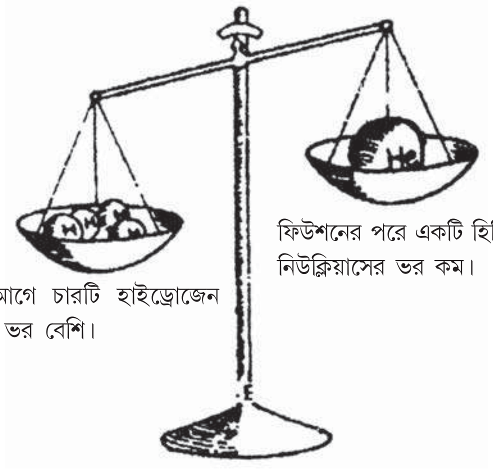

চিত্র ১০.৫ : একটি কাল্পনিক চিত্রে তারকার অভ্যন্তরের ফিউশন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

তারকার কোরের হাইড্রোজেন জ্বালানীর বেশিরভাগ অংশই যখন খরচ হয়ে যায় তখন নিউক্লীয় বিক্রিয়া ক্রমশ মন্দীভূত হয় আর বিকিরণের বহির্মুখী ঘাত দুর্বল হয়ে পড়ে। মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তখন বিকিরণের চাপকে ছাড়িয়ে যায়, ফলে তারকার কোর সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু এতে কোরের উষ্ণতা যায় বেড়ে। ইতিমধ্যে তারকার বাইরের স্তরে বা কোরের উপরের খোলকে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসগুলি 'জ্বলতে' থাকে। কোর এবং বাইরের স্তরে উৎপন্ন বাড়তি তাপ তারার বহিরাঞ্চলকে প্রসারিত করে। এতে তারাটি আকারে বড় হয়, ঔজ্জ্বল্যও বাড়ে। কিন্তু বহিরাঞ্চল প্রসারণের ফলে কেন্দ্রের নিউক্লিয় চুল্লী থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তার উষ্ণতা হ্রাস পায়। ফুলে ফেঁপে ওঠা তারাটিকে তখন লাল ও অপেক্ষাকৃত শীতল দেখায়। তারাটি

যদি সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি ভারী হয় তবে সেটি সূর্যের চেয়ে ১৫ গুণ ভারী বিটেলজিউস (Betelgeuse) তারার মতো লাল মহাদানবে (red supergiant) পরিণত হয়। আর যদি সেটি সূর্যের প্রায় সমান বা সামান্য বেশি ভারী হয় তবে সেটি হয় অল্প ফুলে ওঠা লাল দানব (red giant)।

তারকার এই লাল দানব অবস্থাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী। এই অবস্থায় তারকার হাইড্রোজেন অতি দ্রুত ব্যয় হতে থাকে আর তার কেন্দ্রাঞ্চলে জমা হয় হিলিয়াম। জ্বালানী যত 'পোড়ে', কোর তত সংকুচিত হয় এবং উষ্ণতা উঠে যায় ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এইবার অন্য একটি নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ফলে কোরের হিলিয়াম নিউক্লিয়াসগুলির ফিউশন ঘটে ও কার্বন নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাটি তারকার জীবনের একটি স্বল্পস্থায়ী সন্ধিক্ষণ। তারকার দুইটি পৃথক স্তর এখন একসঙ্গে জ্বলছে—বাইরের স্তরে হাইড্রোজেন ফিউশনের ফলে রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়ামে আর কেন্দ্রাঞ্চলে হিলিয়াম থেকে তৈরি হচ্ছে কার্বন। এর পর তারাটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে তার কোর কত ভারী তার উপর। আমরা কারণের মধ্যে না গিয়ে শুধু প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করব।

কোরের ভর যদি ১.৪ M_S (M_S = সূর্যের ভর) অপেক্ষা কম হয়, তাহলে কোরের আকার যখন পৃথিবীর আকারের মতো দাঁড়াবে তখন তার সংকোচন থেমে যাবে। আমেরিকাবাসী বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নামে এই ১.৪ M_S সীমাটিকে বলা হয় 'চন্দ্রশেখর সীমা'। এ ধরনের তারাকে বলা হয় 'শ্বেত বামন' (white dwarf)। পৃথিবী থেকে দেখলে এগুলিকে খুব ছোট ও অনুজ্জ্বল মনে হয় কিন্তু এগুলি সূর্যের চেয়েও বেশি উষ্ম। যে তারাগুলিকে প্রথম শ্বেত বামন বলে চেনা গিয়েছে তাদের একটি হল উজ্জ্বল তারা সিরিয়াস (Sirius) বা লুব্ধকের ক্ষীণ সাথী সিরিয়াস বি (Sirius B)। কখনও কখনও শ্বেত বামন তারা লক্ষ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল হয়ে ঝলসে ওঠে। এগুলিকে বলে নোভা (Nova)। এগুলি যখন আবার শীতল হয়ে যায় তখন শ্বেত বামন রূপান্তরিত হয় কৃষ্ম বামনে, আমাদের কাছে তখন সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।

কোরের ভর যদি ১.৪ M_S থেকে ৩ M_S-এর মধ্যে থাকে, অর্থাৎ তারার মোট ভর থাকে ৮ M_S থেকে ১৫ M_S-এর মধ্যে, তখন কোরটি সংকুচিত হয়ে মাত্র ১০ কিলোমিটারের মতো ব্যাসার্ধে পৌঁছায়। এইভাবে জন্ম নেয় নিউট্রন তারা। নিউট্রন তারার জন্মের সময় যদি সেটি খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে, তবে সেটি থেকে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বিকিরণকে রেডিও-তরঙ্গের এক-একটি ঝলক (pulse) হিসাবে ধরতে সক্ষম হন। এই তারাগুলিকে তাই পালসার বলা হয়। ১৯৬৭ সালে আবিষ্কারের পর প্রায় ৪০০ পালসারকে চেনা গেছে।

যে তারা আরও ভারী, তার কোরের হিলিয়াম কার্বনে পরিণত হয়। কিন্তু তার বাইরের স্তর জ্বলতেই থাকে। কোরটি আরও সংকুচিত ও উত্তপ্ত হয়। কার্বন নিউক্লিয়াসগুলি ফিউশনের ফলে অক্সিজেন নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে তারকার কোরে যেমন প্রতিটি নিউক্লিয় জ্বালানী নিঃশেষিত হয়, কোরটিও আরও

সংকুচিত হয়, উষ্মতা আরও বাড়ে আর কোরের জ্বালানীর দহন, অর্থাৎ ফিউশনে সাহায্য করে। এই সময় আগের জ্বালানী কিন্তু কোরটিকে ঘিরে থাকা স্তরগুলিতে জ্বলতেই থাকে। তার ফলে তারকাটিতে একসঙ্গে অনেকগুলি নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ফলে জ্বলন্ত খোলক থাকে (চিত্র ১০.৬ দেখুন)। এবং ভারী তারা মধ্যে যতক্ষণ না কোরটি লৌহে পরিণত হয় ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

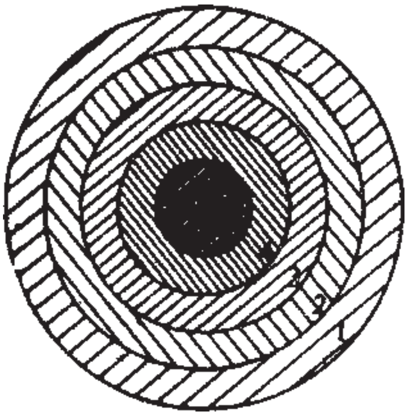

চিত্র ১০.৬ : বিবর্তনের শেষ দিকে ভারী তারার গঠন। তারাটিতে নিউক্লিয় দহনের খোলকগুলি বিভিন্ন উপাদানের কয়েকটি স্তরকে আলাদা করে রেখেছে। স্তরগুলি হল (১) হাইড্রোজেন (২) হিলিয়াম (৩) কার্বন (৪) অক্সিজেন (৫) সিলিকন ও লোহা।

তারার প্রাথমিক ভর যদি ২০ M_S-এর বেশি হয় তবে সেটি আরও সংকুচিত হয় এবং তার কোরটি জমাট বেঁধে একটি কৃষ্ণগহ্বরে (Black hole) পরিণত হয়। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষীয় টান এত প্রবল যে-কোনো বস্তুই তার থেকে বেরোতে পারে না, এমনকি আলোও না। বুঝতেই পারেন যে এর ফলে কোনো কৃষ্ম গহ্বরকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত কোনো কৃষ্মগহ্বরই এ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে ধরা পড়েনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করছেন কয়েকটি তারা কৃষ্মগহ্বর হতেও পারে। উদাহরণস্বরূপ, ছায়াগ্নি (cygnus) নক্ষত্রমণ্ডলীতে সিগনাস XI নামে একটি তারকাযুগ্ম আছে যার একটি তারার ভর ৩৩ M_S। ১৬ M_S ভরের আর একটি অদৃশ্য বস্তু যেন এটিকে প্রদক্ষিণ করছে বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই অদৃশ্য বস্তুটি একটি কৃষ্মগহ্বর।

কখনও কখনও ৩ M_S থেকে ১৫ M_S ভরবিশিষ্ট ভারী তারা প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি নির্গত করে বিস্ফোরিত হয়। এ ধরনের বিস্ফোরণকে বলে সুপারনোভা (supernova)। এদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে উজ্জ্বল সেগুলি একাই প্রায় সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলীর সমান আলোক বিকীর্ণ করে। তাদের ঔজ্জ্বল্য দশ কোটি সূর্যের সমান হতে পারে। আকাশগঙ্গা নক্ষত্রমণ্ডলীতে শেষ সুপারনোভা দেখা গিয়েছে ১৬০৪ সালে।

অনুশীলনী—৬

(ক) তারকার জীবনের নিম্নোক্ত পর্যায়গুলিকে সঠিক ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দিন :

(১) আদি-তারকা (২) সুস্থিত তারকা (৩) গ্যাসের মেঘ

(খ) গ্যাসের মেঘ সংকুচিত হলে কী ঘটে?

(গ) তারকার শক্তির উৎস কোথায়?

(ঘ) তারকা কখন সুস্থিত অবস্থায় আসে?

বাস্তবক্ষেত্রে কোনো তারকার বিবর্তনের মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার আসতে পারে যা সম্পূর্ণরূপে জানা নেই। আমরা যে ঘটনাক্রমের বর্ণনা করলাম, প্রকৃতি তা পুরোপুরি মেনে নাও চলতে পারে। বিশেষত তারকার জীবনের শেষ পর্যায়গুলির বর্ণনা সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক এবং সংশোধনসাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ, সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর যা পড়ে থাকবে তা নিউট্রন তারকা হবে, না কৃষ্ণগহ্বর হবে, নাকি কিছুই থাকবে না তা খুবই অনিশ্চিত। প্রতিটি নূতন পর্যবেক্ষণমালার সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে তারকার জীবনচক্রের রহস্য একটু করে উন্মোচিত হয়।

তারকার মধ্যে ভারী মৌলের সংশ্লেষণ (synthesis) বা আন্তর্নক্ষত্র মেঘের ঘনীভবনের সূত্রপাতের মতো নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটতে থাকে। বিজ্ঞানীদের কাছে তারকা এসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেন একটা গবেষণাগার। এই ঘটনাগুলির ফলেই শেষ পর্যন্ত সৌরজগৎ ও পৃথিবীর বুকে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে।

আপনি জানেন যে তারকারা নক্ষত্রমণ্ডলীর অংশ। নক্ষত্রমণ্ডলীর বিবর্তন কী তারাদের মতো একভাবেই ঘটে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন সেটাই ঠিক। কিন্তু তাঁরা এখনও নক্ষত্রমণ্ডলীর বিবর্তনের একটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্ব খাড়া করতে পারেননি। তবে নক্ষত্রমণ্ডলী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে আমরা মহাবিশ্ব সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় তথ্য জানতে পেরেছি। সেটি হল—মহাবিশ্ব প্রসারণশীল।

১০.৩.৩ প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

আপনি ৯.২৩ অংশে দেখেছেন যে হাবলের পর্যবেক্ষণ নক্ষত্রমণ্ডলীর অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই সময়ে যে টেলিস্কোপ পাওয়া যেত তার সাহায্যে যতগুলি নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখা সম্ভব ছিল সেগুলির মানচিত্রায়ণের পর তিনি সেগুলির গতির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। স্লিফার (V. M. Slipher) নামে এক আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধাঁধা-লাগানো একটি রিপোর্ট হাবলকে এই কাজে উৎসাহিত করেছিল। ১৯১২ সালে স্লিফার আবিষ্কার করেছিলেন যে ক্ষীণদ্যুতির অনেক নীহারিকা পৃথিবী থেকে প্রচণ্ড বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের বর্ণালিরেখাগুলি বর্ণালির লাল প্রান্তের দিকে অনেকটা সরে আছে যাকে ইতিপূর্বে আমরা লোহিত-চ্যুতি বলেছি। এই ব্যাপারটি তখন খুব আশ্চর্য লেগেছিল কেননা আকাশগঙ্গা নক্ষত্রমণ্ডলীর তারাগুলির গতিবেগ অনেক কম এবং তাদের কোনোটি দূরে সরে যাচ্ছে, আবার কোনোটি আমাদের কাছে চলে আসছে। স্লিফার যখন এইসব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেটা নক্ষত্রমণ্ডলীর আবিষ্কারের এক দশক আগে। তখন নীহারিকাগুলিকেও

আমাদের নিজস্ব নক্ষত্রমণ্ডলীর অংশ হিসাবে ভাবা হত, ফলে স্লিফার তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি।

হাবল কিন্তু জানতেন যে নীহারিকাগুলি আসলে নক্ষত্রমণ্ডলী। সুতরাং তিনি তাঁর সহকর্মী হিউম্যাজনের (M. L. Humason) সাথে নীহারিকাগুলির গতি ও দূরত্বের সম্পর্কের উপর সুশৃঙ্খলভাবে কাজ শুরু করলেন। তাঁরা যা দেখতে পেলেন তা রীতিমতো চমকপ্রদ। এক কথায় বললে, তাঁদের পর্যবেক্ষণ থেকে যা দেখা গেল তা হল :

১. সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলীই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

২. কোনো এক নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে যত দূরে, তার দূরে সরে যাওয়ার গতিও তত বেশি।

হাবলের আবিষ্কার থেকে প্রসারণশীল মহাবিশ্বেরই একটা চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য সব নক্ষত্রমণ্ডলী যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তবে আমরা কী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছি? তা কিন্তু না। আমরা যদি অন্য কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যেও থাকতাম তাহলে অন্য সব নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হত। আপনি ১০.৭ চিত্রটি মন দিয়ে দেখলে আর তার সঙ্গে একটি সহজ কাজ করলে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ছবিটি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

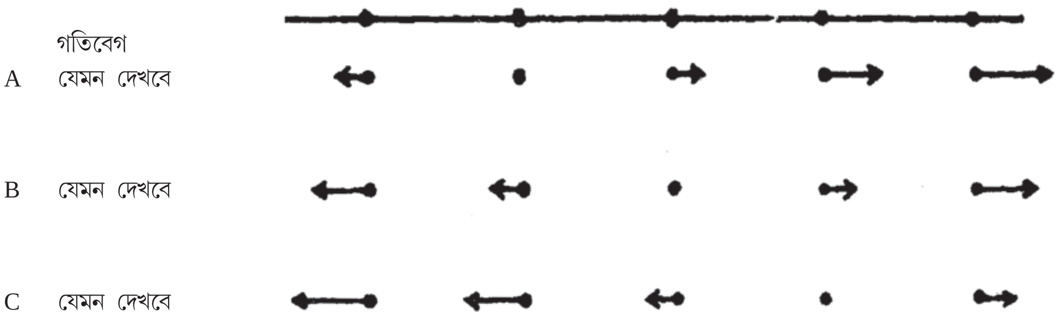

চিত্র ১০.৭ : সমান ব্যবধানে থাকা পাঁচটি নক্ষত্রমণ্ডলী Z, A, B, C, D-এর সারি দেখানো হয়েছে। ট্, ট্ব অথবা ট্র থেকে মাপা তাদের গতিবেগ তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। কোনো নক্ষত্রমণ্ডলী যেদিকে গতিশীল মনে হবে, তীরের মুখ সেই দিকে। যে-কোনও নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে দেখলে অন্য কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীকে তার দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতী বেগে দূরে চলে যেতে দেখা যাবে।

নিজে করার কাজ : একটি রবারের বেলুন দিয়ে তার ওপর কলম দিয়ে কয়েকটি বিন্দু আঁকুন। এবার বেলুনটি ফোলান। বিন্দুগুলির পরস্পরের সাপেক্ষে গতি কেমন বলে মনে হচ্ছে।

লক্ষ্য করলেন তো, যে বেলুনটি আপনি যত ফোলালেন, বেলুনের ওপর বিন্দুগুলি প্রত্যেকে অন্যগুলির থেকে দূরে সরে গেল? আপনি নক্ষত্রমণ্ডলীর সরে যাওয়াটিকেও একইভাবে কল্পনা করতে পারেন। এ পরীক্ষাটি অবশ্য কিছুটা সরলীকৃত, কেননা আপনি বেলুনটি দেখছেন বাইরে থেকে কিন্তু আমরা যখন মহাবিশ্বকে দেখছি

আমরা তো তার একটি নক্ষত্রমণ্ডলীর ভিতরেই রয়েছি। মহাবিশ্ব কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার একটু ধারণা দেওয়াই এই পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য।

মহাবিশ্ব যদি প্রসারণশীল হয় তবে লক্ষ লক্ষ বছর আগে এটি নিশ্চয়ই আরও সন্নিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, নক্ষত্রমণ্ডলীগুলিও পরস্পরের আরও নিকটে ছিল। আপনি হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন, যে তাহলে একেবারে প্রথমে মহাবিশ্ব কেমন ছিল। কেনই বা এটি প্রসারিত হচ্ছে? এখন আমরা মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে বিশ্বতত্ত্ববিদরা (cosmologist) যেসব তত্ত্ব দিয়েছেন সেগুলি বর্ণনা করব।

১০.৩.৪ সৃষ্টিমুহূর্তের কাছাকাছি

মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত তত্ত্ব হল বিগ ব্যাং (অর্থাৎ বিশাল বিস্ফোরণ) তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল এক বিশাল বিস্ফোরণ দিয়ে। যেসব বিস্ফোরণের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলি একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের বিস্ফোরণটি এরকম ছিল না। এটি মহাবিশ্বের প্রতি বিন্দুতে একসঙ্গে ঘটেছিল। এটি প্রথম থেকেই সমস্ত মহাবিশ্ব জুড়ে ছিল, যেখানে প্রতিটি বস্তুকণা অন্য প্রতিটি কণা থেকে দূরে চলে যাচ্ছিল। এটি শূন্যের মধ্যে বস্তুর বিস্ফোরণ নয়, বরং এটিকে মহাশূন্যেরই একটি বিস্ফোরণ বলে ভাবা যায়। সৃষ্টির ঠিক প্রথম মুহূর্তটিকে চিত্রায়িত করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানীরা আদিতম যে মুহূর্তের কথা কিছুটা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারেন তা হল সৃষ্টির $^{১}/_{১০০}$ সেকেন্ড পরের মুহূর্ত। এই মুহূর্তে মহাবিশ্বের উষ্মতা ছিল প্রায় দশ হাজার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। তপ্ততম তারকার কেন্দ্রের উষ্মতার চেয়েও এটি অনেক বেশি। এই উষ্মতায় অণু, পরমাণু, এমনকি পরমাণু নিউক্লিয়াস, অর্থাৎ সাধারণ বস্তুর কোনো উপাদানই আস্ত থাকতে পারে না। বরং যে বস্তুস্রোত সেই বিস্ফোরণ থেকে নির্গত হয়ে ছিল তা ছিল নানা প্রকারের মৌল কণায় তৈরি। যে কণাগুলি সুপ্রাচীন মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছিল সেগুলি হল ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনো। কিছু প্রোটন আর নিউট্রনও ছিল তার সঙ্গে। মহাবিশ্বের বাকিটা ছিল শক্তি দিয়ে ভরা। সব মিলিয়ে সেটি ছিল একটি মহাজাগতিক খিচুড়ি।

বিস্ফোরণের পর সময়ের সঙ্গে বস্তু ও শক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, মহাবিশ্ব প্রসারিত হল, উষ্মতা কমে দাঁড়াল $^{১}/_{১০}$ সেকেন্ড পরে ৩ হাজার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে, ১ সেকেন্ড পরে প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে আর প্রায় ১৪ সেকেন্ড পরে তিনশো কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে। প্রথম তিন মিনিট কাটার পরেই মহাবিশ্ব শীতল হয়ে প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে ছোটখাটো নিউক্লিয়াস তৈরির মতো উষ্মতায় (প্রায় একশো কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস) পৌঁছাল। প্রথম তৈরি হল ভারী হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস, যা শুধু একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন দিয়ে তৈরি। দুটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রন দিয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসও তৈরি হল। পরমাণু গঠনের পক্ষে উষ্মতা তখনও খুব বেশি, যার ফলে তৈরি হওয়া মাত্রই সেগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। বস্তু তখন ক্রমশই ছড়িয়ে চলেছে, তার উষ্মতা আর ঘনত্ব দুইই চলেছে কমে।

অনেক সহস্র বছর পরে উষ্মতা কমে এমন অবস্থায় এল যাতে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রন যোগ হয়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণু গঠন করতে পারে। উৎপন্ন গ্যাস শীঘ্রই মহাকর্ষের প্রভাবে আলগা দানা বাঁধতে শুরু করে। 'বিগ ব্যাং'-এর প্রায় ৫০০ কোটি বছর পরে এই দানাগুলিই শেষ পর্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আজকের মহাবিশ্বের তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি করেছে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে 'সুস্থিত অবস্থার' (steady state) তত্ত্ব নামে আর একটি তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব এখন যেমন, চিরকালই ঠিক একই রকম ছিল। মহাবিশ্বের যত প্রসারণ ঘটে, নতুন বস্তু ততই ক্রমাগত সৃষ্টি হয় এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যের ফাঁকগুলি ভরিয়ে ফেলে। এর ফলে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও প্রথম কয়েকটি মুহূর্তের সমস্যাগুলি আর থাকে না, যেহেতু আদি মহাবিশ্ব বলে কিছু ছিল না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু বিগ ব্যাং তত্ত্বটিকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু এর কারণ, পর্যবেক্ষণ থেকে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে তা বিগ ব্যাং মহাবিশ্বকেই সমর্থন করেন।

বিগ ব্যাং-এর সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণ

প্রথম সাক্ষ্যপ্রমাণটি আমরা পাই মহাবিশ্বের প্রসারণ থেকে যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। মহাবিশ্বের প্রসারণ থেকে এও মনে হয় যে প্রথম পর্যায়ে সমস্ত বস্তু অত্যন্ত ঘনভাবে পুঞ্জীভূত ছিল। বহুদূরের বস্তু কোয়েসার থেকে এর প্রমাণও আমরা পাই। আমরা যখন ৬ থেকে ৮ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোয়েসারের দিকে তাকাই, তখন তার আলো বের হওয়ার সময় সেটি যেমন ছিল সেরকমই দেখতে পাই। সে যুগে মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি বেশি থাকে তবে সেই ঘনত্বের কিছুটা চিহ্ন কোয়েসারের মধ্যে থাকা উচিত। আমরা কিন্তু সত্যই কোয়েসারের মধ্যে সেরকম অধিক ঘনত্বের দেখা পাচ্ছি।

বিগ ব্যাং তত্ত্বের সমর্থনে আর একটি বড় সাক্ষ্যপ্রমাণ আসে মহাজাগতিক পশ্চাদ-বিকিরণ (cosmic background radiation) থেকে। বহু বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে আসছেন যে দূর অতীতে যদি কোনো মহাজাগতিক বিস্ফোরণ হয়ে থাকে, তা থেকে উদ্ভূত বিকিরণ আজও মহাবিশ্বের মধ্যে থাকবে। এই বিকিরণ ক্ষীণ হতে পারে, মহাবিশ্বের প্রসারণ ও উষ্মতা হ্রাসের ফলে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তবুও তা থাকবেই। রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সত্যই একটি ক্ষীণ সংকেত (signal) আবিষ্কার করেছেন—এটি একটি রেডিও-তরঙ্গের গোলমালের মতো যা সর্বদা মহাশূন্যের সর্বত্র বিরাজমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা থেকে বোঝা যায় যে এই 'মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পশ্চাদ বিকিরণ' হল যে সুদূর অতীত 'বিগ ব্যাং' বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টিস্পন্দন ঘটেছিল, তারই নিদর্শন।

গত কয়েক দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরও একটি জিনিস আবিষ্কার করেছেন। সেটি হল বিভিন্ন মৌলের আদি-প্রাচুর্য (primordial abundance)। মহাবিশ্বের সৃষ্টির পরেই যে মৌলগুলি প্রথম গঠিত হয়েছিল, সেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামই মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা আলো পরীক্ষা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রতি ১০০টি পরমাণুর প্রায় ৯৩টিই হাইড্রোজেন পরমাণু

আর বাকি ৭টি হল হিলিয়াম পরমাণু। হিলিয়ামের চেয়ে ভারী মৌল অতি সামান্য পারমাণেই উপস্থিত। এ থেকে মনে হয় যে বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্ব এক অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন অবস্থা থেকে প্রসারণের সঙ্গে দ্রুত শীতল হয়েছিল। ওই উত্তপ্ত ও ঘন অবস্থা যতক্ষণ ছিল তাতে কিছু হাইড্রোজেন ফিউশনের ফলে হিলিয়ামে পরিণত হতে পেরেছিল। কিন্তু ওই অবস্থা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভারী মৌল গঠন করার মতো যথেষ্ট সময় টেঁকেনি। ওই মৌলগুলি অনেক পরে ভারী তারা-অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছিল।

অনুশীলনী—৭

(ক) বিগ ব্যাং ও সুস্থিত অবস্থার তত্ত্বের মধ্যে একটি প্রভেদ বিবৃত করুন।

(খ) নীচের পর্যবেক্ষণগুলির মধ্যে যে তিনটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিগ ব্যাং তত্ত্বকে সমর্থন করে সেগুলিতে টিক ✓ চিহ্ন দিন।

১. তারকার বর্ণালি-রেখায় বেগুনি-চ্যুতি ও লোহিত-চ্যুতি, দুইই দেখা যায়।

২. মহাবিশ্বের বস্তুরাশির মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সবচেয়ে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্য ভারী মৌলগুলি আছে অতি সামান্য পরিমাণে।

৩. নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোক-বর্ণালিতে লোহিত-চ্যুতি দেখা যায়, যার থেকে মনে হয় মহাবিশ্ব প্রসারণশীল।

৪. সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে রয়েছে এক মহাজাগতিক বিকিরণ।

উপসংহারে বলা যায় যে আমরা এমন এক প্রসারণশীল মহাবিশ্বের অধিবাসী যা অদ্ভুত রকম নিয়মিত ভাবে নূতন সব রহস্যের উদ্ভব ঘটায়। একটি প্রশ্নের উত্তর মিলতে মিলতে আরও অনেক প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন ধরুন, আজকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ। এটা কী প্রসারিত হতেই থাকবে? নাকি একদিন এর প্রসারণ থেমে যাবে? তখন কী ঘটবে—মহাবিশ্ব কী একই রকম থেকে যাবে, না সংকুচিত হতে শুরু করবে? আমরা এও দেখেছি যে চারিদিকে যেন নতুন চিন্তাধারা ও মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের কলাকৌশলের বান ডেকেছে। এই এককে মহাবিশ্বের রহস্যময় চরিত্র এবং তাকে বুঝতে আমাদের অদম্য প্রচেষ্টার সম্বন্ধে আমরা আপনাকে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়লাভের প্রয়োজন ছিল বলে কী আপনার মনে হয় না? এডউইন হাবল-এর শেষ গবেষণাপত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই এককটি শেষ করব :

'আমাদের এই পার্থিব নিবাস থেকে দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আমরা কল্পনা করতে চেষ্টা করি কেমন জগতে আমরা জন্মেছি। আজ আমরা মহাশূন্যে হাত বাড়িয়েছি। আমাদের নিকট প্রতিবেশকে আমরা ভালো করে চিনি। কিন্তু দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানও বিবর্ণ হয়ে যায়।...... অবশেষে ক্ষীণ অন্তিম দিগন্তে পর্যবেক্ষণের অনিশ্চিত ভ্রান্তির মধ্যে আমরা এমন সব পথচিহ্নের সন্ধান করি যেগুলি নিজেরাই কিছু সুস্পষ্ট নয়। এই অনুসন্ধান তবু চলতেই থাকবে কেননা এই আগ্রহ ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন। এ মেটার নয়, একে দমিয়ে রাখাও অসম্ভব।'

১০.৪ সারাংশ

এই এককে আমরা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি, তারকার বিবর্তন তথা মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তন সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এখন এই এককের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা যাক।

- আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাশূন্যের মানমন্দির, মহাশূন্য বা সন্ধানী প্রভৃতি নানা উপায়ে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
- মহাবিশ্বের নানা ঘটনাকে বুঝতে এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য তত্ত্ব বা মডেল গঠন করতে ওই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। এমন একটি তত্ত্ব হল তারকার বিবর্তন সম্পর্কিত।
- লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোক-বর্ণালির লোহিত-চ্যুতি লক্ষ্য করে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মহাবিশ্ব প্রসারণশীল।
- বিগ ব্যাং তত্ত্বই হল মহাবিশ্বের সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব মহাশূন্যের সর্বত্র একই সময়ে সংঘটিত এক বিপুল বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল।
- সুস্থিত অবস্থার তত্ত্ব বলে পরিচিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির অন্য একটি তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্ব এখন যেরকম, চিরকালই সেরকম ছিল এবং ভবিষ্যতেও সেইরকমই থাকবে। আদি মহাবিশ্ব বলে কোনোকিছু ছিল না।
- মহাবিশ্বের প্রসারণ, মহাজাগতিক পশ্চাদ বিকিরণ, মৌলের আদি প্রাচুর্য প্রভৃতি সাক্ষ্যপ্রমাণ বিগ ব্যাং তত্ত্বকে সমর্থন করে।

১০.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। নীচের সারণীর প্রথম স্তম্ভে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় স্তম্ভে তাদের বর্ণনা রয়েছে। পদ্ধতি ও মানানসই বর্ণনা তীরচিহ্ন দ্বারা যুক্ত করুন।

পদ্ধতি	বর্ণনা
(ক) আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান	(১) যন্ত্রপাতি সমেত মহাকাশযান প্রতিবেশী বিশ্বে পাঠানো হয়।
(খ) রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞান	(২) পৃথিবী পরিক্রমারত উপগ্রহে, চন্দ্রে অথবা অন্য কোনো গ্রহে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়।
(গ) মহাশূন্যের মানমন্দির	(৩) মহাশূন্য থেকে আগত উল্কা, কসমিক রশ্মি প্রভৃতি মহাবিশ্ব সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যও বহন করে।
(ঘ) মহাশূন্য সন্ধানী	(৪) গ্রহ, তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে আলো সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়।

(ঙ) মহাশূন্যের আগন্তুক

(৫) মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু থেকে নির্গত রেডিও-তরঙ্গ সংগৃহীত ও পরীক্ষিত হয়।

২। যে সকল পদ্ধতির সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাশূন্য থেকে আসা অবলোহিত, অতি-বেগুনি, এক্স রশ্মি বিশ্লেষণ করেন সেগুলি তালিকা দিন।

৩। (ক) যেসব তারার ভর ২৫M_S, ১০M_S, ০.৮M_s, সেগুলি লাল-দানব অবস্থার পর কীভাবে বিবর্তিত হওয়া সম্ভব?

(খ) নোভা ও সুপারনোভার মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। নীচে দেওয়া প্রতিটি মুহূর্তে বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের অবস্থা কেমন ছিল তা দুই-এক লাইনে বর্ণনা করুন।

(১) সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত :

(২) বিগ ব্যাং এর $^{১}/_{১০০}$ সেকেন্ড পর :

(৩) বিগ ব্যাং এর ৩ মিনিট পর :

(৪) বিগ ব্যাং এর ১০,০০০ বছর পর :

(৫) বিগ ব্যাং এর ৫০০ কোটি বছর পর :

১০.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

(ক) ৪৫০ মিটার, ৬৬৭ কিলোহার্ৎস

(খ) প্রায় ৩০ কোটি বা (৩ × ১০^{৮}) মি/সি

(গ) মিডিয়াম-ওয়েভ : ৫৩০ থেকে ১৬০৫ কিলোহার্ৎস। শর্ট-ওয়েভ : ৫ থেকে ১৮ মেগাহার্ৎস

(ঘ) গামা রশ্মি

(ঙ) রেডিও-তরঙ্গ

অনুশীলনী—২

(ক) ৪ × ১০$^{-৭}$ মিটার থেকে ৮ × ১০$^{-৭}$ মিটার; প্রায় ৭.৫ × ১০^{১৪} হার্ৎস ও ৩.৮ × ১০^{১৪} হার্ৎস।

(খ) নীল।

(গ) দৃশ্য আলো ও রেডিও-তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এদের মানগুলি লিখুন।

অনুশীলনী—৩

(ক) (১) রেডিও-টেলিস্কোপ রেডিও-তরঙ্গ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে মহাবিশ্বের অদৃশ্য অঞ্চলকে দৃশ্যমান করে। (২) সেগুলি আরও অনেক দূরে অবস্থিত মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কের সন্ধান করতে পারে। (৩) রেডিও-তরঙ্গ

ধূলির মেঘ ভেদ করে আসতে পারে, আলোকরশ্মি যা পারে না। (৪) রেডিও-টেলিস্কোপ এক বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্যই নির্মিত হয় কিন্তু আলোকীয় টেলিস্কোপ একই সঙ্গে সব আলোক-তরঙ্গই ধরতে পারে।

(খ) পালসার, রেডিও-নক্ষত্রমণ্ডলী, আন্তর্নক্ষত্র মহাশূন্যে জৈব অণু।

অনুশীলনী—৪

(ক) আইনস্টাইন মানমন্দির হল পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। পায়োনীয়ার-১০ একটি মহাকাশযান। সেটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে সৌরজগৎ পেরিয়ে রওনা হয়েছে।

(খ) রকেট, উঁচুতে ওড়া বেলুন ও আকাশযানে বসানো যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী—৫

তারকার উপাদান, উষ্মতা, ঔজ্জ্বল্য ও গতিবেগ।

অনুশীলনী—৬

(ক) গ্যাসের মেঘ, আদিতারকা, সুস্থিত তারকা।

(খ) গ্যাসের মেঘ সংকুচিত হলে কেন্দ্রাঞ্চলের উষ্মতা বাড়ে।

(গ) হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি হালকা নিউক্লিয়াসের ফিউশন, যাতে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়।

(ঘ) কেন্দ্রমুখী মহাকর্ষীয় টান আর বিকিরণের বহির্মুখী ঘাত যখন তুল্যমূল্য হয় তখন তারকা সুস্থিত অবস্থায় আসে।

অনুশীলনী—৭

(ক) বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল এক বিরাট বিস্ফোরণ দিয়ে। সুস্থিত অবস্থায় তত্ত্ব অনুযায়ী আদি মহাবিশ্ব বলে কিছু ছিল না। মহাবিশ্ব আজ যেমন, চিরকালই সেইরকম ছিল।

(খ) (২) (৩) ও (৪)

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। (ক) (৪), (খ) (৫), (গ) (২), (ঘ) (১), (ঙ) (৩)

২। মহাশূন্যের মানমন্দির, রকেট, বেলুন, মহাশূন্য-সন্ধানী প্রভৃতির সাহায্যে।

৩। (ক) কৃষ্ণগহ্বর, নিউট্রন তারা বা পাল্সার, শ্বেত বামন।

(খ) যখন কোনো শ্বেত বামন নক্ষত্র লক্ষগুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলা হয় নোভা। যে তারার কোরের ভর ৩ থেকে ১৫ তার বিস্ফোরণকে আমরা বলি সুপারনোভা।

৪। (ক) সমস্ত মহাবিশ্বে বিগ ব্যাং বিস্ফোরণ ঘটল, বস্তুরাশি মহাবেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

(খ) ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি মৌলকণা তৈরি হল।

(গ) ভারী হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হল।

(ঘ) হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অণু তৈরি হল।

(ঙ) তারকা ও নক্ষত্রমণ্ডলী জন্ম নিল।

একক ১১ □ সৌরজগৎ

গঠন

১১.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
১১.২ সৌরজগৎ : সাধারণ পর্যালোচনা
১১.৩ সূর্য : একটি আদর্শ তারা
১১.৪ গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতু
অধরা গ্রহ : বুধ
মেঘে ঢাকা গ্রহ : শুক্র
রক্তাভ গ্রহ : মঙ্গল
গ্রহাণুপুঞ্জ মেখলা : সৌরজগতের খণ্ডস্তূপ
অবগুণ্ঠিত আজব দানব : বৃহস্পতি
বলয়ঘেরা গ্রহ : শনি
দৃষ্টির অন্তরালের গ্রহেরা
ধূমকেতুর মেঘ
১১.৫ অতিপরিচিত পৃথিবী
১১.৬ সৌরজগতের উদ্ভব
১১.৭ কিছু পুরাকথা ও ভুল ধারণা
১১.৮ সারাংশ
১১.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১১.১০ উত্তরমালা

১১.১ প্রস্তাবনা

দশম এককে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের অভিযানে ব্যবহৃত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের এমন কিছু আধুনিক পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছি। এইসব অভিযানে যেসব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং যেসব উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তারকার বিবর্তনের কিছু তত্ত্বও উপস্থাপিত হয়েছে। দশম এককে আপনি এগুলি পড়েছেন। ওই এককটি পড়ার সময় আপনার নিশ্চয়ই মনে হয়েছে যে মহাবিশ্ব

সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নেহাতই অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকটি নূতন উত্তর কিছু কিছু নূতন প্রশ্ন তুলে ধরে। তবে এই বিশাল ও সুপ্রাচীন মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে যা আমরা আরও একটু ভালোভাবে জানি। সেটি হল সৌরজগৎ, আমাদের এই পৃথিবী যার একটি অংশ।

এই এককে আপনি সৌরজগতের কথা পড়বেন। সৌর পরিবার, এর সদস্যদের বৈশিষ্ট্য এবং সৌরজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বর্তমানে যতটা জানা সম্ভব হয়েছে তা আমরা বর্ণনা করব। সৌরজগতের মধ্যে অন্য সদস্যদের চেয়ে আমরা পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চন্দ্র সম্বন্ধেই বেশি জানতে পেরেছি। তাই আমরা এ দুটির কিছুটা বিশদ বিবরণ দেব।

গ্রহদের গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি জানি। তবু মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে গ্রহের প্রভাবের সম্বন্ধে নানা অবাস্তব ও ভুল ধারণা পোষণ করে। আমরা সংক্ষেপে এর কারণ বিশ্লেষণ করব এবং এই ধারণাগুলির অযৌক্তিকতা দেখাতে চেষ্টা করব। এই এককের সঙ্গেই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ হবে। দ্বাদশ এককে আপনি প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনের কথা পড়বেন। সেও এক সমান আশ্চর্যজনক কাহিনী।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনার যেগুলি পারা উচিত সেগুলি হল :

- সূর্য, গ্রহ, তাদের উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতু, অর্থাৎ সৌরজগতের বিভিন্ন সদস্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সৌরজগতের সৃষ্টির সম্ভাব্য পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমাদের গ্রহ পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের জীবনের উপর গ্রহের গতির প্রভাব সম্বন্ধে অবাস্তব ও ভুল ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১১.২ সৌরজগৎ : সাধারণ পর্যালোচনা

রাত্রিতে আপনি আকাশে অনেক তারা দেখতে পান। কিন্তু দিনে একটি তারাই দেখা যায় আর সেটি হল সূর্য। তার কারণ হল সূর্যই আমাদের নিকটতম তারা। এছাড়া সূর্যের কোনো অসাধারণত্ব নেই। অন্য যেসব তারা অনেক দূরে আছে তাদের আলো এত ক্ষীণ যে দিনের বেলায় তাদের দেখাই যায় না। সূর্যের এই আপাত চমৎকারিত্বের ফলে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে এমন চিন্তার জন্ম হয়েছিল যে সূর্যই মহাবিশ্বের প্রধান। আসলে এটি তার নিজস্ব পরিবার অর্থাৎ সৌরজগতেরই প্রধান। এই পরিবারে আছে পৃথিবী সমেত নয়টি গ্রহ, তাদের সব উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ আর ধূমকেতু। সূর্য থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব হিসাবে সাজালে সূর্যকে প্রদক্ষিণরত এই নয়টি গ্রহ হল : বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস বা অরুণ (Uranus), নেপচুন বা বরুণ (Neptune) এবং

প্লুটো বা যম (Pluto) (চিত্র ১১.১)। বুধ আর শুক্র ছাড়া আর সব গ্রহেরই চারিদিকে পরিক্রমণরত ছোট-বড় উপগ্রহ আছে। তাছাড়া সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে অগণিত গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতুও আছে।

সমস্ত গ্রহ, গ্রহাণু এবং কিছু ধূমকেতু সূর্যকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে (চিত্র ১১.২ দেখুন)। তাদের কক্ষপথগুলি প্রায় একই সমতলে আছে। একখণ্ড কার্ডবোর্ডের উপর কক্ষপথগুলি এঁকে সৌরজগতের মোটামুটি নির্ভুল একটি মডেল তৈরি করতে পারবেন। এই মডেলে একটি মাত্র ব্যতিক্রম হবে প্লুটোর কক্ষপথ কেননা সেটি সৌরজগতের সাধারণ সমতলের সঙ্গে প্রায় ১৭° কোণে হেলে আছে। পৃথিবীর উত্তর মেরুর দিকটিকে আমরা সৌরজগতের 'উত্তর' দিক বলে ধরি। এই 'উত্তর' দিক থেকে দেখলেই সব গ্রহকেই সূর্যের চারিদিকে বামাবর্তে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) ঘুরতে দেখা যায়। সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণই গ্রহদের আবদ্ধ রাখে তাদের পরিক্রমার কক্ষপথে। সূর্য যদি হঠাৎ গরহাজির হত তবে সব গ্রহই তাদের কক্ষপথের স্পর্শক বরাবর সরলরেখায় ছুটে বেরিয়ে যেত।

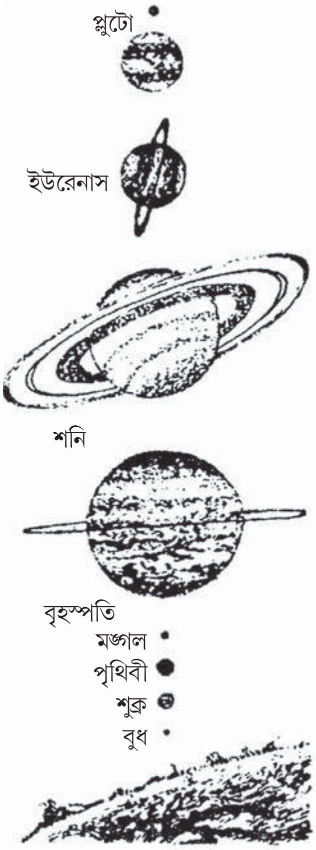

(ক)

(খ)

চিত্র ১১.১ : (ক) সৌরজগৎ ও গ্রহদের আকারের তুলনামূলক চিত্র (খ) সৌরজগতের কিছু সদস্যের প্রতীক চিহ্ন

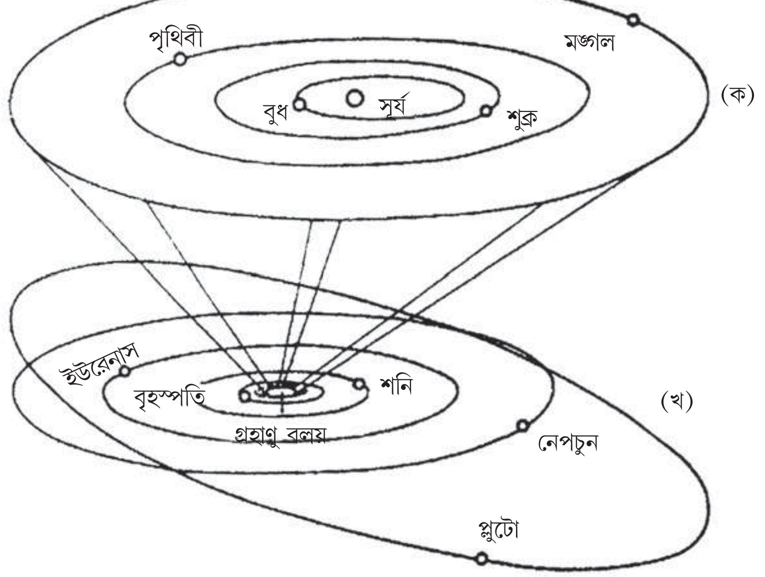

চিত্র ১১.২ : গ্রহদের কক্ষপথ (ক) অভ্যন্তরস্থ গ্রহ (বড় করে দেখানো) (খ) বহিঃস্থ গ্রহণ

সূর্যই সৌরজগতের সবচেয়ে প্রতাপশালী সদস্য। হিসাব করে দেখা যায়, সূর্যের ভর প্রায় ২ × ১০^{৩৩} গ্রাম, যা সমগ্র সৌরজগতের ভরের প্রায় ৯৯.৮৭ শতাংশ। নয়টি গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি আর শনিই সবচেয়ে ভারী। তাদের মিলিত ভর সব গ্রহের ভরের ৯২ শতাংশ। সূর্য যেমন নিজের আলো নিজেই উৎপন্ন করে, গ্রহেরা তা পারে না। তারা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে বলেই তাদের উজ্জ্বল দেখায়। কোনো গ্রহ বা অন্য বস্তুর বাতাবরণের পরিমাণ ও চরিত্রের উপরই সেটি সূর্যের আলোর কত শতাংশ প্রতিফলিত করবে তা সরাসরি নির্ভর করে। যেসব গ্রহ বা উপগ্রহের কোনো বাতাবরণ নেই, যেমন বুধ বা চন্দ্র, তারা অপেক্ষাকৃত কম আলো প্রতিফলিত করে। চন্দ্রকে যে এত উজ্জ্বল দেখায় তার কারণ সেটি পৃথিবীর খুব কাছে আছে।

শুক্র আর ইউরেনাস ছাড়া সব গ্রহই তাদের অক্ষের উপর বামাবর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘোরে। এইসব গ্রহেই তাই পৃথিবীর মতো সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। শুক্র আর ইউরেনাস দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার মতো ঘোরে, তাই এই দুটি গ্রহে সূর্য পশ্চিমদিকে উঠে পূর্বদিকে অস্ত যায়। ইউরেনাস ছাড়া সব গ্রহের আবর্তনের অক্ষ মোটামুটিভাবে তাদের কক্ষতলের সঙ্গে লম্বভাবে আছে। কিন্তু ইউরেনাসের আবর্তনের অক্ষ প্রায় তার কক্ষতলেই রয়েছে, যেন ইউরেনাস গ্রহ উল্টে পড়ে গেছে।

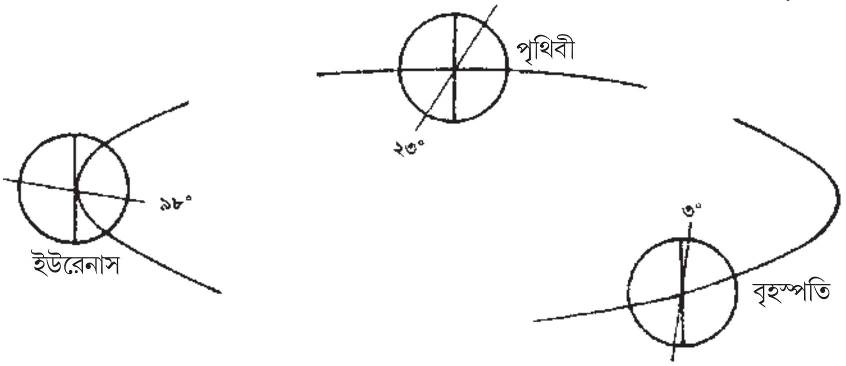

চিত্র ১১.৩ : কক্ষপথের উপর লম্বের সঙ্গে কয়েকটি গ্রহের ঘূর্ণনাক্ষের আনতি কোণ।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই চারটি গ্রহকে অভ্যন্তরস্থ বা পার্থিব (অর্থাৎ পৃথিবীর মতো) গ্রহ বলা হয়। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোকে বলা হয় বহিস্থ বা বৃহস্পতির মতো গ্রহ। অভ্যন্তরস্থ গ্রহ ও বহিস্থ গ্রহদের মধ্যে একটা পরিষ্কার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে। অভ্যন্তরস্থ গ্রহগুলি বেশিরভাগই ধাতু ও পাথরে তৈরি। তাদের গড় ঘনত্ব ৪ থেকে ৫ সেমি/সেমি^{৩}। গ্রহাণুগুলিও উপাদানে অভ্যন্তরস্থ গ্রহগুলির মতো। অন্যদিকে বহিস্থ গ্রহগুলি প্রায় সবটাই গ্যাস আর বরফ। তাদের গড় ঘনত্বও মাত্র ১ থেকে ২ গ্রাম/সেমি^{৩}।

অনুশীলনী—১

কোন্ কোন্ বস্তু নিয়ে সৌরজগৎ তৈরি হয়েছে?

এ পর্যন্ত সৌরজগতের একটা সাধারণ পর্যালোচনা করা গেল। এবার এর প্রতিটি সদস্যকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আমরা সৌর-পরিবারের প্রধান, সূর্যকে দিয়েই শুরু করি।

১১.৩ সূর্য : একটি আদর্শ তারা

আমাদের কাছে সূর্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারা। এটাই একমাত্র তারা যেটি বিশদভাবে পরীক্ষা করার মতো যথেষ্ট কাছে আছে। সূর্যের মহিমার একটা কারণ এর আকার। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১১০ গুণ। এর আয়তন সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো ধারণা করা যাবে যদি বলা যায় যে সূর্যের আয়তনের মধ্যে দশ লক্ষ পৃথিবী সহজেই ধরে যাবে। আগেই আমরা বলেছি যে সূর্যের ভর ২×১০^{৩৩} গ্রাম অর্থাৎ পৃথিবীর ভরের ৩,০০,০০০ গুণেরও বেশি। সূর্যের গড় ঘনত্ব অর্থাৎ প্রতি একক আয়তনের ভর প্রায় ১.৪ গ্রাম/সেমি^{৩}। আপনি দশম এককে তারা হিসাবে সূর্যের সম্বন্ধে কিছুটা পড়েছেন। সেই অংশটি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করে দেখুন।

অনুশীলনী—২

পাশের জায়গায় সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

(ক) সূর্য প্রধানত কী দিয়ে তৈরি?

(খ) সূর্যের শক্তির উৎস কী?

(গ) আরও কত বছর ধরে সূর্য এইভাবে ‘জ্বলতে’ থাকবে?

(ঘ) শক্তির উৎস শেষ হয়ে গেলে সূর্য বিবর্তনের কোন্ কোন্ পর্যায় অনুসরণ করবে?

সূর্যকে যদি অপরিবর্তনশীল বলে মনে হয়, এটি নিজের অক্ষের উপর ২৫ দিনে একবার ঘোরে। সময়ে সময়ে উপরের তলে জোড়ায় জোড়ায় বা এক এক গুচ্ছে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কালো দাগগুলিকে বলা হয় সৌরকলঙ্ক (sun spots)। এগুলির সরণ সূর্যের আবর্তনের একটি নির্দেশক।

গ্যালিলিওই প্রথম এই ব্যাপারটি বুঝেছিলেন। সৌরকলঙ্ক আসলে সূর্যের পৃষ্ঠে এমন একটি অঞ্চল যেখানকার গ্যাসের উষ্ণতা চারিদিকের গ্যাসের তুলনায় প্রায় ১০০০° সেলসিয়াস কম (চিত্র ১১.৪)। ১১ বছরের একটি চক্রে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। অনেকটা সময় নিয়ে দেখলে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে কখনও কম থাকে, কখনও বেশি হয়।

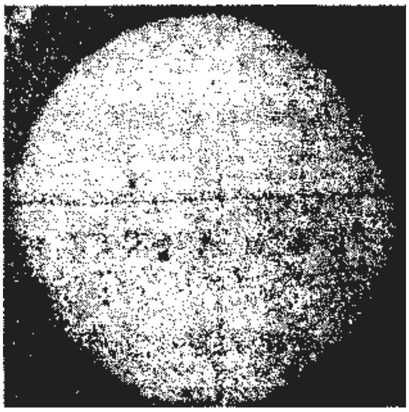

চিত্র ১১.৪ : সূর্যের আলোকমণ্ডলে সৌরকলঙ্ক

সূর্যের স্তর

সূর্যের সমগ্র দেহ অনেকগুলি স্তরে তৈরি। সূর্যের দৃশ্যমান তলটি যে স্তরের অন্তর্গত তা হল আলোকমণ্ডল (Photosphere)। এই তলটিই সূর্যের মূলদেহ ও বাতাবরণের সীমানা। আমরা যখন সূর্যের ব্যাসের কথা বলি তখন আমরা আসলে এই আলোকমণ্ডলের ব্যাসের উল্লেখ করি। আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস। সূর্যের সবথেকে ভিতরের স্তরটি হল তার কোর। এখানেই পারমাণবিক বিক্রিয়ার দ্বারা সূর্যের শক্তি উৎপন্ন হয়। কোর আর আলোকমণ্ডলের মাঝখানে আরও কতকগুলি স্তর আছে। এখানে আমরা সেগুলির বর্ণনা করব না।

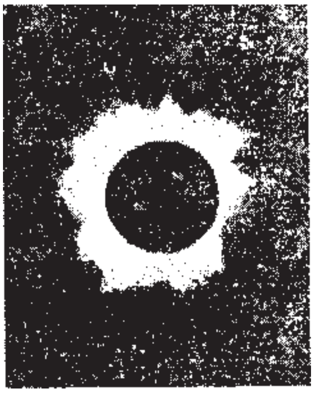

চিত্র ১১.৫ : পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের করোনার চিত্র।

সূর্যের মূল অবয়বের মতো, তার বাতাবরণেরও কয়েকটি স্তর আছে। সবচেয়ে বাইরের স্তরটির নাম করোনা (Corona)। সাধারণভাবে, আলোকমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্যের জন্য করোনাটি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের করোনা তার পূর্ণ মহিমায় দেখা দেয় (চিত্র ১১.৫)। করোনাটি পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত এমনকি তাকে ছাড়িয়েও বিস্তৃত।

সৌরবায়ু ও সৌরছটা (Solar wind and solar flare)

সৌর পরিবারের অধিকাংশই সর্বদা সূর্য থেকে নির্গত বস্তুর স্রোতে ডুবে গেছে। সূর্যের বাতাবরণ থেকে নিয়তই ইলেকট্রন ও প্রোটনের ধারা নির্গত হয় ও সৌরজগৎ পাড়ি দিয়ে প্রবাহিত হয়। আহিত কণার এই দ্রুতগতি প্রবাহকেই বলা হয় সৌরবায়ু। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে প্রায় দশ লক্ষ টন পদার্থ সৌরবায়ু রূপে বেরিয়ে আসে। এইসব আহিত কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এর ফলে উত্তর মেরুতে অরোরা বরিএলিস (aurora borealis) বা উত্তরপ্রভা এবং দক্ষিণ মেরুতে অরোরা অস্ট্রালিস (aurora australis) বা দক্ষিণপ্রভার সৃষ্টি হয়। এইসব প্রাকৃতিক আলোকসজ্জা সত্যিই চমকপ্রদ সব দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

সৌরছটা হল সূর্যপৃষ্ঠের ও সূর্যের বাতাবরণের সবচেয়ে সক্রিয় ঘটনার নিদর্শন। এই ঘটনার অতি অল্প

সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। সাধারণত সৌরকলঙ্কের কাছাকাছি সৌরছটা দেখা যায়। সূর্যপৃষ্ঠের খানিকটা অঞ্চল হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আলো, রেডিও-তরঙ্গ ও এক্সরশ্মির রূপে শক্তি এবং ইলেকট্রন ও প্রোটনের মতো সৌরপদার্থ প্রবল বেগে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সূর্য আমাদের নিকটতম তারকা হওয়ায় এটিকে আমরা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে পেরেছি। এখানে আমরা সূর্যের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করেছি। সৌরজগতের অন্যান্য সদস্যদের কথা পড়ার আগে আপনি নিচের অনুশীলনীটি করে দেখতে পারেন।

অনুশীলনী—৩

(ক) কোন্ পর্যবেক্ষণ থেকে সূর্যের আবর্তন বোঝা যায়?

(খ) কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক ঘটনা সূর্যের সক্রিয়তাকে সূচিত করে?

১১.৪ গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতু

এই অংশে আপনি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতুর সম্বন্ধে পড়বেন। এখানে আমরা পৃথিবী ও চন্দ্রের কথা আলোচনা করব না, কেননা পরের অংশে এগুলির দিকে আমরা একটু গভীরভাবে নজর দেব। ১১.১ সারণিতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহে যে সমস্ত সন্ধানী পাঠানো হয়েছে সেগুলির তালিকা দেওয়া হল। এগুলির বিভিন্ন গ্রহের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, উষ্মতা বাতাবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছে। আপনি আরও বেশি জানতে চাইলে এই পর্যায়ের শেষে তালিকাভুক্ত বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন।

সারণি ১১.১

গ্রহ	বুধ	শুক্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি ও উপগ্রহ আয়ো ও ইউরোপা, শনি ও উপগ্রহ টাইট্যান, ইউরেনাস ও উপগ্রহ মিরান্ডা, নেপচুন, প্লুটো
সন্ধানী সমূহ	মেরিনার শ্রেণি	ভেনেরা মেরিনার পায়োনীয়ার শুক্র অভিযান	মেরিনার ভাইকিং মার্স পাথফাইন্ডার	ভয়েজার, পায়োনীয়ার, গ্যালিলিও

পর্যবেক্ষণ : গ্রহের পৃষ্ঠতলের বৈশিষ্ট্য, বাতাবরণের অবস্থা, রাসায়নিক সংযুতি, উষ্মতা

১১.৪.১ অধরা গ্রহ : বুধ

সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ বহুদিন রহস্যাবৃত ছিল। একে সূর্যের আলোকছটা, তায় বুধের ক্ষুদ্র আকার, এই দুই-এর ফলে বুধকে পরিষ্কার দেখাই শক্ত। অল্পদিনের জন্য বুধ যখন সূর্যোদয়ের ঠিক আগে উদিত হয় তখন তাকে পূর্বের আকাশে ভোরের একটি তারা হিসেবে দেখা যায়। তারপর আবার অল্প কিছুদিন এটিকে পশ্চিমের আকাশে সন্ধ্যার তারা হিসেবে সূর্যাস্তের ঠিক পরে অস্ত যেতে দেখা যায়। খালি চোখে চাঁদকে যত স্পষ্টভাবে দেখা যায়, এখনকার সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ দিয়েও বুধকে ততটা স্পষ্ট দেখা যায় না।

চিত্র ১১.৬ : বুধ

চিত্র ১১.৭ : শুক্র

বুধের আলোকচিত্রে দেখা যায় তার পৃষ্ঠে বেশ বিস্তৃত সমতল অঞ্চলের ব্যবধান অনেক গর্ত ও ভাঁজ রয়েছে (চিত্র ১১.৬)। বুধের কোনো বাতাবরণ নেই। এর একদিক সর্বদাই সূর্যের দিকে ফেরানো এবং তার উষ্ণতা প্রায় ৪২৭° সেলসিয়াস। এর অন্ধকার দিকটির উষ্ণতা প্রায় –২৭০° সেলসিয়াস। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই।

১১.৪.২ মেঘে ঢাকা গ্রহ : শুক্র

গ্রহদের মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী শুক্র। শুক্র যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় মাত্র ৪ কোটি কিলোমিটার। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠতল আমাদের দৃষ্টি থেকে সবসময়েই ঢাকা থাকে ৮০ কিলোমিটার পুরু ঘন হলদেটে-সাদা মেঘে (চিত্র ১১.৭)। সূর্য ও চন্দ্রের পর শুক্রই আকাশে তৃতীয় উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, কেননা এর দূরত্বও কম আর সাদা মেঘ আপতিত সূর্যালোকের ৭৬ শতাংশই প্রতিফলিত করে। শুক্র কখনো কখনো এত উজ্জ্বল হয় যে বায়ুমণ্ডলের আদর্শ অবস্থায় দিনের বেলায় খালি চোখেও এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। শুক্র যখন সন্ধ্যাতারা তখন সূর্যাস্তের ৩ ঘণ্টা পরে, আর যখন সেটি ভোরের শুকতারা তখন সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টা আগে এটিকে সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। নবম

এককে পড়েছেন যে ঠিক চন্দ্রের মতো শুক্রেরও কলার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। শুক্রকে সব কলায় দেখতে প্রায় ২০ মাস সময় লাগে।

সন্ধানীগুলির সাহায্যে যতদূর জানা গেছে, শুক্র প্রচণ্ড তপ্ত ঝলসানো একটি গ্রহ। এর পৃষ্ঠতলের উষ্মতা প্রায় ৪৮০° সেলসিয়াস। এর বাতাবরণের ৯৬ শতাংশই হল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আর তার সঙ্গে আছে সালফিউরিক অ্যাসিড, অল্প হাইড্রোক্লোরিক ও হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিডের মেঘ। খুব সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন, আর্গন, সালফার ডাই-অক্সাইড আর কার্বন মনোক্সাইডও আছে সেই সঙ্গে। বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর তুলনায় ৯০ গুণ বেশি। দগ্ধ করা তাপ, চূর্ণ করা চাপ আর বিষাক্ত সব গ্যাস মিলে শুক্রকে ঠিক পুরাকাহিনীর প্রেমের দেবী বলে মনে হয় না। যা মনে হয় তা হল সাক্ষাৎ নরক! শুক্রগ্রহে প্রাণ কখনোই বাঁচতে পারে না।

শুক্রপৃষ্ঠে এই প্রচণ্ড উষ্মতার কারণ হল যাকে আমরা বলি গ্রীন হাউস অভিক্রিয়া (Green house effect)। সূর্যের আলো শুক্রের মেঘ ও বাতাবরণকে ভেদ করে তার পৃষ্ঠতলে পৌঁছায়। শুক্রের পৃষ্ঠ গরম হয়ে অবলোহিত রশ্মি বিকীর্ণ করে। কিন্তু তার বাতাবরণের কার্বন ডাই-অক্সাইড ওই অবলোহিত বিকিরণকে বার হতে দেয় না। ফলে সূর্যের তাপের খুব সামান্য অংশই বেরিয়ে যেতে পারে এবং বেশিরভাগই শুক্রের বাতাবরণের মধ্যেই আটকে পড়ে। এর ফলে শুক্রপৃষ্ঠের উষ্মতা বেড়ে যায়।

মানুষ মেঘে ঢাকা শুক্র গ্রহের রহস্য উন্মোচন করার পর শুক্র গ্রহকে বাসযোগ্য করে তোলার অনেক পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছে। এর একটি হল গ্রহটির বাতাবরণে এমন কিছু ক্ষুদ্র জীবকে ছেড়ে দেওয়া যারা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করবে। এতে বাতাবরণের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ক্রমশ কমবে এবং গ্রীন হাউস অভিক্রিয়াও এর ফলে কমে আসবে। এর ফলে গ্রহের পৃষ্ঠ শীতল হয়ে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবে। যখন বৃষ্টি নামবে, তাপ ধরে রাখা মেঘও ক্রমশ কেটে যাবে। এসবের ফলে এমন একটি গ্রহের সৃষ্টি হবে যা অক্সিজেনে ভরা এবং যা নানা ধরনের প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট শীতল। হয়তো এই গ্রহে তখন মানুষেরও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। আজ এসব নেহাতই গল্পকথা মনে হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে বেশকিছু সম্ভাব্য ধারণাও আছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে এটি বাস্তবেও পরিণত হতে পারে।

১১.৪.৩ রক্তাভ গ্রহ : মঙ্গল

শুক্রের পর মঙ্গলই আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। মঙ্গল অনেকটাই যেন পৃথিবীর মতো। এর দুই মেরুতে জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইড আর বরফের ঢাকনা আর এর বাতাবরণে ভেসে থাকা সাদা মেঘ ও উন্মত্ত ধূলিঝড়। মঙ্গলের লাল জমির চেহারা ঋতুর সঙ্গে পাল্টে যায়। এর মধ্যে ঘন রঙের কিছু বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে যেগুলিকে বলা হয় মারিয়া (Maria) বা সমুদ্র। মঙ্গলেরও দিন হয় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায়। মঙ্গলে শীত গ্রীষ্ম আছে, দুটিই প্রায় পৃথিবীর এগারো মাস লম্বা। সূর্য থেকে দূরত্ব বেশি হওয়ায় মঙ্গলগ্রহের ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব অনেক বেশি।

মঙ্গল গ্রহে প্রাণ আছে এমন ভাবতে মানুষ বহুদিন প্রলুব্ধ হয়েছে। ১৮৭৭ সালে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী শিয়াপারেলি (Schiaparelli) মঙ্গালের আলোকিত অঞ্চলগুলির ওপর দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যাওয়া একক ও যুগ্মরেখার এক জটিল জালিকা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এগুলির নাম দিয়েছিলেন কানালি (Canali)। ইটালিয়ান ভাষায় কানালি শব্দের অর্থ নালী বা গর্ত। কিন্তু কথাটি সঙ্গো সঙ্গো ইংরাজীতে তর্জমা হয়ে দাঁড়াল ক্যানাল (Canal) বা খাল-এ। এবং তখন থেকে মানুষ চিন্তা করে আসছে ওই খাল কে কেটেছে আর কেমন করে কেটেছে। তবে কি ওই গ্রহে প্রাণী ছিল?

মঙ্গালের চারিদিকে কক্ষপথে অনেক উপগ্রহ এ পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়েছে। কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগার মঙ্গালের মাটিতে নেমেছে। সমস্ত গ্রহটির মানচিত্র আঁকা হয়েছে। মঙ্গালের পৃষ্ঠে উল্কার আঘাতে তৈরি ৫ থেকে ১২১ কিলোমিটার ব্যাসের অনেক গর্ত আছে (চিত্র ১১.৮), বিশাল আগ্নেয়গিরিও আছে। মঙ্গালের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট অলিম্পাস উচ্চতায় মাউন্ট এভারেস্টের তিনগুণ। এটি এখন আর জীবন্ত নেই। মঙ্গালের পৃষ্ঠে উঁচু শৈলশিরা আর গভীর উপত্যকা আছে।

ছবিতে এখনকার গর্তের পাশ দিয়ে আগে যেখানে জলধারা বয়ে যেত সেখানে দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। কোটি কোটি বছর শুকনো হয়ে পড়ে থাকা নদীখাতও দেখা যায়। মঙ্গালের পৃষ্ঠের নানা চিহ্ন থেকে মনে হয় অতীতে মঙ্গালের বাতাবরণ ও সমুদ্র, দুইই ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো ভাইকিং সন্ধানীগুলি সত্যিই এমন নিদর্শন পেয়েছে যার থেকে মনে হয় যে একসময় এই গ্রহে তরল জলের প্রবাহ ছিল এবং এর বাতাবরণও এখন যেমন তার চেয়ে অনেক ঘন ছিল। মঙ্গালের মাটিও পৃথিবীর মাটির মতো বেশিটাই সিলিকেট দিয়ে তৈরি। তবে ওই মাটির শতকরা ১৬ ভাগ হল লোহার অক্সাইড, যার ফলে মঙ্গালের মাটির রং লাল।

> সিলিকেট বলতে সিলিকন, অক্সিজেন এবং অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি কোনো ধাতুর যৌগকে বোঝায়।

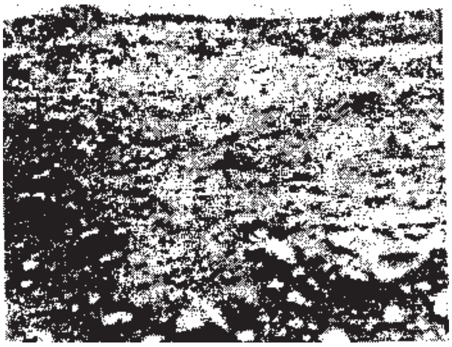

চিত্র ১১.৮ : মঙ্গালের পৃষ্ঠের চিত্র

মঙ্গালের বায়ুমণ্ডলের চাপ খুব কম। পৃথিবীতে সমুদ্রতল থেকে ৩২ কিলোমিটার উচ্চতায় যে চাপ, মোটামুটি তার সমান। মঙ্গালের অতি বিরল বাতাবরণের ৯৫ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড। বাকিটা নাইট্রোজেন, আর্গন আর সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প। খুব অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর ওজোনও দেখা গেছে। মঙ্গালের বাতাবরণে জমাটবাঁধা জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড আর লালচে ধুলোর মেঘ থাকলেও, সূর্যের তাপ ধরে রাখার মতো যথেষ্ট গ্যাস সেখানে নেই। তার ফলে মঙ্গাল খুব শীতল গ্রহ।

এর পৃষ্ঠের উষ্ণতা নিরক্ষরেখার কাছে ও মধ্যাহ্নে ২১° সেলসিয়াস থেকে ২৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু রাত্রিতে সেটা নেমে যেতে পারে –৮৪° সেলসিয়াসে। ঠাণ্ডা, চরম শুষ্কতা, প্রচণ্ড অতিবেগুনি বিকিরণ এবং অত্যন্ত কম অক্সিজেন—সব মিলিয়ে মঙ্গালের বর্তমান অবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাণীদের কাছে খুবই প্রতিকূল। মঙ্গালের উপর ভাইকিং-এর পরীক্ষায় প্রাণের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না।

মঙ্গালের দুটি স্বাভাবিক উপগ্রহ আছে। এদের নাম ফোবস (Phobos অর্থাৎ ভয়) ও ডিমস্ (Deimos অর্থাৎ আতঙ্ক)। ফোবসের ব্যাস ২৭ কিলোমিটার, মঙ্গালগ্রহ থেকে দূরত্ব প্রায় ৯,৩০০ কিলোমিটার। ডিমস্ আরও ছোট, এর ব্যাস মাত্র ১৪ কিলোমিটার। এটি মঙ্গালের পৃষ্ঠ থেকে ২৪,০০০ কিলোমিটার দূরে আছে। মঙ্গালের কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেওয়া চিত্র থেকে দেখা গেছে যে দুই উপগ্রহই আকৃতিতে অত্যন্ত অনিয়মিত, কতকটা আলুর মতো। দুটি গায়েই বড় বড় গর্ত, যেগুলি অতীতে কোনো সময়ে উল্কাপিণ্ডের আঘাতে সৃষ্ট হয়েছে।

১১.৪.৪ গ্রহাণুপুঞ্জের মেখলা : সৌরজগতের খণ্ডস্তূপ

মঙ্গাল আর বৃহস্পতির কক্ষ দুটির মধ্যে ৫৫ কোটি কিলোমিটার ফাঁক রয়েছে। এই ফাঁকের মধ্যে পাথর ও ধাতুর তৈরি হাজার হাজার বস্তু আছে, যেগুলি মাপে ধুলোর কণা থেকে শুরু করে কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত। এগুলি হল গ্রহাণু। মনে করা হয় যে এগুলি হল আদিম সৌর পদার্থ যা শেষ পর্যন্ত দানা বেঁধে গ্রহের রূপ নিতে পারেনি। প্রথম গ্রহাণুটি আবিষ্কৃত হয় ১৮০১ সালে। এর আবিষ্কর্তা গিউসেপ্পি পিয়াৎসি (Guiseppi Piazzi) এর নাম দেন সেরেস (Ceres)। এটি ৯৬০ কিলোমিটার চওড়া। আজ পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে।

বেশিরভাগ গ্রহাণু আকৃতিতে সুগোল নয়। শূন্যে ভাসমান অবস্থায় তারা এক এক পরিমাণ আলো প্রতিফলিত করে। তাদের অনিয়মিত আকৃতি থেকে মনে হয় যে তাদের উৎপত্তি হয়েছে হয় কোনো সংঘর্ষে অথবা কোনো বিস্ফোরণে। প্রতি বছর হাজার হাজার গ্রহাণুর টুকরো আকাশে আলোর রেখা সৃষ্টি করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে আসে। আকাশে ছুটে যাওয়া এই আলোর রেখাকেই আমরা বলি উল্কা (Meteor)। যেসব বস্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তাদের অনেকগুলোই বালির দানা বা নুড়ির মতো। বাতাসেই তারা জ্বলে ধ্বংস হয়ে যায়। যে বস্তুগুলি বায়ুমণ্ডল ভেদ করার পরেও টিকে থাকে আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ে, তাদের বলা হয় উল্কাপিণ্ড (meteorite)। উল্কাপিণ্ড হল একেবারে আমাদের গবেষণাগারের মধ্যে সৌরজগতের একটি টুকরোর মতো। উল্কাপিণ্ডের রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা সৌরজগতের সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই।

এ পর্যন্ত আমরা পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চন্দ্র ছাড়া অন্য পার্থিব গ্রহগুলির কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি। এরপর আপনি বহিঃস্থ গ্রহ ও ধূমকেতুর কথা পড়বেন। কিন্তু তার আগে নিচের অনুশীলনীটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে দেখুন।

অনুশীলনী—৪

নীচে দেওয়া জায়গায় সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন :

(ক) বুধ বা মঙ্গলের চেয়ে শুক্র অনেক বেশি আলো প্রতিফলিত করে কেন?

(খ) কোন্ কোন্ দিক দিয়ে মঙ্গল পৃথিবীর সদৃশ?

(গ) গ্রহাণুপুঞ্জকে আমরা সৌরজগতের ভগ্নস্তূপ বলেছি কেন?

(ঘ) উল্কা ও উল্কাপিণ্ডের প্রভেদ কী?

(ঙ) সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গের নাম কী?

১১.৪.৫ অবগুণ্ঠিত আজব দানব : বৃহস্পতি

বৃহস্পতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। পৃথিবীকে বৃহস্পতির সামনে রাখলে মনে হত যেন খাওয়ার থালার সামনে একটি ৫০ পয়সার মুদ্রা। অন্য সব গ্রহকে যোগ করলে তাদের মোট ভর যা, বৃহস্পতির ভর তার দ্বিগুণেরও বেশি। বৃহস্পতির ষোলোটি উপগ্রহের কথা জানা আছে। বৃহস্পতি শুধু বৃহত্তম গ্রহ নয়, এটি সবচেয়ে প্রাণবন্ত গ্রহও বটে। নানা রহস্য আর চমকপ্রদ ব্যাপারে এটি ভরা। এর উচ্চতম মেঘগুলি প্রধানত –১৪০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় জমাট বাঁধা অ্যামোনিয়া গ্যাসের কেলাস। গ্রহটি হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, আর খানিকটা অ্যামোনিয়া আর মিথেনের উত্তাল গ্যাসীয় বাতাবরণে ঢাকা। কয়েক হাজার কিলোমিটার গভীর এই বাতাবরণ ক্রমশ প্রচণ্ড চাপে ঘনীভূত হয়ে মন্থিত তরলে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই আবরণ একেবারে নিচের দিকে তরল ধাতুর তৈরি। বৃহস্পতির কেন্দ্রে আছে ছোট পাথরের তৈরি কোর। কোর-এর উষ্ণতা সম্ভবত ২০,০০০° সেলসিয়াসের মতো, অর্থাৎ সূর্যপৃষ্ঠের উষ্ণতার প্রায় তিনগুণ। এই কোরটির মধ্যে লোহা, সিলিকনের সঙ্গে অন্যান্য ভারী মৌলও থাকতে পারে। মোটের ওপর বৃহস্পতির গঠন অন্যান্য গ্রহের মতো না হয়ে অনেকটা যেন সূর্যের মতো।

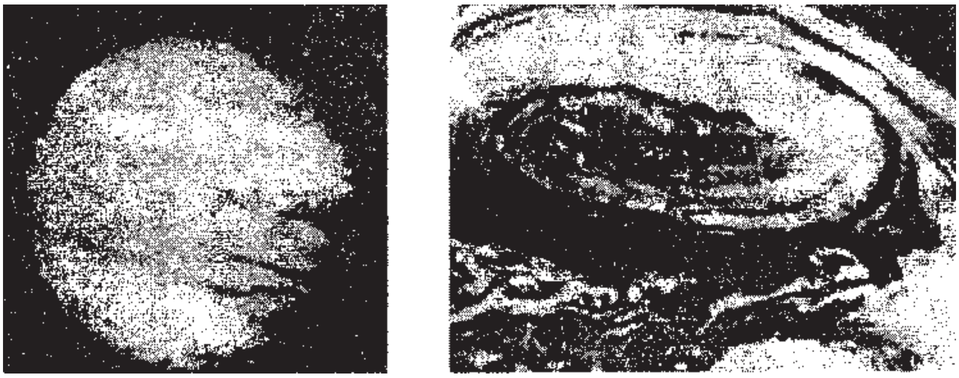

চিত্র ১১.৯ : (ক) বৃহস্পতি (খ) বৃহস্পতির বিরাট লাল দাগ

বৃহস্পতির পৃষ্ঠের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে প্রকট তা হল এর বিরাট লাল দাগ (চিত্র ১১.৯ খ)। এটি একটি উপবৃত্তাকার অঞ্চল, আকারে এত বড় যে পাশাপাশি দুটি পৃথিবী এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

দাগটির রং কখনও হয় ফিকে গোলাপী আবার কখনও আগুনের মতো লালচে-কমলা। বহুদিন ধরে এই বিরাট লাল দাগটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধাঁধায় ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত পায়োনীয়ার ও ভয়েজারের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে বৃহস্পতির লাল দাগটি তার বাতাবরণের একটি প্রকাণ্ড ঘূর্ণিঝড়।

বৃহস্পতি প্রধানত গ্যাস ও তরলের এক দ্রুত আবর্তনশীল গোলক। এর কোনো কঠিন পৃষ্ঠতল নেই। বৃহস্পতি থেকে রেডিও-তরঙ্গও নির্গত হয়। এর গঠন, আকার আর উপগ্রহের সংখ্যা থেকে মনে হয় যে বৃহস্পতি ঠিক গ্রহ নয়, বরং নিজস্ব সৌরজগৎ সমেত একটি 'তারকা', যেটি তারার মতো জ্বলে উঠতে পারেনি। মনে হয় যে বৃহস্পতি যদি মাত্র দশগুণ ভারী হত, তাহলে সেটি আমাদের সূর্যের মতো নিজস্ব শক্তি সৃষ্টি করতে পারত।

বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ আয়ো (IO), ইউরোপা (Europa), গ্যানিমিড (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto)-কে তাদের আবিষ্কর্তা গ্যালিলিওর নাম অনুযায়ী গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ বলা হয়। এই উপগ্রহগুলি নিজেরাই অবাক করা এক-একটি জগৎ। ৩২৪০ কিলোমিটার ব্যাসের আয়ো যেন একটি আগুনের গোলা। ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাত চলছে সেখানে। আয়োর পর আছে ৩১২০ কিলোমিটার ব্যাসের ইউরোপা, ৪৯০০ কিলোমিটার ব্যাসের গ্যানিমিড আর ৪৫৭০ কিলোমিটার ব্যাসের ক্যালিস্টো। ইউরোপা, মনে হয় জমাট বরফে তৈরি। গ্যানিমিড আর ক্যালিস্টোর উপরেও রয়েছে মোটা বরফের স্তর। বৃহস্পতির বাকি উপগ্রহগুলিকে অবশ্য ততটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি।

অ্যামোনিয়ার মেঘ, প্রবল রেডিও-তরঙ্গ নিঃসরণ প্রচণ্ড ঝড় আর আগুনে পোড়া অথবা বরফে জমা উপগ্রহ—এসব নিয়ে বৃহস্পতি গ্রহকে প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে খুব একটা সম্ভাব্য জায়গা বলে মনে হয় না তবু, কোনো কোনো দিক দিয়ে, চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে অবস্থায় প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল, আজকের দিনে বৃহস্পতির অবস্থা তার চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়। জল, অ্যামোনিয়া আর মিথেন, যা প্রাণের সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়, তা সবই বৃহস্পতির বাতাবরণে উপস্থিত। তাছাড়া বৃহস্পতির মেঘের মধ্যে সবসময়েই চলেছে বিদ্যুতের চমক আর বজ্রপাত। যদি বৃহস্পতি গ্রহে মাত্র দু'-একটি জৈব যৌগেরও দেখা মেলে, তাতে এই ধারণাটাই আরও শক্তিশালী হবে যে মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

১১.৪.৬ বলয়ঘেরা গ্রহ : শনি

খালি চোখে যেসব গ্রহ দেখা যায়, ষষ্ঠ গ্রহ শনি তাদের একবারে শেষে। শনির বলয়গুলি শুধু টেলিস্কোপের সাহায্যেই দেখা যায়। কিন্তু এই বলয়শ্রেণীর জন্যেই শনি সৌরজগতে সবচেয়ে সুন্দর আর আশ্চর্যজনক দৃশ্য। টেলিস্কোপ দিয়ে শনিকে দেখার পর গ্যালিলিও তাঁর বর্ণনায় বলেছিলেন গ্রহটির কান আছে। আসলে সেগুলি ছিল শনির নিরক্ষরেখাকে ঘিরে থাকা তিনটি বলয়। শনি হল দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ, আকার ও ভরে একমাত্র বৃহস্পতিই তার চেয়ে বড়। শনি বৃহস্পতির চেয়ে ঠান্ডা। তার মেঘের ওপরের উষ্ণতা –১৮০° সেলসিয়াস। বৃহস্পতির মতো শনিও প্রধানত হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামে তৈরি। তার সঙ্গে

আছে খুব সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়া, মিথেন ও অন্যান্য যৌগ। শনির গড় ঘনত্ব জলের চেয়ে কম। অর্থাৎ যথেষ্ট বড় মহাসাগরে ডুবিয়ে দিলে শনি ভাসতেই থাকত।

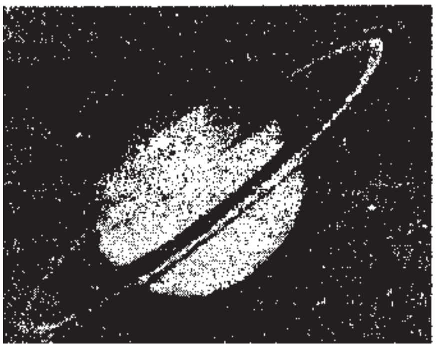

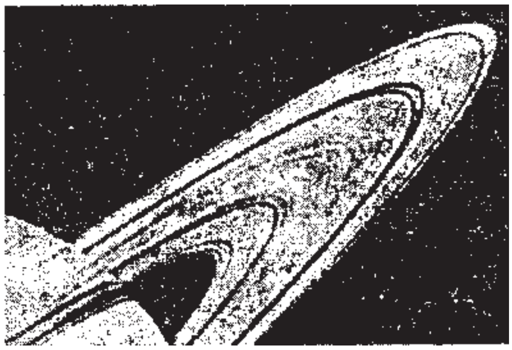

চিত্র ১১.১০ : (ক) শনিগ্রহ (খ) শনির বলয়শ্রেণী

শনির সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল তার বলয়শ্রেণী, যার জন্য গ্রহটির সৌন্দর্য এক কথায় অতুলনীয়। বলয়গুলি আসলে ঘনসন্নিবদ্ধ আলাদা আলাদা অজস্র চুড়ি, কতকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের খাঁজের মতো। এমনকি বলয়গুলির মধ্যে যেখানে ফাঁক আছে বলে মনে করা হয়, সেখানেও ছোট ছোট বস্তুখণ্ড দেখা গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা একেবারে বাইরের দিকে নতুন একটি বলয় দেখা গেছে যার মধ্যে দুটি আলাদা চুড়িগাছা যেন পরস্পরের ওপর দড়ির মতো পাকানো। বলয়গুলি কঠিন পদার্থের বড় বড় খণ্ড দিয়ে তৈরি যেগুলি সম্ভবত বরফে ঢাকা পাথরের টুকরো।

শনির বলয়ের প্রান্তদেশে অন্তত ষোলোটি উপগ্রহ তাকে পরিক্রমণ করছে। পরিচিত উপগ্রহগুলির কাছের দৃশ্য থেকে বোঝা যায় যে সেগুলি বরফ-ভরা আর উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষে প্রচণ্ড রকম ক্ষতবিক্ষত। শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইট্যানের (Titan) ব্যাস ৫৮০০ কিলোমিটার। এটি এত বড় যে এটি নিজেই একটি গ্রহ হতে পারত। সমগ্র সৌরজগতে টাইট্যানই একমাত্র উপগ্রহ যার প্রায় পৃথিবীর মতো ঘন বাতাবরণ আছে। টাইট্যানের এই বাতাবরণের ৯০ শতাংশ নাইট্রোজেন গ্যাস; তার সঙ্গে আছে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের মতো কিছু জৈব যৌগ। টাইট্যান অতি শীতল এক জগৎ। এর পৃষ্ঠে উষ্ণতা –১৮৪° সেলসিয়াস। অত্যন্ত বিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস থাকা ছাড়াও এর চরম শীতলতার জন্যই এটি আমরা প্রাণ বলতে যা বুঝি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

১১.৪.৭ দৃষ্টির অন্তরালের গ্রহরা

খালি চোখে দেখা যায় না এমন বাকি তিনটি গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো পরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইউরেনাস : সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপেও ইউরেনাসকে অস্পষ্ট দাগযুক্ত একটি সবুজ চক্রের মতো মনে হয়। বাইরের বাতাবরণে প্রচুর পরিমাণ মিথেন আর অ্যামোনিয়ার মেঘের জন্যই এই রংটির উৎপত্তি। অ্যামোনিয়ার এই মেঘের উষ্ণতা –২১৭° সেলসিয়াস, ইউরেনাস ঠিক বৃহস্পতি আর শনির মতো হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন প্রভৃতি গ্যাসে তৈরি। ইউরেনাসের ঘূর্ণনের অক্ষ এর কক্ষপথের লম্বের সঙ্গে ৯৮° কোণে আনত, অর্থাৎ অক্ষটি প্রায় কক্ষপথের তলেই অবস্থিত। কোনো কোনো সময় একটি মেরু সোজাসুজি সূর্যের দিকেই এসে পড়ে। সূর্য তখন সরাসরি ওই মেরুর ওপর কিরণ দেয়। মনে হয় গ্রহটি যেন একপাশে সম্পূর্ণ হেলে পড়েছে, চাকার মতো গড়িয়ে চলছে কক্ষপথে। এদিক দিয়ে ইউরেনাস সৌরজগতে একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইউরেনাসের পনেরোটি উপগ্রহ আছে। ১৯৭৭ সালে ইউরেনাসের চারিদিকে পাথরের চূর্ণে তৈরি নয়টি অস্পষ্ট বলয়ও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভয়েজার-২ সন্ধানী ইউরেনাসের চারপাশে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার জুড়ে এক চৌম্বক ক্ষেত্র লক্ষ্য করেছে।

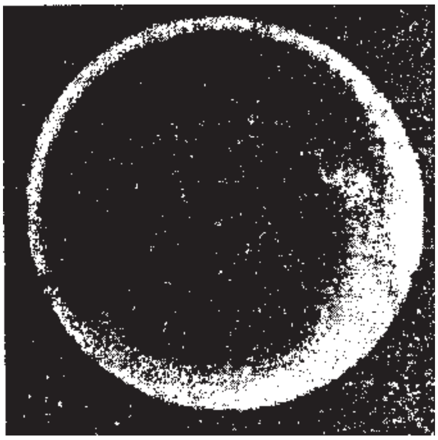

চিত্র ১১.১১ : ইউরেনাস

নেপচুন : ১৮৪৬ সালে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালে (Johann Gottfried Galle) অষ্টম গ্রহ নেপচুনকে প্রথম দেখতে পান। আমরা আগেই ৮.৩.৪ অংশে নেপচুন আবিষ্কারের বিবরণ দিয়েছি। এর দূরত্ব এত বেশি যে নেপচুন থেকে দেখলে সূর্যকে নিশ্চয়ই একটা উজ্জ্বল বিন্দুর মতো দেখায়। নেপচুনের বাতাবরণে মিথেন থাকলেও সেখানে অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এর মেঘের উষ্ণতা প্রায় –২৩৭° সেলসিয়াস। নেপচুনকে পরিক্রমণ করে সৌরজগতের অন্যতম বৃহৎ উপগ্রহ ট্রাইটন (Triton)। ট্রাইটন নেপচুনকে দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ গ্রহটির নিজস্ব আবর্তনের বিপরীত দিকে প্রদক্ষিণ করে। ট্রাইটনের বাতাবরণ নাইট্রোজেন আর মিথেন গ্যাসে তৈরি। উপগ্রহটিতে তরল নাইট্রোজেনের সমুদ্রও থাকতে পারে। ট্রাইটনের সঙ্গে আছে আরও ছোট একটি উপগ্রহ, যার নাম নেরাইড (Nereid)। ভয়েজার-২ সন্ধানীর সাহায্যে নেপচুনের আরও ছয়টি উপগ্রহ, অর্থাৎ মোট আটটি উপগ্রহ হয়েছে। এছাড়া নেপচুনের পাঁচটি বলয়ও দেখা গেছে, যার তিনটি অত্যন্ত অস্পষ্ট।

প্লুটো : প্লুটোর অস্তিত্বও ইউরেনাসের কক্ষপথ থেকে তার বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই প্রস্তাবিত হয়েছিল। একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পার্সিভ্যাল লাওয়েল (Percival Lowell) লক্ষ্য করলেন যে নেপচুনের প্রভাব মেনে নেওয়ার পরেও ইউরেনাসের বিচ্যুতির পুরো ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না। নেপচুনের গতিপথেও একইরকম বিচ্যুতি দেখা গেল। লাওয়েল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পিকারিং (W. H. Pickering) গণনা করে দেখলেন এইসব বিচ্যুতির কারণ সম্ভবত অন্য একটি গ্রহ। তাঁরা এই অজ্ঞাত X গ্রহের ভর আর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ গণনা থেকেই বলে দিলেন। ১৯১৬ সালে আকাশে প্রায় প্রত্যাশিত জায়গাতেই প্লুটো আবিষ্কৃত হল। তার ভর অবশ্য দেখা গেল অনেক কম, কতকটা আমাদের চাঁদের মতো। প্লুটো গ্রহটি ছোট, ঠান্ডা আর অন্ধকার; আকারে পৃথিবীর পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র। এর পৃষ্ঠদেশ জমাট মিথেনে ঢাকা। ১৯৭৮ সালে প্লুটোর একটি উপগ্রহও আবিষ্কৃত হয়েছে, যার নাম ক্যারন (Charon)। প্লুটোর সম্বন্ধে সত্যিই আমরা বিশেষ কিছু জানি না।

প্লুটোর কক্ষপথ নেপচুনের কক্ষপথকে মাড়িয়ে গেছে। আর কোনো ক্ষেত্রেই এক গ্রহের কক্ষপথ অন্য গ্রহের কক্ষপথকে পার হয়ে যায় নি। এমন হতে পারে যে প্লুটো নেপচুনের একটি পলাতক উপগ্রহ। প্লুটোর আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে এটিই অজ্ঞাত X গ্রহ। কিন্তু এখন হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতি ঘটানোর পক্ষে প্লুটোর ভর খুবই কম। কাজেই ধরা-না-দেওয়া X গ্রহের অনুসন্ধান এখনও চলছে।

১১.৪.৮ ধূমকেতুর মেঘ

প্লুটোর কক্ষ ছাড়িয়ে বাইরের কনকনে ঠান্ডা অঞ্চল হল ধূমকেতুদের রাজ্য। ধূমকেতুরা ক্ষণিকের অতিথি। সূর্যকে ঘিরে তারা দৌড়ে যায়, তারপর তাদের দেখা মেলাই ভার। ধূমকেতুরা সৌরজগতের আদি ইতিহাসের নিদর্শন, যার জন্য আমরা এগুলির সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। সৌরপদার্থ যখন আলোড়িত হচ্ছে আর সূর্য সবে জ্বলে উঠেছে তখন সূর্যের তাপে হালকা মৌলগুলি সৌরজগতের একেবারে বাইরের দিকে ছিটকে গিয়েছিল। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর কার্বন একসঙ্গে হয়ে তৈরি হয়েছিল কতকটা তুলোর মতো তুষারের গোলা। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে তার লক্ষগুণ দূরে সেগুলি এখনও একটি মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। ধূমকেতুর এই পাতলা মেঘ কয়েকশো কোটি কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত, যা নিকটতম তারার দূরত্বের অর্ধেক পথ।

ধূমকেতু নানারকম বরফে তৈরি। তার মধ্যে যেমন সাধারণ জলজমা বরফ আছে, তেমনি আছে জমাটবাঁধা কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ। বরফের সঙ্গে ধুলোর কণা থাকায় সেগুলিকে নোংরা বরফ-গোলার মতো দেখায়।

বিশাল ওই মেঘের মধ্যে শত শত কোটি ধূমকেতু সূর্যকে ঘিরে প্রকাণ্ড কক্ষপথে ধীরগতিতে ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ তারা এই মেঘের মধ্যে তাকে, ততক্ষণ ধূমকেতু আলো বিকীর্ণ করে না। কখনও কখনও পাশ দিয়ে যাওয়া কোনো তারার মহাকর্ষীয় টান এই মেঘে একটু নাড়া দেয়। দু'-একটি ধূমকেতু তখন সৌরজগৎকে ত্যাগ করে আন্তর্নক্ষত্র মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। অন্যগুলি সূর্যের টানে পথ চলতে থাকে।

পৃথিবী থেকে ধূমকেতুদের কখনও কখনও বেশ উজ্জ্বল দেখায়। আপনি হয়তো ভাবছেন নোংরা তুষারের গোলা কী করে উজ্জ্বল লম্বা লেজের ধূমকেতুতে পরিণত হয়। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছে আসে, সূর্যের ক্রমবর্ধমান তাপে তার গা তত গরম হয়। কিছুটা জমাটবাঁধা পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়ে তার কেন্দ্রের চারিদিকে একটি দ্রুত বেড়ে ওঠা মেঘ সৃষ্টি করে যাকে আমরা বলি ধূমকেতুর মাথা বা কোমা (coma)। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছে আসে তত বেশি পদার্থ বাষ্পীভূত হয় এবং তার মাথা তত বড় ও উজ্জ্বল হয়। সেই সঙ্গে সূর্যকিরণ ও সৌরবায়ুর চাপ মাথা থেকে ধুলা ও গ্যাসের তৈরি একটি দীপ্তিময় লেজকে ঠেলে বার করে। এই লেজটি সবসময়েই সূর্যের বিপরীত দিকে বেরিয়ে থাকে।

সূর্যের খুব কাছ দিয়ে গেলে ধূমকেতু প্রচণ্ড গতিবেগ লাভ করে, যা ঘণ্টায় দশ লক্ষ কিলোমিটারের বেশি হতে পারে। সেটি যখন মহাশূন্যে ফিরে যায় তখন তার লেজটি সামনের দিকে থাকে। বেশিরভাগ ধূমকেতুই দীর্ঘ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে গভীর শূন্যে শত শত কোটি কিলোমিটার দূরে চলে যায় এবং হাজার হাজার বছর সেখানেই থাকে। কিন্তু দু'-একটি ধূমকেতু অত সহজে সূর্যকে ছেয়ে যেতে পারে না। কোনো বড় গ্রহ, বিশেষত বৃহস্পতির পাশ দিয়ে গেলে গ্রহটির আকর্ষণ ধূমকেতুটিকে সূর্যকে ঘিরে স্বল্প-পর্যায়কালের কক্ষপথে ঠেলে দেয়। সবচেয়ে বিখ্যাত ধূমকেতুগুলির একটি হল হ্যালির ধূমকেতু (Halley’s Comet, চিত্র ১১.১২)। এটি ৭৪ থেকে ৭৯ বছর অন্তর একবার করে ফিরে আসে। এটিকে শেষ দেখা গেছে ১৯৮৬ সালে। কখনও কখনও ধূমকেতুর টুকরো উল্কা হয়ে পৃথিবীতে পড়ে। বারবার ফিরে আসা ধূমকেতু প্রতিবারই কিছু পরিমাণ গ্যাস হারায়। সব বরফ গলে গেলে ধূমকেতু চূর্ণ হয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট কণার পাতলা ধারায়। সেগুলি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে যায় আর ধূমকেতুর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এবার একটু বিরতি। বরং নিচের অনুশীলনীটির উত্তর করে দেখুন।

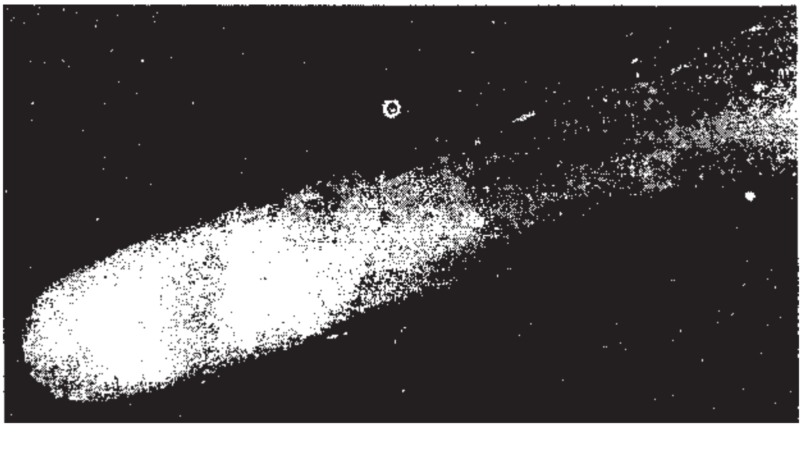

চিত্র ১১.১২ : হ্যালির ধূমকেতু

অনুশীলনী—৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) বৃহস্পতির কোন্ কোন্ ধর্মের জন্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বৃহস্পতি—তারকারই মতো, তবে সেটি জ্বলন্ত নয়।

(খ) শনির কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি অন্যান্য বহিস্থ গ্রহ থেকে আলাদা? বলা হয় যে শনি জলে ভাসতে পারে। এর থেকে শনির কোন্ ধর্ম সূচিত হয়?

(গ) কোন্ পর্যবেক্ষণ নেপচুন ও প্লুটো আবিষ্কারের পথ দেখিয়েছিল? X গ্রহের অনুসন্ধান এখনও চলছে কেন?

(ঘ) ধূমকেতুর মাথা ও লেজ কীসের তৈরি?

এই অংশে আমরা পৃথিবী ও চন্দ্র ছাড়া বাকি সৌর-পরিবারের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা আমাদের গ্রহ পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চন্দ্রকে কিছুটা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

১১.৫ অতিপরিচিত পৃথিবী

আমরা যে বিশাল গোল্লাটির উপর বসবাস করি সেটিকে কীভাবে বর্ণনা করা যায়? শূন্য থেকে দেখলে এটিকে একটি নীলচে-সাদা গোলক বলে মনে হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদ, বরফঢাকা পর্বতচূড়া, নীল মহাসমুদ্র আর সাদা মেঘ নিয়ে এই পৃথিবী অতি সুন্দর একটি গ্রহ। মানুষ এর ওপর প্রচুর অনুসন্ধান চালিয়েছে। তবু পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এর পৃষ্ঠতল থেকে কয়েক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত পাথর ও জলের একটি পাতলা খোলক আর উপরের বায়ুমণ্ডল-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভূমিকম্পে উদ্ভূত তরঙ্গের পর্যবেক্ষণের মতো পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা, স্বচক্ষে না দেখে এবং কোনো নমুনা না পেয়েও, পৃথিবীর অভ্যন্তরের একটা চিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। আমরা এখানে পৃথিবী সম্বন্ধে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ধারণার বিবরণ দেব। কিন্তু তার আগে ১১.১৩ চিত্রের সাহায্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

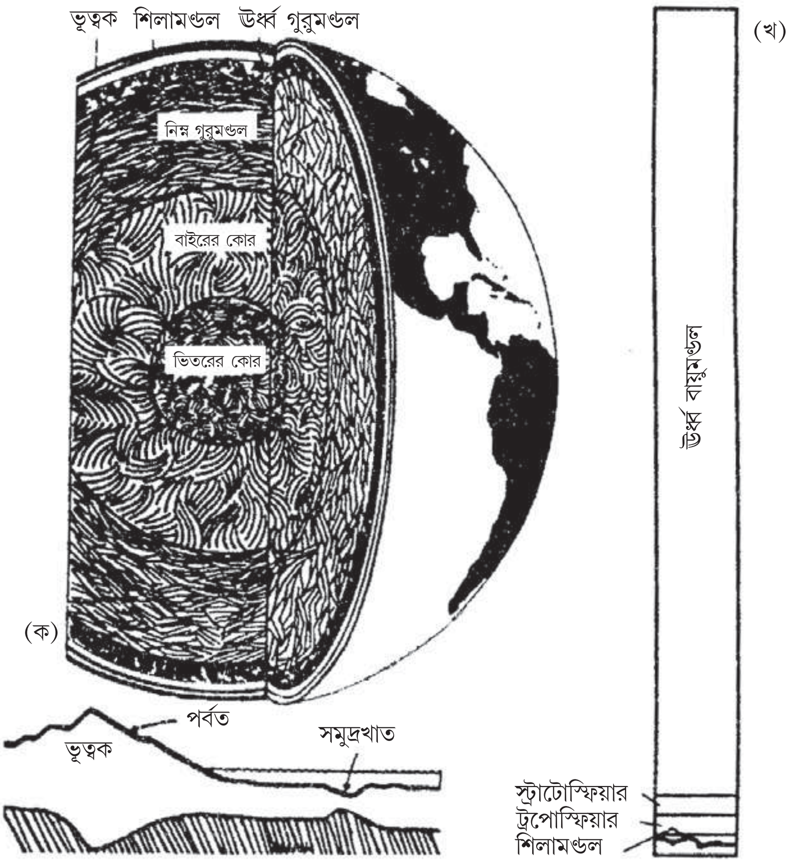

চিত্র ১১.১৩ : (ক) পৃথিবীর প্রস্থচ্ছেদ ও তার অভ্যন্তরীণ গঠন। (খ) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। (গ) পৃথিবীর অনিয়মিত ভূত্বক।

অনুশীলনী—৬

(ক) পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলি ভিতরের কোর থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে তালিকাভুক্ত করুন।

(খ) যে বায়ুস্তরে আমরা শ্বাসকার্য চালাই এবং পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি সেগুলির নাম কী?

(গ) ভূত্বক কি সর্বত্র একই রকমের?

ভূপৃষ্ঠভিত্তিক পরীক্ষা, আকাশযান, রকেট ও বেলুনের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বেশ বিশদভাবেই জানা গেছে। বায়ুমণ্ডল যদিও সুস্পষ্ট কোনও স্তরে বিভক্ত নয়, তবু সেরূপ কল্পনা করা সুবিধাজনক। ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে কাছে হল ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)। এটির ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২১ শতাংশ অক্সিজেন এবং বাকি এক শতাংশ প্রধানত জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নিয়ন ও আর্গন। এর গড় উষ্ণতা সমুদ্রতলে ১৬° সেলসিয়াস এবং একেবারে শীর্ষে –১৬° সেলসিয়াস।

এর ওপরের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে (Stratoshphere) আছে ওজোন (Ozone)। এর উষ্মতা –১৬° সেলসিয়াস থেকে –৪° সেলসিয়াস-এর মধ্যে। এই ওজোন স্তর সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি বিকিরণ শোষণ করে আমাদের ওই বিকিরণ থেকে রক্ষা করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড তাপ ধরে রেখে গ্রীন-হাউস অভিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলকে তাপিত করে (১১.৪.২ অংশের কথা মনে করুন)। এ না হলে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উষ্মতা অনেক কম হত আর সবসময়েই তা বরফে ঢাকা থাকত।

এবার আমরা খুব সংক্ষেপে পৃথিবীর নিজস্ব গঠন ও উপাদানের বর্ণনা দেব। এর এক মহাসাগরের তলায় প্রায় ১০ কিলোমিটার আর মহাদেশের তলায় প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পুরু। পৃথিবীকে আপেল ভাবলে এর ত্বক হবে আপেলের খোসার মতো পুরু। ভূত্বকের প্রধান মৌল উপাদান হল অক্সিজেন (৪৭.৩ শতাংশ) ও সিলিকন (২৭.৭ শতাংশ)। অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম মিলিয়ে এর প্রায় ২৩ শতাংশ। আর সব মৌল একত্রে ২ শতাংশেরও কম।

ভূত্বক হল পৃথিবীর বাইরের স্তর শিলামণ্ডলের সবচেয়ে উপরের অংশ। শিলামণ্ডলের কিছু কিছু উঁচু জায়গাকে আমরা পর্বত ও কিছু খাঁজকে আমরা সমুদ্রের তলার খাত হিসাবে দেখি। ভূত্বকের তলায় পৃথিবীর অভ্যন্তরের বেশিরভাগ অংশই তপ্ত ও আংশিক গলিত তরল।

এবার পৃথিবীর উপর আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরার ফলে ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি হয়। পৃথিবীতে যে নিয়মিত ঋতু পরিবর্তন ঘটে তার কারণ পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ তার কক্ষপথের উপর লম্ব থেকে কিছুটা হেলে আছে। অন্য কোনো কোনো গ্রহের মতো যদি অক্ষটি প্রায় লম্ব বরাবর থাকত, তাহলে পৃথিবীর উপর কোনো ঋতু পরিবর্তন ঘটত না (চিত্র ১১.১৪ ক)। পৃথিবীর অক্ষের উপর আবর্তন আর সূর্য-পরিক্রমণ, এই দুই-এর ফলে মনে হয় সূর্য, তারকা, গ্রহেরা যেন আকাশে গতিশীল। এছাড়া সাগর ও মহাসাগরে জোয়ার-

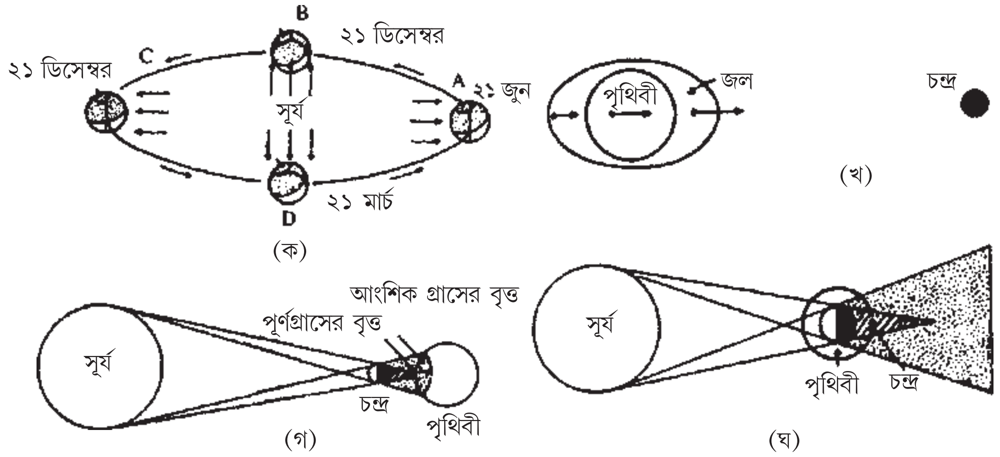

চিত্র ১১.১৪ : (ক) পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ হেলে থাকাই ঋতু পরিবর্তনের কারণ। বছরের অর্ধেক সময় উত্তর মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকে, যার ফলে সূর্যকিরণ উত্তর গোলার্ধে (ছায়াঙ্কিত) বেশি ঋজুভাবে পড়ে। বছরের বাকি অংশ দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ বেশি সূর্যকিরণ পায়। আবর্তনের অক্ষ কক্ষতলের সঙ্গে লম্বভাবে থাকলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হত না। (খ) চন্দ্রের উপস্থিতির ফলে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটা। (গ) সূর্যগ্রহণ : পূর্ণগ্রাস বৃত্তের মধ্যে থাকলে পর্যবেক্ষক পূর্ণগ্রাস দেখতে পাবেন। আংশিক গ্রাসের বৃত্তের মধ্যে থাকলে দেখবেন আংশিক গ্রাস। (ঘ) চন্দ্রগ্রহণ।

ভাঁটা, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের মতো ঘটনাও ঘটে। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের অস্তিত্বই এসবের কারণ। আসুন, এবার এই চাঁদের সম্বন্ধে একটু খোঁজ নেওয়া যাক।

পৃথিবীর সঙ্গী চন্দ্র

চাঁদের বিষয়ে কোন্ কোন্ ব্যাপার আপনার চোখে পড়েছে? চাঁদ যখন রাত্রির আকাশে থাকে তখন সেটিই হয় আকাশের উজ্জ্বলতম বস্তু। চাঁদের কলার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এবং সবসময় চাঁদের একই পৃষ্ঠ পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। প্রথমে এই পর্যবেক্ষণগুলির ব্যাখ্যা করা যাক। রাত্রির আকাশে চাঁদকে উজ্জ্বলতম দেখানোর কারণ এই যে এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে। পৃথিবীকে ঘিরে পরিক্রমণের জন্যই চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে (চিত্র ১১.১৫ক দেখুন)। পৃথিবীর চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে চাঁদ ২৭.৩৩ দিনে একবার পরিক্রমা করে। নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরতেও চাঁদের একই সময় লাগে। এজন্যই আমরা পৃথিবী থেকে সবসময় চাঁদের একই দিক দেখতে পাই।

পৃথিবী ছাড়া চাঁদই একমাত্র জ্যোতিষ্ক যেখানে মানুষ পা ফেলেছে। চাঁদে অবশ্য তারা অল্পদিনই থেকেছে, সর্বসাকুল্যে মাত্র ১৩ দিন। তারা চাঁদের মাটি ও পাথরের নমুনা নিয়ে এসেছে, তাছাড়া চাঁদের সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যও নিয়ে এসেছে। এগুলি আমরা এখন বর্ণনা করব। চাঁদের পৃষ্ঠে আছে সমতল, ঘন রং-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যাকে আমরা বলি মারিয়া (Maria) বা সাগর, ছোট বড় গহ্বর, পাহাড় আর উপত্যকা। পৃথিবীর উপর নদী জল বয়ে যাওয়ার ফলে যেমন খাত সৃষ্টি হয়, চাঁদের উপর সেরকম খাতও আছে। এছাড়া সমকেন্দ্রিক পর্বত-বলয় নিয়ে তৈরি কিছু স্তূপাকৃতি অঞ্চলও দেখা যায়।

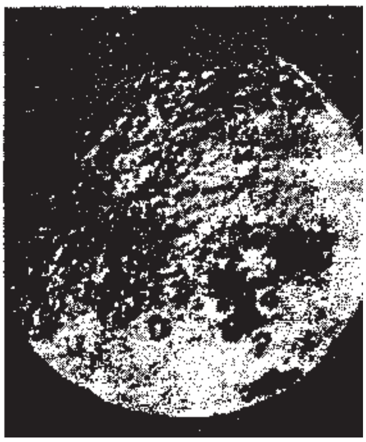

চিত্র ১১.১৫ : (ক) চাঁদের কলা (খ) চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠ

চাঁদের পাথর ও মাটি অনেকটা পৃথিবীর পাথর-মাটির মতোই। তবে সেগুলি অনেক বেশি পুরনো আর তাতে যেমন টাইট্যানিয়ামের মতো কয়েকটি মৌল বেশি পরিমাণে আছে, তেমনি সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের

মতো কয়েকটি মৌলের ঘাটতিও আছে। চাঁদের মাটি গঠনে কতকটা মিহি বালির মতো। চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠটি সামনেরটি থেকে আলাদা। সেদিকে কোনো সাগর, পর্বত বা উপত্যকা নেই (চিত্র ১১.১৫ খ), আছে শুধু সমানভাবে ছড়ানো গহ্বর। চাঁদের পৃষ্ঠের উষ্মতা সূর্যের আলো যেখানে সোজাসুজি পড়ে সেখানে ১৩০° সেলসিয়াস আর যেদিকে রাত্রি সেদিকে –১৭০° সেলসিয়াস। চাঁদে না আছে জল, না আছে কোনো বায়ুমণ্ডল। প্রায় তিনশো কোটি বছর আগে চাঁদের অভ্যন্তর শীতল হয়ে গেছে। তখন থেকে চাঁদ শান্ত অবস্থায় আছে। তার কোনো পরিবর্তনই হয়নি।

চাঁদ এক প্রাণহীন জগৎ। তবু চাঁদের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ শেষ হয়ে যায়নি। চাঁদের সব রহস্য এখনও পুরোপুরি বোঝা যায়নি। আরও কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়ে গেছে।

অনুশীলনী—৭

(ক) চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমণের পর্যায়কাল ২৭.৩৩ দিন এবং পৃথিবীর দিকে সবসময়েই তার একই দিক ফেরানো থাকে। তাহলে নীচের কোন্ উক্তিটি ঠিক?

১. চাঁদের আবর্তনের পর্যায়কাল ২৯.৫ দিন

২. চাঁদের আবর্তনের পর্যায়কাল ২৭.৩৩ দিন

৩. চাঁদের আবর্তন নেই।

(খ) চন্দ্রকে কেন প্রাণহীন জগৎ বলা হয়?

সৌরজগৎ সম্বন্ধে এত কিছু জানার পর আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে কীভাবে এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং কীভাবে এটি বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যে তত্ত্বটি সৌরজগৎ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণগুলিকে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করে বলে মনে হয় আমরা এখন সেটির বর্ণনা দেব।

১১.৬ সৌরজগতের উদ্ভব

এই তত্ত্বে আমরা ধরে নিই যে সূর্য এবং সমস্ত গ্রহ আন্তর্নক্ষত্র গ্যাস ও ধূলির এক বিশাল ঘূর্ণায়মান মেঘ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল (চিত্র ১১.১৬ দেখুন)। কোনো কারণে এই মেঘ সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এই সঙ্কোচনকে দ্রুততর করে তোলে। মেঘটির সঙ্কোচন যেমন চলতেই থাকল (চিত্র ১১.১৬ ক), সেটির ঘূর্ণন আরও দ্রুত হল এবং আকৃতি দাঁড়াল চাকতির মতো (চিত্র ১১.১৬ খ)। ক্রমশ আরও মালমশলা চাকতির কেন্দ্রের দিকে জমা হয়ে শেষ পর্যন্ত জন্ম দিল একটি তারার। সেটিই হল সদ্যোজাত সূর্য। সঙ্কোচনের ফলে সূর্যের উষ্মতা বাড়তে বাড়তে শেষপর্যন্ত সে নিজস্ব শক্তি উৎপাদন শুরু করল (চিত্র ১১.১৬ গ)। সূর্যের চারিদিকে গ্যাস ও ধূলির যে চক্রটি ঘূর্ণায়মান ছিল সেটি ঘনীভূত হয়ে গ্রহদের সৃষ্টি হল। এই ঘূর্ণায়মান চক্রে হালকা মৌলগুলি কিনারার দিকে নিক্ষিপ্ত হল আর ভারী মৌলগুলি এসে জমা হল ভিতরের দিকে। সূর্যের শক্তি যত বৃদ্ধি পেল, ভিতরের দিকের গ্রহগুলির গ্যাসের খোলসগুলি ততই

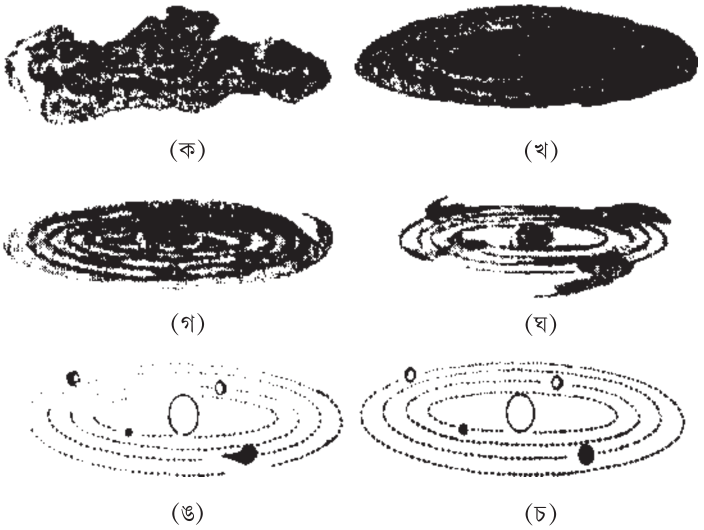

চিত্র ১১.১৬ : সৌরজগতের উদ্ভব সংক্রান্ত একটি তত্ত্ব

তাড়িত হল, পড়ে রইল মেঘের মধ্যে ভারী মৌলের কোরগুলি (চিত্র ১১.১৬ ঙ)। বাইরের গ্রহগুলির উপর বিশেষ প্রভাব পড়ল না। শেষপর্যন্ত উজ্জ্বল সূর্যের বিকিরণে মেঘটির যেটুকু মুক্ত গ্যাস অবশিষ্ট ছিল তা অপসারিত হল এবং ছোট-বড় কিছু গ্রহ রইল পড়ে (চিত্র ১১.১৬ চ)। ছোট কঠিন গ্রহগুলি রইল তারাটির কাছে বা আর বড় গ্যাসের তৈরি গ্রহগুলি অনেক দূরে দূরে। পৃথিবী হল এদের মধ্যে তৃতীয় গ্রহ।

পৃথিবীর আদি ইতিহাস

পৃথিবীর জন্ম প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে এসেছে। বিবর্তনের প্রথম কয়েক কোটি বছরে ছোটখাটো নানা বস্তুর আঘাত, মহাকর্ষ, ক্রমশ নিষ্পেষণের ফলে বস্তুর সঙ্কোচন ও আরও কয়েকটি কারণে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়েছিল। এর ফলে তার কিছু উপাদান গলে যায়। লোহা বেশিরভাগ সিলিকেটের আগেই গলে গিয়েছিল। লোহা ভারী হওয়ায় ডুবে কেন্দ্রের দিকে নেমে গিয়েছিল। আর রান্নার স্টোভের উপর গরম হাওয়া যেমন উপরে ওঠে, তেমনি হালকা সিলিকেটগুলিকে ঠেলে উপরের পৃষ্ঠের দিকে তুলে দিয়েছিল। লোহা নীচে নেমে যাওয়ার সময়ে পৃথিবীর তল স্ফীত হয়ে তাতে বিশাল বুদবুদের সৃষ্টি হল, তার মধ্যে দিয়ে আগ্নেয় বিস্ফোরণ ঘটল আর তার উপর দিয়ে গলিত লাভা গড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। শেষপর্যন্ত লোহার অধিকাংশই কেন্দ্রে জমা হয়ে পৃথিবীর কোরের সৃষ্টি করল। ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন শীতল ও শান্ত হল তখন তার পৃষ্ঠে কঠিন শিলার একটি পাতলা স্তরের সৃষ্টি হল। এই শিলাস্তর শিলামণ্ডলের উপর বিশাল ভেলার মতো ভেসে রইল। এগুলিই ছিল মহাদেশের আদি অবস্থা। শত শত কোটি বছর ধরে সেগুলি ভেসে বেড়াল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন আদি অবস্থায় তারা ছিল একটি অতি-মহাদেশের রূপে। প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে তারা পরস্পর থেকে দূরে ভেসে গিয়ে আজকের মহাদেশগুলি সৃষ্টি করেছে (চিত্র ১১.১৭)।

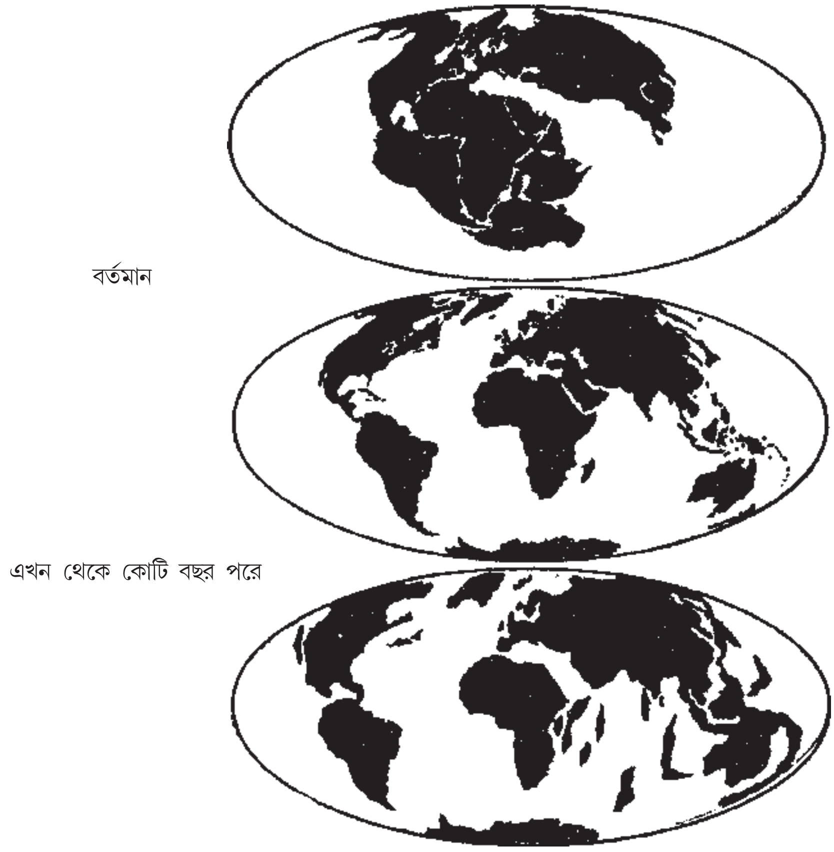

চিত্র ১১.১৭ : মহাদেশগুলির সঞ্চারণ

সূর্যকিরণ পৃথিবীর উপরে সমস্ত গ্যাস অপসৃত করায় আদি পৃথিবীর কোনও বায়ুমণ্ডল ছিল না। গলিত পদার্থ আর অগ্ন্যুৎপাত থেকে যে জলীয় বাষ্প, মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া বার হল, সেগুলি দিয়েই তৈরি হল পৃথিবীর প্রথম বাতাবরণ। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি জলকে তার উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে দিল। হাল্কা গ্যাস হাইড্রোজেন পৃথিবী ছেড়ে উধাও হল। অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া আর মিথেনের সঙ্গে মিলে জল, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য যৌগ গঠন করল। উচ্চ আকাশে অক্সিজেনের তিনটি করে পরমাণু একত্র হয়ে ওজোনের অণু তৈরি করল, যার ফলে প্রায় একই সময়ে ওজোন স্তরেরও সৃষ্টি হল। পৃথিবী যখন আরও শীতল হল, তার বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি রূপে ঝরে পড়ল। পৃথিবীর বুকে বিশাল গর্তগুলি জলে ভরে গেল।

সাধারণ অক্সিজেন অণুতে দুটি করে অক্সিজেন পরমাণু থাকে।

প্রায় চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আরও উল্লেখযোগ্য একটি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। সেটি হল প্রাণের প্রথম ক্ষীণ স্পন্দন। যে অতিবেগুনি রশ্মি আজকের প্রাণীদের অধিকাংশের কাছেই মারাত্মক সেটাই ছিল প্রাণসৃষ্টির সহায়ক। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। এ সম্বন্ধে দ্বাদশ এককে আরও কিছু জানতে পারবেন।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর এক বিশেষ আত্মীয়তা রয়েছে। সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকত না। যেসব মৌলিক প্রক্রিয়া প্রাণের ধারক, সূর্য সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির নিয়মিত যোগানদার। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এমনই যে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল মৃদু আর এখনও তাই। আমাদের মতো প্রাণীদের বেঁচে থাকার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত। দ্বাদশ ও চতুর্দশ একক পড়লে এই সম্পর্কটি আপনি আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন।

এ পর্যন্ত আমরা সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতুর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। সৌরজগতের সৃষ্টির ইতিহাসও আমরা পর্যালোচনা করেছি। এমন বোধহয় আমাদের জীবনের ওপর এগুলির প্রভাব সম্বন্ধে পুরাকাহিনী ও ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১১.৭ কিছু পুরাকথা ও ভ্রান্ত ধারণা

দ্বিতীয় ও নবম এককে পড়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে সূর্য ও তারকাদের লক্ষ্য করতেন আর তাদের গতিবিধি থেকে ঋতু পরিবর্তন ও বন্যার সময়ের পূর্বাভাস দিতে পারতেন। তাঁরা চাঁদের আকৃতির আপাত-পরিবর্তনের সঙ্গে মহাসাগরের জোয়ার-ভাঁটার সম্পর্কও বার করেছিলেন। কিন্তু আকাশে তো গ্রহরাও আছে, যাদের পাঁচটিকে খালি চোখেই দেখা যায়। এরা হল— বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি ! সূর্য যদি শীত-গ্রীষ্মের কারণ হতে পারে, চাঁদ যদি নাড়া দিতে পারে মহাসাগরে, তবে পৃথিবীর ব্যাপারে গ্রহদের কোনও প্রভাব থাকবে না কেন?

এই স্বাভাবিক কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র (Astrology)। কোনও ব্যক্তির জন্মের মুহূর্তে কোন্ গ্রহ কোন্ তারামণ্ডলের মধ্যে ছিল, তা দিয়েই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় এমন একটা ধারণা তৈরি হতে শুরু করল। গ্রহদের গতিবিধি রাজরাজড়া, রাজবংশ ও গোটা সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে এমন একটা বিশ্বাসও জন্ম নিল। জ্যোতিষীরা গ্রহদের গতিবিধির উপর খুব সূক্ষ্মভাবে নজর রাখতে শুরু করলেন। যেমন ধরুন, মঙ্গল যখন শেষবার সিংহ রাশিতে উদিত হয়েছিল, তখন কী ঘটেছিল তা তাঁরা বার করলেন। হয়তো তেমনই কিছু আবার ঘটবে। এইভাবে তাঁরা রাজা-মহারাজাদের উপদেশ দিতেন কখন প্রতিবেশী রাজাকে আক্রমণ করতে হবে। যুদ্ধের দেবতা শনি আর মঙ্গলের অবস্থান অনুকূল না হলে তাঁরা পরামর্শ দিতেন যুদ্ধযাত্রা পিছিয়ে দিতে। কোনো সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল তার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা। আর গ্রহেরা যদি কোনো জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে তারা কোনো ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীর উপরেই বা প্রভাব ফেলবে না কেন? এইভাবে পর্যবেক্ষণ, গণিত আর যুক্তিহীন চিন্তার একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিকাশ ঘটল। তা সত্ত্বেও, কালক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করল। এবং এর ফলেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব বেড়ে গেল, সারা পৃথিবীতে যেটা আজও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রহদের গতিবিধির সঙ্গে মানুষের কোনো নির্দিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক আজ পর্যন্ত কখনোই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সত্য কথা বলতে কি, জ্যোতিষশাস্ত্রের নানা সূত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে সেগুলি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে সেগুলিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়।

করে দেখুন

একই দিনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রাশিতে জাত ব্যক্তিদের জীবনের ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী সংগ্রহ করুন এবং সেগুলি তুলনা করে দেখুন।

আপনি দেখবেন যে প্রতিটির বক্তব্য অন্যগুলি থেকে ভিন্ন কিন্তু সমান অস্পষ্ট। এটাও লক্ষ্য করবেন যে আপনার জীবনে পরবর্তী এক সপ্তাহে যা ঘটবে তার একটিও কোনো সংবাদপত্রেই নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। একইভাবে আমাদের সমাজে সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতির সঙ্গে নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার জড়িত আছে। সৌরজগৎ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়ার পর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে এসব ধারণার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই।

১১.৮ সারাংশ

● এই এককে আমরা সংক্ষেপে সৌরজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের কয়েকটির, যথা সূর্য, গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতুর বর্ণনা দিয়েছি।

● সৌরজগতের উদ্ভব এবং পৃথিবীর আদি ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

● কীভাবে মানুষের জীবনের উপর গ্রহের প্রভাবের সম্বন্ধে বহু পুরাকাহিনী ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে এবং সেগুলির যে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই তা দেখাতে আমরা চেষ্টা করেছি।

১১.৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) পার্থিব গ্রহ এবং বৃহস্পতির মতো গ্রহগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী দুটি ধর্মের উল্লেখ করুন।

(২) বুধের তুলনায় শুক্র সূর্য থেকে বেশি দূরে থাকা সত্ত্বেও শুক্রের পৃষ্ঠে সর্বোচ্চ উষ্মতা বুধের চেয়ে বেশি। এর কারণ কী?

(৩) কোনো কোনো ধূমকেতু প্রায়ই সূর্যের কাছে ফিরে আসে কেন?

(৪) নিচের তালিকায় সৌরজগৎ সৃষ্টির কয়েকটি ধাপ দেওয়া আছে। ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে তাদের ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দিন :

(ক) পদার্থ যখন চাকতিটির কেন্দ্রের দিকে জমা হতে লাগল, তখন সূর্যের জন্য হল।......................

(খ) ভিতর দিকের গ্রহগুলি তাদের গ্যাস অপসারিত হওয়ার পর কঠিন অবস্থা লাভ করল। বাইরের গ্রহগুলি রইল গ্যাসীয় অবস্থায়।..............................।

(গ) আন্তর্নক্ষত্র গ্যাসের এক বিশাল ঘূর্ণায়মান মেঘ সঙ্কুচিত হতে শুরু করল এবং কিছুকাল পরে চাকতির আকৃতি ধারণ করল।

(ঘ) সূর্যকে ঘিরে থাকা গ্যাস ধূলির মেঘ ঘনীভূত হয়ে গ্রহের সৃষ্টি হল।............................

(৫) আদি পৃথিবী থেকে পৃথিবীর পার্থক্য নির্দেশ করে, এমন তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।........

১১.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১ সূর্য, নয়টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও ধূমকেতু।

অনুশীলনী ২ (ক) হাইড্রোজেন, হিলিয়াম।

(খ) হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে ফিউশনের ফলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত করে।

(গ) প্রায় ৫ শত কোটি বছর।

(ঘ) এটি প্রথমে সাদা বামন ও তারও পরে কৃষ্ম বামনে পরিণত হবে।

অনুশীলনী ৩ (ক) সূর্যের আলোকমণ্ডলের উপর সৌরকলঙ্কের সরণ।

(খ) সৌরকলঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধি, সৌরবায়ু ও সৌরছটা।

অনুশীলনী ৪ (ক) শুক্রের উপরের মেঘের জন্য।

(খ) মঙ্গালের ২৪ ঘণ্টার দিন, ঋতু পরিবর্তন মেরুতে বরফের ঢাকনা; সাদা মেঘ ও বাতাবরণে ধূলিঝড়।

(গ) কেননা সেগুলি সৌর উপাদানেরই পিণ্ড যা একত্রিত হয়ে গ্রহ তৈরি করতে পারেনি— কতকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ভগ্নস্তূপের মতো।

(ঘ) উল্কাপিণ্ড হল আকাশ থেকে আসা বস্তু যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ে। যখন মহাশূন্য থেকে কোনো ধূলিকণা বা অন্য বস্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন আকাশে যে আলোর রেখা দেখা যায় তাকেই বলে উল্কা।

অনুশীলনী ৫ (ক) বৃহস্পতির আকার, গঠন, ঘনত্ব ও বহু সংখ্যক উপগ্রহ।

(খ) শনিগ্রহের বলয়। শনির গড় ঘনত্ব জলের চেয়ে কম।

(গ) ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতি। কেননা ইউরেনাস ও নেপচুনের কক্ষপথের বিচ্যুতি কেবলমাত্র প্লুটোর উপস্থিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(ঘ) মাথা : জলজমা বরফ, তার সঙ্গে জমাট মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া। লেজ : ধূলি ও গ্যাস।

অনুশীলনী ৬ (ক) ভিতরের কোর, বাইরের কোর, ম্যান্ট্‌ল্ বা গুরুমণ্ডল, ভূত্বক, ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল।

(খ) ট্রপোস্ফিয়ার, ভূত্বক।

(গ) না, ভূত্বকে পর্বত ও খাত আছে, যেগুলি জলপূর্ণ হয়ে মহাসাগর হয়েছে।

অনুশীলনী ৭ (ক) (২)

(খ) প্রাণকে টিকিয়ে রাখার মতো কোনো বায়ুমণ্ডল বা জল সেখানে নেই।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

(১) গঠনের উপাদান, ঘনত্ব।

(২) গ্রীন হাউস অভিক্রিয়া। এটি আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

(৩) বৃহস্পতি বা শনির মতো বড় গ্রহের কাছ দিয়ে গেলে তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য ধূমকেতু হ্রস্ব পর্যায়কালের কক্ষপথে চলতে থাকে।

(৪) (১) ২ (২) ৪ (৩) ১ (৪) ৩

(৫) আদি পৃথিবীর অনেক বেশি উষ্ণতা ও অশান্ত অবস্থা, বায়ুমণ্ডলের অভাব, প্রাণের অনুপস্থিতি।

একক ১২ □ প্রাণের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি

গঠন

১২.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১২.২ পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি

বিশেষ সৃজন

স্বতঃজনন

রাসায়নিক অভিব্যক্তি

মিলারের পরীক্ষা

১২.৩ জৈব অভিব্যক্তি

১২.৪ প্রাণের তন্ত্ররূপ

জীবনচক্র

বার্ধক্য

১২.৫ পৃথিবীর বাইরে প্রাণ

১২.৬ সারাংশ

১২.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১২.৮ উত্তরমালা

১২.১ প্রস্তাবনা

আমাদের গ্রহ পৃথিবীর কীভাবে ও কখন জন্ম হয়েছিল, তা আপনারা ইতিপূর্বে পড়েছেন। আসুন, বর্তমান এককটিতে আমরা যে সুদূর অতীতে আমাদের গ্রহে কোনো প্রাণ ছিল না, সেখানে ফিরে যাই। অনুমান করি, কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল, কীভাবেই বা উদ্ভিদ ও প্রাণী আবির্ভূত হয়েছিল। যেসব জিনিস অবশ্যই বহু লক্ষ কোটি বছর আগে ঘটে থাকবে, সেগুলির আলোচনায় স্বভাবতই কিছু পরিমাণে অনুমান ও অনিশ্চয়তা থাকে। কিন্তু বহু প্রাপ্ত প্রমাণ এবং ভৌত বিজ্ঞানগুলির বনিয়াদী সূত্রগুলির সঙ্গে অনুমান বা আন্দাজটির মিল থাকতে হয়। এটি আমাদের গ্রহে জীবনের প্রাণের বিষয়ে প্রস্তাবিত মতবাদটি সম্বন্ধে কিছুটা আস্থার

সৃষ্টি করে। আজ প্রায় সকলেই মনে করেন যে প্রায় চার লক্ষ কোটি বছর আগে এমন সব স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল, যেগুলির উপাদান ছিল প্রাণহীন পদার্থের অণু। ধরাপৃষ্ঠে সকল প্রাণবন্ত জীবেরই যে অনুরূপ সংযুতি (Composition) এবং বনিয়াদী আণবিক গঠন আছে, সেই উল্লেখযোগ্য তথ্যের দ্বারা এই মতবাদটি সমর্থিত।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পরে আপনাদের সমর্থ হওয়া উচিত :

- প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদের এবং সেই প্রসঙ্গে পাস্তুরের অবদানের বিবরণ দিতে,
- রাসায়নিক অভিব্যক্তিদের এবং তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে,
- জৈব অভিব্যক্তিবাদ এবং জীবগুলির বৈচিত্র্য আলোচনা করতে,
- প্রাণের তন্ত্ররূপে, পশ্চাৎমুখী প্রভাবের (feed-back) পদ্ধতি, বার্তা (information) ও নিয়ন্ত্রণের বিবরণ দিতে,
- জীবনচক্র ও বার্ধক্যের ধারণাগুলি আলোচনা করতে,
- পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্বের সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করতে।

১২.২ পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি

কীভাবে তার সৃষ্টি হয়েছিল, কে তাদের সৃষ্টি করেছিল এবং কেন সে সৃষ্ট হয়েছিল, এ নিয়ে মানুষ চিরকালই বিস্ময়বোধ করেছে। এই সূত্রে কৌতূহল এত প্রবল হয়েছে যে প্রত্যেক প্রাচীন চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা ধর্মপ্রবক্তা এই প্রশ্নের কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং প্রাণের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো-না-কোনো পদ্ধতির প্রস্তাব রেখেছেন।

একটা প্রাচীন গ্রীক ধারণা অনুযায়ী, "কসমোজোয়া" বা মহাকাশের প্রাণরাশি থেকে "স্পোর" বা রেণু নামে ছোট ছোট এককে প্রাণ বিভিন্ন গ্রহে নীত হয়েছিল। এই স্পোরগুলির পুরু অভেদ্য আবরকটি জল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় উপাদানের ক্ষয় নিবারণ করেছিল। অনুমান করা হয়েছিল, উষ্ণতা ও আর্দ্রতার অনুকূল অবস্থায় এই স্পোরগুলি যে পর্যন্ত জীববসতিশূন্য গ্রহে প্রারম্ভিক জীবগুলির জন্ম দিয়েছিল। এই ধারণায় প্রাণের স্পোরগুলির এক বিশ্বজনীন ও অনন্ত সঞ্চয় অনুমান করা হয়েছিল এবং এভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল যে কোথাও প্রাণের উৎপত্তি সর্বপ্রথম কীভাবে ঘটেছিল। অবশ্য গ্রীকদের অথবা সেকালের অন্য কারো জানা ছিল না যে ভ্রাম্যমাণ স্পোরগুলি মহাকাশে অতিবেগুনি ও গামা রশ্মির মতো বিনাশক বিকিরণগুলির সম্মুখীন হবে।

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এছাড়াও অন্য নানা মতবাদ সময়ে সময়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি ছিল নিতান্তই অনুমান-নির্ভর, কিন্তু অন্য কতকগুলির কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল। এসব মতবাদের কয়েকটি কী ছিল, তা সংক্ষেপে দেখা যাক।

১২.২.১ বিশেষ সৃজন (special creation)

সকল সংস্কৃতির লোকজনের মধ্যেই একটি সাধারণ বিশ্বাস হল, প্রাণের মানুষসহ সব বিভিন্ন আকারই প্রায় ১০,০০০ বছর আগে সহসা এক ঐশ প্রত্যাদেশে সৃষ্ট হয়েছিল। প্রাণের এই অসংখ্য আকারগুলি সবসময়েই একরকমই থেকেছে এবং জগতের অন্ত পর্যন্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তন যৌক্তিকতা নেই, কারণ এমন সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, অবশ্যই এক লক্ষ বা ততোধিক বছর আগে যাদের অস্তিত্ব ছিল। বস্তুত গবেষণায় দেখা গেছে, এমনকি সাড়ে তিন শত কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। মনে হয়, প্রাণের সরল আকারগুলি প্রাণহীন পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল এবং কালক্রমে জটিলতর হয়ে উঠেছিল।

১২.২.২ স্বতঃজনন (spontaneous generation)

প্রাত্যহিক পরিবেশে চারিদিকে তাকালে দেখতে পাই, খড়, মাটি, কাদা, ময়লা, বস্তুত যে-কোনো ধরনের আবর্জনা বা পচা জিনিস কিলবিল-করা, নড়াচড়া-করা জীবের ভিড়ে দূষিত। এইরকম দৃশ্য থেকে মানুষ এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে প্রাণ আপনাআপনি বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণহীন পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। জীববিদ্যার জনক রূপে পরিচিত অ্যারিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এই মত পোষণ করতেন যে কেবল কীটপতঙ্গ নয়, অধিকন্তু মাছ, ব্যাঙ এবং ইঁদুরও আবর্জনা ও আর্দ্র মাটির মতো প্রজননোপযোগী পদার্থ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এমনকি মানুষেরও উৎপত্তি অনুরূপভাবে ঘটে থাকতে পারে। এই স্বতঃজননবাদটি এই সেদিন ১৮৬২ সালে ফরাসী অণুজীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের পরীক্ষাগুলির দ্বারা অপ্রমাণিত হয়। অ্যারিস্টোটলের ধারণাগুলির স্থানচ্যুত করা সহজ ছিল না। স্বতঃজননবাদকে অপ্রমাণ করতে লুই পাস্তুরের সবটুকু উদ্ভাবনী শক্তি ও পরীক্ষানৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়েছিল। কেবল "প্রাণই প্রাণের জন্ম দেয়", তাঁর এই প্রকল্পটি পরীক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমি কর্তৃক নিয়োজিত তৎকালীন সুপরিচিত জীববিজ্ঞানীদের সমাবেশের সামনে পাস্তুর তাঁর পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

তাঁর পরীক্ষার জন্য পাস্তুর দুটি কাচকুপী বা ফ্লাস্ক নিয়ে সেগুলিকে সামান্য শর্করামিশ্রিত ঈস্ট-নির্যাস দিয়ে অর্ধেক পূর্ণ করেছিলেন এবং যে-কোনো জীবকে মারার জন্য সেগুলিকে উত্তপ্ত করেছিলেন। ফ্লাস্কগুলির মধ্যে একটির মুখ তিনি সীল করে দিয়েছিলেন এবং অন্যটিকে বায়ুতে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। কয়েকদিন পরে কী ঘটেছে তা দেখার জন্য তিনি তাঁর বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, বন্ধ ফ্লাস্কটি তখনও সকল জীব থেকে মুক্ত অথচ খোলা ফ্লাস্কটি জীবের দ্বারা সংক্রামিত। বস্তুত এরকম সীল করা ফ্লাস্কের একটি এখনও পারীর বিজ্ঞান আকাদেমিতে রাখা আছে—এমনকি একশো বছরেরও পরে তার মধ্যে কোনো জীব নেই। অক্সিজেনের অভাবেই সীল করা ফ্লাস্কে জীবের বৃদ্ধি ঘটেনি, এরকম সন্দেহও নিরসনের জন্য পাস্তুর অবশ্য রাজহাঁসের মতো গলার ফ্লাস্ক নিয়ে এবং সেগুলির মুখ খোলা রেখে পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন (চিত্র ১২.২)—রাজহাঁসের মতো গলা বায়ুকে প্রবেশ করতে দেবে, কিন্তু নির্যাসটিতে যে-কোনো জীবের প্রবেশ নিবারণ করবে। এবারও এই ফ্লাস্কগুলিকে কোনো জীবের বিকাশ ঘটল না।

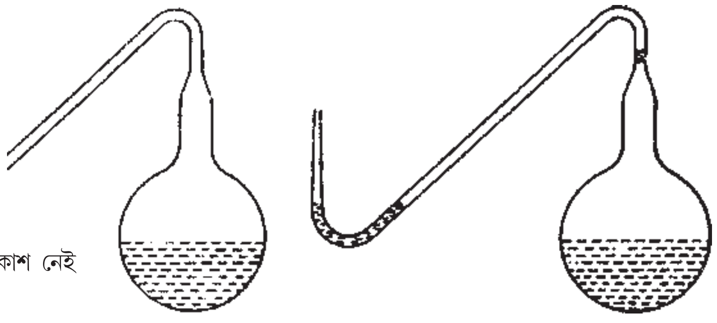

চিত্র ১২.১ : পাস্তুর নির্যাসটিকে এমন সব ফ্লাস্কে ফুটিয়েছিলেন যেগুলির দীর্ঘ রাজহংস-গলা বায়ুকে ঢুকতে দিত, কিন্তু ধূলিকণা বা জীবাণুকে নয়। শীতল করার পরে যতদিন না গলা ভাঙা হল, নির্যাসটি পরিষ্কার রইল। পাস্তুর যুক্তি দেখালেন, এই পরীক্ষাগুলি বায়ুতে কোনো জীবন্ত বস্তুর অস্তিত্ব অপ্রমাণ করেছে।

এভাবেই এই সরল পরীক্ষাগুলি দিয়ে পাস্তুর দেখিয়েছিলেন যে জীবন আপনাআপনি বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয় না।

পাস্তুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মদের সন্ধান বা গাঁজনের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছিল। সে সময়ে ফ্রান্সে মদ প্রস্তুত করা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং মদের "টক হয়ে যাওয়া" বা খারাপ হয়ে যাওয়া এই শিল্পকে তৎকালে বিপন্ন করছিল। পাস্তুর দেখালেন, সন্ধান প্রক্রিয়ার সময়ে কয়েকটি অনিষ্টকর জীবাণুর সংস্পর্শ নিবারণ করতে পারলে মদ টক হয়ে যাবে না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্য একটি ক্ষেত্র অর্থাৎ শল্যচিকিৎসাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করল। শল্যচিকিৎসাজনিত ক্ষত এবং আঘাত অনিবার্যভাবে সংক্রামিত হয়ে যেত এত বেশি যে আঘাতের জন্য না মরলেও শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি থেকে সংক্রমণের ফলে অবশ্যই মৃত্যু ঘটত। পাস্তুরের কাজের ভিত্তিতে অনুমান করা হল, যদি ক্ষতকে "পরিষ্কার" রাখা যায়, অর্থাৎ ক্ষতে রোগজীবাণুর প্রবেশ যদি নিবারণ করা যায়, তবে ক্ষতটি সংক্রামিত হবে না এবং অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে নিরাময় হবে।

১২.২.৩ রাসায়নিক অভিব্যক্তি

প্রাণ প্রথম কীভাবে উৎপন্ন হয়েছিল, সে প্রশ্নের উত্তর তখনও অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিল। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অর্থ হল, বহু শত কোটি বছর পিছনের সময়ে ফিরে দেখা এবং প্রাণ যখন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল সে সময়ে পৃথিবীর অবস্থা কী থেকে থাকতে পারে, তা অনুমানের চেষ্টা করা। ঠিক এটাই করার চেষ্টা করেছিল সোভিয়েট প্রাণরাসায়নিক ওপারিন এবং ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী হলডেন। তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন, "নিষ্প্রাণ জৈব অণুগুলি থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে।"

অন্যকথায়, প্রাণের উৎপত্তির সমস্যাটি বুঝতে হলে অবশ্যই ধরাপৃষ্ঠে "জৈব অণুগুলি"র উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। বিকাশের আদি দশায় যখন উত্তপ্ত গ্যাসগুলি ঘনীভূত হচ্ছিল এবং বিগলিত পদার্থ আজকের শিলাগুলির আকারে কঠিন হয়ে উঠেছিল, পৃথিবী তখন বিশাল কারখানার মতো বহু যৌগ উৎপাদন করছিল। নানাপ্রকার অণু উৎপাদনের জন্য শক্তির সহজপ্রাপ্য উৎস ছিল মহাজাগতিক রশ্মি, অতিবেগুনি বিকিরণ,

বিদ্যুৎ চমকানোর মতো তড়িতমোক্ষণ (electrical discharge), তেজস্ক্রিয়া এবং আগ্নেয়গিরি ও উষ্ম প্রস্রবণের উত্তাপ। আলোড়িত অবস্থার জন্য সকল প্রকারের অণু অবিরাম সৃষ্ট ও বিনষ্ট হচ্ছিল। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির মতো আবহমণ্ডলীর লঘুতর গ্যাসগুলি শূন্যে চলে গেল—যদি না তারা অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তরল বা কঠিন পদার্থ উৎপাদন করতে পেরে থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তারা রয়ে গেল ধরাপৃষ্ঠে। বিশেষত অক্সিজেন মুক্ত-অক্সিজেনের আকারে থাকতে পারল না—অন্যান্য মৌলের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যৌগ উৎপাদন করল। যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করল এবং পৃথিবীর আবহমণ্ডলে রয়ে গেল। অক্সিজেন অনুরূপভাবে ক্যালসিয়াম ও কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ চুনাপাথর তৈরি করল। আবার নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রে সংযোজিত হয়ে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন করল। কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগগুলিও সৃষ্ট হল—কখনও কখনও নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনসহ। এই যোগগুলিকে বর্তমানে "জৈব যৌগ" আখ্যা দেওয়া হয়।

এই সময়েই পৃথিবী শীতল হতে শুরু করেছিল। পৃথিবী যথেষ্ট শীতল হলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাত ঘটল। ধরাপৃষ্ঠের অবনমিত স্থানগুলিতে বৃষ্টির জল জমতে শুরু করল এবং সেভাবে মহাসমুদ্রগুলি উৎপন্ন হল। এই তপ্ত জলধিগুলিতে ছিল আবহমণ্ডল থেকে ধুয়ে আসা সুপ্রচুর ও বিবিধ জৈব যৌগ। উষ্ম জলে এই যৌগগুলির মধ্যে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়ার ফলে আরও বহু যৌগের উৎপাদন ঘটল। পৃথিবীর বিকাশের এই দশার সঞ্চিত জলকে "তপ্ত লঘু সুরুয়া" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে নির্মিত "অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি"। অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণুগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে "প্রোটিনের" বিশাল জটিল অণুগুলি নির্মাণ করল—এগুলি প্রাণ গড়বার ইটপাথরের মতো।

জটিল জৈব অণুগুলির মধ্য থেকেই এমন সব অণুসমষ্টির প্রথম উৎপত্তি ঘটল যেগুলি নিজেরাই নিজেদের অনুলিপি সৃষ্টি করতে পারে। নিজের অনুলিপি করার গুণের জন্য এগুলিকে জীবন্ত আখ্যা দেওয়া হয়। জলের রক্ষাকারী আবরণের নিচে না থাকলে সূর্যের মারাত্মক অতিবেগুনি বিকিরণে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত যে-কোনো জীবন্ত অণু বিনষ্ট হতে পারত। এমন আদিম প্রাণের জন্য খাদ্যের সরবরাহও ছিল খুব সীমিত, কারণ তা নির্ভর করত জলের ঊর্ধ্বতর স্তরগুলিতে বিকিরণের দ্বারা সংশ্লেষিত ও ধীরে ধীরে গভীরে নেমে আসা জৈব পদার্থগুলির ওপরে। কাজেই লক্ষ বছর ধরে প্রাণ নিশ্চয়ই এই বিশেষ অবস্থাগুলির অধীনে অস্তিত্বরক্ষা করে এসেছে। আবার ক্লোরোফিলযুক্ত যে জীবগুলি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা আপন খাদ্য উৎপাদন করতে পারে যেগুলি হয়তো উৎপন্ন হয়েছিল অণুর এলোপাথাড়ি সংযোজনের ফলে। এমন জীবগুলির অস্তিত্বরক্ষার সম্ভাবনা বেশি ছিল। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে শর্করা ও শ্বেতসারের মতো কার্বোহাইড্রেটের সংশ্লেষণে সূর্যালোক সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নিঃসৃত হয়। এরকম জীবগুলি

> নিজ অনুলিপিকর অণু (self-replicating molecules) অর্থাৎ যেগুলি চারিপাশের রাসায়নিক বস্তুগলি থেকে নিজেদের অনুরূপ অন্যান্য অণু নির্মাণ করতে পারে।

বৃদ্ধি পেলে এবং সালোকসংশ্লেষ চলতে থাকলে আবহমণ্ডল মুক্ত-অক্সিজেনে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠল। আমরা দেখব, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের উপরে এর বিরাট প্রভাব পড়েছিল।

> আদিম পৃথিবীর আবহমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের অভাব ছিল এবং এতে প্রধানত ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি। প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে সিয়ানো ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আরম্ভ করা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির ফলেই বিশ্বে মুক্ত অক্সিজেন নিঃসৃত হয়।

অতিবেগুনি বিকিরণের ক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন ওজোন উৎপাদন করে—এই গ্যাসটির মধ্য দিয়ে অতিবেগুনি বিকিরণে যেতে পারে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার উচ্চতায় এই ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে একটি সুরক্ষক "ওজোন স্তর" সৃষ্ট হয়। আমরা তাই একটি সুখকর ঘটনাস্রোত পাই—যত বেশি সালোকসংশ্লেষ, তত বেশি অক্সিজেনের উৎপাদন। আবার আবহমণ্ডলে অক্সিজেন থেকে উৎপন্ন অধিকতর ওজোন, সূর্যের অতিবেগুনি বিকিরণ থেকে পৃথিবীকে আড়াল করে রাখে। এর ফলে জীবগুলির পক্ষে জলের উপরিতলে আসা এবং আবর্তিত ও বিক্ষিপ্ত জল থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হলে এমনকি স্থলেও বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল। জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মিশ্রণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ পরিণামে জটিলতর, এমনকি বুদ্ধিমান জীবেরও আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

১২.২.৪ মিলারের পরীক্ষা

ধরাপৃষ্ঠে যখন প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল তখন সে অবস্থাগুলি অবশ্যই বর্তমান ছিল, পরীক্ষাগারে ছোট আকারে সেগুলিকে আবার সৃষ্টি করে উল্লিখিত মতবাদটি পরীক্ষা করা যায়।

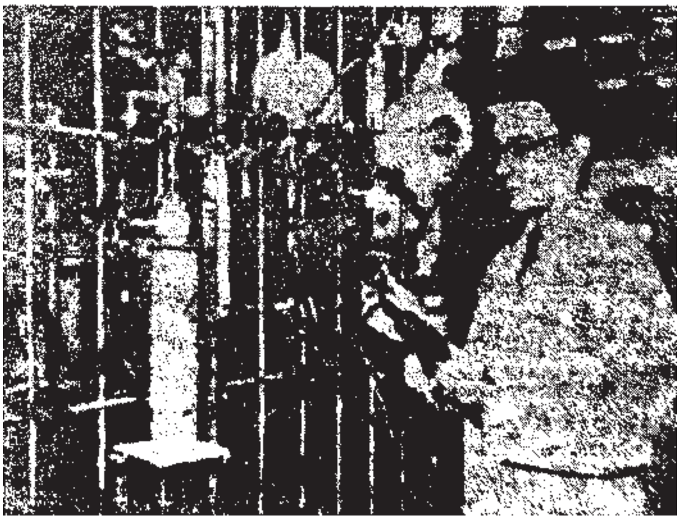

চিত্র ১২.২ : স্ট্যানলী মিলারকে তাঁর যন্ত্রসহ দেখানো হয়েছে। প্রাণ উদ্ভূত হওয়ার আগে পৃথিবীতে চলতে থাকা অবস্থায় অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংশ্লেষণ এই যন্ত্রটির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়।

মার্কিন জীববিজ্ঞানী মিলার (চিত্র ১২.২) একটি বন্ধ ফ্লাস্কের ভিতরে ৮০° সেলসিয়াসে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের এক গ্যাসীয় মিশ্রণে এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করেছিলেন। তার উষ্মতা এবং তার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক মোক্ষণ নিয়ে এই মিশ্রণটি ছিল এমন অবস্থায় যা হয়তো প্রাণের উৎপত্তির আগে পৃথিবীর অবস্থারই অনরূপ। এক সপ্তাহ পরে ফ্লাস্কটির ভিতরের বস্তু (চিত্র ১২.৩) পরীক্ষা করে তার মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গেল—এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি প্রোটিন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। আগেই বলেছি, প্রোটিন হল জীবের গঠনের জন্য অপরিহার্য ইটপাথরের মতো। পরীক্ষাগারে প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কিত অণুগুলি উৎপাদনের ফলে ওপারিন-হলড্রেনের রাসায়নিক অভিব্যক্তিবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বর্ণিত হল। তদবধি এই প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে। এমনি হয়েছে কতকগুলি শর্করা ও নাইট্রোজেন-ঘটিত ক্ষারকের ক্ষেত্রেও—এগুলিকে অন্যথায় জীবের এককরূপী কোষের নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায়। অনুরূপ পরীক্ষার পরিণামে এমন নানাবিধ যৌগ উৎপন্ন হয়েছে যেগুলি বহু প্রকারে ফ্যাট বা চর্বি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক রঞ্জকগুলি (pigments) তৈরি করে। জীবনের উৎপত্তির সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিলারের পরীক্ষা এভাবেই দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

মিলারের পরীক্ষা থেকে আমরা যে প্রমাণ পাই, আজও মহাকাশে চলতে থাকা অনুরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তা সমর্থিত হয়। ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় মর্চি মর্চিসনের কাছে যে উল্কাপিণ্ডটি পড়েছিল, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণে জৈব অণুর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। এই অণুগুলির প্রকৃতি ও আপেক্ষিক অনুপাত মিলারের পরীক্ষাজাত বস্তুগুলির অত্যন্ত অনুরূপ ছিল। আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশেও মিথেন, ইথেন, ফরম্যালডিহাইড, অ্যাসিটিলিন প্রভৃতির মতো জৈব অণুগুলির অস্তিত্ব রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যায় দেখানো হয়েছে।

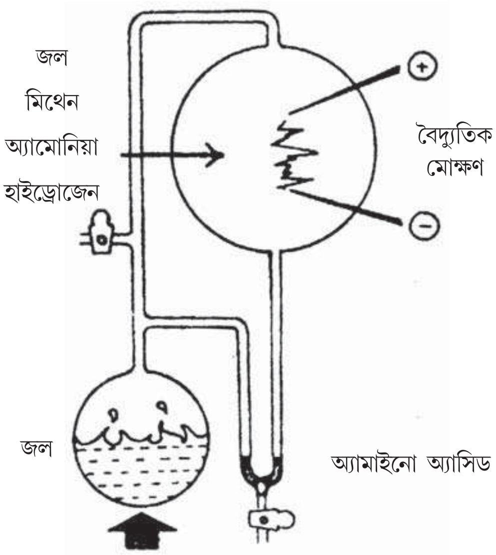

চিত্র ১২.৩ : আদিম পৃথিবীপৃষ্ঠের অবস্থাগুলির অনুকরণে কৃত পরীক্ষার একটি নিদর্শন। মিথেন, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন আছে, এমন একটি রুদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে জলকে উত্তপ্ত করা হয় এবং বাষ্পীভূত মিশ্রণটির ভিতরে বৈদ্যুতিক মোক্ষণ ঘটানো হয়। U-নল কলটিতে জৈব যৌগগুলি জমে ওঠে।

অনুশীলনী—১

(১) নিম্নে প্রদত্ত সারণীতে আমরা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কিত কয়েকটি মতবাদ এবং মতবাদগুলির কয়েকটি লক্ষণ তালিকাবন্ধ করেছি। লক্ষণগুলিকে প্রাসঙ্গিক মতবাদের সঙ্গে মেলান।

মতবাদ	লক্ষণ
(ক) স্বতঃজননবাদ	১. মহাকাশ থেকে কসমোজোয়া বা স্পোরগুলি বহু গ্রহে নীত হয়েছিল।
(খ) বিশেষ সৃজনবাদ	২. পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রভাবে ওপারিন ও হলডেন এই ধারণা উপস্থাপিত করেন যে পূর্বে উৎপাদিত জৈব অণুগুলি থেকে পৃথিবীতে প্রাণ উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে।
(গ) রাসায়নিক অভিব্যক্তিবাদ	৩. ঐশ প্রত্যাদেশের দ্বারা প্রাণের অসংখ্য আকারগুলি সৃষ্ট হয়েছিল।
(ঘ) প্রাচীন গ্রীক মতবাদ	৪. পচনশীল খাদ্য ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে জীব উৎপন্ন হয়।

(২) পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি অসম্পূর্ণ উক্তি নীচে দেওয়া হয়েছে। বন্ধনীর ভিতর থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করুন।

(ক) .... এর রাসায়নিক অভিব্যক্তিবাদের মতো পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদের সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারণ করা যায়।

(খ) মিলার একটি .... ফ্লাস্কের ভিতরে ৮০° ডিগ্রি সেলসিয়াসে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের একটি গ্যাসীয় মিশ্রণে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করেছিলেন।

(গ) ফ্লাস্কটির ভিতরের বস্তু পরীক্ষা করে তার মধ্যে .... পাওয়া গেল, যা প্রোটিন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য।

(ঘ) পরীক্ষাগারে অনুরূপ পরীক্ষার পরিণামে এমন নানাবিধ .... উৎপন্ন হল যেগুলি বহু প্রকারের চর্বি ও স্বাভাবিক রঞ্জক তৈরি করে।

(যৌগ, বন্ধ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ওপারিন হলডেন)

১২.৩ জৈব অভিব্যক্তি

পৃথিবীতে কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি ঘটে থাকতে পারে, তা আপনারা আগের পরিচ্ছেদটিতে দেখেছেন। ধরাপৃষ্ঠে অবস্থা যেমন যেমন পরিবর্তিত হল, কীভাবে ক্রমশ জটিলতর জীবগুলির অভিব্যক্তি ঘটল, তাও আপনারা দেখেছেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে প্রথম প্রকৃত কোষগুলির উৎপাদন দিয়েই জৈব অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়েছিল। এগুলি নিশ্চয়ই এমন সব আকারের ছিল যাদের মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল না এবং

যারা তাদের চারিপাশের জলে সহজলভ্য জৈব অণুগুলি ব্যয় করে প্রাণধারণ করত। কালক্রমে পৌষ্টিক দ্রব্যগুলি (nutrients) খরচ হয়ে গেলে অবশ্যই এমন সব কোষ এই প্রথম উদ্ভূত হয়ে থাকবে যেগুলি সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজ খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আলোকের শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম। আজ আমরা যে উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলিকে দেখতে পাই, তাদের বৈচিত্র্যের বিস্তার সরল এককোষী জীবগুলি থেকে একদিকে বহুপ্রকার উদ্ভিদ এবং অন্যদিকে মানুষসহ সকল জীবের মধ্যেই পরস্পর সম্পর্ক আছে এবং নিম্নতর জীবগুলি থেকে উন্নততর জীবগুলির অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ বিষয়ে আমরা 'মানুষের অভিব্যক্তি' নামে পরবর্তী এককটিতে আরও পড়ব। এই লক্ষ লক্ষ প্রজাতির একে একে পৃথক পর্যালোচনা নিতান্তই গুরুভার হবে। সেজন্য এগুলির অভিব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং আকার ও ক্রিয়ার সাদৃশ্য অনুযায়ী এগুলিকে নানা গোষ্ঠীতে শ্রেণীবিভক্ত করার প্রয়োজন হয়।

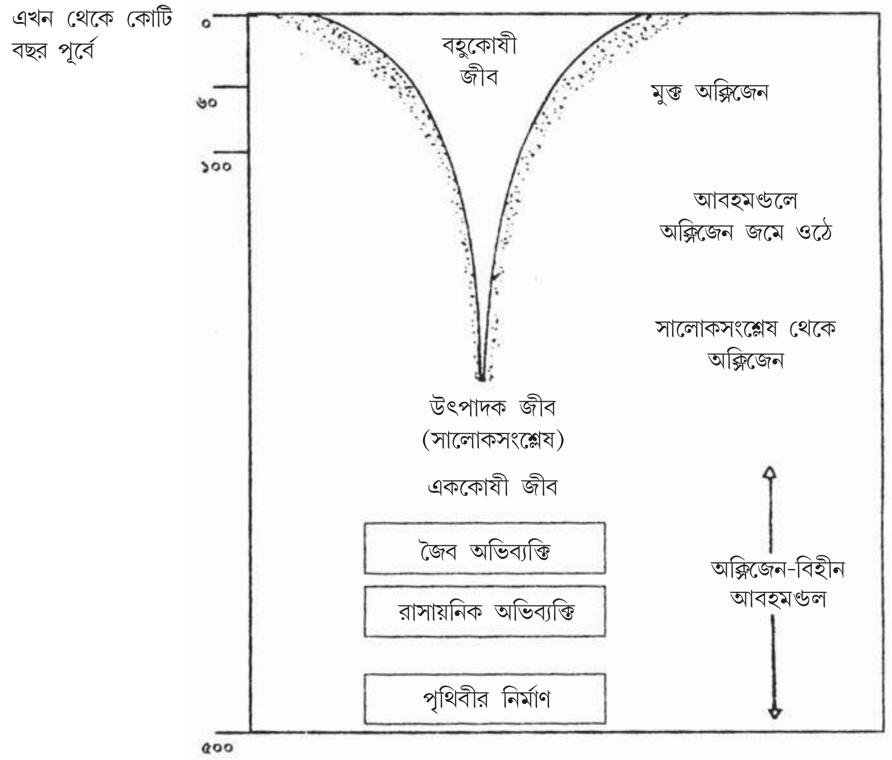

চিত্র ১২.৪ : পৃথিবীতে প্রাণের ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটনার চিত্ররূপ

বর্তমানে অধিকাংশ জীববিজ্ঞানী ১২.৫ চিত্রে প্রদর্শিত জীবের পাঁচটি বিভাগ বা সর্গকে (kingdom) স্বীকার করেন। আদিমতম এককোষী জীবগুলিকে নিয়ে প্রথম সর্গ—মোনেরা (Monera)। সূচনায় প্রায় ২ শত কোটি বছর ধরে কেবল এগুলিরই অস্তিত্ব ছিল। এই কোষগুলির নিউক্লিয়াস নেই এবং বর্তমানে এদের প্রতিভূ ব্যাকটেরিয়া এবং সিয়ানো-ব্যাকটেরিয়া—শেষোক্তগুলি অতীতে নীলহরিৎ শৈবাল বা ব্লু-গ্রীন অ্যালজী নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় সর্গ প্রোটিস্টার (Protista) অভিব্যক্তি ঘটেছিল প্রায় ১.৫ শত কোটি বছর আগে।

যেসব এককোষী জীবের নিউক্লিয়াস আছে, সেগুলি নিয়ে এই সর্গটি গঠিত। শৈবাল বা অ্যালজী, এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া এবং পিচ্ছিল বস্তুর ছাতা (slime moulds) এই সর্গটিতে স্থান পেয়েছে।

বর্ষাকালে গাছের তলায় আপনারা নিশ্চয়ই ব্যাঙের ছাতা গজাতে দেখেছেন। এগুলি এবং এককোষী ঈস্ট হল ফাংগী বা ছত্রাক সর্গটির সদস্য। যেসব জটিলতম জীব পচনশীল জৈব পদার্থ আহার করে, এগুলি তাদের অন্যতম। সেজন্য এগুলিকে একটি পৃথক সর্গে স্থান দেওয়া হয়। কতকগুলি ছত্রাক আবার পরজীবীও বটে এবং উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের গুরুতর রোগ ঘটিয়ে থাকে; আবার কতকগুলি ছত্রাক আমাদের দিয়েছে ঔষধের সর্বাপেক্ষা কার্যোপযোগী বর্গ, অ্যান্টিবায়োটিক। আপনারা নিশ্চয়ই পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদির নাম শুনেছেন—এগুলি ছত্রাকের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। এরপরে পৃথিবীর পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের (adaptation) ফলস্বরূপ উদ্ভিদ (plants) ও প্রাণী (animals) এই দুটি পরবর্তী সর্গের অভিব্যক্তি

চিত্র ১২.৫ : জীবগুলির পাঁচটি বিভাগ বা সর্গ (kingdom)

ঘটে। প্রায় ৬০ কোটি বছর আগে উদ্ভিদগুলির অভিব্যক্তির সূচনা হয়; এই জীবগুলির অধিকাংশেরই ক্লোরোফিল নামে একটি সবুজ রঞ্জক আছে, যা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজ খাদ্য উৎপাদনে তাদের সাহায্য করে। উদ্ভিদেরা প্রথমে এককোষী শৈবালের আকারে সমুদ্রে আবির্ভূত হয়েছিল। সবুজ শৈবালগুলিকে ব্যক্তজীবী

(gymnosperms) বা অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং গুপ্তবীজী (angiosperms) বা সপুষ্পক উদ্ভিদের মতো স্থলের উদ্ভিদগুলির কৌলিক যোগসূত্র বলে বিশ্বাস করা হয়। বর্তমানে এই উদ্ভিদগুলির প্রকারভেদ ঘটেছে এবং সংখ্যাতেও এগুলি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ভিদগুলি এমন বহুকোষী জীব যেগুলি সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজ খাদ্য সংশ্লেষণ করে; পক্ষান্তরে প্রাণীগুলি এমন বহুকোষী জীব যারা উদ্ভিদের দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য আহারের দ্বারা জীবনধারণ করে। অমেরুদণ্ডী অর্থাৎ শিরদাঁড়াহীন প্রাণী এবং মেরুদণ্ডী অর্থাৎ শিরদাঁড়াবিশিষ্ট প্রাণী—এই দুই ভাগে প্রাণীদের ভাগ করা হয়। বিবিধ প্রাণীগোষ্ঠীকে এমনভাবে সাজানো সম্ভব যাতে তাদের জটিলতার বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গ অমেরুদণ্ডী; কিন্তু মাছ, কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, সাপ, পাখি এবং গোরু এবং হরিণ, ঘোড়া, হাতি এমনকি মানুষের মতো স্তন্যপায়ীরা সকলেই মেরুদণ্ডী গোষ্ঠীভুক্ত।

কাজেই আমরা দেখি যে, জৈব অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে এবং কয়েক শত বছর ধরে অগ্রসর হচ্ছে, বিবিধ প্রজাতি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং তাদের নিজ নিজ পরিবেশে নিজেদের অভিযোজিত করেছে।

অনুশীলনী—২

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হয়েছে।

(ক) প্রথম কোষে কোন্ বস্তুর অভাব ছিল? ....

(খ) আপনার অঞ্চল বা এলাকায় পাওয়া যায়, এমন কতকগুলি অপুষ্পক উদ্ভিদের নামের তালিকা দিন। ....

(গ) খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে রঙ্গাকটি উদ্ভিদের আছে, তার নাম লিখুন। ....

(ঘ) যেসব প্রাণীর শিরদাঁড়া আছে, তাদের কী বলা হয়? ....

১২.৪ প্রাণের তন্ত্ররূপ (Systems view of life)

আপনারা উপরে দেখেছেন যে অভিব্যক্তি এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষের মতো এত জটিল জীব পর্যন্ত জীবনের বিবিধ প্রকার আকারের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এটা জানতে আপনাদের আগ্রহ হতে পারে যে এইগুলির মধ্যে এমনকি সরলতম জীবটিও খাদ্যগ্রহণ, বর্জ্য পদার্থের রেচন (Excretion), উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া এবং অপত্য প্রজননের মতো বিবিধ জীবনপদ্ধতি নির্বাহে সক্ষম। বিভিন্ন পরিবেশে সে বেঁচে থাকতে পারে। দেখা যাক, কীভাবে জীব এসব করতে সমর্থ হয়।

যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা প্রাণ বলে চিনতে পারি, সেগুলি বস্তুত জীবের বিভিন্ন অংশের সমন্বিত কাজকর্মের প্রকাশ। উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী, যে-কোনো জীবের বিভিন্ন অংশগুলিকে বিশৃঙ্খলভাবে একত্রে বসিয়ে দেওয়া হয়নি বরং সেগুলি নানা তন্ত্রে (system) সংগঠিত হয়েছে।

তন্ত্র হল এমন কতকগুলি বিশেষ ও পরস্পর সম্পর্কিত অংশের একটি বিন্যাস, সেগুলি কোনো উদ্দেশ্যের জন্য একটি এককের মতো সংগঠিত হয়েছে। অংশগুলি একত্রে কাজ করে এবং সম্পূর্ণ সমাহারটি একটি একক গঠন করে। পরিবহন-যান উৎপাদনের জন্য সংগঠিত একটি যাননির্মাতা কোম্পানিকেও একটি তন্ত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে। কোম্পানিটির ফলপ্রদ কাজকর্মের জন্য এর সকল অংশকে, যেমন—কাঁচামাল কেনার বিভাগটি, কারখানা, পরিচালনা এবং বিপণন বিভাগটিকে অবশ্যই সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হবে। একটি প্রাণী বা উদ্ভিদও এমন বহু অংশ দিয়ে গঠিত যেগুলি এক সুবিবৃত তন্ত্রের প্রতিভূ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাণীদেহে

খাদ্যের আহার ও পরিপাকে নিয়োজিত অংশগুলি, দেহভার বহনের জন্য কঙ্কালের আকারে সজ্জিত অস্থিগুলি, শিরা ধমনী দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তসংবাহক হৃদপিণ্ড এবং নানাপ্রকার সংকেত গ্রাহক ও নির্দেশদাতা মস্তিষ্ক একত্রে এই তন্ত্রটি গঠন করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরে এবং জলস্থলবায়ুর দ্বারা প্রদত্ত এক পরিবেশে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্মিলনটি সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। জীবনের এই বিবিধ আকার যেভাবে পরস্পরের উপরে নির্ভর করে, তাতে এই গ্রহটিকেই এক বিশাল তন্ত্ররূপে অনুমান করতে হয়।

অন্য একভাবে এর দিকে তাকালে, পৃথিবীর প্রাণ ও পরিবেশ হল এক সুসমন্বিত তন্ত্র যার ভিতরে এক এক প্রকারে জীব উপতন্ত্রের মতো বর্তমান। আবার এই উপতন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির ভিতরে, অর্থাৎ একটিমাত্র উদ্ভিদ বা প্রাণীতে, একটি জটিল বহুকোষী তন্ত্র দেখতে পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে শিল্প, কৃষি বা শিক্ষার তন্ত্রগুলিকে সমাজের উপতন্ত্ররূপে বিবেচনা করা যায়।

জৈব তন্ত্রগুলি নিজেদের একটি নির্দিষ্ট সংযুক্ত (composite) আকারেও ক্রিয়া অব্যাহত রাখে। যথা, একটি বিড়াল বিড়ালই থাকে, খাদ্যের জন্য শিকার খুঁজে বেড়ায়, শাবক প্রসব করতে পারে, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ তন্ত্র সুস্থিত হয়ে ভৌত সূত্রগুলির ভিত্তিতে ক্রিয়া করে। একটি তন্ত্রের এই সুস্থিতি কীভাবে অব্যাহত রাখা হয়? একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক : চারিপাশের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলেও কোনো পুরুষ বা নারী কীভাবে এই অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি বজায় রাখে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, কীভাবে তারা নির্দিষ্ট ৩৭° সেলসিয়াস উষ্মতা বা রক্তের সংযুতি (composition) অথবা রক্তচাপকে অব্যাহত রাখে? দেখা গেছে, সকল জীবেরই বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের এক প্রকারের জাল থাকে যা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের নানা পরিস্থিতির সঙ্গে উপযোজনের নির্দেশ দেয়; যথা, আপনি একটি শামুককে স্পর্শ করলে সে তার খোলকের ভিতরে ঢুকে যায়। এটি তার প্রাণরক্ষার জন্য বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের একপ্রকার কৌশল। আপনি যদি রোদে বসে থাকেন এবং গরম বোধ করেন, দেহের ভিতরে উৎপাদিত একটি সঙ্কেত ঘর্মক্ষরণ ঘটায় এবং ঘর্মের বাষ্পীভবনের দ্বারা দেহকে শীতল করে। এটি দেহে নির্দিষ্ট উষ্মতা অব্যাহত রাখার জন্য বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের আরও একটি উদাহরণ।

আপনারা দেখতে পারেন, সকল জীবেরই বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের একটি জাল আছে, যা খুব সরল অথবা কখনও কখনও বেশ জটিল হতে পারে। এটি ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব রক্ষা বা সুস্থিত ভৌত অবস্থায় জীবনধারণ, কোনোটিই সম্ভব নয়।

সাধারণ বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের পর্যালোচনার জন্য "সাইবারনেটিক্স" (cybernetics) নামে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। এর কারণ, এমনকি যন্ত্রগুলিও এমনভাবে পরিকল্পিত হতে হয় যাতে সুস্থিতভাবে কাজ করা যায়। টেলিভিশন সেট বা রেফ্রিজারেটরের সঙ্গে ব্যবহৃত ভোল্টেজ রেগুলেটর নামে একটি যন্ত্রের সঙ্গে আপনারা নিশ্চয়ই পরিচিত। কোনো সময়ে ভোল্টেজ একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বে চলে গেলে ভোল্টেজ রেগুলেটর তাকে সেই মাত্রায় ফিরিয়ে আনে। এভাবে টিভি বা রেফ্রিজারেটরে সরবরাহ করা ভোল্টেজ সুস্থিত থাকে।

আরেকটি উদাহরণ হল, বিশেষত অফিস, হোটেল প্রভৃতি অট্টালিকায় অগ্নিনিবারণ। এক্ষেত্রে কক্ষগুলির উষ্মতা মাপার জন্য একটি কৌশল ব্যবহৃত হয় এবং একটি বিশেষ কক্ষে উষ্মতা সহসা বৃদ্ধি পেলে একটি ভাল্‌ভ খুলে গিয়ে ছাদ থেকে জল ছিটাতে থাকে। আগুনের বিরুদ্ধে এটি স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা।

চিন্তা করলেই দেখি বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হল, "স্বাভাবিক" মান থেকে কোনো ব্যতিক্রম বা "প্রভেদকে" ধরা এবং এটির সাহায্যে ওই প্রভেদ সংশোধনের জন্য একটি সংকেত উৎপাদন করা। সকল সুস্থিত তন্ত্রের মূলে আছে এভাবে ত্রুটি সংশোধনের জন্য ব্যতিক্রম, প্রভেদ বা ত্রুটিকে ব্যবহার করা। এটিকে এক "পশ্চাৎমুখী" বা "ফিডব্যাক" ব্যবস্থাও বলা যায়, যার অর্থ হল ত্রুটি সংশোধন বা কমানোর জন্য ত্রুটিটিকে পিছনে এনে একটি নিয়ন্ত্রকে পৌঁছে দেওয়া।

জীবগুলির তাদের চারিপাশের পরিবর্তন অনুযায়ী নিজ জীবন নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য সামর্থ্য আছে। বাইরের পরিবেশে পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা স্বাভাবিক বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ গঠন এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বজায় রাখে। জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এই নিত্যতার (constancy) অবস্থা "হোমিওস্ট্যাসিস" বা সমস্থিতি বলে পরিচিত।

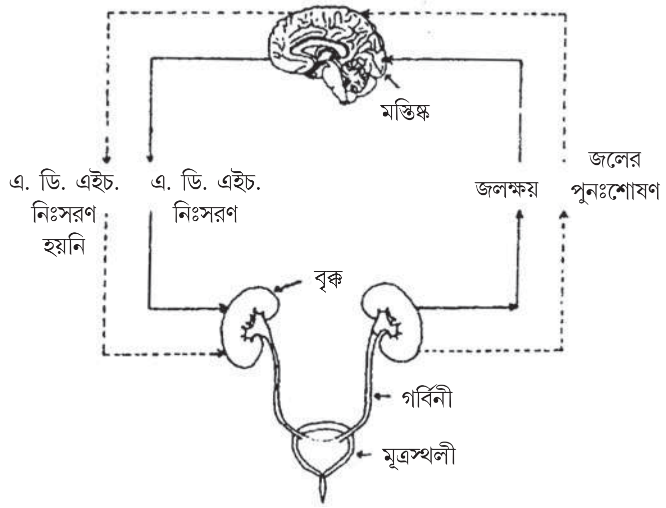

চিত্র ১২.৬ : বৃক্ক থেকে জলক্ষয় নিবারণের ফিডব্যাক পদ্ধতি

আপনাদের আমরা মানবদেহে ফিডব্যাক তন্ত্রের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেব—এটি রক্তে জলের সঠিক পরিমাণকে অব্যাহত রাখে (চিত্র ১২.৬)। বৃক্ক আমাদের দেহ থেকে জলের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ বা নিবারণ করতে সক্ষম। এর জন্য মূত্রের আকারে জলের অত্যধিক নির্গমন নিবারণ করতে বৃক্কের সংগ্রাহক নলগুলির দ্বারা জল পুনঃশোষিত হয়। জলের এই শোষণ অ্যান্টি-ডাইইউরেটিক হরমোন বা এ. ডি. এইচ. (ADH) নামে একটি রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণাধীন। এটি পুরোমস্তিষ্কের (forebrain) একাংশের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত নার্ভকোষগুলির দ্বারা উৎপাদিত হয়। যদি গ্রীষ্মে অধিকতর বাষ্পীভবনের ফলে দেহ অধিক পরিমাণে জল হারাতে শুরু করে, তবে রক্তে জল হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিবর্তিত হয়—এ সম্বন্ধে আমাদের দেহ অত্যন্ত সুবেদী (sensitive)। প্রয়োজনের সময়ে একটি ইতিবাচক (positive) সঙ্কেত মস্তিষ্কে গিয়ে এ. ডি. এইচ. নামে এই বিশেষ রাসায়নিকটির উৎপাদন ঘটায়। এ. ডি. এইচ. বৃক্কে জলের শোষণ বাড়ায় এবং মূত্রের রেচন (excretion) কমায়। শোষিত জল রক্তে ফিরে গিয়ে রক্তের স্বাভাবিক গাঢ়তাকে অপরিবর্তিত রাখে।

অনুশীলনী—৩

নীচের উক্তিগুলি তন্ত্রগুলিকে বর্ণনা করছে। বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত শব্দগুলি ব্যবহার করে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(ক) উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী, যে-কোনো ....-এর বিভিন্ন অংশগুলিকে বিশৃঙ্খলভাবে একত্র বসিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং সেগুলি নানা ....-এ সংগঠিত হয়েছে।

(খ) সকল জীবেরই .... ও ....-এর একপ্রকার জাল আছে।
(গ) .... হল সাধারণভাবে বার্তা ও নিয়ন্ত্রণের পর্যালোচনা।
(ঘ) বৃক্কগুলি আমাদের দেহ থেকে জলের .... নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ করতে সক্ষম।
(ঙ) এগুলি মস্তিষ্কে সংকেত পাঠিয়ে .... নামে এমন একটি বিশেষ রাসায়নিকের উৎপাদন ঘটায়, যা ....-এর জলের শোষণ বাড়ায় এবং মূত্রপ্রবাহ হ্রাস করে।
(এ. ডি. এইচ., জীব, ক্ষয়, বার্তা, নিয়ন্ত্রণ, সাইবারনেটিক্স, বৃক্ক, তন্ত্র)

১২.৪.১ জীবনচক্র

জীববিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল, জীব একটি তন্ত্র যার বিভিন্ন অংশ সারা জীবন ধরে তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে অব্যাহত রাখতে কাজ করে। কিন্তু এই তন্ত্র কীভাবে গঠিত হয়?

জীব তার জীবনকালে জন্ম, বৃদ্ধি, প্রজনন ও মৃত্যুর মতো কয়েকটি পরিচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। আমাদের চারিদিকে আমরা উদ্ভিদকে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হতে, বৃদ্ধি পেতে, ফলধারণ করতে এবং শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যেতে দেখি। শিশুরা জন্মায়, বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণবয়স্ক হয়, বিবাহ করে, নিজেরা সন্তানলাভ করে, বৃদ্ধ হয় এবং মারা যায়। জীবের জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটে থাকে সেগুলির দ্বারাই জীবনচক্র গঠিত হয়।

জনিতারা (parents) মৃত ও লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অপত্যেরা (progenies) জীবনচক্রের পুনরাবৃত্তি করে চলে। প্রজননের দ্বারা প্রজন্মগুলির এই ধারাবাহিকতা সম্ভব হয়। এককোষী জনিতার সরল বিভাজনের দ্বারা মোটামুটি সমান আয়তনবিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর কোষগুলি উৎপাদন করে ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল (অ্যালজী), প্রোটোজোয়া প্রভৃতির মতো আদিম জীবগুলির প্রজনন সম্পন্ন হয়। অতঃপর জাত কোষগুলি প্রত্যেকটি বৃদ্ধি পেয়ে জনিতার আয়তন লাভ করে। কতকগুলি জীব একটি উপবৃদ্ধি বা কোরকের (outgrowth or bud) বিকাশ ঘটায়, যেটি জনিতৃদেহ (parent body) থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং একটি স্বতন্ত্র জীবরূপে বিকশিত হয়। কতকগুলি নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে জনিতৃদেহ কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি খণ্ড একটি সম্পূর্ণ জীবরূপে বিকাশলাভ করে।

উপরে বর্ণিত সকল পদ্ধতিরই সাধারণ লক্ষণটি হল, একটিমাত্র জনিতা এগুলিতে জড়িত থাকে এবং সেকারণে সকল উদ্ভূত পরস্পরসদৃশ হয়। প্রজননের এই পদ্ধতিকে "অযৌন প্রজনন" বলে। উল্লেখযোগ্য যে কেবল নিম্নতর প্রাণী এবং কতকগুলি উদ্ভিদগোষ্ঠীর মধ্যেই অযৌন প্রজননের প্রাধান্য আছে। একে মানুষ নিজ সুবিধার্থে উদ্ভিদ প্রজনন (plant breeding) বা উদ্যানবিদ্যায় (horticulture) ব্যবহার করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শাখাকে সোজাসুজি কেটে নিয়ে এবং তাকে পৃথকভাবে বড় করে একটি নূতন গোলাপ গাছ পাওয়া যেতে পারে। কয়েক প্রকারের লেবুজাতীয় ফল, লেবু, কমলালেবু প্রভৃতির মতো কতকগুলি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের চাষে এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে, এভাবে উৎপাদিত উদ্ভিদগুলি বীজজাত উদ্ভিদের তুলনায় দ্রুততর সুপরিণত হয় এবং শীঘ্রতর ফলধারণ করে।

এখন আমরা জানি, বংশগতির (heredity) সঙ্গে পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত ব্যক্তিগত প্রকরণগুলির (variations) উপরে অভিব্যক্তি নির্ভর করে। যে প্রজননে দুই জনিতা জড়িত, সেই যৌন প্রজনন পদ্ধতিতে এই প্রকরণগুলি বংশগতভাবে পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজনন এই পদ্ধতিতে

ঘটে থাকে। পুং-জনিতা শুক্রাণু বা "স্পার্ম" নামে একটি অতি বিশিষ্ট কোষ উৎপাদন করে এবং জনিত্রী (স্ত্রী-জনিতা) ডিম্বাণু বা "ওভম্" উৎপাদন করে। এই কোষগুলিকে "গ্যামেট" বা জননকোষও বলা হয় এবং এগুলি অন্যান্য দেহকোষ থেকে ভিন্ন, কারণ এদের "ক্রোমসোম" সংখ্যা অন্যান্য কোষের অর্ধেক। ক্রোমসোমগুলি হল এমন সব রাসায়নিক গঠন যেগুলি জীবনের সকল পদ্ধতির বার্তা বহন করে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষ দুটি নিষেক (fertilization) নামে পদ্ধতিতে মিলিত হয়ে "জাইগোট" নামক একটি নূতন কোষ গঠন করে। জাইগোট থেকে বহুকোষী জীবের বিকাশের ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই মূলত অভিন্ন। বিকাশের প্রথম সোপানে এককোষী জাইগোটের বিভাজন ঘটে এবং পরবর্তী কোষগুলি পরস্পর লিপ্ত (adhering) থেকে বারবার বিভাজিত হতে থাকে। অবশেষে এই কোষগুলি নানা অঙ্গ গঠনের জন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে। যথা, বিকাশের ধারায় কতকগুলি কোষ যকৃৎ গঠনের জন্য বৈশিষ্ট্য পায়। এই কোষগুলি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে শুরু করে এবং যকৃৎ গঠনের জন্য লক্ষ লক্ষ কোষের জন্ম দেয়। বিভেদিত (differentiated) মস্তিষ্ককোষগুলি অনুরূপভাবে জীবদেহে মস্তিষ্কের জটিল গঠন সৃষ্টি করে। অন্যান্য অঙ্গও সদৃশ পদ্ধতিতে গঠিত হয়ে জীবের বিভিন্ন অংশে পরিণত হয়। জীব সুপরিণত হওয়ার পরে কালক্রমে বার্ধক্যের সূচনা ঘটে।

১২.৪.২ বার্ধক্য

বার্ধক্যের সরল অর্থ হল বুড়ো হওয়া অর্থাৎ দেহের কোষ ও অঙ্গগুলির গঠন ও ক্রিয়ার ক্রমাবনতির পদ্ধতি। বার্ধক্য জীবনচক্রের একটি সম্পূরক অংশ। কোনো জীব মারাত্মক দুর্ঘটনায় না পড়লেও, অন্য জীব তাকে খেয়ে না ফেললেও, অথবা সে মারক রোগে আক্রান্ত না হলেও বৃদ্ধ বয়সের স্বাভাবিক অন্তিম পরিণাম রূপে আসে মৃত্যু। মানুষের বার্ধক্যের লক্ষণগুলির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত; সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল শুষ্ক ও কুঞ্চিত ত্বক, ভঙ্গুর অস্থি, হ্রাসপ্রাপ্ত রক্তসংবহন এবং শীর্ণ বিশুষ্ক দেহ। বার্ধক্যের এই বাহ্য লক্ষণগুলি কোষমধ্যে ঘটতে থাকা পরিবর্তনগুলির এবং কোষের বিভাজনশক্তি লোপের পরিণাম।

একটি জীবনকালে কোটি কোটি কোষ বিনষ্ট হয় এবং কোষবিভাজন পদ্ধতির দ্বারা দ্রুত প্রতিস্থাপিত হয়। বার্ধক্য তখনই আসে যখন যতগুলি কোষ প্রতিস্থাপিত হয়, ততোধিক কোষের বিনাশ ঘটে। কোষগুলির নির্দিষ্ট বিভাজনশক্তি থাকে এবং এক এক জীবের পক্ষে তা সুনির্দিষ্ট। কতকগুলি প্রাণী অন্যদের তুলনায় কেন দ্রুততর বৃদ্ধ হয় এবং অন্যদের অপেক্ষা তাদের জীবৎকাল হ্রস্বতর কেন, এগুলির ব্যাখ্যা এ থেকেই মেলে।

বিভিন্ন দেহকোষের বিভাজন হারেরও বিশেষত্ব আছে। মানুষের যে কোষগুলি ত্বক গঠন করে, সেগুলি ক্রমাগত বিনষ্ট ও পুনর্গঠিত হচ্ছে, কিন্তু যে কোষগুলি মস্তিষ্ক গঠন করে সেগুলি জন্মের প্রায় ৫-৬ বছর পরের একটি সময় থেকে আদৌ বিভাজিত হয় না। কাজেই এক ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের কোষের বয়স ভিন্ন ভিন্ন হারে বাড়ে।

বার্ধক্যের পদ্ধতি এবং কীভাবে তাকে বিলম্বিত করা যায়, সেবিষয়ে পর্যালোচনায় সাম্প্রতিককালে প্রভূত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বার্ধক্যকে বিলম্বিত করতে পারলে এবং জীবনকালের দীর্ঘতর সময় আমরা দেহমনে সক্রিয় থাকতে পারলে কত চমৎকার হয়—তাই না? যেসব শারীরিক ব্যায়াম রক্তসংবহন ও অন্যান্য দেহপ্রক্রিয়ার মন্দনের প্রতিকূলতা করে, সেগুলি এ বিষয়ে সাহায্য করে বলে বিদিত আছে। বার্ধক্যকে বিলম্বিত করতে পারে এমন কতকগুলি ঔষধ নিয়েও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

অনুশীলনী—৪

প্রদত্ত শূন্যস্থানে চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটিকে দেখান।

১. অযৌন প্রজনন নির্বাহে অংশগ্রহণ করে :

(ক) উভয়জনিতা ( )

(খ) একটিমাত্র জনিতা ( )

২. যৌন প্রজননে জননকোষগুলি উৎপন্ন হয় :

(ক) ক্রোমোসোম সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে ( )

(খ) ক্রোমোসোম সংখ্যাকে অর্ধেকে হ্রাস করে ( )

(গ) ক্রোমোসোম সংখ্যায় কোনোও পরিবর্তন না ঘটিয়ে ( )

৩. বার্ধক্যের কারণ হল :

(ক) মস্তিষ্ক কোষগুলির বৃদ্ধির মন্দন ( )

(খ) ত্বকের কুঞ্চন ( )

(গ) কোষের ক্রিয়ার ত্রুটি ( )

(ঘ) সর্বদেহের কোষ ও অঙ্গগুলির গঠন ও ক্রিয়ায় অবনতি ( )

১২.৫ পৃথিবীর বাইরে প্রাণ

ধরাপৃষ্ঠে প্রাণের কীভাবে উৎপত্তি ঘটেছিল সে বিষয়ে আমরা যেমন কৌতূহলী হয়েছি, সৌরজগতের অপর কোনো গ্রহে অথবা বিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণ আছে কিনা তাও অন্বেষণের চেষ্টা চলেছে।

সাম্প্রতিককালে মহাকাশযান এবং ভূপৃষ্ঠ-ভিত্তিক মানমন্দিরগুলির দ্বারা মহাকাশে অনুসন্ধান আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে সমগ্র সৌরজগতে পৃথিবী গ্রহটি বোধহয় একমাত্র স্থান যেখানে প্রাণ রয়েছে। অন্য গ্রহগুলি সূর্য থেকে এমন দূরত্বে আছে যে জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে তারা হয় অত্যধিক উত্তপ্ত না-হয় অতিশীতল। একমাত্র নিকট সম্ভাবনার স্থান হল মঙ্গলগ্রহ। ভাইকিং মহাকাশ অন্বেষক প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে মঙ্গলগ্রহ থেকে শিলা ও মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছে (চিত্র ১২.৭)। কিন্তু এই গ্রহে বর্তমান বা অতীত কোনো জীবিতেরই চূড়ান্ত প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

মানুষ সৌরজগৎ ছাড়িয়েও প্রাণের সন্ধান করছে। বর্তমানে এজন্য দুটি পথ বা কৌশল তার কাছে খোলা আছে : হয় বিশ্বের কোনো বিশেষ তারায় মানুষ বা যন্ত্র পাঠিয়ে প্রাণের সন্ধানে তার পৃষ্ঠকে পরীক্ষা করা, না-হয় মহাকাশ থেকে বেতার তরঙ্গের আকারে যেসব সংকেত আসতে পারে সেগুলি কান পেতে শোনা। আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান অবস্থায় প্রথম কৌশলটি আমাদের সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে নিয়ে যায় না। দ্বিতীয় কৌশলটির ভিত্তি এই অনুমানের উপরে, যে প্রায়োগিক দিক দিয়ে আমাদের মতো বা তার চেয়েও উন্নততর সভ্যতা থাকতে পারে; কাজেই আমরা তাদের সঙ্গে বেতারবার্তার বিনিময় করতে পারি।

এই কাজে এপর্যন্ত আমাদের কোনোও ফললাভ ঘটেনি। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে ধূলিকণা, গ্যাস ও নক্ষত্রগুলি নিয়ে যে সম্পূর্ণ মণ্ডলটির ভিতরে সূর্যের চলন, আমাদের সেই ছায়াপথটি (galaxy) হয়তো ইতিমধ্যেই অনেক প্রাচীনতর ও উন্নততর সভ্যতার মধ্যে বার্তা বিনিময়ের কলরবে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। হয়তো পৃথিবীতে অদ্যপি অনাবিষ্কৃত কোনো কৌশলে এই সংকেতগুলি প্রেরিত হয়েছে, যার ফলে হয়তো আমরা সেগুলিকে আদৌ ধরতে পারছি না।

সম্প্রতি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন কিছু নক্ষত্র দেখতে পেয়েছেন, আমাদের সূর্যের মতোই যেগুলির গ্রহ আছে। এটি সত্য বলে প্রমাণিত হলে বিশ্বে লক্ষ লক্ষ গ্রহমণ্ডল থাকতে পারে,—এতে সেগুলির কয়েকটিতে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

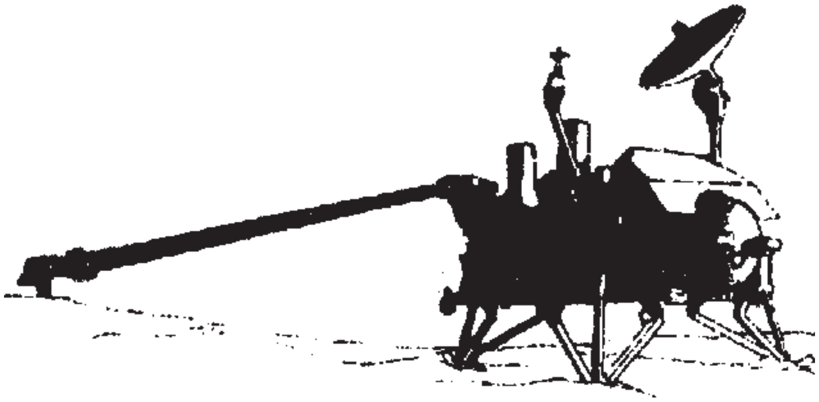

চিত্র ১২.৭ : একটি ভাইকিং অবতরণযান যা মঙ্গলগ্রহের শিলা ও মৃত্তিকার নমুনা বিশ্লেষণ করেছিল।

১২.৬ সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখেছেন :

- পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত নানা মতবাদ এবং কীভাবে পাস্তুর একটি সুপরিকল্পিত পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে কেবল জীবেরাই অন্য জীব উৎপন্ন করতে পারে।
- ওপারিন-হলডেনের রাসায়নিক অভিব্যক্তিবাদ এবং সে বিষয়ে মিলারের পরীক্ষাগুলি থেকে প্রাপ্ত সমর্থন।
- জৈব অভিব্যক্তি কীভাবে প্রথম কোষগুলির উৎপাদন দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং আবহমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন নিঃসরণে ও ওজোন স্তর নির্মাণে সালোকসংশ্লেষ কোনো্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণী, উভয় আকারের জীবেরই বিপুল প্রকারভেদ সম্ভব হল।
- প্রাণের তন্ত্ররূপ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে জীবগুলির নিজ নিজ আকার ও ক্রিয়া অব্যাহত রাখার সামর্থ্য।

- জীবনচক্র, অর্থাৎ জন্মকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকে যে বিভিন্ন দশা দিয়ে যেতে হয়, এবং বার্ধক্যের ঘটনা।

১২.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. কোন্ উপায়ে প্রাণের স্বতঃজনন সম্বন্ধে ধারণাটি লুই পাস্তুরের গবেষণার ফলে বর্জিত হয়েছিল?

....

....

....

....

....

২. প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন মতবাদগুলির উপরে মিলারের পরীক্ষার সংঘাতগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

....

৩. জীবের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ব্যতিক্রমকে কি সংশোধন করা যায়? আপনার উত্তর সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

....

....

....

....

....

৪. পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্য পাওয়ার কোনোও বিদিত কৌশল আছে কি? সেগুলি কী কী?

....

....

....

....

....

১২.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১. (১) (ক) ৪ (খ) ৩ (গ) ২ (ঘ) ১

(২) (ক) ওপারিন-হলডেন (খ) বন্ধ (গ) অ্যামাইনো অ্যাসিড (ঘ) যৌগ

২. (ক) নিউক্লিয়াস (খ) সাইকাস ও পাইন গাছ (গ) ক্লোরোফিল (ঘ) মেরুদণ্ডী

৩. (ক) জীব, তন্ত্র (খ) বার্তা, নিয়ন্ত্রণ (গ) সাইবারনেটিক্স (ঘ) ক্ষয় (ঙ) এ.ডি.এইচ., বৃক্ক

৪. (১) খ (২) খ (৩) ঘ

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. কিছু পরীক্ষার আয়োজন করে পাস্তুর দেখিয়েছিলেন যে পচনশীল খাদ্য ও অন্যান্য জৈব পদার্থ জীব উৎপন্ন করে না, বরং পচন ও সন্ধান জীবাণুর দ্বারা ঘটে থাকে।

২. মিলার একটি বন্ধ কাচকূপীতে ৮০° সেলসিয়াসে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের একটি গ্যাসীয় মিশ্রণ রেখে এক সপ্তাহ ধরে কাচকূপীটিতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করেছিলেন। এটি ছিল পৃথিবীর আদি আবহমণ্ডলের প্রতিভূ। এভাবে উৎপন্ন পদার্থগুলির বিশ্লেষণে জীবদেহে আছে বলে বিদিত জৈব যৌগগুলির উৎপাদন প্রকাশ পেল। এই পরীক্ষাটি ওপারিন ও হলডেনের উপস্থাপিত রাসায়নিক অভিব্যক্তিবাদকে সমর্থন করেছিল।

৩. জীবের এমন সব পদ্ধতি আছে যা স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনকে বুঝতে পারে এবং একবার ধরতে পারলে পরিবর্তনটি পশ্চাদমুখী বা ফিডব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধিত হয়।

৪. অন্য গ্রহগুলি সূর্য থেকে এবং পরস্পর থেকে এত দূরে আছে যে বর্তমানে মানুষের কাছে দুটি মাত্র উপায় আছে : হয় একটি মনুষ্যচালিত বা মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানকে অবতরণ করানো, না-হয় এতদুদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাকাশ থেকে সংকেত পাওয়া।

একক ১৩ □ মানুষের অভিব্যক্তি

গঠন

১৩.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
১৩.২ অভিব্যক্তিবাদ
ডারউইন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন
মানুষের অভিব্যক্তি
প্রাইমেট ঐতিহ্য
১৩.৩ মানুষের অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ
প্রত্নজীববিদ্যা বিষয়ক প্রমাণ
পুরাতত্ত্বীয় প্রমাণ
নৃতত্ত্বীয় প্রমাণ
প্রাণরাসায়নিক প্রমাণ
অতীতের কালনির্ধারণ
১৩.৪ সারাংশ
১৩.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১৩.৬ উত্তরমালা

১৩.১ প্রস্তাবনা

এই গ্রহটি প্রাণের পোষকতা করার মতো যথেষ্ট শীতল হওয়ার কয়েক সহস্র লক্ষ বৎসরের মধ্যে কীভাবে আদিম জীবগুলি আবির্ভূত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এককটিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম। বর্তমান এককে আমরা অভিব্যক্তিবাদ (Theory of evolution) নিয়ে আলোচনা করব। আমরা বিশেষত মানুষের অভিব্যক্তির উপরেই জোর দেব—মানুষের বুদ্ধির অত্যুচ্চ মাত্রা, সোজা হয়ে হাঁটা এবং লক্ষণীয় সামাজিকতার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি বানর ও বনমানুষের মতো অন্যান্য স্তন্যপায়ী থেকে তার স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়েছে।

জীবাশ্মের প্রথাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মানবজাতির বিশেষত তার সমাজ, রীতিনীতি ও গঠনের পর্যালোচনা (অর্থাৎ যাকে আমরা নৃবিদ্যা আখ্যা দিই) এবং কোষীয় ও জৈব অতিকায় অণুগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাণী হিসাবে মানুষের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা—এগুলিকে একত্রিত করে আমরা এখানে মানুষের উৎপত্তির চিত্রটি আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের পরে আপনাদের এগুলি করতে পারা উচিত :

- প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদটি বর্ণনা করা।
- মানুষের অভিব্যক্তির বিভিন্ন দশার তালিকা প্রণয়ন করা।
- প্রত্নজীববিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, নৃবিদ্যা ও প্রাণরসায়নের মতো বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষের অভিব্যক্তির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে প্রমাণ বিবৃত করা।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্মগুলির বয়স কীভাবে নির্ণয় করা হয়, তা ব্যাখ্যা করা।

১৩.২ অভিব্যক্তিবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার কাছাকাছি বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই "বিশেষ সৃজন" সম্বন্ধীয় মতবাদটি সম্বন্ধে সন্দিহান হতে শুরু করেছিলেন এবং কীভাবে বিভিন্ন আকারে জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে থাকতে পারে, তা ব্যাখ্যার জন্য নানা প্রয়াস করা হচ্ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফরাসী প্রকৃতিবিজ্ঞানী লামার্ক (চিত্র ১৩.১) বিশ্বাস করতেন, পরিবেশের সঙ্গে যেসব অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক সঙ্গতি আছে, সেগুলির ব্যবহার ও বিকাশের দ্বারাই সকল জীব নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে তদনুযায়ী প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে তাদের অঙ্গগুলিও পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনগুলি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বাহিত হয়। জিরাফ উঁচু গাছের পরিবেশে বাস করত এবং পাতা খেতে থাকে তার গ্রীবায় টান দিতে হত; এভাবেই তার গ্রীবা লম্বা হয়ে গেল এবং এই লক্ষণটিকে পরবর্তী প্রজন্মগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করল। বিজ্ঞানীদের কাছে এই মতবাদটি সামান্যই সমর্থন পেয়েছে। আমরা যা দেখতে পাই তা হল, কুকুরকে কয়েকটি কাজ করার প্রশিক্ষণ দিলে সেই সামর্থ্য পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হবে অথবা বিজ্ঞানীর দক্ষতা তার সন্তানদের ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছাবে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

চিত্র ১৩.০১ : লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) ছিলেন এক ফরাসী প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং ডারউইনের পূর্বসূরী। লামার্ক অভিব্যক্তিগত পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ভাবতেন যে কোনো প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটানোর জন্য চেষ্টা করার সময়ে এরকম পরিবর্তন ঘটে এবং এগুলি অতঃপর বংশানুক্রমে বাহিত হয়।

১৩.২.১ ডারউইন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন

কীভাবে জৈব অভিব্যক্তি ঘটেছিল, ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২, চিত্র ১৩.২) ১৮৫৯ সালে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ The Origin of Species-এ সেটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। পৃথিবী

প্রদক্ষিণকারী পালের জাহাজ এইচ. এম. এস. বিগল্-এ প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে বাইশ বছর বয়সে ডারউইন তাঁর পর্যবেক্ষণ শুরু করেন (চিত্র ১৩.৩)। সমুদ্রযাত্রায় তিনি পাঁচটি রোমাঞ্চকর বছর অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি অতলান্তিক মহাসাগরের বহু দ্বীপে, দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলে এবং কয়েকটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে গিয়েছিলেন যেগুলির মধ্যে গ্যালাপাগোস দ্বীপটির গুরুত্ব সর্বাধিক। এই ভ্রমণের ফলে ডারউইন বিশ্বের এমন একটি অঞ্চলের দীর্ঘ সংসর্গে এসেছিলেন, যেটি উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনের বিষয়ে তাঁর স্বদেশ থেকে আমূল ভিন্ন ছিল। সমুদ্রযাত্রার সম্পূর্ণ সময়টি ধরে তিনি বহু বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন এবং বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

চিত্র ১৩.২ : চার্লস ডারউইন, বিচিত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর সক্রিয় কাজকর্ম Origin of Species-এর গ্রন্থকার হিসাবে তাঁকে ১৮৫৯ সালে খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর সংগ্রহ পরীক্ষা করে এবং কীভাবে প্রজাতিগুলির অভিব্যক্তি ঘটেছিল, সেই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করে তিনি প্রায় বাইশ বছর কাটিয়েছিলেন। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন—অতীত যুগের জীবগুলির জীবাশ্ম ও চিহ্ন তিনি যেসব শিলায় আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলির বিবরণী; বিশ্বে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিস্তার এবং সবশেষে গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধনের জন্য অথবা কুকুর ও পায়রার প্রজননের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রজনন সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলি করা হচ্ছিল, সেগুলির পর্যালোচনা।

চিত্র ১৩.৩ : এইচ. এম. এস. বিগল্-এর বিশ্ব-পরিক্রমণকারী জরিপ-যাত্রার (১৮৩১-১৮৩৬) গতিপথ। চার্লস ডারউইনের প্রত্যাগমন যাত্রার পথ বিখণ্ডিত রেখাগুলি দিয়ে দেখানো হয়েছে।

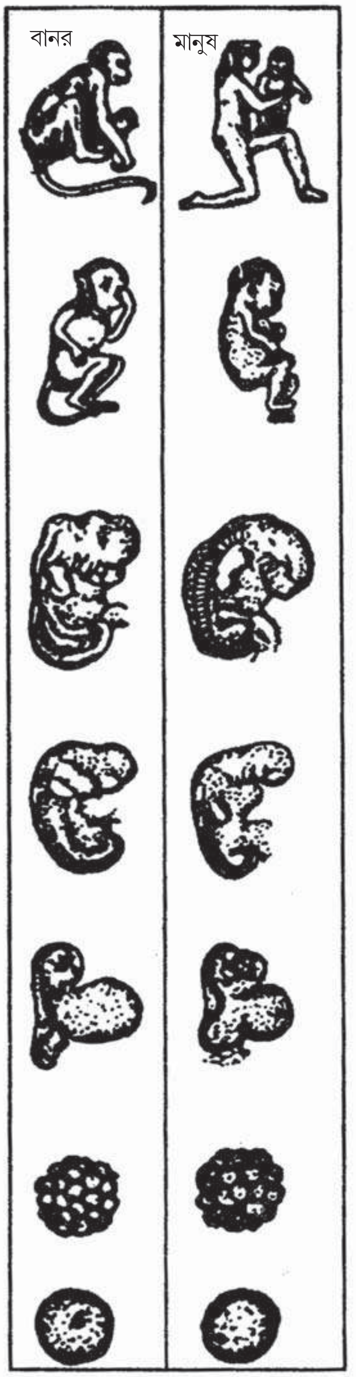

চিত্র ১৩.৪ : ভ্রূণীয় বিকাশকালে বানর ও মানুষের সাদৃশ্য

অভিব্যক্তির পদ্ধতি হিসাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-বাদের উপস্থাপনা ছিল ডারউইনের বিরাট উদ্ভাবনী পদক্ষেপ। এই মতবাদটি প্রস্তাবের কৃতিত্ব সাধারণত ডারউইনকে দেওয়া হলেও অন্য একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসও একই সময়ে এবং স্বাধীনভাবে অভিব্যক্তিবাদের ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সভায় উভয় বিজ্ঞানীরই গবেষণাকর্ম যৌথভাবে উপস্থাপিত হয়। দুটি নিরীক্ষণ দিয়ে মতবাদটির সূচনা করা হয়েছিল। প্রথমত, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি পরিবেশে সীমিত হওয়ায় যতগুলি জীব নিজেদের প্রজনন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, তদপেক্ষা বেশি জীব জন্মগ্রহণ করে। উৎপাদনের এই আধিক্যের ফলে ঘটে থাকে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত যোগ্যতম জীবের অস্তিত্বরক্ষা। খাদ্য, জল, বায়ু, আলোক—জীবকে জীবনধারণ ও প্রজননে সক্ষম করে এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতিগুলি অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে এবং আপন প্রজাতির মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। দ্বিতীয় নিরীক্ষণটি হল, বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে শাবকদের বা সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে এবং মাতাপিতার সঙ্গে অল্পস্বল্প প্রভেদ থাকে। এগুলিকে আমরা এখন জিনঘটিত বা জেনেটিক বিভিন্নতা (Genetic variation) আখ্যা দিই। ডারউইন এই মত পোষণ করতেন যে এসব বিভিন্নতা অভিব্যক্তি-বিষয়ক পরিবর্তনগুলির উৎস। তাঁর মতে, যে-কোনো গোষ্ঠীতে তারাই অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং প্রজনন করে, যাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের সঙ্গে সর্বোত্তম সঙ্গতি স্থাপনে তাদের সক্ষম করে; যাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব আছে, তাদের অস্তিত্বরক্ষার সম্ভাবনা কম। এভাবে এক পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রকৃতি প্রয়োজনীয় বিভিন্নতাগুলিকে বেছে নিয়ে সংরক্ষণ করে। ডারউইন একেই **প্রাকৃতিক নির্বাচন** আখ্যা দিয়েছিলেন।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনভিত্তিক অভিব্যক্তিবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণ তথা অন্যান্য বিদ্যমান তথ্য বিচার-বিবেচনা করে ডারউইন মতবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি যে কেবল অভিব্যক্তিবাদটি উপস্থাপন করেছিলেন, তা নয়; অভিব্যক্তি-বিষয়ক পরিবর্তনের একটি পদ্ধতিও তিনি আমাদের দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য জীব সম্বন্ধে যেমন আরও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মতবাদের মতোই ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনভিত্তিক অভিব্যক্তিবাদও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে।

তাঁর নিজের সময়ে ডারউইনের জৈব অভিব্যক্তিবাদ অধিকাংশ লোকের কাছে, বিশেষত চার্চের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, কারণ এর বক্তব্য ছিল "বিশেষ সৃজনের" প্রতিকূল। বস্তুত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ডারউইন

অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়গুলির সমর্থন পেয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে বিতর্ক চলেছিল এবং আজও চলেছে—বিজ্ঞানী ও ধর্মীয় মানুষদের মধ্যে।

১৩.২.২ মানুষের অভিব্যক্তি

মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমাননির্ভর উল্লেখ করলেও ডারউইন Origin of Species গ্রন্থে সাধারণভাবেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিব্যক্তির একটি পদ্ধতি দিয়েছিলেন। চার বছর পরে তিনি Descent of Man গ্রন্থটি প্রকাশ করেন; এতে তিনি এই অনুমান ব্যক্ত করেন যে, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষেরও অভিব্যক্তি ঘটেছে পূর্বে বিদ্যমান জীবগুলি থেকে।

শিম্পাঞ্জি ও গরিলার মতো বৃহৎ আফ্রিকান বনমানুষগুলির সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠনসাদৃশ্য ডারউইনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। এ থেকে তিনি মানুষের উৎপত্তিস্থান অনুমান করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায় "বিশ্বের প্রত্যেক বিরাট অঞ্চলে জীবিত স্তন্যপায়ীগুলি একই অঞ্চলের লুপ্ত প্রজাতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং সম্ভাবনা আছে যে, শিম্পাঞ্জি ও গরিলার সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত লুপ্ত বনমানুষগুলির দ্বারা আফ্রিকা অতীতে অধ্যুষিত ছিল; যেহেতু এই দুটি প্রজাতি বর্তমানে মানুষের নিকটতম আত্মীয়, অতএব অন্য অঞ্চলের তুলনায় আফ্রিকা মহাদেশে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের নিবাস থাকার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা প্রবল।"

ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ অর্থাৎ আদি অজাত শাবকেরা অত্যন্ত সদৃশ কয়েকটি দশার মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করে (চিত্র ১৩.৪)। অবশ্য আদি বিকাশের ঘটনাগুলির সময়কালের অল্প অল্প পরিবর্তন পরিণত জীবে প্রভূত পরিবর্তন উৎপন্ন করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বহুদিক দিয়ে অপরিণত বনমানুষের মতো—তাদের ক্ষুদ্র মুখমণ্ডল এবং মস্তিষ্ক ঘিরে গোলাকার করোটিক অস্থিগুলি এরই নির্দেশ দেয়। মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি মানুষের অভিব্যক্তির একটি বিনিশ্চায়ক (crucial) পদ; কোনো বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষের ভ্রূণে বিকাশহারের মন্দনের পরিণামরূপে এটিকে দেখা যেতে পারে। জন্মের সময়ে থামবার পরিবর্তে বাল্যের অনেকটা পর্যন্ত মস্তিষ্কের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মানসিক যন্ত্রপাতির অনেক বৃহত্তর ও জটিলতর একটি অঙ্গ উৎপাদন করে।

১৩.২.৩ প্রাইমেট ঐতিহ্য

মানুষ স্তন্যপায়ী নামে এমন প্রাণীগুলির শ্রেণীভুক্ত যেগুলি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চুল ও দুগ্ধক্ষরণকারী স্তনগ্রন্থির অস্তিত্বের কারণে অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। শ্রেণীটির মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে আবার স্তন্যপায়ীদের কয়েকটি ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী বা বর্গে (order) ভাগ করা যায়। বনমানুষ ও বানরসহ মানুষ যে বর্গের অন্তর্গত, সেই প্রাইমেট বর্গের প্রাণীগুলি রাত্রে সক্রিয় থাকত অর্থাৎ তাদের অভিব্যক্তির সূচনায় তারা ছিল নিশাচর। এই প্রাণীগুলি ছিল পতঙ্গভুক এবং বৃক্ষের উপরে বাস করত (চিত্র ১৩.৫)। ডালপালায় ঝুলন্ত অবস্থায় পতঙ্গ আহার করা—এই যোগাযোগের পরিণামে প্রাইমেটদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন বিকাশলাভ করেছিল। হাতে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছিল। বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অন্যান্য অঙ্গুলির বিপরীতে নিয়ে আসার সামর্থ্য জন্মাল, অর্থাৎ এটিকে কাছে এনে অঙ্গুলিশীর্ষগুলির সঙ্গে মেলানো গেল যাতে শিকারকে ধরে রাখতে সাহায্য হয়। অঙ্গুলিগুলি সুবেদী হয়ে উঠল—নখরের পরিবর্তে তাদের নখ হল। চক্ষুকোটরগুলি মাথার সামনে সরে এল—এ থেকে প্রাইমেটরা পেল উন্নততর দৃষ্টি এবং দূরত্ববিচারের তীক্ষ্ণ সামর্থ্য।

প্রাইমেটদের এই লক্ষণীয় অভিযোজনগুলির ফলে উদ্ভব ঘটল বৃহদায়তন প্রাণীগুলির, যারা দিবাচর জীবনধারা অবলম্বন করল অর্থাৎ দিনের বেলায় সক্রিয় থাকল। পাতা ও ফলের মতো উদ্ভিজ্জ খাদ্য তাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল। বানর ও বনমানুষের উৎপত্তি এই অভিযোজনগুলিকে আরও উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেল। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সুবেদী থাকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, কারণ দেখার চেয়ে স্পর্শের দ্বারাই আরও ভালোভাবে ফলের পরিপক্কতা বিচার করা যায়।

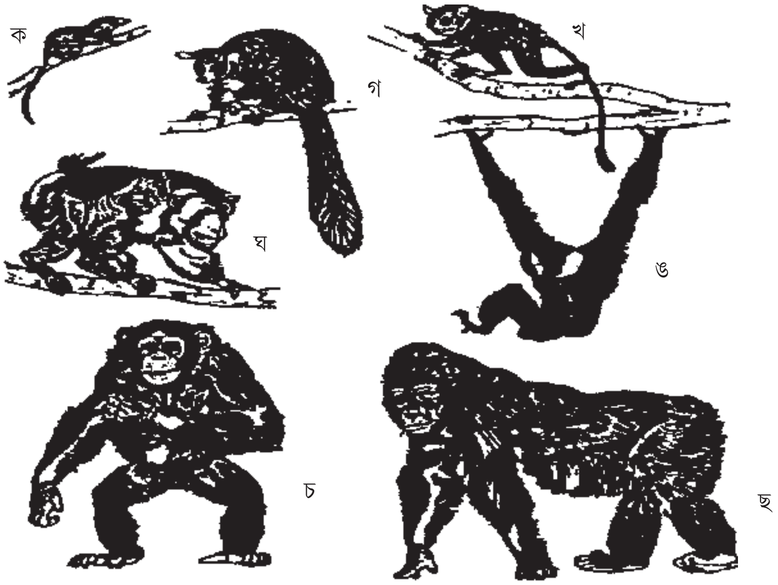

চিত্র ১৩.৫ : একটি বৃক্ষচারী শ্রু (ক) এবং আধুনিক প্রাইমেটদের কতিপয় প্রতিনিধি, লেমুর (খ), টার্সিয়ের (গ), ম্যাক্যাক বানর (ঘ), উল্লুক (ঙ), শিম্পাঞ্জি (চ), গরিলা (ছ)

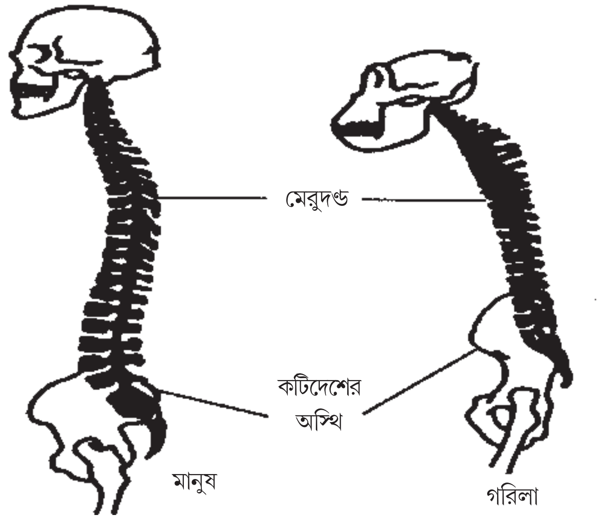

চিত্র ১৩.৬ : মানুষ ও গরিলার করোটি, মেরুদণ্ড ও কটিদেশের অস্থির তুলনা

ডাল দিয়ে হাঁটার চেয়ে বনমানুষেরা বরং দীর্ঘ কর্মঠ বাহু দিয়ে ডাল থেকে ঝুলে তার নীচে দিয়েই চলাচল করে (চিত্র ১৩.৫ঙ)। এটি তাদের আপেক্ষিক ঋজু দেহভঙ্গির (posture) সঙ্গে জড়িত এবং তাদের কটিদেশ এই ধরনের চলনের অঙ্গ হয়ে উঠল। এমনকি মাটিতে চলাফেরার সময়েও বনমানুষেরা সময়ে সময়ে দ্বিপদ প্রাণীর মতো অর্থাৎ দুই পায়ের উপরে চলে থাকে। ছোট ছোট পদক্ষেপে এবং দোলনের গতিতে এভাবে হাঁটা অসুন্দর হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি দুই পায়ে চলা। করোটি ও মেরুদণ্ডের পরিবর্তনগুলি ঋজু দেহভঙ্গিতে সাহায্য করে (চিত্র ১৩.৬)। আর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং দেহের অন্য অঙ্গগুলি যেভাবে বক্ষ ও উদরের মধ্যে প্রলম্বিত থাকে, তাও নিয়মিত চতুষ্পদ প্রাণীগুলি থেকে ভিন্ন।

অনুশীলনী—১

(ক) নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সত্য (স) না মিথ্যা (মি), তা নির্দেশ করুন।

১. লামার্ক লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন জীবের ভ্রূণগুলি অত্যন্ত পরস্পরসদৃশ দশাগুলির মধ্য দিয়ে যায় এবং তার থেকে মনে হয় যে অন্যান্য জীবের মতো মানুষও বানর ও বনমানুষের মতো প্রাণীদের থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে।

২. দূরত্ববিচারের তীক্ষ্ণ ক্ষমতার চাহিদা থেকে আদি প্রাইমেটগুলিতে চক্ষুকোটর স্থান পরিবর্তন করে মাথার সামনে এসেছে।

(খ) প্রদত্ত শূন্যস্থানে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

১. এইচ. এম. এস. বিগল্-এ তাঁর সমুদ্রযাত্রার সময়ে ডারউইন কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন?

....

....

....

....

২. অন্যান্য প্রাণীদের থেকে স্তন্যপায়ীদের কীভাবে পৃথক করা যায়?

....

....

....

....

৩. কোন্ প্রাণীগুলি পতঙ্গভুক?

....

....

....

....

৪. বৃক্ষশাখার নীচে দিয়ে যে স্তন্যপায়ীগুলি চলাফেরা করে তাদের নাম লিখুন।

....

....

....

....

১৩.৩ মানুষের অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ

আদি প্রাইমেটদের দ্বিপদ চলনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা অভিযোজন আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। প্রথম মানবরূপী প্রাণী আবির্ভাবের পূর্বে আরও অনেক পরিবর্তন তখন ঘটতে বাকি ছিল। এসব নানা পরিবর্তন কী ছিল, 'হোমো স্যাপিয়েনস্' বা আধুনিক মানুষের অভিব্যক্তির সমর্থনে আমাদের কোন্ কোন্ প্রমাণ আছে—এসব আপনারা জানতে চাইতে পারেন। আপনারা বোধহয় স্বীকার করবেন যে যখনই কোনো মতবাদ উপস্থাপিত হয়, সেই চিন্তাধারার সমর্থনে আমরা প্রমাণের অনুসন্ধান করি। সাধারণ অভিব্যক্তিবাদের ক্ষেত্রে এবং আমাদের নিজ প্রজাতির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি সত্য। অতীতে বসবাসকারী প্রাণীদের জীবাশ্মের বিবরণী, প্রাইমেট ও অন্য প্রাণীদের বিকাশশীল ভ্রূণগুলিতে দৃষ্ট যেসব সাদৃশ্যের কথা আমরা উপরে বলেছি, অতীতের পুরাতত্ত্বীয় অবশেষগুলি এবং তাদের কাল নির্ধারণ আরও সাম্প্রতিক প্রাণরাসায়নিক (biochemical) পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এরকম বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত প্রমাণগুলি থেকে এই মতবাদটি পুনর্গঠনের চেষ্টা করা যাক। আদি মানবদের রেখে যাওয়া গুহাচিত্র ও অন্যান্য কারুকর্ম থেকে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩.৩.১ প্রত্নজীববিদ্যা বিষয়ক প্রমাণ

প্রত্নজীববিদ্যা (palaeontology) ভূবিজ্ঞানগুলির (earth sciences) অন্যতম শাখা, এর অপরিহার্য কাজ হল কোটি কোটি বছর আগে অতীত ভূতত্ত্বীয় যুগগুলির উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান। আদিতম কাল থেকে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী পরপর পৃথিবীতে বসবাস করেছে, সেগুলি নিয়েই প্রত্নজীববিদ্যার কাজকর্ম। তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ শিলায় চাপা পড়া কঙ্কাল ও অস্থির আকারে রয়ে গেছে। এগুলিকে জীবাশ্ম (fossil) বলা হয়। এই জীবাশ্মগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মানুষের অভিব্যক্তির বিনিশ্চায়ক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কখনও কখনও প্রাণীর সমাধিস্থ দেহ ও কঙ্কালের সম্পূর্ণ বিশরণ বা ভাঙন (disintegration) ঘটে। চারিপাশের বস্তু যথেষ্ট দৃঢ় হলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া গঠনগুলির সঠিক দেহরেখাবিশিষ্ট একটি গহ্বর পড়ে থাকে। এরকম গহ্বরকে মোল্ড্ (mold) বা ছাঁচ বলে। ইমপ্রেশন (impression) বা ছাপ হল মোল্ডের অনুরূপ। চারিপাশের বস্তুর উপরে লুপ্ত বস্তু বা দেহাংশগুলি এই ছাপ রেখে যায়। চারিপাশের বস্তু কোমল থাকার সময়েই এই ছাপগুলি তৈরি হয়, যেমন—মৃত্তিকা বা লাভায় পদচিহ্ন। লুপ্ত প্রাণীদের পদচিহ্ন হল এমন সব ছাপ যা থেকে পদচিহ্ন রেখে যাওয়া প্রাণীগুলি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এখানে একথা উল্লেখ করার গুরুত্ব আছে যে আদি মানুষের যত জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, সেগুলি সাধারণত খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। এর কারণ হল মাত্র বিগত ৫০,০০০ বছর বা তার কাছাকাছি সময় ধরে মানুষ মৃতদেহ সমাধি দিতে আরম্ভ করেছে। পরবর্তী যুগের এই জীবাশ্মগুলি অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং সেকারণে আমাদের অধিকতর তথ্য দিয়ে থাকে। পূর্ববর্তী যুগের ক্ষেত্রে প্রায়ই অস্থিগুলির অংশবিশেষই সম্পূর্ণ কঙ্কালটি পুনর্গঠনের জন্য অনুমানের ভিত্তি। দুই ভাবে—ভাগ্যক্রমে এবং পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে সুচিন্তিত খননক্রিয়ায় জীবাশ্মের অবক্ষেপগুলি আবিষ্কৃত হয়।

প্রথম হোমিনিড : প্রথম মানব জীবাশ্ম

পূর্ব আফ্রিকার দুটি পৃথক পৃথক স্থানে আদিমতম মানবসদৃশ প্রাণী বা হোমিনিডের (চিত্র ১৩.৭) অবশেষগুলি পাওয়া যায়। তিরিশ থেকে ছত্রিশ লক্ষ বছর আগে জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করেছে, এমন কয়েকশো ব্যক্তির জীবাশ্মের খণ্ড পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ায়। তানজানিয়া হল দ্বিতীয় স্থানটি, যেখানে মোটামুটি সাড়ে সাঁইত্রিশ লক্ষ বছর আগের তিনটি হোমিনিড তাদের পদচিহ্নের বিশ মিটার দীর্ঘ পদরেখা রেখে গেছে। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, এই আদিতম হোমিনিডেরা মানবসদৃশ দেহের শীর্ষে বনমানুষের মাথা দিয়ে গঠিত ছিল। তাদের মধ্যে দৃষ্ট হোমিনিডীয় বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে তাদের দৃঢ়ভাবে মানুষের পূর্বপুরুষদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়। তারা যে দুই পায়ে হাঁটত, তার প্রমাণ আছে। অবশ্য এত প্রচুর আদিম লক্ষণ তখনও রয়ে গিয়েছিল যে-কোনো বৃক্ষারোহী বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষের সঙ্গে তাদের নিকট সম্পর্ক ছিল বলে বিবেচনা করা যায়।

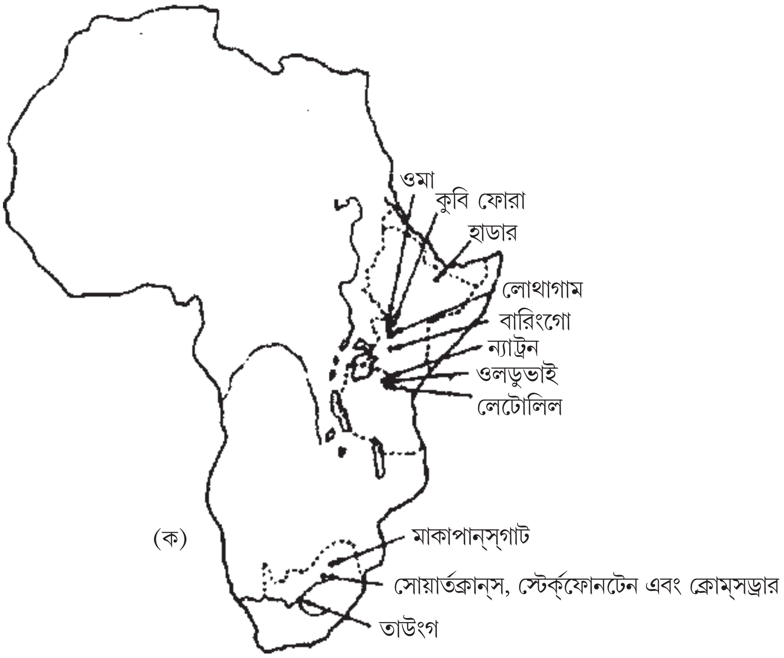

চিত্র ১৩.৭ : পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আদি হোমিনিডদের নিবাসস্থলগুলির মানচিত্র। (খ) ইথিওপিয়ায় ডঃ ডোনাল্ড জোহানসন্‌ কর্তৃক আবিষ্কৃত বিংশতিবর্ষীয় এক হোমিনিডের কঙ্কালের অংশ—তিরিশ লক্ষেরও বেশি বছর আগে এ জীবিত ছিল। জীবাশ্মের এই অবশেষগুলি 'লুসি' নামে পরিচিত।

অস্ট্র্যালোপিথেকাস—পরিবৃত্তীয় (transitional) মানবাকার

প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় কয়েক প্রকার হোমিনিড-জাতীয় পূর্বপুরুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের আদিমতমগুলির মধ্যে একটি হল অস্ট্র্যালোপিথেকাস (চিত্র ১৩.৮)। দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা থেকে অস্ট্র্যালোপিথেকাসের যে জীবাশ্মগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি থেকে দেখা যায় যে, তাদের মস্তিষ্ক

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল এবং সেকারণেই মস্তিষ্ক বেষ্টনকারী অস্থিগুলি বরং বনমানুষ-সদৃশ ছিল, কিন্তু মুখমণ্ডল বনমানুষদের তুলনায় হ্রস্বতর ছিল। দাঁতের এনামেল নির্দেশ করে যে অস্ট্র্যালোপিথেকাস অবশ্যই ফল খেত। অস্ট্র্যালোপিথেকাসের দ্বিপদ দেহভঙ্গির দৃঢ় প্রমাণ আছে কারণ মেরুদণ্ডে হোমিনিডের বৈশিষ্ট্যসূচক বক্রতা দেখা যায়। যে কঙ্কাল-কাঠামোর সঙ্গে পদদ্বয় সংযুক্ত থাকে, কটিদেশের সেই অস্থি আধুনিক মানুষের মতো হ্রস্ব না হলেও বনমানুষের তুলনায় হ্রস্বতর।

হোমো হ্যাবিলিস—প্রথম হাতিয়ার নির্মাতা

মানুষের অভিব্যক্তিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম হল মস্তিষ্কের আয়তনের নাটকীয় প্রসার—এপর্যন্ত জীবাশ্ম থেকে যে উপাত্ত পাওয়া যায়, তদনুযায়ী এই ঘটনা আরম্ভ হয়েছিল প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে। পূর্ব আফ্রিকার অবক্ষেপগুলি থেকে উদ্ধার করা কয়েকটি নমুনায় মস্তিষ্কের আয়তন দৃশ্যত ছিল ৬৫০ ঘন সেন্টিমিটারের ঊর্ধ্বে এবং ৮০০ ঘন সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। এই নমুনাগুলি আমাদের স্বজাতীয়দের প্রথম আবির্ভাবের সূচক বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং এগুলিকে **হোমো হ্যাবিলিস** আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। প্রজাতিটির **হোমো হ্যাবিলিস** নামটির আক্ষরিক অর্থ হল হস্তকুশলী মানুষ। **হোমো হ্যাবিলিস** সোজা হয়ে হাঁটত। হাতের অস্থিগুলিতে আধুনিক মানুষের বহু বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হলেও সেগুলি স্থানে স্থানে কিছুটা বক্র এবং আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েনস-এর তুলনায় বলিষ্ঠতর। পদ ও চরণের অস্থিগুলিতে বনমানুষ ও মানুষ উভয়ের মতো বৈশিষ্ট্য থাকলেও মোটের উপরে সেগুলি বনমানুষের চেয়ে মানুষের অস্থিগুলিরই অনেক নিকটতর। পদ ও চরণ ছিল অভ্যাসগত দ্বিপদ প্রাণীর মতো। **হোমো হ্যাবিলিসের** জীবাশ্ম এবং পাথর-চটানো স্থূল ফলক (flake) ও পাথরের হাতিয়ারগুলির (tools) যুগপৎ অস্তিত্ব নির্দেশ করে যে এরা হাতিয়ার ব্যবহার করত। এই আদিম হোমিনিডরা মাংস খেত, এমন কোনো প্রমাণ নেই।

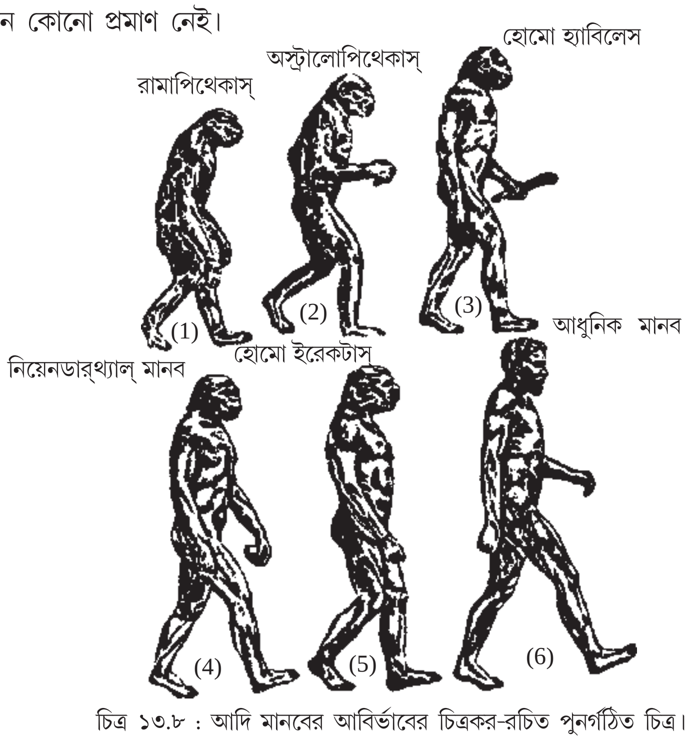

চিত্র ১৩.৮ : আদি মানবের আবির্ভাবের চিত্রকর-রচিত পুনর্গঠিত চিত্র।

হোমো ইরেকটাস

হোমো ইরেকটাস বা ঋজু মানব প্রথম আবির্ভূত হয় অন্তত যোলো লক্ষ বছর আগে; হোমো স্যাপিয়েনস্-এ পরিবৃত্তি (transition) ঘটার পূর্বে দশ লক্ষ বছরের বেশি এদের অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। হোমো ইরেকটাসের ৮০০ থেকে ৯০০ ঘন সেন্টিমিটার মাপের বৃহৎ মস্তিষ্ক ছিল (চিত্র ১৩.৯)। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার সর্বত্র **হোমো ইরেকটাসের** জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। **হোমো ইরেকটাস** যে পশুশিকার করত এবং মাংস খেত তার নির্দশন পাওয়া যায় তার ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ার এবং তাদের নিজ বাসভূমির নিকট থেকে উদ্ধার করা পশু হাড়ের উপরে এই হাতিয়ারগুলির রেখে যাওয়া চিহ্ন থেকে।

প্রমাণ আছে যে **হোমো ইরেকটাসের** জীবন মোটামুটি ছিল এবং বুদ্ধিমান, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ারত জীব হিসাবে এরা বেশ চাপের মধ্যে বাস করত। এমনকি এও অনুমান করা যায় যে একটি অপেক্ষাকৃত জটিল কথ্যভাষার বিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক বিবরণী এ বিষয়ে নীরব।

নিয়েনডার্থ্যাল্ মানবেরা

এইগুলি ছিল প্রথম আবিষ্কৃত মানব-সদৃশ জীবাশ্ম। বসবাসের এলাকা অনুযায়ী প্রায় ১,০০,০০০ বছর আগে থেকে ৪০,০০০ বা ৩৫,০০০ বছর আগে পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এবং তা অতিক্রম করে নিকটপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় নিয়েনডার্থ্যাল্দের অস্তিত্ব ছিল। নিয়েনডার্থ্যাল্ ও আধুনিক মানুষদের মধ্যে চমকপ্রদ গঠনগত প্রভেদ আছে। দেহভঙ্গি, গতিবিধির পরিসর এবং হাতিয়ার ব্যবহারের নৈপুণ্যে আধুনিক মানুষের থেকে অভিন্ন হলেও নিয়েনডার্থ্যালের কঙ্কাল বাস্তবে বলিষ্ঠতর ছিল। আধুনিক মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক, চার চেয়ে নিয়েনডার্থ্যালের মস্তিষ্ক গড়ে সামান্য বৃহত্তর ছিল—মাপে ছিল প্রায় ১৪০০ ঘন সেন্টিমিটার (চিত্র ১৩.৯)। বলিষ্ঠতর পেশীতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মস্তিষ্ক বৃহদায়তন হয়ে থাকতে পারে। নিয়েনডার্থ্যাল্ মানবেরা (চিত্র ১৩.৮) ছিল সুদক্ষ শিকারী ও নিপুণ হাতিয়ার নির্মাতা এবং তারা নিজ দেহে সুরক্ষার জন্য পশুচর্ম ব্যবহার করত। মানবেতিহাসে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক সমাধিদান সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল।

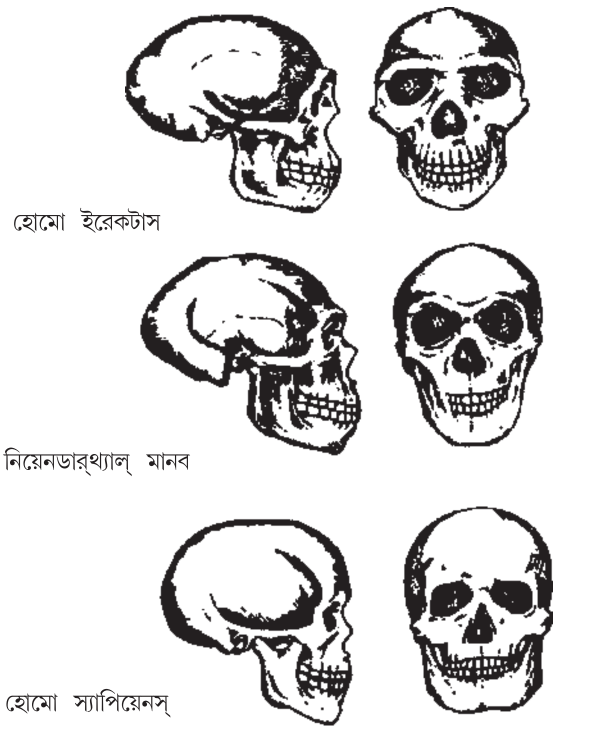

চিত্র ১৩.৯ : হোমো ইরেকটাস্ ও হোমো স্যাপিয়েনসের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, উভয়ের কিছু কিছু লক্ষণ নিয়েডার্থ্যালের ছিল। নিয়েনডার্থ্যালের অতি বৃহৎ মস্তিষ্কটি হোমো স্যাপিয়েন্সের মস্তিষ্ককে সামান্য ছাড়িয়ে যায় এবং একটি আধুনিক লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়।

হোমো স্যাপিয়েনস্—আধুনিক মানব

হোমো স্যাপিয়েন্সের কিছু জীবাশ্মের আবিষ্কার থেকে মনে হয় যে আধুনিক মানব (চিত্র ১৩.৮, ১৩.৯) আফ্রিকায় আবির্ভূত হয় এবং মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে পুরাতন বিশ্বের অবশিষ্টাংশে পরিযান (migration) করে। লক্ষণীয় যে চল্লিশ হাজার বছর পূর্বেকার উচ্চতর প্রস্তর যুগে প্রথম দিকের এই আধুনিক মানবেরা আজকের জনসমষ্টির তুলনায় স্পষ্টত বলিষ্ঠতর বা অধিকতর সুগঠিত ছিল।

১৩.৩.২ পুরাতত্ত্বীয় প্রমাণ

মানুষের প্রাচীনকাল, বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে পর্যালোচনা পুরাতত্ত্ব (archaeology) নামে পরিচিত। মানুষের জৈব ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি পাশাপাশি অগ্রসর হয়েছিল এবং এই দুটি একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল। মানুষের দৈহিক অবশেষের মতো তার সাংস্কৃতিক অবশেষগুলিও প্রাচীন অবক্ষেপগুলিতে চাপা পড়ে আছে। প্রায়ই এই দুই শ্রেণীর প্রমাণ একই শিলাস্তরে একত্রে পাওয়া যায়। সময় অতিবাহিত হতে হতে এবং মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দৈহিক অঙ্গের বিকাশ ঘটতে ঘটতে মানুষের সংস্কৃতি উত্তরোত্তর বিচিত্রতর ও জটিলতর হয়ে উঠল। সে হাতিয়ার নির্মাণের জন্য নূতন নূতন বস্তুর ব্যবহার শিখল এবং সেগুলির উন্নতির জন্য নতুন নতুন প্রয়োগকৌশলের বিকাশ ঘটাল। খাদ্যের নাগাল পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে এবং সেকারণেই বসতিগুলিতে সমবায়ী জীবনের উপরেও হাতিয়ারের ব্যবহার প্রচণ্ড ছাপ ফেলেছিল। বহু অঞ্চলে পুরাতত্ত্বীয় অবশেষগুলি থেকে দেখা যায়, তারা যে মাংস আহার করত তার প্রধান উৎস ছিল বলগা-হরিণ।

১৩.৩.৩ নৃতত্ত্বীয় প্রমাণ

আধুনিক মানবেরা যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল, তখন পৃথিবীতে ছিল অতি শীতল, বরফ ঢাকা তুষারযুগ (Ice Age)। এই যুগ শুরু হয়েছিল প্রায় ৭৫,০০০ বছর আগে এবং শেষ হয়েছিল প্রায় ১০,০০০ বছর আগে। তুষার যুগটি তীব্রতম ছিল প্রায় ১৮,০০০ বছর আগে; এই সময়ের সঙ্গে মিলে যায় প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলার বিকাশ, যার নিদর্শন হল গুহাগাত্রে ও শিলা নির্মিত আশ্রয়স্থলে অঙ্কিত রঙিন চিত্রগুলি। ওই একই কালের বহু সহস্র ক্ষোদিত ও উৎকীর্ণ অস্থিখণ্ড ও গজদন্তখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুত প্রতিকৃতিগুলির অধিকাংশই এমন সব প্রাণীর যেগুলিকে আমরা চিনতে পারি; বলগা-হরিণ ও বাইসনের চিত্র বিশেষত সুপ্রচুর, কিন্তু মানুষের আলেখ্য বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত।

কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ মত এই যে, শেষ তুষার যুগের অন্তে অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষের জীবনধারায় এক নাটকীয় বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ঘটেছিল—যাযাবর অবস্থায় শিকার ও খাদ্যসংগ্রহের পরিবর্তে এসেছিল খাদ্যোৎপাদনের জন্য স্থায়ী বসতিস্থাপন। বীজ ছড়িয়ে দিলে যে তার ফলে শস্য এবং সে থেকে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হতে পারে, এই আবিষ্কার নিশ্চয়ই সামাজিক জীবনের উপরে একটি বড় ছাপ ফেলেছিল। স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলেই সম্ভবত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং এছাড়াও হয়েছিল অবসর যাপনের জন্য নৃত্যগীতের বিকাশ। অবশ্যই ভাষা ও যোগাযোগের ক্ষমতা বিকশিত হয়েছিল, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল নিসর্গ সম্বন্ধে বিস্ময়ের ও চিন্তার ক্ষমতায়।

১৩.৩.৪ প্রাণরাসায়নিক প্রমাণ

ইতিপূর্বে ১৩.২ পরিচ্ছেদে বলেছিলাম, মানুষ ও বৃহৎ বনমানুষদের যে বহু দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তা ডারউইন হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে মানুষ ও বনমানুষ একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জীবাশ্মের পর্যালোচনা এবং তার দৃষ্ট দৈহিক সাদৃশ্যগুলির উপরেই ডারউইনের সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি ছিল। তাঁর অনুমান কতটা ঠিক ছিল, তা এখন এক শতাব্দী পরে প্রোটিনের এবং ডি.এন.এ. (D.N.A.) নামে জীনবাহী (genetic) পদার্থের প্রাণরাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা যায়।

প্রাণরাসায়নিক (biochemical) পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমরা দেখতে পাই, যেমন অভিব্যক্তি এগিয়ে চলে এবং প্রজাতিগুলির বিভেদ (differentiation) ঘটতে থাকে, তারা তাদের প্রোটিন ও ডি. এন. এ.-র গঠনে পরিবর্তন-গুলি জমিয়ে তোলে। পৃথক হয়ে যাওয়ার সময় যত দীর্ঘ হয়, পরিবর্তনগুলিও হয় তত বিরাট। এই পরিবর্তনগুলিকে শতকরা জীনঘটিত (বা জেনেটিক) দূরত্বের হিসাবে ব্যক্ত করা হয়, এটি দুই প্রজাতির ডি.এন.এ.-র মধ্যে আনুপাতিক প্রভেদ নির্দেশ করে। আফ্রিকান বনমানুষের ও মানুষের প্রোটিনের তুলনাত্মক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিকটভাবে সম্পর্কিত এবং এশীয় বনমানুষগুলি অর্থাৎ উল্লুক ও ওরাংওটান এই ত্রয়ীর আরও দূর জ্ঞাতিভ্রাতা (চিত্র ১৩.১০)।

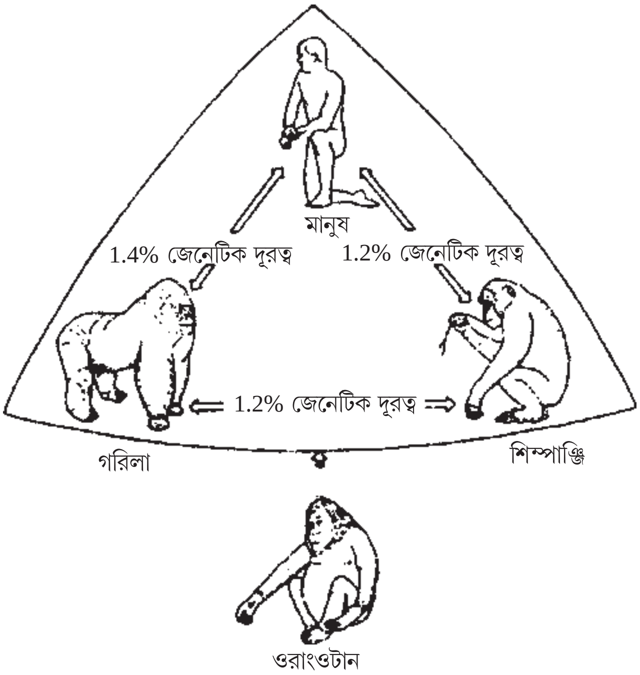

চিত্র ১৩.১০ : মানুষ ও বনমানুষদের মধ্যে জেনেটিক দূরত্ব দেখানোর একটি চার্ট।

একদা এশীয় ও আফ্রিকান বনমানুষেরা নিকট সম্পর্কিত বলে বিবেচিত হত এবং ভাবা হত যে ১৫০ লক্ষ বছরেরও আগে হোমিনিডরা বনমানুষ থেকে বিকাশলাভ করেছিল। কিন্তু প্রাণরাসায়নিক প্রমাণ নির্দেশ করেছে যে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ বছরের মতো আগে বনমানুষ ও মানুষের পরস্পর থেকে অপসৃতি (divergence) ঘটে থাকতে পারে। গরিলারা প্রথমে শিম্পাঞ্জি ও মানবসদৃশ প্রাণীদের ছেড়ে পৃথক হয়ে যায়, যার ফলে শেষোক্তেরা পরস্পর পৃথক হওয়ার আগে অল্পকালের জন্য তাদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল। রামপিথেকাসের (চিত্র ১৩.৮) জীবাশ্মের নিদর্শন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া গিয়েছিল—এক সময়ে এটিকে আধুনিক মানব প্রজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত মনে করা হত। অবশ্য প্রাণরাসায়নিক প্রমাণের ভিত্তিতে এখন দেখানো হয়েছে যে একে হোমিনিড বলে বিবেচনা করা যায় না, কারণ একটি বেঁচে ছিল হোমিনিড থেকে এশীয় বনমানুষগুলির অপসৃতির আগে। একই জিনিস শিবপিথেকাস্ ইনডিকাস্-এর ক্ষেত্রেও সত্য—এটির জীবাশ্মের একটি সুন্দর নিদর্শন ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের পশ্চিম হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

অনুশীলনী—২

অভিব্যক্তির যে ধরনের প্রমাণ স্তম্ভ ১-এ দেওয়া হয়েছে, তাকে ২-এর উক্তির সঙ্গে মেলান।

১	২
প্রাণরাসায়নিক	(ক) সময় অতিবাহিত হতে হতে এবং মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দৈহিক অঙ্গের বিকাশ ঘটতে ঘটতে তার সংস্কৃতি উত্তরোত্তর বিচিত্রতর ও জটিলতর হয়ে উঠল।
প্রত্নজীববিদ্যাবিষয়ক	(খ) মানুষের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে পূর্বেকার অনুমান প্রোটিন ও ডি.এন.এ.-র প্রকৃতি সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে; সেগুলি দেখিয়েছে, শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিকট-সম্পর্কিত।
নৃতত্ত্বীয়	(গ) ইথিওপিয়ার একটি স্থান থেকে উদ্ধার করা 'লুসি' নামক কঙ্কালের আংশিক জীবাশ্মটি দেখিয়েছিল, মস্তিষ্কের আয়তন তেমন বড় না হওয়া সত্ত্বেও দ্বিপদ চলন ইতিমধ্যেই এক পরিণত দশা পর্যন্ত বিকশিত হয়েছিল।
পুরাতত্ত্বীয়	(ঘ) প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু সহস্র খোদিত ও উৎকীর্ণ অস্থিখণ্ড ও গজদন্তখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৩.৩.৫ অতীতের কালনির্ধারণ

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে কী করে আমরা আজ বলতে পারি, বিশেষ একটি শিলা দশ লক্ষ বছরের পুরানো বা একটি জীবাশ্মের বয়স পঞ্চাশ হাজার বছর। যেমন ধরুন, কোটি কোটি বছরের সময়মাত্রায় বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় কল্পের স্থিতিকাল আমরা কীভাবে হিসাব করি? প্রস্তর ও শিলার অবক্ষেপের মতো ভূতত্ত্বীয় পদ্ধতিগুলি যে হারে ঘটে থাকে, তার উপরে ভিত্তি করেই এমন হিসাব গোড়ার দিকে করা হত। সমুদ্রে বা নদীগুলির মোহানায় অবক্ষেপের আকারে শিলার বহু স্তরের উৎপত্তি ঘটেছে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট বেধের অবক্ষেপ উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় সময়ের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ধারণা করার একটি উপায় হল, বর্তমানে নদীগুলি যে হারে সমুদ্রে পলির অবক্ষেপণ ঘটাচ্ছে তা মাপা।

তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় জীবাশ্ম ও কয়েক প্রকার শিলার কাল আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি যন্ত্র ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলির অস্তিত্ব সহজেই নির্ণয় করা যায়। এগুলির মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের আকারে সময়নিরূপক বা 'ঘড়ি' সন্নিবিষ্ট থাকে—তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ একটি ধ্রুবহারে পরিবর্তিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত (decay) হয়ে তেজস্ক্রিয়াহীন আকারে পরিণত হয়। এই হারটি জানা থাকলে শিলায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এবং তার থেকে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়াহীন আইসোটোপের পরিমাণ মেপে শিলা বা জীবাশ্মটি উৎপন্ন হওয়ার কাল থেকে সময়ের দৈর্ঘ্য হিসাব করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরেনিয়াম সীসার কয়েকটি তেজস্ক্রিয়াহীন আইসোটোপে রূপান্তরিত হয়। অতএব শিলায় বর্তমান ক্ষয়-না-পাওয়া ইউরেনিয়াম এবং তৎসম্পর্কিত সীসার আইসোটোপগুলির অনুপাতের তুলনার দ্বারা ইউরেনিয়াম-বিশিষ্ট শিলাগুলির বয়স নির্ণয় করা যায় (চিত্র ১৩.১১ দেখুন)।

জীবাশ্মের বয়স হিসাব করার জন্য বর্তমানে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি হল তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে কালনির্ধারণ (radio-carbon dating)। কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি সাধারণভাবে কার্বন-১৪ নামে পরিচিত। যেহেতু রাসায়নিকভাবে কার্বন-১৪ সাধারণ কার্বনের থেকে অভিন্ন, অতএব আবহমণ্ডলে যে অনুপাতে তারা কার্বন ডাই-অক্সাইড আকারে বর্তমান ঠিক সেই অনুপাতে উভয়েই উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকলার দ্বারা বিশোষিত হয়। উদ্ভিদ এই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে তার খাদ্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার করে। প্রাণীরা উদ্ভিদ আহার করে। কাজেই যতক্ষণ উদ্ভিদ বা প্রাণী জীবিত থাকে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকলাগুলিতে কার্বন-১৪ আইসোটোপের অনুপাত থাকে আবহমণ্ডলের থেকে অভিন্ন। কিন্তু মৃত্যু ঘটামাত্র দেহে আর কার্বন প্রবেশ করতে পারে না, কারণ সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) বা খাদ্যাহার থেমে যায়। মৃত্যুর পরে দেহে পূর্ব থেকে বর্তমান কার্বন-১৪ নিয়ত হারে সাধারণ কার্বনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। অতএব অবশিষ্ট কার্বন-১৪ পরমাণুগুলির সংখ্যা যত কম, জীবাশ্মটি তত পুরাতন। কাজেই প্রাচীন কাঠ বা অস্থির একটি খণ্ড নিয়ে তাতে বর্তমান কার্বন-১৪-এর পরিমাণ মেপে আমরা বস্তুটির বয়স হিসাব করতে পারি। যেসব বস্তুর বয়স জানা আছে, সেগুলির উপরে এই কৌশলটি প্রয়োগ করে এটির নির্ভুলতা পরীক্ষা করা হয়েছে—এতে অজ্ঞাত নমুনাগুলির বয়স নির্ধারণের বিষয়ে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

যেসব জৈব বস্তুতে এখনও কার্বন আছে, মাত্র সেগুলির উপরেই কার্বন-১৪ প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য। যে জীবাশ্মগুলিতে সকল জৈব পদার্থ ক্ষয় হয়ে গেছে, সেগুলির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে ফ্লুরিন বা ফসফরাসের মতো অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌলের উপস্থিতি নির্ণয় করে জীবাশ্মটির বয়সের হিসাব করা যায়।

চিত্র ১৩.১১ : তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলির কেন্দ্রক অপ্রতিষ্ঠিত (unstable)। এক কেন্দ্রকগুলি যখন ভেঙে পড়ে বা ক্ষয় পায় (decay), সেগুলি থেকে বিশেষ বিশেষ কণা বা রশ্মি নির্গত হয়। এই তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের পরিণামে অন্য একপ্রকার পরমাণু সৃষ্ট হয়।

অনুশীলনী—৩

নীচের উক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ করুন।

(ক) ....সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় জীবাশ্ম ও কয়েক প্রকার শিলার কাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব।

(খ) তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়াহীন আকারে ক্ষয়ের হার................এর বয়স হিসাব করতে সাহায্য করে।

(গ) যেসব জৈব বস্তুতে এখনও.............আছে, সেগুলির জন্য তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে কালনির্ধারণের প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) যে জীবাশ্ম সকল জৈব পদার্থ ক্ষয় হয়ে গেছে, সেগুলির বয়স.............এর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে হিসাব করা হয়।

১৩.৪ সারাংশ

বর্তমান এককটিতে আপনারা পড়েছেন যে

- ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদে প্রস্তাব করা হয়েছে, জীবের সর্বোত্তম অভিযোজিত আকারগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং যে বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলীর উপরে তাদের যোগ্যতা নির্ভর করে, সেগুলিকে বংশানুক্রমে বহন করে।

- প্রত্নজীববিদ্যা, পুরাতত্ত্ব ও নৃবিদ্যা থেকে আহৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং একালের মানুষ ও বনমানুষের প্রোটিন ও জেনেটিক পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত তাদের সকলের একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের অস্তিত্ব ছিল।
- বিভিন্ন মৌলের তেজস্ক্রিয় ও তেজস্ক্রিয়াহীন আইসোটোপগুলি মেপে শিলা, জীবাশ্ম ও নৃতত্ত্বীয় অবশেষগুলির বয়স হিসাব করা হয়।

১৩.৫ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. ডারউইনের মতবাদে কী বলা হয়েছে?

....

....

....

....

২. প্রত্নজীববিদ্যা ও পুরাতত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ কী, তা লিখুন।

....

....

....

....

৩. জীবাশ্মের বয়স কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

....

....

....

....

৪. প্রাচীন উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ ও তাদের জিনিসপত্রের অবশেষগুলির বয়স কীভাবে জানা যায়?

....

....

....

....

৫. চিত্র ১৩.১২-এর (ক) ও (খ) অংশে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ দেখানো হয়েছে। এগুলি পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(ক)

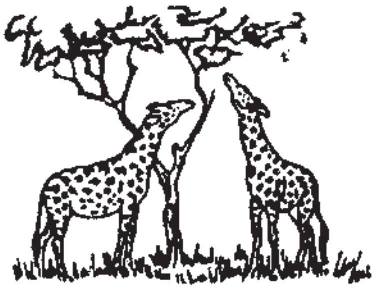

সম্ভবত আদিম জিরাফদের গ্রীবা হ্রস্ব ছিল এবং তারা খাদ্যের নাগাল পাওয়ার জন্য গ্রীবায় টান দিত।

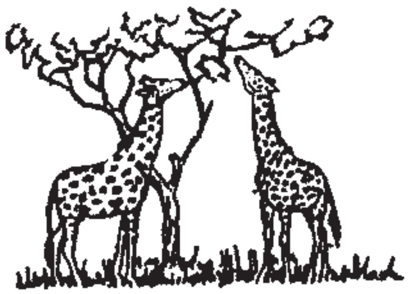

তাদের শাবকদের ছিল দীর্ঘতর গ্রীবা, যাতে তারা খাদ্যের নাগাল পাওয়ার জন্য টান দিত।

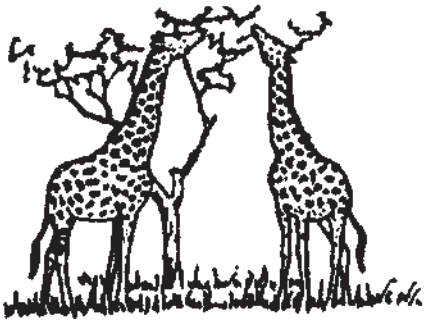

ক্রমাগত গ্রীবায় টান দেওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত আজকের জিরাফের উদ্ভব হল।

(খ)

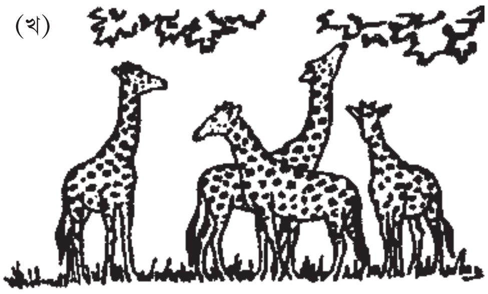

আদিম জিরাফদের সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের গ্রীবা ছিল।

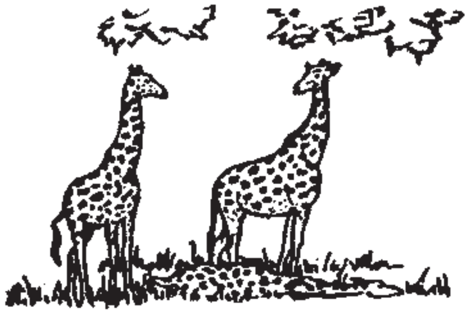

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে দীর্ঘতর গ্রীবার জিরাফগুলি এবং তাদের শাবকেরা অস্তিত্ব রক্ষা করল।

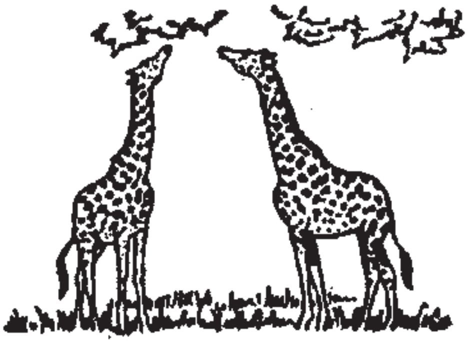

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত কেবল দীর্ঘগ্রীবা জিরাফেরাই অস্তিত্ব বজায় রাখল।

১৩.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১. (ক) ১. মিথ্যা ২. সত্য

(খ) ১. তাঁর সমুদ্রযাত্রার সময়ে ডারউইন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন এবং সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

২. স্তন্যপায়ীদের দেহে স্তনগ্রন্থি ও চুল আছে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নেই।

৩. আদি প্রাইমেটরা।

৪. বনমানুষেরা।

২. (ক) পুরাতত্ত্বীয় (খ) প্রাণরাসায়নিক (গ) প্রত্নজীববিদ্যা বিষয়ক (ঘ) নৃতত্ত্বীয়

৩. (ক) তেজস্ক্রিয়া (খ) জীবাশ্ম (গ) কার্বন (ঘ) ফ্লুওরিন বা ফসফরাস।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. জীবের সর্বোত্তম অভিযোজিত আকারগুলি অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং যে বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলীর উপরে তাদের যোগ্যতা নির্ভর করে সেগুলিকে বংশানুক্রমে বহন করে।

২. প্রত্নজীববিদ্যা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবাশ্মের অবশেষগুলি নিয়ে কাজকর্ম করে, পক্ষান্তরে মানুষের প্রাচীনকাল, বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে পর্যালোচনাই পুরাতত্ত্ব।

৩. জৈব পদার্থে এখনও কার্বন থাকলে উপরে কার্বন-১৪ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়; যেসব জীবাশ্মে সকল জৈব পদার্থ ক্ষয় পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং এই জীবাশ্মগুলির ক্ষেত্রে বয়স হিসাব করার জন্য জীবাশ্মে রূপান্তরের সময়ে অস্থিগুলিতে যে হারে ফ্লুওরিন যোজিত হয়েছে, তাকে ব্যবহার করা হয়।

৪. কার্বন-১৪ ব্যবহার করে প্রাচীন কাঠ, অস্থিনির্মিত প্রাচীন শিল্পবস্তু প্রভৃতির বয়স নির্ণয় করা যায়।

৫. (১) (ক) লামার্ক (খ) ডারউইন

(২) কেবল ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদই বর্তমান উপাত্তের দ্বারা সমর্থিত হয়।

শব্দার্থসংগ্রহ

পরমাণু (atom) : কোনো মৌলের যে ক্ষুদ্রতম কণায় তার গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রাণরসায়ন (biochemistry) : জীবিত দেহীর রসায়ন।

জৈব অণু (biomolecule) : জীবদেহে বর্তমান শর্করা, ফ্যাটও প্রোটিনের মতো পদার্থগুলির অণু।

দ্বিপদ (biped) : যে প্রাণীর দুটি পা আছে, যথা—মানুষ বা পাখি।

করোটি (cranium) : মাথার মস্তিষ্ক-বেষ্টনকারী অস্থিনির্মিত অংশ।

ডি.এন.এ. (DNA) : ডি-অক্সি-রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড—জিনবাহী বা জেনেটিক পদার্থ সঞ্চয় ও স্থানান্তর করার জন্য দায়ী জটিল জৈব অণু।

মৌল (element) : অক্সিজেন, কার্বন প্রভৃতি যেসব সরলতম পদার্থকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সরলতর আকারে ভেঙে ফেলা যায় না।

পরিবেশ (environment) : উষ্মতা, আলোক, জল, অন্যান্য জীব প্রভৃতির মতো যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কোনো জীব বাস করে, সেগুলির মিলিত নাম।

অভিব্যক্তি (evolution) : পূর্ববর্তী সরলতর আকার থেকে জটিলতর আকারের জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) বিকাশ।

জীবাশ্ম (fossil) : কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বা উদ্ভিদের চেনার যোগ্য অংশ, চিহ্ন বা ছাপ—যা একদা মাটিতে চাপা পড়েছিল এবং এখন শিলার মতো কঠিন হয়ে গেছে।

জিনবিষয়ক বা জেনেটিক (genetic) : যেসব উপায়ে বৈশিষ্ট্যগুলি মাতাপিতা থেকে সন্তানে বাহিত হয়।

হরমোন (hormone) : যে অন্তঃস্রাবী রস রক্তে প্রবেশ করে এবং দৈহিক অঙ্গগুলিকে বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত করে।

আইসোটোপ (isotope) : কোনো মৌলের এমন পরমাণু (যথা, ভারী হাইড্রোজেন) যার কেন্দ্রকের ভর-রাসায়নিক অভিন্নতা সত্ত্বেও ওই একই মৌলের অন্যান্য থেকে ভিন্ন।

ভর (mass) : কোনোও বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণের মাপ।

অণু (molecule) : দুই বা ততোধিক পরমাণুর সংযোগে গঠিত কণা।

কেন্দ্রক (nucleus of an atom) : প্রোটন ও নিউট্রনে গঠিত পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশ।

নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid) : সকল জীবিত কোষে বর্তমান দুটি জটিল যৌগ (ডি.এন.এ., আর.এন.এ.)।

জৈব অণু (organic molecule) : যে সকল অণুতে উপাদান হিসাবে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু অথবা সেগুলি থেকে উদ্ভূত যৌগগুলি বর্তমান।

সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) : যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদগুলি কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেটের মতো জটিল পদার্থগুলি নির্মাণের জন্য সূর্যালোকের শক্তিকে ব্যবহার করে।

প্রাইমেট (primate) : স্তন্যপায়ীদের উচ্চতম বর্গ, মানুষ, বনমানুষ, বানর ও লেমুর যার অন্তর্গত।

প্রোটিন (protein) : সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য দেহগঠনকারী পদার্থ; দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতির মতো খাদ্যে বর্তমান।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ (radioactive substance) : রেডিয়াম ও ইউরেনিয়ামের মতো কিছু মৌলের পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যায় এবং সেই সঙ্গে এমন সব বিকিরণ বা তড়িতবাহিত কণার নিঃসরণ ঘটে, যেগুলি অনচ্ছ বস্তুকেও ভেদ করতে এবং বৈদ্যুতিক ফলাফল উৎপাদন করতে পারে।

১৩.৭ সহায়ক পুস্তক তালিকা

Cosmos - Karl Saarg, Balantine Books, New York, 1985

Physics, Part I & II, A text book for class X - N.C.E.R.T, 1985, 1st Chapter

Essays about the Universe—Borris A. Vorentsov-Velia Minv, Mir. Publishers, Mosco, 1985

Basic Biology, Par II, A text book for class X, R. N. Kapil, N.C.E.R.T, 1986

The Ascent of Man - J. Bronvoski, BBC, London, 1976

New Guide to Science - Izag Asimv, Penguin, 1987

পাঠ উপকরণ

এফ. এস. টি.—1

পর্যায়—4

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এস. টি.—1

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায়
4

পরিবেশ ও সম্পদ	**377**
একক **14** ❑ ইকোসিস্টেম ও বাস্তুতন্ত্র	**379**
একক **15** ❑ পরিবেশের উপাদান	**402**
একক **16** ❑ পরিবর্তনশীল পরিবেশ	**427**
একক **17** ❑ প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ	**460**
একক **18** ❑ সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	**482**

চতুর্থ পর্যায় □ পরিবেশ ও সম্পদ

তৃতীয় পর্যায়ে আপনি মহাবিশ্ব, সৌরজগৎ ও পৃথিবীর বুকে প্রাণের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে জেনেছেন। এই পর্যায়ের পাঁচটি এককে আপনি পৃথিবীর পরিবেশ ও সম্পদ সম্বন্ধে অনুশীলন করবেন। আমরা প্রথমে বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব। আপনি দেখবেন যে সব প্রাণীই বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সজীব ও অজীব অংশগুলির উপর নির্ভরশীল। আপনি এও জানবেন যে শক্তি, পুষ্টি, জল প্রভৃতি প্রাণের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য উপাদানগুলির যোগান কয়েকটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। এর ফলে প্রাণ ও তার প্রতিপালনকারী প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রকৃতিতে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় থাকে। এর পর আমরা পৃথিবীর পরিবেশের তিনটি অংশ, সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ও অরণ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করব। এগুলির মধ্যে রয়েছে তিনটি আলাদা বাস্তুতন্ত্র। আমরা এগুলির প্রতিটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত বাস্তুতন্ত্রগত প্রক্রিয়াগুলির বর্ণনা দেব। এগুলির অন্তর্গত প্রাণীরা তাদের নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু মানুষের কিছু কাজকর্মের ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এবং তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে সেই সব অঞ্চলের প্রাণীদের উপর।

পরিবেশের উপর প্রযুক্তি ও জনসংখ্যার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতিকে উপলব্ধির বিচারবুদ্ধির অভাব এবং প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ও অপব্যবহার সারা বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রক্রিয়াগুলিকে একত্র করে তাকেই আমরা বলি দূষণ। অম্লবর্ষণ, আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা, মৃত্তিকাক্ষয়, অতিপৌষ্টিকতা ও ওজোন স্তরের হ্রাস প্রভৃতি পরিবেশ-দূষণের কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার পর পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের কথায় যাব, যা পরিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। প্রাকৃতিক সম্পদ দুই ধরনের—সজীব ও নিষ্প্রাণ। সজীব সম্পদের মধ্যে আছে গাছপালা, বন্যপ্রাণী, জল ও স্থলের প্রাণী। আর নিষ্প্রাণ সম্পদ বলতে বোঝায় নদী ও ভূগর্ভের জল, মাটি, স্থল ও জলভাগের নানা খনিজ পদার্থ। এর কোনো কোনোটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আবার কয়েকটি হয়তো আছে অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে। আমাদের জনসংখ্যার প্রচণ্ড বৃদ্ধি এবং সম্পদগুলির উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব এই দুই-এর ফলে এগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটে চলেছে। প্রযুক্তির উন্নতি এবং উৎপাদনের নবতর পদ্ধতির উদ্ভাবন সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত ক্ষয় আমাদের জীবনযাত্রায় গুণগত পরিবর্তন আনছে। আমাদের তাই জানা প্রয়োজন এই সম্পদগুলি কী, এগুলি কোন্ কাজে লাগে এবং কীভাবে আমরা এগুলির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতে পারি। দূরসন্ধানের সাহায্যে কীভাবে পেট্রোলিয়াম, বিভিন্ন খনিজ, মাটি, উদ্ভিদ, অরণ্য, ভূগর্ভস্থ জল প্রভৃতির অনুসন্ধান করা হয়, এখানে সেটি আলোচিত হবে। বিশেষ জোর দেওয়া হবে অচিরাচরিত নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের উপর।

পর্যায়টি শেষ করার আগে অব্যবহৃত সম্পদ ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ কাজে লাগানোর জন্য পুনরাবর্তন এবং আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্বকাল বাড়ানোর জন্য সযত্ন পরিকল্পনার প্রয়োজন সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই পর্যায়টি পড়ার পর আপনার যেগুলি পারা উচিত সেগুলি হল :

- সব ধরনের প্রাণীই যে সজীব ও অজীব উপাদান নিয়ে গঠিত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, তা উপলব্ধি করতে,
- সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল, অরণ্য ও সেগুলির বাস্তুতন্ত্র হিসাবে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে,
- পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি ও তার কারণগুলি চিহ্নিত করতে,
- পৃথিবীর নানা ধরনের সম্পদগুলির তালিকা প্রস্তুত করতে এবং
- আমাদের সম্পদের সীমিত ভাণ্ডারগুলি কীভাবে মানুষের অবস্থায় উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় তা বর্ণনা করতে।

একক ১৪ □ ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র

গঠন

১৪.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১৪.২ বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি এবং পরিবেশ

১৪.৩ বাস্তুতন্ত্র

১৪.৩.১ বাস্তুতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জীব এবং বাস্তব্যবিদ্যায় তাদের ভূমিকা

১৪.৩.২ খাদ্যশৃঙ্খল

১৪.৩.৩ খাদ্যজাল

১৪.৩.৪ বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ

১৪.৪ বাস্তুতন্ত্রে বস্তুর আবর্তন

১৪.৪.১ নাইট্রোজেনচক্র

১৪.৪.২ কার্বনচক্র

১৪.৪.৩ জলচক্র

১৪.৫ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে মিথস্ক্রিয়া

১৪.৬ সারাংশ

১৪.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১৪.৮ উত্তরাবলী

১৪.১ প্রস্তাবনা

যদিও বিজ্ঞানীরা অন্যান্য জ্যোতিষ্কে জীবনের লক্ষণের জন্য অবিরাম অনুসন্ধান চালাচ্ছেন, তবু আমরা যতদূর জানি, আমাদের পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। এই গ্রহে কীভাবে জীবনের উদ্ভব ঘটেছিল, পূর্ববর্তী পর্যায়ে আপনারা ইতিমধ্যেই তা শিখেছেন। আপনারা আরও পড়েছেন যে কয়েক সহস্র লক্ষ বছর আগে

ধরাপৃষ্ঠে বসবাসের অবস্থাগুলি আজকের অবস্থার থেকে বেশ পৃথক ছিল এবং আগেকার জীবগুলিও ছিল এখনকার থেকে ভিন্ন। ঠিক যেমন কোটি কোটি বছর সময়ে পৃথিবীতে বসবাসের বর্তমান অবস্থাগুলির বিবর্তন ঘটেছে, প্রাণী ও উদ্ভিদের বর্তমান প্রকারগুলিও তেমনি পুরাতন প্রকারগুলি থেকে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সূর্যালোক, বায়ু, মাটি ও জল ছাড়াও পৃথিবীতে সঠিক বায়ুচাপ ও উষ্মতা আছে, যা জীবনের অস্তিত্ব, অভিব্যক্তি ও বৈচিত্র্যকে সম্ভবপর করে। বস্তুত পৃথিবীর পরিবেশ ও জীবগুলির মধ্যে নিসর্গে এক অতি সূক্ষ্ম সাম্য বর্তমান। বর্তমানে যে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, এই সাম্য বিঘ্নিত হলে তা পরিবর্তিত, এমনকি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এই অসাম্যের কয়েকটি প্রতিকূল ফল হল আকস্মিক বন্যা, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি। সুতরাং, জীবিত ও নিষ্প্রাণ বস্তুগুলি কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতি এই সাম্যকে অব্যাহত রাখে, আমাদের তা অবশ্যই বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর এগুলি করতে আপনাদের সক্ষম হওয়া উচিত :

- কেমনভাবে জীবনের সকল আকারই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাদের পরিবেশের এবং পরস্পরের উপরে নির্ভর করে, তার বিবরণ দেওয়া,
- জীবনের অস্তিত্বের জন্য শক্তি, পুষ্টি ও জলের মতো অপরিহার্য বস্তুগুলি কীভাবে প্রকৃতিতে ঘটমান কয়েকটি পদ্ধতির দ্বারা ক্রমাগত পাওয়া যায়, তা ব্যাখ্যা করা,
- জীবনের পরস্পর নির্ভরতা সম্বন্ধে এবং কীভাবে তার পরিপোষক পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রকৃতিতে সূক্ষ্ম সাম্য থাকে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা।

১৪.২ বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি এবং পরিবেশ

আজকাল জীবনের বহু ক্ষেত্রের লোকেদের বাস্তব্যবিদ্যা বা 'ইকোলজি' এবং 'পরিবেশ' শব্দগুলি ব্যবহার করতে শুনি। রাজনৈতিক নেতা, নগর পরিকল্পক, ছাত্র ও স্থপতিরা পরিবেশীয় বিষয় এবং 'বাস্তব্যবিদ্যায় আগ্রহে'-র কথা বলে থাকেন। এই উক্তিগুলি খুবই সুপ্রচলিত, কিন্তু বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই কি এগুলি প্রকৃতই বোঝেন? প্রায়ই এগুলিকে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কাজেই এই শব্দগুলি সম্বন্ধে কিছু সর্বজনীন বোধ প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে।

ইকোলজি বা বাস্তব্যবিদ্যা জীববিদ্যায় সেই শাখা বা জীব ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের পর্যালোচনা করে। কোনও জীবকে তার জীবনকালে যা কিছু বাইরে থেকে প্রভাবিত করে সেগুলি একত্রে তার **পরিবেশ**

রূপে পরিচিত। এই পরিবেশীয় প্রভাবগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে জীবিত বস্তুগুলি কোনও জীবকে প্রভাবিত করে, তাদের **সজীব** বা **বায়োটিক উপাদান** বলে; আর যেগুলি প্রাণহীন, তারা **অজীব** বা **অ্যাবায়োটিক উপাদান** বলে অভিহিত হয়। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটি বোঝা যাক। নদীতে একটি মাছের কথা বিবেচনা করুন—এর জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বহুবিধ পরিবেশীয় উপাদানকে আমরা শনাক্ত করতে পারি। জলের উষ্ণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অজীব বা অ্যাবায়োটিক উপাদান; কিন্তু নদীকূল বরাবর বৃক্ষরূপী সজীব বা বায়োটিক উপাদানের অবস্থিতির দ্বারা এটি প্রভাবিত হতে পারে—বৃক্ষ নদীকে ছায়া দেয় এবং তাকে সূর্যালোকে উত্তপ্ত হতে দেয় না। মাছের খাদ্য হিসাবে যে জীবগুলি কাজে লাগে, সেগুলির ধরন ও সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ সজীব উপাদান। অন্য দুটি অজীব উপাদান হল, নদীতলের বস্তুগুলির প্রকৃতি এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ—এগুলির সঙ্গে জলপ্রবাহের দ্রুতির সম্পর্ক আছে। সংক্ষেপে, জীবের পরিবেশ জটিল এবং তার নানা উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান।

অনুশীলনী—১

নীচে প্রদত্ত তালিকাটি থেকে যথাযথ শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(ক) .... হল জীবগুলির সঙ্গে তাদের .... এর মিথস্ক্রিয়ার পর্যালোচনা।

(খ) .... শব্দটির খুব বিস্তারিত অর্থ হল যা কিছু একটি .... কে তার জীবনকালে প্রভাবিত করে।

(গ) পরিবেশে .... এবং .... উপাদান থাকে।

(পরিবেশ, সজীব, জীব, অজীব, পরিবেশ, বাস্তব্যবিদ্যা)

১৪.৩ বাস্তুতন্ত্র

নদীতে মাছের দৃষ্টান্তটি এটা বেশ পরিষ্কার করে দেয় যে জীবিত বস্তুগুলিকে এবং নিসর্গে তাদের অবস্থানকে ঠিকমতো বুঝতে চাইলে আমাদের অবশ্যই সেগুলিকে এক মিথস্ক্রিয় (interacting) তন্ত্রের অংশরূপে বিবেচনা করতে হবে; পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করলে চলবে না। এমন একটি মিথস্ক্রিয় তন্ত্র, যথা একটি নদী, ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে অভিহিত হয়।

কোনও-না-কোনও সময়ে আপনারা নিশ্চয়ই হ্রদ, জলাশয়, তৃণভূমি বা অরণ্য দেখেছেন। এগুলি সবই বাস্তুতন্ত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ। একটি জলাশয়কে আমাদের আদর্শ বস্তুতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা যাক (চিত্র ১৪.১ দেখুন) এবং তাকে আরও নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা যাক।

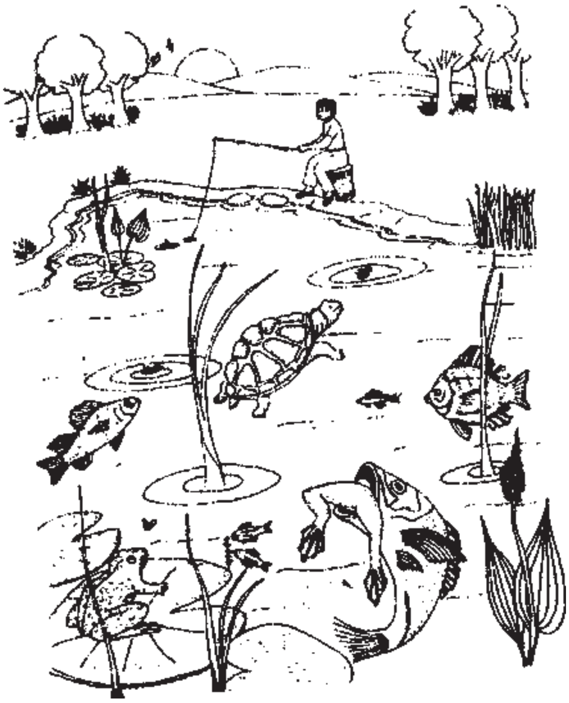

চিত্র ১৪.১ : জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রে সজীব ও অজীব উপাদানগুলি দেখানো হয়েছে।

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম মূলত জীবিত ও নিষ্প্রাণ, এই দুই প্রকার উপাদানে গঠিত। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, ব্যাঙ, পাখি, মাছ, কাছিম ও পতঙ্গ এবং জীবাণু (microbe/microorganism) বলে অভিহিত বহুবিধ আণুবীক্ষণিক জীব জীবিত উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্ত। জল, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো দ্রবীভূত গ্যাস, খনিজ, মৃত্তিকা এবং পাথর দিয়ে নিষ্প্রাণ উপাদানগুলি রচিত। জলাশয়ের নানা উপাদানের মধ্যে পরস্পর মিথস্ক্রিয়া ঘটে। বস্তুত জলাশয়টি নিজেই যেন একটি ক্ষুদ্র জগৎ। এখানে জীবেরা জন্ম নেয়; জলাশয়ের ভিতরেই তারা বাস করে, শ্বাস নেয়, আহার করে, বর্জ্য দ্রব্য রেচন (excretion) করে, চলাফেরা করে, সহবাস ও প্রজনন করে, একে অন্যের আহার হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। যথার্থই বলা যায়, জলাশয়টির এক গতিশীল অস্তিত্ব আছে। গতকাল যেমন ছিল, আজ এটি ঠিক তেমন নয়। এবারে একটি বাস্তুতন্ত্রের সজীব বা বায়োটিক উপাদানগুলি এবং তাদের ভূমিকার দিকে আরও নিবিড় দৃষ্টি দেওয়া যাক।

১৪.৩.১ বাস্তুতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জীব এবং বাস্তব্যবিদ্যায় তাদের ভূমিকা

একটি বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের ভিতরে উৎপাদক, খাদক (consumer) ও বিয়োজক (decomposer)—এই তিনটি প্রশস্ত শ্রেণীতে জীবগুলিকে বিভক্ত করা যায়। বাস্তুতন্ত্রে এগুলির অবস্থা কী, তা দেখা যাক।

পৃথিবীতে প্রায় সকল জীবনের জন্য শক্তির চূড়ান্ত উৎস হল সূর্য। সবুজ উদ্ভিদগুলির মাধ্যমে এবং কয়েক প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও অ্যালজী বা শৈবালের মাধ্যমেও সৌরশক্তি সজীব জগতে প্রবেশ করে; এগুলিকে উৎপাদক আখ্যা দেওয়া হয়। সালোকসংশ্লেষের (Photosynthesis) সময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল এই দুটি সরল নিম্নশক্তি পদার্থকে, কার্বোহাইড্রেটের মতো যেগুলিকে খাদ্য বলা যায় তেমন জটিলতর পদার্থে পরিবর্তিত করতে সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের শক্তির ব্যবহার করে। সালোকসংশ্লেষ উপজাত বস্তু (by product) রূপে অক্সিজেন উৎপাদন করে। সালোকসংশ্লেষ চালানোর এবং খাদ্য তৈরির জন্য সবুজ উদ্ভিদগুলির কেবল যে সূর্যালোক, জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডেরই প্রয়োজন, এমন নয়; উপরন্তু, ভাসমান উদ্ভিদের চারিদিকের জলে এবং উদ্ভিদমূলের চারিপাশের মৃত্তিকার জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির মতো কয়েকটি খনিজ পদার্থও অল্প পরিমাণে আবশ্যক।

সালোকসংশ্লেষ

কার্বন ডাইঅক্সাইড + জল + সৌরশক্তি + খনিজ → খাদ্য + অক্সিজেন

(তীরচিহ্নের অর্থ 'উৎপাদন করে'।)

সালোকসংশ্লেষের সময়ে তৈরি করা খাদ্য পরবর্তীকালে স্বয়ং উদ্ভিদটির দ্বারা অথবা কোনও উদ্ভিদভোজী জীবের দ্বারা শক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। জীবদেহে শ্বসন নামে পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যয় হয়ে যায় এবং তার সঞ্চিত শক্তি মুক্ত হয়। শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে এবং শ্বসনের ফলে তিনটি জিনিস উৎপন্ন হয়; শক্তি—যার একাংশ কর্মে প্রযুক্ত হয়; কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল—যেগুলি সালোকসংশ্লেষ শুরু করবারই উপাদান।

শ্বসন :

খাদ্য + অক্সিজেন → কার্বন ডাই-অক্সাইড + জল + শক্তি

খাদ্য কেবল শক্তিরই উৎস নয়, অধিকন্তু জীবদেহ নির্মাণে ব্যবহৃত পুষ্টিদ্রব্যগুলিরও (nutrients) উৎস। কাজেই দেখছি, সালোকসংশ্লেষের সময়ে পুষ্টিদ্রব্য ও শক্তি খাদ্য নামে একটিমাত্র বস্তুতে একত্রিত হয়। সবুজ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া এই খাদ্য অন্য জীবেরাও আহার করতে পারে।

এ পর্যন্ত দেখেছি, নিজের খাদ্য উৎপাদন করে বলে সবুজ উদ্ভিদকে উৎপাদক বলা হয়। উদ্ভিদ জীবনধারণ করে এবং মরে যায়; প্রাণীরা উদ্ভিদকে আহার করে এবং তারাও কালক্রমে প্রাণ হারায়। বিয়োজক (decomposer) জীবগুলি মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপরে ক্রিয়া করে এবং এই মৃতদেহগুলি যেসব পদার্থে নির্মিত, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেগুলির বিয়োজন (decomposition) ঘটায়। অন্য কথায়, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ফাংগাস এবং কৃমির মতো বিয়োজকগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের পদার্থগুলিকে আবার তাদের প্রাথমিক আকারে পরিবর্তিত করে।

উৎপাদক ও বিয়োজক ছাড়া খাদক (consumer) নামে আরও এক শ্রেণীর জীব আছে। এই জীবগুলি নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না এবং শক্তি ও পুষ্টিদ্রব্যের (nutrient) জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপরে নির্ভর করে।

খাদকদের অন্তর্ভুক্ত হল—নিরামিষাশী প্রাণী যারা উদ্ভিদ আহার করে, মাংসাশী প্রাণী যারা অন্য প্রাণীদের ভক্ষণ করে এবং সর্বভুক প্রাণী যারা উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়কেই আহার করে। হরিণ, ছাগল ও গোরু নিরামিষাশী প্রাণীর দৃষ্টান্ত। যেসব মানুষ নিরামিষ আহারকেই বেছে নিয়েছেন, তাঁদেরও নিরামিষাশী বলে বিবেচনা করা যায়। নেকড়ে, বাঘ, বিড়াল, জলফড়িং (ড্রাগন ফ্লাই) ও ঈগল—এরা সবাই মাংসাশী। ইঁদুর এবং অধিকাংশ মানুষ সর্বভুক প্রাণীর দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী—২

নীচে দেওয়া শব্দধাঁধায় শূন্য প্রকোষ্ঠগুলি পূরণ করুন। ধাঁধাটি সম্পূর্ণ করার পরে জীবগুলিকে উৎপাদক, বিয়োজক, নিরামিষাশী, মাংসাশী ও সর্বভুক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করুন।

সংকেত *

বাম থেকে ডাইনে :	উপর থেকে নীচে :
১. পাখি (৫)	২. প্রাণী (৫)
২. শস্য (৫)	৪. আগাছা (৫)
৩. পশু (৬)	১০. পশু (৩)
৪. পশু (৭)	১১. ছত্রাক (৬)
৫. পতঙ্গ (১১)	১২. পাখি (৩)
৬. পাখি (৪)	১৩. প্রাণী (৬)
৭. পশু (৪)	১৪. সবজি (৩)
৮. কৃমি (৯)	১৫. পাখি (৬)
৯. প্রাণী (৩)	১৬. পশু (৪)

* বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি শব্দের অক্ষরসংখ্যা বোঝাচ্ছে।

১৪.৩.২ খাদ্যশৃঙ্খল

পূর্ববর্তী ১৪.৩.১ অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন, জীবগুলির পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ার একটি পথ হল খাদ্যের মাধ্যম, অর্থাৎ একটি জীব অন্য জীবের আহার হয়ে যায়। যে জীবগুলি একে অন্যকে ভক্ষণ করে, তাদের পারম্পর্য একটি খাদ্যশৃঙ্খল রচনা করে (চিত্র দেখুন।)

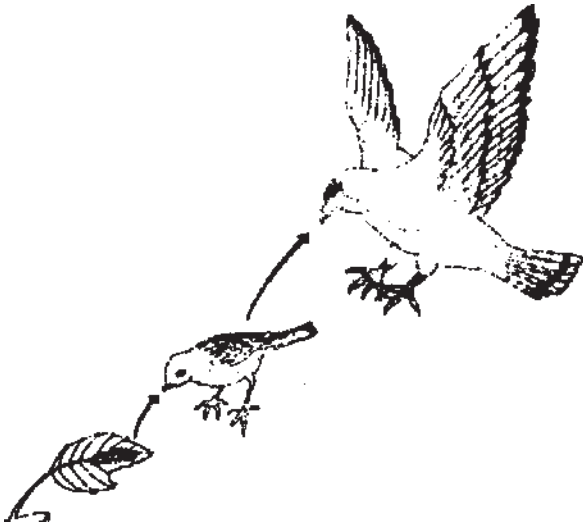

চিত্র ১৪.২ : খাদ্যশৃঙ্খল

চিত্রে তীরচিহ্নগুলি উৎপাদক উদ্ভিদ থেকে শুঁয়াপোকা, চড়াই এবং পরিশেষে ঈগল পাখিতে পুষ্টিদ্রব্য ও শক্তির যাত্রাপথের দিক নির্দেশ করে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলের পদ বা যোজকের সংখ্যা সাধারণত চার বা পাঁচে সীমাবদ্ধ থাকে। এমন কেন, তা নিয়ে আপনি বিস্ময়বোধ করতে পারেন। পরে আপনি এর উত্তর পাবেন। খাদ্যশৃঙ্খলের যোজক বা পদগুলিতে ফিরে আসা যাক। প্রতিটি যোজককে পৌষ্টিক স্তর (trophic level) বলেও উল্লেখ করা হয়। কোনও জীব যে পৌষ্টিক স্তরের অন্তর্গত, সেটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জীবটি খাদ্যশৃঙ্খলে উদ্ভিদ থেকে কত দূরে আছে। সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদক প্রথম পৌষ্টিক স্তরটি গঠন করে। দ্বিতীয় পৌষ্টিক স্তরে থাকে উদ্ভিদভোজী বা নিরামিষাশী প্রাণীরা। উচ্চতর পৌষ্টিক স্তরগুলি মাংসাশী প্রাণীদের দ্বারা গঠিত। এখানে অন্য যে বিষয়টি আমরা বলতে চাই, তা হল এই যে সকল ক্ষেত্রে একটি জীবকে একটিমাত্র বিশেষ পৌষ্টিক স্তরের অন্তর্গত করা যায় না। মানুষের দৃষ্টান্ত নিন—মানুষ সর্বভুক অর্থাৎ সে নিরামিষাশীও বটে, মাংসাশীও বটে, কাজেই সে দ্বিতীয় এবং অথবা তৃতীয় পৌষ্টিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১৪.৩.৩ খাদ্যজাল

একটি বাস্তুতন্ত্রের বা ইকোসিস্টেমের ভিতরে বহু ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল থাকে। কতকগুলি জীব যুগপৎ কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খলে জড়িত থাকতে পারে (চিত্র ১৪.৩ দেখুন)। কাজেই কতিপয় খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর বিজড়িত হয়ে এমন একটি খাদ্যজাল (food web) সৃষ্টি করে, যেটি খুব জটিল হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের ভিতরে প্রকৃত আহারনির্ভর সম্বন্ধটি আরও সঠিকভাবে বর্ণনার জন্য প্রায়ই খাদ্যজাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রোগ বা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বনে হরিণ বিরল বা লুপ্ত হয়ে গেলে, যতদিন না সাধারণ অবস্থার শিকার আবার সুলভ হয়, সিংহের মতো শিকারী প্রাণীগুলি শিয়াল, নেকড়ে, সারস প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীকে ভক্ষণ

করতে পারে (চিত্র ১৪.৩ দেখুন)। সংক্ষেপে বলতে পারি, বহু পরস্পরযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিকে গৌণ বা মুখ্য প্রতিবন্ধ ও পরিবর্তন সত্ত্বেও জীবগুলিকে অস্তিত্বরক্ষায় সমর্থ করে। এভাবে পরস্পরযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খলগুলি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রকে স্থায়িত্ব দেয়।

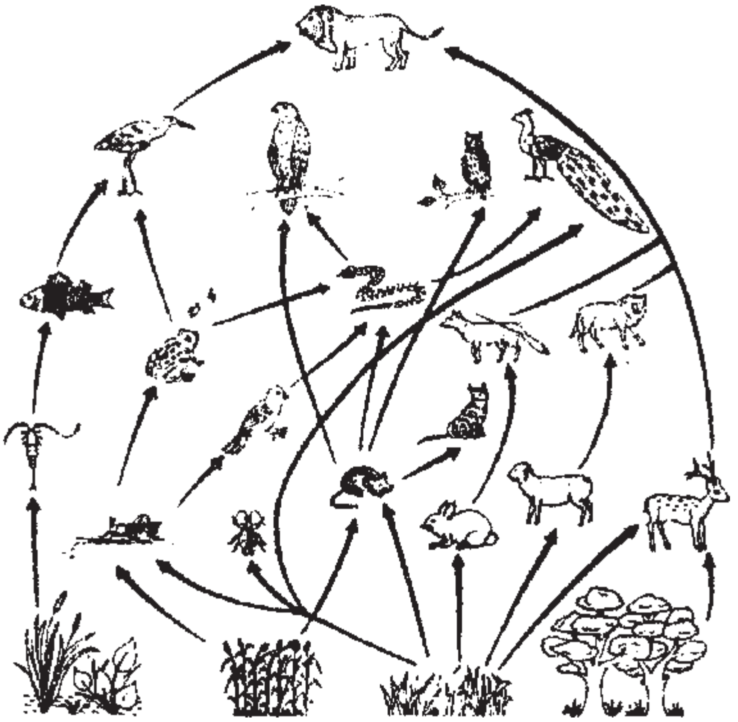

চিত্র ১৪.৩ : একটি খাদ্যজালে মুখ্য খাদ্যযোজকগুলি দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক শৃঙ্খলের উৎসবিন্দু একটি উদ্ভিদ এবং কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি খাদ্যজাল সৃষ্টি করে।

১৪.৩.৪ বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ

যে-কোনও ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের জন্য শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্যালোক। আগের ১৪.৩.১ অনুচ্ছেদে আপনারা পড়েছেন, সৌরশক্তি উদ্ভিদের দ্বারা খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত থাকে। আমরা বা অন্য প্রাণীরা যেসব খাদ্য আহার করি, তার সবগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের দ্বারা উৎপাদিত হয়। আপনারা প্রাতরাশের কথা ভাবুন। রুটি উদ্ভিজ্জ বস্তু থেকে উৎপন্ন একটি দানাশস্য দিয়ে তৈরি হয়। উদ্ভিজ্জ দ্রব্য খেয়েছে এমন মুরগি থেকে আসে ডিম। দুধ আসে গাভী থেকে—যে গাভী উদ্ভিদ থেকে লব্ধ পশুখাদ্য বা ঘাস ভক্ষণ করেছে। এককথায়, উদ্ভিদ আহার করে বা কাঠ জ্বালিয়ে উদ্ভিদ থেকে যে শক্তি আমরা পাই, তা হল উদ্ভিদের দ্বারা বন্দি হওয়া সৌরশক্তির প্রতিরূপ। আমরা সৌরশক্তির সঞ্চিত সম্পদের উপরে নির্ভরশীল। মাংস খেলে সেই শক্তি পাই, যা কয়েক বছর আগে উদ্ভিদের দ্বারা সঞ্চিত হয়েছিল এবং তার পরে ছাগলের মতো প্রাণীর দ্বারা চারণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছিল। ইন্ধনের জ্বালানি কাঠ কাটলে সেই শক্তি পাই, যা হয়তো এক শতাব্দী বা ততোধিক

কাল ধরে বৃক্ষের দ্বারা সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হয়েছে। কয়লা বা পেট্রোলিয়াম জ্বালালে আমরা পাই কোটি কোটি বছর আগে উদ্ভিদের দ্বারা সঞ্চিত সৌরশক্তি।

একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহকে এবারে অনুসরণ করা যাক। চিত্র ১৪.৪-এ নকশার আকারে এটি দেখানো হয়েছে।

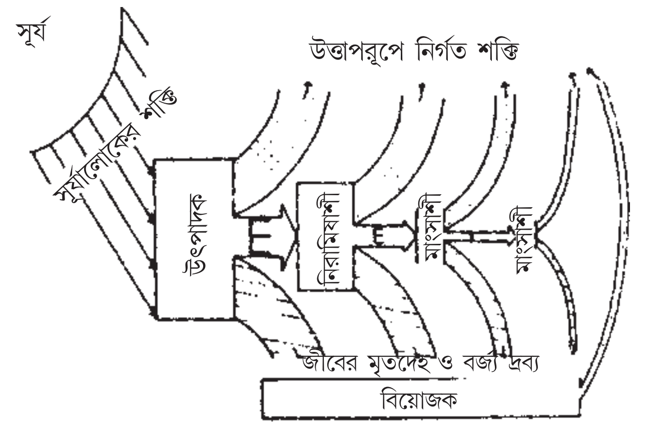

চিত্র ১৪.৪ : একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ

লক্ষ্য করুন যে উৎপাদক থেকে অন্তিম স্তর পর্যন্ত প্রবাহে শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তী পৌষ্টিক স্তরে প্রবাহিত শক্তিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মাপের E অক্ষর দিয়ে দেখানো হয়েছে—প্রতিটি E অক্ষরের মাপ শক্তির তুলনামূলক পরিমাপের ইঙ্গিত দেয়। চিত্রের উপরার্ধে তীরচিহ্নগুলি বিভিন্ন জীবের দ্বারা নিঃসৃত উত্তাপের আকারে শক্তিক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়।

চিত্রের নিম্নার্ধে তীরচিহ্নগুলি জীবের মৃতদেহে আবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে এবং ক্ষরিত বর্জ্য দ্রব্যের মাধ্যমে হারানো শক্তিকে দেখাচ্ছে। বিয়োজক জীবগুলি (decomposers) এসব বর্জ্য দ্রব্য ও মৃতদেহকে খাদ্যের উৎসরূপে ব্যবহার করে এবং এগুলি থেকে শক্তি আহরণ করে। তারাও কিছু অব্যবহৃত তাপশক্তি বার করে দেয়।

একটি বাস্তুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত শক্তি এভাবে প্রথমে উৎপাদক জীবগুলির কাছে ধরা পড়ে। উৎপাদকগুলি থেকে শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদক প্রাণীতে (consumers) প্রবাহিত হয়। শৃঙ্খলের শেষে দেখতে পাই, সর্বশেষ পৌষ্টিক স্তরের (trophic level) জন্য খুব অল্প শক্তিই অবশিষ্ট থাকে, কারণ এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে যেতে সবসময়েই কিছু শক্তি হারিয়ে যায়। শক্তির এই ক্ষয় বাস্তুতন্ত্রে পৌষ্টিক স্তরের সংখ্যাকে সীমিত রাখে এবং সেজন্য মাত্র বিরল ক্ষেত্রেই এগুলি পাঁচের অধিক হয়ে থাকে। একটি খাদ্যশৃঙ্খল পদগুলি কেন চার বা পাঁচে সীমাবদ্ধ থাকে, এভাবে তা-ও পরিষ্কার বোঝা যায়।

অনুশীলনী—৩

নীচে প্রদত্ত তালিকাটি থেকে নিম্নলিখিত খাদ্যশৃঙ্খলগুলিতে হারানো যোজকগুলি বসান।

(ক) উদ্ভিদ → ····· → মাছ → মানুষ

(খ) ঘাস → কীট → চড়াই → ····· → পেঁচা

(গ) ····· → ইঁদুর → সাপ → বাজপাখি

(ঘ) পতঙ্গ → মাকড়সা → ব্যাঙ → ·····

(ঙ) ঘাস → ঘাসফড়িং → ····· → ঈগল

(ইঁদুর, সাপ, পতঙ্গ, ইঁদুর, গম)

অনুশীলনী—৪

নীচে তালিকাবদ্ধ বিষয়বস্তুগুলি ব্যবহার করে একটি খাদ্যজাল গঠন করুন।

হরিণ	নিরামিষাশী পতঙ্গ
খরগোশ	মাকড়সা
উদ্ভিদ	চড়াই
নেকড়ে	বাজপাখি
সাপ	

ইঙ্গিত : নীচে উৎপাদকগুলিকে, মাঝের স্তরে নিরামিষাশীদের এবং শীর্ষে মাংসাশী প্রাণীদের রাখুন এবং কে কাকে আহার করে, তার উপরে নির্ভর করে এগুলিকে তীরচিহ্ন দিয়ে যুক্ত করুন।

১৪.৪ বাস্তুতন্ত্রে বস্তুর আবর্তন

জীবগুলির অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চারটি পুষ্টিদ্রব্যের (nutrients) প্রয়োজন হয়; এগুলি হল কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন। এদের ফসফরাস ও গন্ধকেরও প্রয়োজন পড়ে। আমাদের পরিবেশে এই মৌলগুলি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। সুতরাং প্রাণকে অব্যাহত রাখতে এগুলিকে অবশ্যই পুনরাবর্তিত করতে হয়। তাছাড়া এই মৌলগুলিকে অবশ্যই জীবিত থেকে নিষ্প্রাণ উপাদানে এবং তার বিপরীত মুখে কার্যকরভাবে যাতায়াত করতে হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝা যাক। খাদ্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদেরা কার্বনকে কার্বন ডাই-অক্সাইড আকারে গ্রহণ করে। নিরামিষাশী প্রাণীরা উদ্ভিদ আহার করলে কার্বন তাদের মধ্যে চালিত হয় এবং সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে মাংসাশী প্রাণী ও অন্যান্যদের দেহে চালিত হয়ে থাকে। উৎপাদক, নিরামিষাশী ও মাংসাশী জীবগুলির রেচন (excretion) পদ্ধতির এবং বিয়োজকদেরও ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বনকে পরিশেষে বাস্তুতন্ত্রের নিষ্প্রাণ বস্তুর ভাণ্ডারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমন সব চক্রপদ্ধতির মাধ্যমে এই পুষ্টিদ্রব্যগুলি জীবেদের দ্বারা বারবার ব্যবহৃত হয়।

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের ক্রিয়ার এই দিকটিকে বস্তুর আবর্তন (cycling of materials) বলে। শক্তিপ্রবাহ একমুখী পদ্ধতি, পক্ষান্তরে অজৈব পুষ্টিদ্রব্যগুলি মোটামুটি চক্রপথে চলে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আপনারা নাইট্রোজেন, কার্বন ও জলের চক্রগুলি সম্বন্ধে পড়বেন। এ থেকে আপনারা বিবিধ জীবিত ও নিষ্প্রাণ উপাদানের জটিলভাবে লিপ্ত থাকার ধারণা পাবেন।

১৪.৪.১ নাইট্রোজেনচক্র

নাইট্রোজেন বহু অপরিহার্য জৈব যৌগের, বিশেষত নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি আবহমণ্ডলের একটি প্রধান অংশ (শতকরা ৭৯ ভাগ)। আবহমণ্ডলই নাইট্রোজেনের মুখ্য ভাণ্ডার; এখানে এটি গ্যাসীয় আকারে বর্তমান—দুর্ভাগ্যক্রমে এই আকারে নাইট্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে না।

বস্তুত প্রোটিন গঠনের জন্য উদ্ভিদ মৃত্তিকার নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম লবণগুলি থেকে নাইট্রোজেন পায় এবং সেই প্রোটিন থেকে প্রাণীরা তাদের প্রোটিনের কিছুটা পেয়ে থাকে। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্তিকায় নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম লবণের পরিমাণ সীমিত এবং সেগুলির সরবরাহ দ্রুত শেষ হয়ে যেত, যদি না নাইট্রোজেনের সরবরাহের নবীকরণ অবিরত চলত। এমন কোন্ কোন্ পদ্ধতি নাইট্রোজেনের আবর্তন সম্ভবপর করে? এবারে আমরা সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

চিত্র ১৪.৫-এ দেখানো নাইট্রোজেনচক্রের নটি মূল পদের দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে আপনাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চিত্রে সংখ্যা ১ দেখলে তার ব্যাখ্যার জন্য নিম্নবর্ণিত নাইট্রোজেনচক্রের পদ ১ দেখুন।

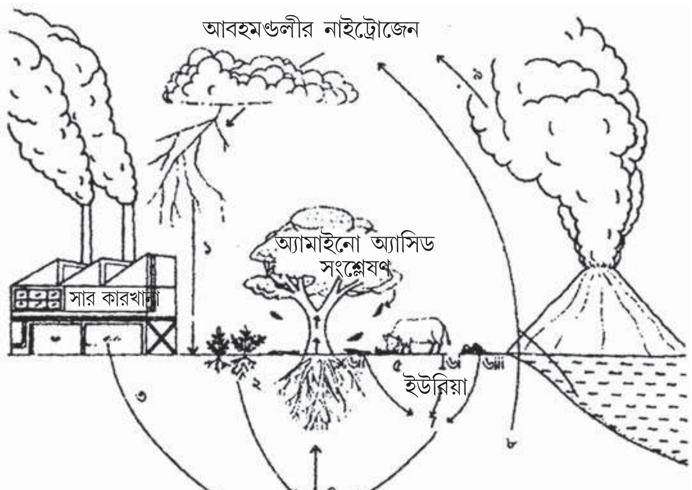

চিত্র ১৪.৫ : নাইট্রোজেনচক্র

(১) ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ে বায়ুতে কিছু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বিদ্যুতের উচ্চ তাপে নাইট্রোজেনের অক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি বৃষ্টিজলে দ্রবীভূত হয়ে মাটিতে পৌঁছায় এবং নাইট্রেটে পরিণত হয়। এই নাইট্রেটগুলি উদ্ভিদের দ্বারা গৃহীত হয়।

(২) কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া আবহমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে ব্যবহার করতে এবং তার থেকে নাইট্রেট গড়ে তুলতে পারে। এগুলিকে নাইট্রোজেন-বন্ধনকারী (nitrogen-fixing) ব্যাকটেরিয়া বলে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে কতকগুলি মৃত্তিকায় মুক্ত অবস্থায় বাস করে; অন্যেরা কোনও কোনও উদ্ভিদের মূলের উপরে ছোট ছোট গ্রন্থি বা অর্বুদে (nodule) থাকে (চিত্র ১৪.৬ দেখুন)। শিম, মটর, চীনাবাদাম, ক্লোভার ও অ্যালফা-অ্যালফার মতো যেসব উদ্ভিদের মূলের উপরে এই ব্যাকটেরিয়াবাহী অর্বুদগুলি থাকে, সেগুলি নিশ্চয় আপনাদের কাছে পরিচিত। এই উদ্ভিদগুলির মধ্যে কতকগুলিকে কৃষকেরা পশুখাদ্য তৈরির কাজে লাগান এবং তার পরে অবশিষ্ট উদ্ভিদকে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাটিতে চষে ফেলেন।

চিত্র ১৪.৬ মূলের অর্বুদ

(৩) যে হারে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়, তার তুলনায় ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেন-বন্ধন (nitrogen-fixation) অর্থাৎ নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের শোষণোপযোগী আকার দেওয়ার পদ্ধতিটি বেশ মন্থর। এমন অবস্থায় জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সার দিয়ে নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করা হয়।

(৪) নাইট্রোজেন নাইট্রেট আকারে উদ্ভিদের দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং প্রোটিন গঠনের উপাদানস্বরূপ অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিতে পরিবর্তিত হয়।

(৫) উদ্ভিদের মাধ্যমে নাইট্রোজেন (food web) প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদভোজী প্রাণীর দেহে চলে যায়।

(৬) শেষ পর্যন্ত নাইট্রোজেন নিম্নলিখিত পথে মাটিতে ফিরে যায় : (i) রেচনের (excretion) সময়ে বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম যৌগের আকারে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য দ্রব্যগুলিকে মাটি বা জলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (ii, iii) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বন্দি হওয়া নাইট্রোজেন তাদের মৃত্যুর ফলে এবং তার পরে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের ক্রিয়ায় মৃতদেহের শটনের (decay) ফলে মাটিতে ফিরে যায়।

(৭) মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ অ্যামোনিয়াম যৌগে এবং পরিশেষে নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়।

(৮) কোনও কোনও মাটিতে, বিশেষত জলা, মোহানা, হ্রদ ও সমুদ্রতলের কিছু অংশে এমন নাইট্রোজেনমোচী (denitrifying) ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলি নাইট্রোজেন-বন্ধনের বিপরীত ফল উৎপাদন করে। এগুলি নাইট্রেটের উপরে ক্রিয়া করে এবং বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনকে মুক্ত করে দেয়।

(৯) নাইট্রোজেনের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির অন্যতম হল আগ্নেয়গিরি। বহু শতাব্দী ধরে আগ্নেয়গিরিগুলি অল্প অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন নিঃসরণ করে চলেছে এবং আবহমণ্ডলের নাইট্রোজেন ভাণ্ডারে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

নাইট্রোজেনচক্রে অনুপ্রবেশ

মানুষের হস্তক্ষেপ নাইট্রোজেনচক্রে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। কেমন করে, তা দেখা যাক। আমরা যখন শস্য ফলাই ও সংগ্রহ করি, উদ্ভিদদেহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে গিয়ে মাটি থেকে নাইট্রোজেনের ক্ষয় ঘটে। অনুরূপভাবে, কাঠের জন্য গাছকাটার ফলে আমাদের অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র থেকে প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন বেরিয়ে যায়। আপনারা বলতে পারেন, আমাদের ক্ষেতে বাণিজ্যিক সার দিয়ে অথবা বড় মাত্রায় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী উদ্ভিদের চাষ করে আমরা নাইট্রোজেনের ক্ষয় পূরণ করতে পারি। হ্যাঁ, যতক্ষণ যথাযথ পরিমাণে সঠিক ধরনের সার প্রয়োগ করা হচ্ছে, আপনাদের ধারণা ঠিক। কিন্তু বাণিজ্যিক সারগুলির ভারী মাত্রায় প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকায় ও ভূগর্ভস্থ জলে (ground water) অত্যধিক নাইট্রোজেন জমে ওঠে এবং নদী, হ্রদ প্রভৃতি পুষ্টিদ্রব্যে (nutrient) অতি সমৃদ্ধ হয়ে পড়ে। যানবাহন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে নিঃসৃত বস্তুগুলি ভয়াবহ হারে আবহমণ্ডলে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলিকে, বিশেষত নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড যোগ করে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করে; শেষোক্ত বস্তুটি বৃষ্টিপাতের সময়ে মৃত্তিকায় এবং পরিশেষে ভূ-জলস্তরে বাহিত হয়। নদী, হ্রদ প্রভৃতির পুষ্টিসমৃদ্ধি, আবহমণ্ডলে অত্যধিক নাইট্রোজেন অক্সাইডের উপস্থিতি, নাইট্রিক অ্যাসিডের অত্যধিক উৎপাদন এবং মাটিতে তার মিশ্রণের ফলাফল এই পর্যায়ের একক ১৬-তে পর্যালোচিত হবে।

অনুশীলনী—৫

শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

জীবের অধিকাংশ অণুর জন্য প্রয়োজনীয় মৌল নাইট্রোজেন .... রূপে আবহমণ্ডলীয় ভাণ্ডারে থাকে। উদ্ভিদ কেবলমাত্র .... আকারেই নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করতে পারে। নাইট্রোজেন গ্যাস ....এর দ্বারা ব্যবহারযোগ্য যৌগগুলিতে আবদ্ধ হয়। এগুলিকে ....-এর মতো উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে পাওয়া যায়। .... ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন বন্ধনের বিপরীত ফলাফল উৎপাদন করে। বর্জ্যদ্রব্য ও .... যোগ করে মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করা হয় এবং পরবর্তীকালে এগুলির উপরে .... ক্রিয়া করে।

১৪.৪.২ কার্বনচক্র

আমরা দেখেছি, কার্বন সকল জৈব পদার্থেরই অন্যতম অপরিহার্য মৌল এবং সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির সাহায্যে বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করে। আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে কার্বন থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড আবহমণ্ডলের শতকরা ০.০৩ থেকে ০.০৪ ভাগ গঠন করে। সমুদ্রেও কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে আছে। চিত্র ১৪.৭-এ কার্বনচক্রের যে বারোটি মূল পদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, কার্বন-সম্পর্কিত চক্রবৎ পদ্ধতিগুলি বোঝার জন্য সেগুলি দেখতে আপনাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চিত্রে ১ থেকে ১২ সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করুন। এই সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটি চক্রটির একটি অঙ্গাস্বরূপ পদ্ধতির নির্দেশ দিচ্ছে। চিত্রে সংখ্যা ১ দেখলে সেটি কী দেখাচ্ছে তা লক্ষ্য করুন এবং কার্বনচক্রের ১ সংখ্যক উক্তিটিতে তার ব্যাখ্যা পড়ুন।

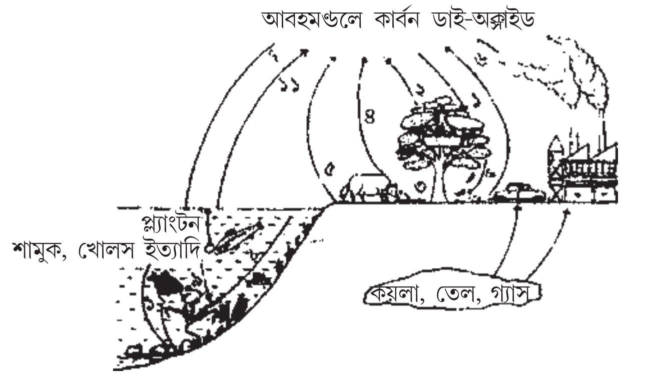

চিত্র ১৪.৭ : কার্বনচক্র

(১) আপনারা ইতিপূর্বে পড়েছেন, সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড খাদ্যজালে প্রবেশ করে (অনুচ্ছেদ ১৪.৩.১)।

(২) ওই একই অনুচ্ছেদে (১৪.৩.১) আপনারা আরও পড়েছেন, উদ্ভিদের দ্বারা বন্দি হওয়া এবং জৈব অণুতে পরিবর্তিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের কিয়দংশকে শ্বসনের মাধ্যমে আবহমণ্ডলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

(৩) আবার কার্বনের কিয়দংশ উদ্ভিদদেহের অঙ্গীভূত হয় এবং পরবর্তীকালে নিরামিষাশী প্রাণী প্রভৃতির দেহে চলে যায়।

(৪) শ্বাসক্রিয়ার সময়ে জীবেরা বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে মুক্ত করে দেয়।

(৫) প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু এবং তাদের মৃতদেহ ও বর্জ্য দ্রব্যের পরবর্তী শটনের (decay) দ্বারাও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে আবহমণ্ডলীয় ভাণ্ডারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

(৬) কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাসের মতো জীবাশ্মঘটিত জ্বালানিগুলির (fossil fuels) উৎপাদন কার্বনচক্রের অংশবিশেষ—এভাবে কোটি কোটি বছর ধরে কার্বন বন্দি হয়ে থেকেছে। জীবাশ্মঘটিত জ্বালানিগুলি এমন সব প্রাচীন উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশেষ যেগুলি কোটি কোটি বছর ধরে উচ্চ উষ্ণতা ও চাপের প্রভাবাধীন থেকেছে। মোটরগাড়ি, বিমানপোত প্রভৃতির মতো যানবাহন চালনায়, শিল্পে, খাদ্যরন্ধনে

এবং অন্য বিবিধ উদ্দেশ্যে শক্তির উৎস হিসাবে মানুষ কাঠ, পিট, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করে আসছে। জীবাশ্মঘটিত জ্বালানিগুলিকে শক্তিসমৃদ্ধ পদার্থরূপে বিবেচনার সময়ে অবশ্যই ভুলবেন না যে এই শক্তি হল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আসা সৌরশক্তি, যা জ্বালানিগুলির মধ্যে রাসায়নিক আকারে সঞ্চিত রয়েছে।

(৭) সমুদ্রের সঙ্গে বায়ুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থাকায় বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড জলের ঊর্ধ্বতর স্তরগুলিতে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনেটের উৎপাদন ঘটায়।

(৮) সমুদ্রজলে যে উদ্ভিদগুলি বৃদ্ধি পায়, তারা আবহমণ্ডলীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড পায় না। সুতরাং সালোকসংশ্লেষের সময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস হিসাবে তারা জলে বিদ্যমান কার্বনেটগুলিকে ব্যবহার করে।

(৯) জলজ উদ্ভিদগুলির দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য জলীয় খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাছ যখন জলজ উদ্ভিদ খায়, কার্বন উদ্ভিদ থেকে মাছে এবং পরিশেষে মৎস্যভোজী অন্য জীবে গিয়ে থাকে।

(১০) সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের কিয়দংশ সমুদ্রজলে দ্রবীভূত হয় এবং উদ্ভিদের দ্বারা আবার ব্যবহৃত হতে পারে।

(১১) অবশ্য এভাবে নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডের কিয়দংশ বায়ুমণ্ডলে চলে যায়।

(১২) শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি জীব জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিষ্কাশন করে এবং তাকে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদন করে, যা দিয়ে তারা তাদের খোলক নির্মাণ করে। মৃত প্রাণীগুলির খোলক সমুদ্রতলের অবক্ষেপে সঞ্চিত হয় এবং পরিণামে চুনাপাথরে পরিবর্তিত হতে পারে।

কার্বনচক্রে অনুপ্রবেশ

যতক্ষণ বায়ু ও জলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের গড় পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, কার্বনচক্রের অনুকূল অবস্থা অব্যাহত থাকে। এর বৃদ্ধির প্রবণতা থাকলে একটা অবস্থা আসবে যখন কতকগুলি প্রাণী তাদের শ্বসনের পক্ষে অবস্থাটিকে দুঃসহ বোধ করবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড কমবার প্রবণতা থাকলে বহু বছর পরে এমন অবস্থা উপনীত হবে যখন উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষ করতে এবং প্রাণিজীবনের জন্য অক্সিজেন উৎপাদন করতে অসমর্থ হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, এই চক্রে সাম্য বজায় রাখা কত গুরুত্বপূর্ণ ! বর্তমান শতাব্দীতে জীবাশ্মঘটিত জ্বালানির অবিবেচক ব্যবহার, নির্বিচারে বন কাটা এবং কৃষি থেকে জমির ব্যবহারকে সিমেন্ট-কংক্রিটের রাস্তা ও বাড়িঘর নির্মাণে নিয়ে গিয়ে চাষযোগ্য অঞ্চল কমানো—এগুলির ফলে কার্বনচক্র বিঘ্নিত হয়েছে।

কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, দুর্ঘটনাজনিত আগুন, বিমানপোত এবং কিছুটা রান্নাঘর থেকেও আমরা বিশাল পরিমাণ ধোঁয়া বেরোতে দেখি। স্বাভাবিক অবস্থায় যতটা সামলানো যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর ফলে বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়। প্রায় একশো বছর আগে শিল্পবিপ্লবের সূচনা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপাদন বেড়ে চলেছে এবং তখন থেকে আবহমণ্ডলে এর গাঢ়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের বর্ধিত পরিমাণ সম্বন্ধে প্রধান উদ্বেগের কথা হল পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুর উষ্মতার উপরে এর সম্ভাব্য প্রভাব। আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য পৃথিবী থেকে বিকীর্ণ তাপকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতির ফলাফল একক ১৬-তে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

অনুশীলনী—৬

নীচে দেওয়া শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

কার্বনের ভাণ্ডার হল ....-এ বিদ্যমান এবং ....-এ দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। কার্বন ....-এর মাধ্যমে উৎপাদকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেসময়ে তারা ....কে উৎপন্ন খাদ্যের অঙ্গীভূত করে। ....-এর সময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড আকারে কার্বনকে আবহমণ্ডলে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ....ও.........................-এর মৃত্যু এবং মৃতদেহগুলির ....-এর দ্বারাও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে আবহমণ্ডলীয় ভাণ্ডারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৪.৪.৩ জলচক্র

জলের গুরুত্ব প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট। জল জীবনের সমার্থক। যে-কোনও জীবের দেহে জলই হল সবচেয়ে সাধারণ বস্তু। আমাদের পরিবেশেও বস্তুটির প্রাচুর্য সর্বাধিক। জীবমণ্ডলে (biosphere) আনুমানিক একশো পঞ্চাশ কোটি ঘন কিলোমিটার পরিমাণ জল কোনও-না-কোনও আকারে বর্তমান। জলের প্রধান ভাণ্ডার হল সমুদ্র, যা পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগকে আবৃত করে আছে। সমুদ্রজল লবণাক্ত। প্রধানত নদীতে এবং ভূপৃষ্ঠের নীচে শিলাগুলির ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টজল পাওয়া যায়।

জলচক্র চালিত হয় সূর্যের তাপশক্তি দিয়ে, যা জলের বাষ্পীভবন ঘটায়। পক্ষান্তরে, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার পরে অভিকর্ষ জলকে পৃথিবীতে টেনে নামিয়ে আনে। এখানে আমরা জলচক্রের সঙ্গে পূর্ববর্ণিত চক্র দুটির একটি প্রভেদের উল্লেখ করতে চাই। যেসব বল জলকে আবর্তিত করে, সেগুলির অধিকাংশে কিন্তু নাইট্রোজেন ও কার্বনচক্রগুলির মতো জীবের ভূমিকা নেই, বরং এগুলি হল বাষ্পীভবন, ঘনীভবন প্রভৃতির মতো স্বাভাবিক ভৌত পদ্ধতি।

এই এককটিতে জলচক্রকে চারটি মূল পদে ভাগ করা হয়েছে। আমরা আরও অগ্রসর হওয়ার আগে চিত্র ১৪.৮টি সতর্কভাবে দেখুন এবং তার পরে নাইট্রোজেন ও কার্বন চক্র পাঠের সময়ে যেমন করেছিলেন, তেমনি ভাবে প্রাসঙ্গিক বিবরণটি পড়ুন।

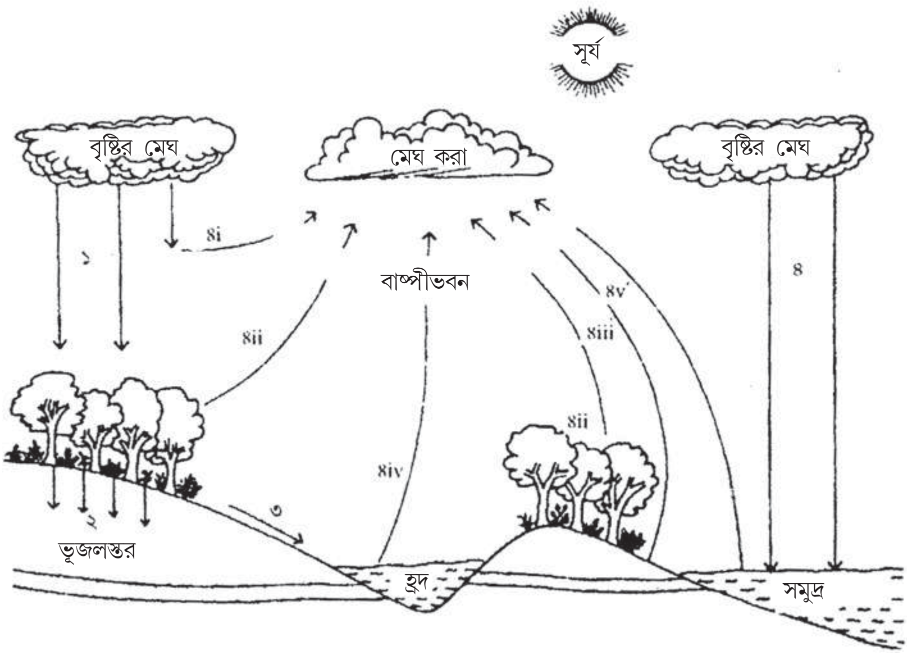

চিত্র ১৪.৮ : জলচক্র

(১) মানবজাতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও শিল্পসংক্রান্ত কাজকর্মে যা কিছু জল ব্যবহৃত হয়, তার সবটুকুই হল সাদা বা মিষ্ট জল, যার অধিকাংশ বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সমুদ্রজল থেকে পাওয়া যায়।

(২) বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পৌঁছালে কিছু জল সোজাসুজি মাটিতে পড়ে; কিছু পড়ে গাছপালার উপরে, বাড়ি, পথঘাট ইত্যাদির উপরে। মাটিতে যে জল পড়ে, তার একাংশ মাটির মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে মৃত্তিকা বা শিলার একটি অভেদ্য স্তরে পৌঁছায় এবং ভূগর্ভস্থ জল রূপে জমে। মাটিতে জলের নিম্নমুখী চলনের হার নির্ভর করে মৃত্তিকার প্রকৃতি, তার নতি, গাছপালার ধরন এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপরে। ভূতলের জল মানুষের দ্বারা গার্হস্থ্য, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়।

(৩) মাটির উপরে পড়া জলের কিছুটা নালা-নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত কিছু জল ছোট খানাখন্দ, হ্রদ প্রভৃতিতেও গিয়ে জমতে পারে।

(৪) যে বিভিন্ন উপায়ে জল নানা আকারে পৃথিবীতে পৌঁছায়, এ পর্যন্ত আমরা সেগুলিই আলোচনা করছিলাম। কীভাবে জল আবহমণ্ডলে ফিরে যায়, এবারে সেকথা বোঝা যাক।

১. বৃষ্টিজলের কিয়দংশ আদৌ মাটিতে পৌঁছায় না, কারণ তার আগেই তা বাষ্পীভূত হয়ে আবহমণ্ডলে ফিরে যায়।

২. উদ্ভিদগুলিও তাদের পাতার মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জলকে আবহমণ্ডলে আবার ছেড়ে দেয়।

৩. ভূপৃষ্ঠে ও গাছপালার উপরে পড়ে থাকা জল এবং নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের পৃষ্ঠস্তরের জল বাষ্পীভূত হয়ে আবহমণ্ডলে ফিরে যায়।

জলীয় বাষ্প আবহমণ্ডলে মেঘ হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে শেষ পর্যন্ত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং ঘনীভূত হয়—ঠিক যেমন ঘরের বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প বরফজলের গেলাসের বাইরে ঘনীভূত হয়ে পড়ে।

জলচক্রে অনুপ্রবেশ

আজকাল মানুষের মুখ্য চিন্তাগুলির অন্যতম হল জলের ব্যবস্থাপনা। নৈসর্গিক জলচক্র জলসম্পদের উপরে মানুষের কাজকর্মের ফলাফলের ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি। বহু বছর ধরে মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং তার গুণের অবনতি ঘটেছে। এটি বহু পরিমাণেই জলসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার, কৃষি ও শিল্পের জন্য জলের অধিকতর চাহিদার জন্যই ঘটেছে।

মানুষের ক্রিয়াকলাপের হানিকর ফলাফলের তালিকায় সর্বাগ্রগণ্য হল বনবিনাশ (deforestation) অর্থাৎ নির্বিচারে বন কাটা এবং পরিণামে গাছপালার আচ্ছাদনের অবলুপ্তি। কাগজের কাঁচামাল হিসাবে, নির্মাণকার্যে ও জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার তার জন্য দায়ী। বনবিনাশ শুধুমাত্র আবহমণ্ডলে আর্দ্রতাই কমায় না, অধিকন্তু একাদিক্রমে অন্যান্য অবাঞ্ছনীয় ফলাফলের দিকেও নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, গাছপালা মাটিকে একত্রে ধরে রাখতে সাহায্য করে, কিন্তু অনেক কমে গেলে উপরিপৃষ্ঠের মাটিকে তা আর যথাস্থানে ধরে রাখতে পারে না। এর পরিণামে বৃষ্টিপাতের সময়ে অথবা বায়ুর তাড়নায় উপরিপৃষ্ঠে উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে বা উড়ে গিয়ে কঠিনতর অনুর্বর শিলাগুলিকে উন্মোচিত করে দেয়। খুব বেশি জল কঠিন মাটি দিয়ে চুঁইয়ে নামে না এবং ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার আবার ঠিকমতো জলে ভরে ওঠে না। শিথিলভাবে আবদ্ধ মাটি তার পৃষ্ঠ দিয়ে প্রবহমান জলে বাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নদীবক্ষে ও বাঁধে অবক্ষেপিত হয় এবং সেগুলিকে অবরুদ্ধ করে।

মানুষের অন্য যেসব ক্রিয়াকলাপ জলচক্রকে বিঘ্নিত করে, সেগুলি হল, বৃহৎ শিল্পনগরীগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধান (sanitary facilities) ও আবর্জনা দূরীকরণ ব্যবস্থার অভাব। গার্হস্থ্য ও শিল্পজাত বর্জ্য দ্রব্যকে প্রায়ই নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কখনও কখনও তা জলজ জীবনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে।

বনবিনাশের (deforestation) প্রতিকার হল বনসৃজন (afforestation) অর্থাৎ নূতন বৃক্ষরোপণ। এর জন্য একথা জানার খুব গুরুত্ব আছে যে কোনও বিশেষ অবস্থার পক্ষে কী ধরনের গাছ সর্বাপেক্ষা উপযোগী হবে। এদিকে কোনও মনোযোগ না দিলে আমরা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি আরও বাড়াতে পারি। এই প্রসঙ্গে ইউক্যালিপটাস একটি দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষগুলির এটি অন্যতম। যেসব

জায়গায় জল সংরক্ষণের আবশ্যকতা ছিল, সেখানে মাটিকে বেঁধে রাখার এবং বাতাস প্রতিরোধের জন্য এই গাছটি লাগানো হয়েছিল। ইউক্যালিপটাসের নির্বাচন সর্বনাশা প্রমাণিত হয়েছে, কারণ মাটি থেকে উচ্চ হারে জল টেনে নেওয়ার এবং পরে সেই জল আবহমণ্ডলে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই উদ্ভিদটি কুখ্যাত। উদ্ভিদটি ভূ-জলস্তরকে শূন্য করে দেয় এবং এর তলায় অন্য সব উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। এজন্য বহু লোক একে 'বাস্তব্যবিদ্যার দানব' (ecological) এই আখ্যাও দিয়ে থাকেন। এই উদ্ভিদটি পাশাপাশি জমিতে চাষবাসও অসম্ভব করে তোলে।

অনুশীলনী—৭

শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

চলমান ....-এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে জল অবিরাম পুনর্বিতরিত হচ্ছে। এটি ....-এর দ্বারা চালিত হয় এবং বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাত এর অন্তর্ভুক্ত। জলের প্রধান চলন হল তার মুখ্য ভাণ্ডার .... থেকে .... পর্যন্ত যাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের আকারে .... ও ....-এ ফেরা।

১৪.৫ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে মিথস্ক্রিয়া

এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদটিতে আপনাদের এই ধারণাটি দেব যে সমগ্র পৃথিবী একটি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র। এ পর্যন্ত যা কিছু শিখেছেন, বৃহত্তর মাপকাঠিতে তা পৃথিবীর পক্ষেও প্রযোজ্য। কীভাবে, তা দেখা যাক।

এ পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন, জীবগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং তাদের পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে অন্তহীন। আমরা দেখতে পাই, সূর্য সকল শক্তির উৎস। সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সৌরশক্তি উদ্ভিদের দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্যে সঞ্চিত থাকে। এই শক্তিই পার্থিব জীবগুলিকে পালনপোষণ করে। যে জল চক্র মিষ্ট জলের সরবরাহকে সুনিশ্চিত করে এবং ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতা ও আর্দ্রতাকে অবিরাম নিয়ন্ত্রণ করে, সূর্যালোক তাকেও চালনা করে। স্থল বা জল যেখানের জীবনই হোক না কেন, সালোকসংশ্লেষের দ্বারা বন্দি হওয়া শক্তি খাদকদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে প্রাণিজীবনকে সম্ভবপর করে। আরও নিগূঢ় এক মিথস্ক্রিয়ায় সকল জীবেরই অণু পরিমাণে বিয়োজকদের কাছে পৌঁছায় এবং তারা শক্তির শেষাংশটুকু নিষ্কাশন করে নেয়। শুধু তাই নয়, নাইট্রোজেন, কার্বন প্রভৃতির মতো অপরিহার্য মৌলগুলিও মুক্ত হয়ে যায়। চলমান শক্তিপ্রবাহে প্রত্যেক অংশীদার তার অব্যবহৃত শক্তির ভাগকে তাপের আকারে বার করে দেয়। এই শক্তি ভৌতজগতে অর্থাৎ আবহমণ্ডলে ফিরে যায়। ভৌত ও জৈব জগতের মধ্যে পুষ্টিদ্রব্য

(nutrients) ও শক্তির বিষয়ে এভাবে একটি সাম্য থাকে। এই অবস্থাকে নৈসর্গিক সাম্যও (natural equilibrium) বলা হয়—বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি এবং পরিবেশীয় সুরক্ষার সমস্যাগুলির পর্যালোচনায় আমরা প্রায় এই শব্দটির সম্মুখীন হই।

অস্তিত্বরক্ষার এই মূল বিষয়গুলি আধুনিককালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে, কারণ অন্যথায় তিনি এমন কিছু বেছে নিতে পারেন যাতে এসব পদ্ধতির এবং পরিণামে এই গ্রহে প্রাণের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হবে।

১৪.৬ সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা পড়েছেন :

- ইকোলজি বা বাস্তব্যবিদ্যায় আমরা জীব ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার পর্যালোচনা করি—জীবকে যা কিছু প্রভাবিত করে, তা তার পরিবেশের অন্তর্গত।
- একই অঞ্চলের অধিবাসী এবং পরস্পর নানাভাবে নির্ভরশীল সমস্ত জীব এবং তাদের পরিবেশটিকে নিয়ে একটি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র গঠিত।
- প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজন কতকগুলি পুষ্টিদ্রব্য (nutrient), শক্তির একটি উৎস, উৎপাদক ও বিয়োজক জীব। অধিকাংশ বাস্তুতন্ত্রে খাদক জীবও থাকে।
- একটি বাস্তুতন্ত্রে সকল জীবকে একটি খাদ্যজালে (food web) যুক্ত করা যায়—কে কাকে খায়, এটি তার চিত্র। উৎপাদক জীবেরা যখন খাদ্য প্রস্তুত করে, শক্তি ও পুষ্টিদ্রব্য একত্রে জীবজগতে প্রবেশ করে। জীবজগতে প্রবিষ্ট প্রায় সকল শক্তিই সালোকসংশ্লেষের সময়ে সবুজ উদ্ভিদের দ্বারা বন্দি হওয়া সৌরশক্তি থেকে আসে। এই শক্তি উদ্ভিদ, খাদক ও বিয়োজকদের দ্বারা মুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হয়। মৃতদেহ এবং প্রাণীর বর্জ্য দ্রব্যগুলি বিয়োজকদের দ্বারা শক্তির উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়। তারা যে পুষ্টিদ্রব্যগুলিকে (nutrients) সকল আকারে মুক্ত করে দেয়, সেগুলিকে উদ্ভিদেরা ব্যবহার করতে পারে।
- বাস্তুতন্ত্র দিয়ে শক্তির প্রবাহ অবশ্যই একমুখী হওয়া হত্ত্বেও পুষ্টিদ্রব্যগুলি অনির্দিষ্ট কাল আবর্তিত হতে পারে।
- সমগ্র পৃথিবীটি একটি বাস্তুতন্ত্র, যাতে জীবনের অস্তিত্বের মূলনীতিগুলি তার অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্রের মতোই প্রযোজ্য।

১৪.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. সঠিক উক্তির ক্ষেত্রে প্রকোষ্ঠে টিক (✓) চিহ্ন দিন; ভুল উক্তির ক্ষেত্রে ক্রশ (×) চিহ্ন দিন।

(ক) বাস্তুতন্ত্রকে একটি স্বাধীন এককরূপে বিবেচনা করা হয় এবং সৌরশক্তি তার শক্তির একমাত্র বাহ্য উৎস। ☐

(খ) যতক্ষণ খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিদ থাকে, অন্য কোনও জীব ছাড়াই একটি বাস্তুতন্ত্রে অস্তিত্ব অনির্দিষ্ট কাল চলতে পারে। ☐

(গ) শক্তি চক্রপথে চলে, কিন্তু পুষ্টিদ্রব্য কেবল একমুখে চলে। ☐

(ঘ) মাংসাশী জীব কোনও প্রাণীকে ভক্ষণ করলে অধিকতর পরিমাণে শক্তি বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যায়। ☐

(ঙ) কৃষির কাজকর্ম দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে নৈসর্গিক সাম্যকে বিঘ্নিত করে। ☐

২. নীচে শূন্যস্থানে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

(ক) কোন্ কোন্ বিষয় পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব করেছিল?

(খ) যে পুষ্টিদ্রব্যগুলি জীবের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয়, সেগুলির তালিকা দিন।

৩. শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(ক) বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবেশবিন্দু হল ....

(খ) খাদ্যশৃঙ্খলে পৌষ্টিক স্তরের সংখ্যা মাত্র বিরল ক্ষেত্রেই চার বা পাঁচের অধিক হয়, কারণ প্রত্যেক স্তরে .... এর কিয়দংশ হারিয়ে যায় এবং পরিণামে তার অত্যল্প অংশই শেষ চতুর্থ বা পঞ্চম স্তরের জন্য অবশিষ্ট থাকে।

(গ) .... হল এমন জীবের উদাহরণ, যারা একাধিক পৌষ্টিক স্তরে থাকে।

(ঘ) জীবগুলির একটি গোষ্ঠী এবং যে পরিবেশীয় বিষয়গুলির সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়া—উভয়কে একত্রে নিয়ে একটি .... গঠিত।

(ঙ) বাস্তুতন্ত্রে .... ঘটিত সম্পর্ক এবং ....-এর প্রবাহ সম্বন্ধে খাদ্যজাল আমাদের অবহিত করে।

১৪.৮ উত্তরাবলী

অনুশীলনী

১. (ক) বাস্তব্যবিদ্যা, পরিবেশ

(খ) পরিবেশ, জীব

(গ) সজীব, অজীব

২. বাম থেকে ডাইনে :

১. Crane—মাংসাশী ২. Wheat—উৎপাদক ৩. Jackal—মাংসাশী ৪. Giraffe—নিরামিষাশী ৫. Grasshopper—নিরামিষাশী ৬. Crow—সর্বভুক ৭. Deer—নিরামিষাশী ৮. Earthworm—বিয়োজক ৯. Man—নিরামিষাশী বা সর্বভুক

উপর থেকে নীচে :

২. Whale—সর্বভুক ৪. Grass—উৎপাদক ১০. Rat—সর্বভুক ১১. Fungus—বিয়োজক ১২. Hen—সর্বভুক ১৩. Spider—মাংসাশী ১৪. Pea—উৎপাদক ১৫. Parrot—নিরামিষাশী ১৬. Lion—মাংসাশী

৩. (ক) পতঙ্গ (খ) ইঁদুর (গ) গম (ঘ) সাপ (ঙ) ইঁদুর

৪.

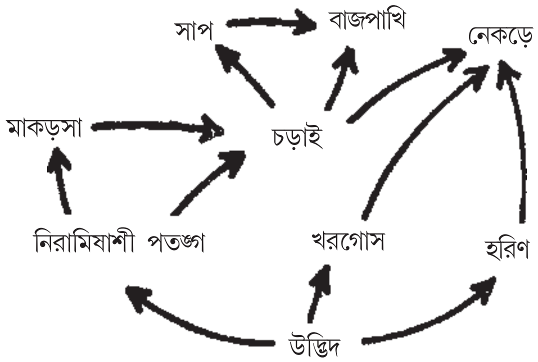

৫. গ্যাস, নাইট্রেট, নাইট্রোজেন-বন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া, মটর/শিম, নাইট্রোজেনমোচী, মৃতদেহ, বিয়োজকগুলি

৬. আবহমণ্ডল, সমুদ্র, সালোকসংশ্লেষ, সৌরশক্তি, শ্বসন, উদ্ভিদ, প্রাণী, শটন

৭. জলচক্র, সৌরশক্তি, সমুদ্র, আবহমণ্ডল, স্থল, সমুদ্র

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. (ক) ✓ (খ) × (গ) × (ঘ) ✓ (ঙ) ✓

২. (ক) সূর্যালোক, বায়ু, জল, মৃত্তিকা, উপযুক্ত উষ্ণতা এবং বায়ুচাপ

(খ) কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন

৩. (ক) উৎপাদক (খ) শক্তি (গ) মানুষ (ঘ) বাস্তুতন্ত্র (ঙ) আহার, শক্তি

একক ১৫ □ পরিবেশের উপাদান

গঠন

১৫.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১৫.২ সমুদ্র

১৫.২.১ সমুদ্রের কয়েকটি ভৌত বৈশিষ্ট্য

১৫.২.২ সমুদ্রে প্রাণের বসতি

১৫.২.৩ সমুদ্র ও উপকূলে বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

১৫.৩ বায়ুমণ্ডল

১৫.৩.১ বায়ুমণ্ডলের কয়েকটি ভৌত বৈশিষ্ট্য

১৫.৩.২ বায়ুমণ্ডলে প্রাণ

১৫.৩.৩ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

১৫.৪ অরণ্য

১৫.৪.১ অরণ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১৫.৪.২ অরণ্যের প্রাণরাশি

১৫.৪.৩ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

১৫.৫ সারাংশ

১৫.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১৫.৭ উত্তরমালা

১৫.১ প্রস্তাবনা

একক ১৪-এ আপনারা পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি মূল বিষয় পড়েছেন। আপনারা দেখেছেন, জীবগুলি তাদের পরিবেশসহ একটি ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। এই এককটিতে আমরা পৃথিবীর পরিবেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থাৎ সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ও অরণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই এক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। এদের পরিবেশীয় অবস্থাগুলি

অত্যন্ত পৃথক। সেই অনুযায়ী এই বাস্তুতন্ত্রগুলিতে বিদ্যমান জীবগুলিও তুলনাবিহীন। বহু বছর ধরে মানুষের কয়েকটি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এই বাস্তুতন্ত্রগুলি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে, সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের পরে আপনাদের পারা উচিত :

- পৃথিবীর পরিবেশের তিনটি উপাদান অর্থাৎ সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ও অরণ্যের বর্ণনা করা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা করা,
- সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ও অরণ্য-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি লক্ষণীয় বাস্তুতন্ত্রীয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা,
- আমাদের কৃষি, শিল্প ও পরিবহনের মতো কাজকর্মের দ্বারা উল্লিখিত পরিবেশীয় উপাদানগুলির কী ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা শনাক্ত ও তালিকাবদ্ধ করা।

১৫.২ সমুদ্র

শীতল সমুদ্রবায়ু উপভোগ করতে, স্নান করতে ও সাঁতার কাটতে সারা বিশ্বে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক সমুদ্রসৈকতে যান। বাস্তব্যবিদ্যার (ecology) দিক দিয়ে বলতে গেলে সমুদ্রগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র (eco-system)। বিশ্বের প্রধান সমুদ্রগুলি হল অতলান্তিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হলেও এগুলির পরস্পর যোগাযোগ আছে এবং কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার আগে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে এই এককটিতে আমরা সমুদ্র ও মহাসমুদ্র শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহার করব।

১৫.২.১ সমুদ্রের কয়েকটি ভৌত বৈশিষ্ট্য

সমুদ্রগুলি এত বিশাল যে তারা কল্পনাকে স্তম্ভিত করে দেয়। তারা ভূপৃষ্ঠের শতকরা সত্তর ভাগেরও অধিক আবৃত করে রাখে। সমুদ্রের গভীরতায় পার্থক্য আছে—উপকূলের কাছে অগভীর, ক্রমে মাঝখানে গভীর। সমুদ্রের জলের তলায় পরিখা, উপত্যকা এবং যাকে পাহাড় বলা যায় তা-ও আছে! গভীরতম অংশটি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং এর গভীরতা বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার চেয়ে বেশি।

সমুদ্রের জল কখনও স্থির থাকে না। বাতাস জলের পৃষ্ঠে ঘর্ষণজনিত বল প্রয়োগ করে এবং ঢেউ তোলে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের জলকে গতিশীল রাখে। তটবর্তী অঞ্চলে লক্ষণীয় জোয়ার-ভাঁটা হল সমুদ্রজলের অন্য এক ধরনের গতি। সমুদ্রের জলতল দিনে দু'বার ওঠে এবং নামে। জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টির মুখ্য কারণ হল চন্দ্র-সূর্যের মহাকর্ষীয় টান। উপকূলীয় জলরাশি একটি উচ্চতা পর্যন্ত ওঠে, যাকে বলে জোয়ার—এসময়ে

সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে থাকে; আবার সূর্য ও চন্দ্র বিপরীত পাশে থাকলে ভাঁটা হয়। সমুদ্রস্রোত জলের আরও এক ধরনের গতি। স্রোত কয়েকভাবে উদ্ভূত হয় : সমুদ্রজলের ঘনত্বের পরিবর্তনে, উষ্মতার পার্থক্যে এবং পৃথিবীর আবর্তন ও মুখ্য বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে। এই স্রোতগুলি কতকটা ভূপৃষ্ঠের নদীগুলির মতো সমুদ্রজলকে বহু দূরে পরিবাহিত করে।

সমুদ্রজল লবণাক্ত। জলের প্রতি হাজার ভাগে লবণের ওজনের পরিমাণ প্রায় পঁয়ত্রিশ ভাগ। সাধারণ লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড সমুদ্রজলের প্রধান লবণজাতীয় উপাদান। ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের লবণও বর্তমান। সমুদ্রজলে এই প্রভূত পরিমাণ লবণের কারণ হল স্থল ধৌত করে নদী দিয়ে বাহিত হয়ে আসা অল্প অল্প লবণের ক্রমাগত জমে ওঠা।

সমুদ্রজলের সর্বনিম্ন উষ্মতা মেরুর কাছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ নীচে এবং সর্বোচ্চ উষ্মতা গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রায় আটাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সামুদ্রিক পরিবেশের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল চাপ। সমুদ্র বা স্থলের পৃষ্ঠে আবহমণ্ডল প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজনের মতো চাপ দেয়—একে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একক (Atmosphere) ধরা হয়। জলের প্রতি দশ মিটার গভীরতায় জলের ওজনের জন্য এই চাপ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের হারে বৃদ্ধি পায়। কাজেই সমুদ্রের তিন হাজার মিটার গভীরে থাকলে সেখানে চাপ হবে ভূপৃষ্ঠের তুলনায় তিনশো গুণ। অত্যন্ত বিশেষ ধরনের উপকরণ ছাড়া এই গভীরতায় মানুষের বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

১৫.২.২ সমুদ্রে প্রাণের বসতি

সমুদ্রগুলি বৃহত্তম ও নিবিড়তম বসতিপূর্ণ বাস্তুতন্ত্ররূপে পরিচিত। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যায় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। এক ঘনমিটার সমুদ্রজলে প্রায় দু'লক্ষ জীব থাকতে পারে। জীবগুলি সমুদ্রের গভীরতার সর্বত্রই অল্পবিস্তর থাকে, কিন্তু মহাদেশ ও দ্বীপগুলির সীমানা ঘিরেই তাদের ঘনত্ব বেশি।

যে প্রধান উপাদানগুলি সমুদ্রে জীবনের পরিমাণ ও বৈচিত্র্যকে সীমিত রাখে, সেগুলি হল শক্তি ও পুষ্টিদ্রব্য (nutrients)। আপনারা ইতিমধ্যে পড়েছেন, সকল প্রকার প্রাণীর জন্যই সূর্যালোক থেকে শক্তি আসে—উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অন্য জীবের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে। সমুদ্রজলে আলোকের তীব্রতা গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হ্রাস পায়। এমনকি সবচেয়ে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ জলেও দুশো মিটার গভীরে আলোক প্রায় মেলেই না এবং সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) অব্যাহত রাখা যায় না। সুতরাং জলের নীচে সেসব অঞ্চলেই উদ্ভিদ দেখা যায় সেখানে আলোক মেলে। আপনারা অবশ্যই বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, উদ্ভিদেরা কীভাবে নিজেদের আলোকিত অঞ্চলে রাখে। তারা বায়ুস্থলী অথবা কোষমধ্যস্থ তৈলবিন্দুর মতো কয়েকটি প্লবতাকৌশলের (floating device) বিকাশ ঘটিয়েছে, যেগুলি তাদের জলের ঊর্ধ্বতর স্তরে ভাসমান থাকতে সাহায্য করে। এই উদ্ভিদগুলি নানাপ্রকার—কতকগুলি অতিক্ষুদ্র ও আণুবীক্ষণিক, মুক্ত অবস্থায় ভাসমান (চিত্র ১৫.১ দেখুন) এবং জলের সঙ্গে ভেসে বেড়ায়; কিন্তু অন্যগুলি তুলনায় বৃহত্তর এবং জলমধ্যে কোনও বস্তুর গাত্রে সংলগ্ন থাকে। তাদের বিস্তারের একটি নিয়ামক শর্ত

হল আলোকের প্রকৃতি। আমরা এখনই দেখেছি, জলের মাত্র কোনও একটি গভীরতা পর্যন্ত সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে। সূর্যালোকের বর্ণালীর লোহিত রশ্মি জলের উর্ধ্বস্তরে এবং সবুজ তার পরে শোষিত হয়ে যায়; কিন্তু নীল রশ্মি জল ভেদ করে সর্বাধিক গভীরে যায়। স্বভাবত এগুলির পূরক (complementary) বর্ণের শৈবালগুলি যথাক্রমে জলের ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় বাস করে। সবুজ লোহিতের পূরক, তাই জলের উর্ধ্বতর স্তরগুলিতে সবুজ শৈবালের সংখ্যাধিক্য থাকে; অনুরূপভাবে বাদামী বর্ণের শৈবাল আর একটু গভীরে থাকে এবং যেসব অঞ্চলে নীল আলোক পৌঁছায় সেখানে লোহিত শৈবালের প্রাধান্য।

প্রাণিজীবনের অবস্থা কী? প্রাণীদেরও স্তরবিন্যাস দেখা যায়, অর্থাৎ, তারাও স্তরে স্তরে বিস্তৃত (চিত্র ১৫.১ দেখুন)। উর্ধ্বতর স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী (Zooplankton বা প্রাণিকণা) উদ্ভিদকণার (phytoplankton) সঙ্গে সহাবস্থান করে এবং তাদের থেকে শক্তি আহরণ করে। এর অল্প নীচে প্রাণীজীবনের জন্য শক্তি পাওয়া যায় জীবের নিমজ্জিত মৃতদেহ ও বর্জ্য পদার্থ (wastes) থেকে, অথবা সাঁতরে নামা জীবিত প্রাণী থেকে।

উপর থেকে ভেসে নামা মৃতদেহগুলি অতি ধীরে পড়তে থাকে। যথা, তিন হাজার মিটার গভীরতায় পৌঁছাতে একটি ছোট চিংড়ির এক সপ্তাহ লাগতে পারে। বড়গুলি ছাড়া অন্যান্য জৈব পদার্থের অবতরণের হার এত মন্থর যে গভীর জলে বা সমুদ্রতলে পৌঁছানোর পূর্বেই সেগুলি ভুক্ত, বিনষ্ট বা দ্রবীভূত হয়ে যায়। সুতরাং সমুদ্রের যত গভীরে নামা যায়, খাদ্য বিরল হয়ে আসে। দু'শো মিটার বা তার কাছাকাছি গভীরতার পরে আলোক পৌঁছাতে পারে না এবং সেখানে উদ্ভিদ জন্মায় না। সুতরাং খাদ্য পাওয়ার জন্য উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের ভালো সাঁতারু হতে হয়। তাদের অনেকে জলের উর্ধ্বতর স্তরগুলিতে এসে খাদ্য গ্রহণ করে ফিরে যায়। আরও নীচে অথবা ছশো মিটারের তলায় নামলে কেবল সূর্যালোকই অনুপস্থিত এমন নয়, অধিকন্তু উষ্মতাও হ্রাস পায় এবং চাপও বাড়ে। এখানেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে। মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর দু'হাজারেরও বেশি প্রজাতি এই গভীরতায় বাস করে। এসব কঠোর অবস্থায় এই জীবগুলির কীভাবে অভিযোজন ঘটেছে, তা দেখা যাক।

এই সম্পূর্ণ অন্ধকার অঞ্চলে বহু জীব তাদের নিজ আলোক উৎপাদন করে; এই ব্যাপারটি জৈবপ্রভা (bioluminescenice) বলে পরিচিত। এটি তাদের শিকার ধরতে এবং বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করতে সাহায্য করে। কোনও কোনও স্পঞ্জ, জেলিফিশ, কম্ব জেলি, শামুক, কৃমি, ব্রিটল্ স্টার, স্কুইড, গভীর সমুদ্রের ছোট চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি আলোক নিঃসরণ করে। এই আলোক-নিঃসারক জীবগুলি দেহে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়াকে আশ্রয় দেয়, যেগুলি এই আলোকের উৎস। জীবটির দেহের বিশেষ বিশেষ থলিতে এসব ব্যাকটেরিয়ার উপনিবেশ থাকে। যথা, মাছের ক্ষেত্রে মাথার পাশে, লেজের প্রান্তে অথবা দেহের পাশে এগুলি অবস্থিত। আলোকের প্রয়োজন না থাকলে মাছ অনচ্ছ (opaque) পর্দা উঠিয়ে অথবা আলোকপ্রদায়ী ব্যাকটেরিয়ার দিকে রক্তসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে আলোকের নিঃসরণ বন্ধ রাখে। এসব ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন আলোক সাধারণত নীল, হরিৎ বা পীতবর্ণ।

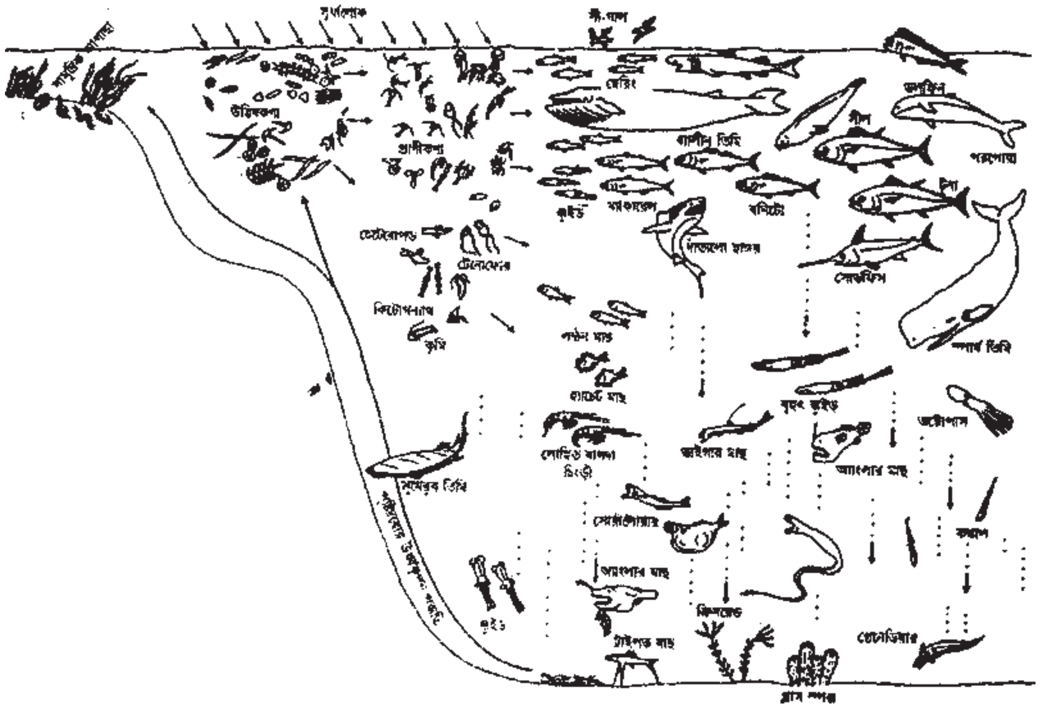

চিত্র ১৫.১ : সমুদ্রে জীবনধারা। খাদ্য নামে যে মূল জৈব পদার্থ সমুদ্রে জীবকে গঠন করে ও ইন্ধন জোগায়, তার অধিকাংশই সমুদ্রজলের আলোকিত পৃষ্ঠস্তরগুলির মধ্যে উদ্ভিদকণা বা ফাইটোপ্লাংক্টনের (phyto = উদ্ভিদ, plankton = ভ্রাম্যমাণ) দ্বারা সংশ্লেষিত হয়। এই আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদকোষগুলি উদ্ভিদভোজী প্রাণিকণা বা জুওপ্ল্যাংকটন (zoo = প্রাণী, plankton = ভ্রাম্যমাণ) এবং কিছু কিছু মাছের দ্বারা ভুক্ত হয় এবং অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী আবার সেগুলিকে আহার করে। জলের ঊর্ধ্বতর স্তরের জীবগুলির মৃতদেহ ও বর্জ্য পদার্থের ধারা—যা বিন্দু এবং হ্রস্ব নিম্নমুখী তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে—সমুদ্রের গভীরতার বিচিত্র অধিবাসীদের খাদ্যের মুখ্য উৎস হিসাবে কাজ করে। অগভীর অঞ্চলে খাদ্য পাওয়া যায় স্থলের নিকাশী জল থেকে এবং বাড়ন্ত ও আবদ্ধ বড় উদ্ভিদগুলি থেকে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপকূলীয় ঊর্ধ্বকূপন (upwelling) পদ্ধতিটি (বাঁদিকে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো) সমুদ্রতলের নিকটে ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি বিয়োজক (decomposer) জীবগুলির দ্বারা উৎপন্ন জৈব পুষ্টিদ্রব্য দিয়ে পৃষ্ঠস্তরের জলকে আবার উর্বর করে তোলে। এই পদ্ধতি পৃষ্ঠস্তরের জলকে ক্রমাগত পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ করে এবং এর ফলে ঊর্ধ্বতর স্তরগুলিতে উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণার অস্তিত্ব রক্ষিত হয়। (জীবগুলি এবং গভীরতাগুলি একই মানে আঁকা হয়নি।)

আলোকের অপ্রতুলতা অথবা অভাবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অভিযোজন (adaptation) ছাড়াও কতকগুলি জীব অধিকতর গভীরতায় উচ্চ চাপকে প্রতিহত করার জন্য কিছু পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রাণীদের মতো ক্যালসিয়াম-প্রধান অস্থি ও খোলক এত উচ্চ চাপে ভেঙে পড়তে পারে। তাই এসব গভীরজলের জীবের কঙ্কাল উচ্চচাপসহ সিলিকা দিয়ে নির্মিত। তিমির কর্ণাস্থি, স্কুইডের চোয়াল এবং হাঙরের দাঁতে সিলিকা থাকায় সেগুলি বলিষ্ঠতর।

এই পরিবেশে যে-কোনও রকমের সুরক্ষার অথবা শিকারী প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার অভাব থাকায় জীবগুলি নানা দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্য এবং আত্মরক্ষা তথা শিকার ধরার ব্যবস্থা অর্জন করেছে।

এগুলির মধ্যে আছে লক্ষণীয়ভাবে ধারারেখ (streamlined) দেহ—যা তাদের পলায়ন ও পশ্চাদ্ধাবন উভয়ের জন্যই দ্রুত চলাফেরায় সমর্থ করে, ব্যতিক্রমী বর্ণধারণ এবং ঘ্রাণ ও শ্রবণের সুবিকশিত শক্তি।

পুষ্টিদ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা

জলের উচ্চতর স্তরগুলিতে পুষ্টিদ্রব্যগুলি অবিরত উদ্ভিদকণাগুলির (ফাইটোপ্ল্যাংক্টন) দ্বারা গৃহীত হয়—উদ্ভিদকণাগুলি সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যের উৎপাদক। অতঃপর এগুলি থেকে পুষ্টিদ্রব্য উদ্ভিদভোজী এবং মাংসাশী জীবগুলির দেহে চলে যায়। শেষোক্ত জীবগুলির মৃত্যু হলে তাদের দেহাবশেষকে হয় অন্য কোনও প্রাণী খেয়ে ফেলে, না-হয় বিয়োজক জীবেরা তাদের শটন (decay) ঘটায়। কিছু শটনজাত পদার্থ নিমজ্জিত হয়ে সমুদ্রতলে পৌঁছায়। এর অর্থ হল, সমুদ্রজলের উচ্চতর স্তরগুলিতে উৎপাদকের দ্বারা গৃহীত পুষ্টিদ্রব্য অবিরাম নীচের স্তরগুলিতে নেমে আসে। জানেন কি, জলের ঊর্ধ্বস্তরে পুষ্টিদ্রব্য পুনরায় সঞ্চিত না হলে কী ঘটবে? কোনও উদ্ভিদকণা থাকবে না, সালোকসংশ্লেষ ঘটবে না, প্রাণিজীবন অব্যাহত রাখার জন্য কোনও খাদ্য উৎপন্ন হবে না। ফলে সকল জীবেরই মৃত্যু ঘটবে। বস্তুত প্রকৃতিতে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় না। দেখা যাক, জলের ঊর্ধ্বস্তরে পুষ্টিদ্রব্যের অবিরাম সরবরাহের নিশ্চয়তা কীভাবে ঘটে। দুটি উপায় আছে : (ক) নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয় বলে তারা স্থল থেকে প্রচুর আবর্জনা ও পুষ্টিদ্রব্য জলে নিয়ে আসে। (খ) ঊর্ধ্বকূপন (upwelling) প্রক্রিয়ায় নিম্নস্তরের পুষ্টিসমৃদ্ধ জল সমুদ্রপৃষ্ঠে চলে আসে। বস্তুত যা হয় তা হল, বাতাসের ধাক্কায় সমুদ্রপৃষ্ঠের জল তটভূমিতে এসে পড়ে এবং নীচে থেকে জল এবারে সমুদ্রপৃষ্ঠে আসে। শেষোক্ত জল শীতল এবং পুষ্টিদ্রব্যে সমৃদ্ধ। যেসব অঞ্চলে ঊর্ধ্বকূপন ঘটে, সেগুলি উৎপাদনের অত্যন্ত সহায়ক। সেজন্য এমন সব অঞ্চলেই বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

জানেন কি, সমুদ্রজল কোথাও নীল এবং কোথাও সবুজ দেখায় কেন? স্বচ্ছ নীল জলে সাধারণত পুষ্টিদ্রব্য কম, ফলে সেখানে প্ল্যাংকটনের গাঢ়তাও অপেক্ষাকৃত অল্প। পুষ্টিসমৃদ্ধ জল এক বিশাল প্ল্যাংকটন সম্প্রদায়ের পোষকতা করে এবং সবুজাভ ও অপেক্ষাকৃত ঘোলাটে হয়ে থাকে, কারণ জলে অজস্র ক্ষুদ্র জীবের আণুবীক্ষণিক দেহের দ্বারা সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয়ে যায়।

১৫.২.৩ সমুদ্র ও উপকূলে বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

ভারতসহ সারা বিশ্বের তটবর্তী ও সামুদ্রিক অঞ্চলগুলির বিপর্যস্ত কারণ বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে বাস করে এবং সামুদ্রিক খাদ্যের ষাট শতাংশ তটের নিকটবর্তী এলাকা থেকে আহৃত হয়। পয়ঃপ্রণালীর জল, আবর্জনা এবং শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থের অধিকাংশ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকেই নানাপ্রকার পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু চিমনির ধোঁয়া কোথায় যাবে, অথবা নানা রকমের ধুয়ে-আসা রাসায়নিক পদার্থ তাদের অধিকাংশই বিষাক্ত—কোথায় প্রবাহিত হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করা হয়নি। কাজেই বিপুল পরিমাণে শিল্পজাত বর্জ্যপদার্থকে সমুদ্রে

গিয়ে পড়তে দেওয়া হয়েছে। আগেকার যুগে একথাও ভাবা হত, সমুদ্র এত বিশাল যে তার মধ্যে কোনও কিছু নিক্ষেপেই তার উপরে প্রভাব পড়ে না। এখন অবশ্য ভারতেও এমন ঘটেছে যে একটি সার কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত বস্তুর জন্য পশ্চিম তটবর্তী আরব সাগরে বিশাল পরিমাণে মৃত মাছ ভাসতে দেখা গেছে। এরকম ঘটনা বিরল নয় এবং শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থকে সমুদ্রে যেতে দেওয়ার আগে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলি অপসারণের জন্য অবশ্যই তাকে শোধন করতে হবে। পয়ঃপ্রণালীর জলের জন্যও একই কাজ করা উচিত কারণ তাতেও অনিষ্টকর রাসায়নিক পদার্থ ও ব্যাকটেরিয়া সমুদ্রজলে বাহিত হয়।

সমুদ্রে গিয়ে পড়া নদীগুলি পাহাড় ও সমতল থেকে বালি নিয়ে আসে, কাজেই উপকূলের কাছে প্রচুর পলি জমে। নদীগুলি সমুদ্রজলে কৃষিক্ষেত্র থেকে ধুয়ে আসা জলও আনে, আজকাল যার অর্থ হল কিছু পরিমাণে সার ও কীটনাশক পদার্থ।

সম্প্রতি একটি নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটি হল নিউক্লিয়ার শিল্প ও নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র থেকে আসা রাসায়নিক পদার্থ। এই আবর্জনায় তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান এবং তা সমুদ্রজলের জীবগুলিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করে। বিশেষত বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এই আবর্জনা বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়; এরা এই আবর্জনাকে দরিদ্র দেশগুলির তটবর্তী এলাকায় স্তূপীকৃত করার উপায় খুঁজে নিয়েছে।

বেশ কয়েকবার শোনা গেছে যে জাহাজগুলি, বিশেষত তৈলবাহী ট্যাংকারগুলি তাদের যাত্রাপথে তেলের চিহ্ন রেখে যায়। কাজেই সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের বিশাল বিশাল এলাকা তেলের একটি পাতলা স্তরে আবৃত হয় এবং জীবগুলিকে অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করে। ভারতীয় উপকূলে এ বিষয়ে অবস্থাটি আমরা নীচে সারণী ১৫.১-এ উল্লেখ করছি।

সারণী ১৫.১ : ভারতে সামুদ্রিক দূষণ

ক্রমিক সংখ্যা	অঞ্চল	দূষণের ধরন
১.	কচ্ছ উপসাগর এবং গুজরাটের উপকূল	উপকূলের ক্ষয়ের জন্য স্বাভাবিক অবক্ষেপণ। বায়ুবাহিত বালুকার অবক্ষেপণ। লবণ তৈরির শিল্প থেকে দূষণ। জ্বালানি ও পশুখাদ্যের জন্য উপকূলের উদ্ভিদের বিনাশ।
২.	পশ্চিম উপকূল (মুম্বই থেকে কেরল)	তৈলকূল খনন এবং ট্যাংকার থেকে তেল ছড়িয়ে পড়া কলকারখানা থেকে দূষণ। উচ্চ স্থলভাগ থেকে বয়ে আসা জল। সালভিনিয়ার মতো আগাছার আক্রমণ, যেটি কেরলে প্রায়ই দেখা যায়। গরানজাতীয় গাছের বিনাশ, জীবাশ্মঘটিত জ্বালানির ব্যবহার এবং নৌচালন পথকে গভীর করার জন্য মাটিকাটা।

৩.	মান্নার উপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বরাবর পক্ উপসাগর	শিল্পে ব্যবহারের জন্য খাত থেকে প্রবাল উত্তোলন।
৪.	লাক্ষাদ্বীপ	উপহ্রদগুলিতে অত্যধিক পলি পড়া। উপকূল বরাবর নির্মাণকার্য। মিনিকয়ে ও অন্যত্র অরণ্যনাশ। প্রবালপুঞ্জের উপরে শিকারী জীবের বৃদ্ধি।
৫.	হুগলি নদীর মোহানা	কলকাতার চারপাশে একশো পঞ্চাশটির বেশি কলকারখানা থেকে অশোধিত শিল্পজাত আবর্জনা অবিরত নদীতে পড়ছে। এর মধ্যে আছে সাতাশিটি চটকল, বারোটি বস্ত্রকল, সাতটি চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান, পাঁচটি কাগজ ও কাগজমণ্ডের কারখানা এবং চারটি মদচোলাই কারখানা।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সামুদ্রিক জীবদের জন্য সমুদ্রগুলি মূল্যবান বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) এবং বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোককে এগুলি খাদ্য ও জীবিকা যোগায়। সামুদ্রিক উদ্ভিদকুল (flora) থেকে ঔষধেরও বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। সুতরাং স্বভাবতই সামুদ্রিক জীবের সুরক্ষার জন্য এবং সমুদ্রে দূষণের হ্রাসের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। সম্প্রতি সমুদ্রগর্ভে খনিজের বৃহৎ গোলকসদৃশ গাঢ় পিণ্ডও পাওয়া গেছে, যেগুলিকে অর্বুদ বা নোডিউল (nodule) বলে। কিছু নোডিউল নিকেল ও ক্রোমিয়ামের মতো অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজে সমৃদ্ধ। অবশ্য এত বিরাট গভীরতায় এই নোডিউলগুলির জন্য খননকার্যে (mining) উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন। ভারত ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে।

অনুশীলনী—১

(ক) .... হল পৃথিবীর বৃহত্তম ও নিবিড়তম বসতিপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র।

(খ) সমুদ্রে সাধারণত দৃষ্ট জলের গতিগুলি হল .... এবং ....।

(গ) সমুদ্রে জীবনের পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের প্রধান নিয়ামক উপাদানগুলি হল .... এবং ....।

(ঘ) .... প্রক্রিয়া গভীর জল থেকে খনিজ ও অত্যাবশ্যক পদার্থগুলিকে সমুদ্রপৃষ্ঠে নিয়ে আসে।

(ঙ) যে সমুদ্রজল পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং বহু প্রকার প্ল্যাংক্টনের পোষকতা করে, তাকে সাধারণত .... দেখায়।

(জোয়ার-ভাঁটা, শক্তি, ঢেউ, সবুজাভ, পুষ্টিদ্রব্য, সমুদ্র, স্রোত, উর্ধ্বকূপন)

১৫.৩ বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল বা আবহমণ্ডল হল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গ্যাসগুলির একটি আচ্ছাদন, যা পৃথিবী গ্রহকে আবৃত রাখে। এটি আমাদের গ্রহকে অনুপম এবং প্রাণের বিকাশকে সম্ভবপর করেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল না থাকলে আমরা শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন পেতাম না এবং উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড পেত না। দিবসে সূর্যের রশ্মি আমাদের গ্রহকে ঝলসে দিত এবং রাতে উষ্ণতা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নেমে যেত। এমন এক পরিস্থিতিতে কোনও জীবই বেঁচে থাকত না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা আপনারা ইতিপূর্বে পড়েছেন। এবারে দেখা যাক, বায়ুমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

১৫.৩.১ বায়ুমণ্ডলের কয়েকটি ভৌত বৈশিষ্ট্য

(ক) বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ। আয়তন অনুসারে বায়ুতে রয়েছে ৭৮.০৮ শতাংশ নাইট্রোজেন এবং ২১ শতাংশ অক্সিজেন। মাত্র ০.০৩ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অল্প অল্প পরিমাণে অন্য কয়েকটি গ্যাস আছে। ওজোনের একটি পাতলা স্তরের উপস্থিতি পৃথিবীতে প্রাণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র, হ্রদ, নদী প্রভৃতি থেকে বাষ্পীভবনের ফলে যে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয়, তা-ও যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়। আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপাদানস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসগুলির কয়েকটির সম্বন্ধে এখন বিশদ আলোচনা করা যাক।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান অক্সিজেনকে প্রাণবায়ুও বলা হয়। অক্সিজেন বিনা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সম্ভব নয়। মানুষ খাদ্য ও জল ছাড়া কিছুকাল বাঁচতে পারে, কিন্তু অক্সিজেন বিনা কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়। বায়ুতে কেবল অক্সিজেনই দহন বা জ্বলন সম্ভবপর করে। জ্বালানির দহনে উৎপন্ন তাপ খাদ্যরন্ধনে, যানচালনায়, শিল্পে এবং নানা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা শ্বাসক্রিয়ায় যে বায়ু গ্রহণ করি, তার আয়তনের বেশিরভাগই নাইট্রোজেন। আমরা দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ অক্সিজেনে শ্বাস নিতে পারি না। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিমণ্ডলে কখনও আগুন লাগালে তাকে নেভানো কঠিন হবে। ভাগ্যের কথা, বায়ুতে নাইট্রোজেনের উপস্থিতির ফলে এরকম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে না।

বায়ুমণ্ডলের অন্য একটি অত্যন্ত বিনিশ্চায়ক উপাদান হল কার্বন ডাই-অক্সাইড। আপনারা একক ১৪-তে ইতিমধ্যেই পড়েছেন যে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে এই গ্যাসটিকে ব্যবহার করে। এভাবে উৎপন্ন খাদ্য অন্যান্য জীবের জন্য শক্তির উৎস রূপে কাজ করে।

এছাড়াও বায়ুমণ্ডলে রয়েছে আর্গন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন প্রভৃতি অন্যান্য গ্যাস। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে এদের বিক্রিয়া ঘটে না, তাই এগুলিকে নিস্ক্রিয় গ্যাস বলে।

একক ১২-তে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে ধরাপৃষ্ঠের প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে একটি ওজোন স্তর আছে। ওজোন অক্সিজেনের একটি আকার। ওজোনের প্রত্যেক অণুতে (O_3) তিনটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে; অন্যদিকে সাধারণ অক্সিজেন অণুতে (O_2) থাকে মাত্র দুটি পরমাণু। ওজোন স্তরটির সুরক্ষক ভূমিকা আছে, কারণ এটি পৃথিবীগামী সূর্যালোকের অনেকখানি অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে এবং ত্বককে জ্বলন ও অন্যান্য অনিষ্টকর ফলাফল থেকে বাঁচায়।

(খ) গ্যাস, ধূলিকণা ও ধোঁয়া ছাড়াও বহু প্রকারের জীব বায়ুমণ্ডলে থাকে। (বিশদ বিবরণের জন্য অনুচ্ছেদ ১৫.৩.২ দেখুন)

(গ) ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায়, বায়ুর ঘনত্ব ততই হ্রাস পায়। প্রায় চার হাজার মিটার উচ্চতার পর অতিরিক্ত অক্সিজেনের সরবরাহ ব্যতীত মানুষ ও অন্যান্য অনেক প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন।

১৫.৩.২ বায়ুমণ্ডলে প্রাণ

ভূপৃষ্ঠের ন্যায় বায়ুমণ্ডলও প্রাণের পোষকতা করে। এর মধ্যে কতকগুলি জীব হল নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ, পাখি, বাদুড় প্রভৃতি যা আপনারা সবাই দেখে থাকবেন। ওড়া এবং শিকার ধরার মতো কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের জন্য মাধ্যম হিসাবে তারা বায়ুকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে। বাদুড় ও পাখির মতো জীবেরা দক্ষ বায়ুচারী। বাতাসে ভেসে থাকার জন্য তাদের ডানার এবং সেগুলি সঞ্চালনের জন্য শক্তিশালী পেশীর বিকাশ ঘটেছে। কতকগুলি পাখির অত্যুত্তম দৃষ্টিশক্তি আছে। শিকারকে আঁকড়ানোর এবং ধরে থাকার জন্য নখর প্রভৃতি অন্যান্য সুগঠিত অঙ্গও তাদের আছে। কখনও কি ঈগলের মতো বড় পাখিকে বাতাসে উড়ন্ত ছোট পাখিদের ধরতে দেখেছেন? এটি দেখার মতো দৃশ্য। ঈগলটি দূর থেকে উড়ে এসে অতি বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে ছোঁ মেরে ধরে, তাকে নখর দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখে এবং বসে খাওয়ার জন্য কোনও নির্জন স্থানে উড়ে যায়। খাদ্য অন্বেষণে পাখিরা সাধারণত ভূপৃষ্ঠের খুব কাছেই উড়ে বেড়ায়, কিন্তু কখনও কখনও তারা দেড় হাজার মিটারের মতো উচ্চতাতেও ওড়ে। দূরগামী যাযাবর পাখিরা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যাওয়ার সময়ে প্রায় ছয় হাজার মিটারের মতো অবিশ্বাস্য উচ্চতায় ওড়ে। অল্পতর উচ্চতার তুলনায় এখানে বাতাস অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল ও প্রবল হওয়ায় তার সুযোগ নিতে তারা এই উচ্চতায় আসে। এই পাখিরা বায়ুস্রোতের দিকেই ওড়ে এবং তার ফলে অনেকটা শক্তি ও শ্রম বাঁচায়।

খালি চোখে যে জীবগুলিকে আমরা দেখতে পাই, সেগুলি ছাড়াও বায়ু এমন বহু বিচিত্র ধরনের জীবকে বহন করে যেগুলিকে কেবল অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দেখা যায়। ছত্রাক (fungus), মস, ফার্ন প্রভৃতির রেণু (spore), নানাপ্রকার পরাগরেণু, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসও বায়ুতে ভাসমান থাকে। বহু উদ্ভিদের ক্ষুদ্র বীজও থাকে। একখণ্ড রুটিকে কয়েকদিন খোলা রেখে দিয়ে বায়ুতে ছত্রাকরেণুর উপস্থিতি দেখানো যায়।

এতে ছোট ছোট, কখনও বা মখমলের মতো নানাবর্ণের ছোপ দেখা দেবে। এগুলি সবই নানা রকমের ছত্রাক, যাদের রেণু বাতাসে ভাসছিল এবং রুটির উপরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

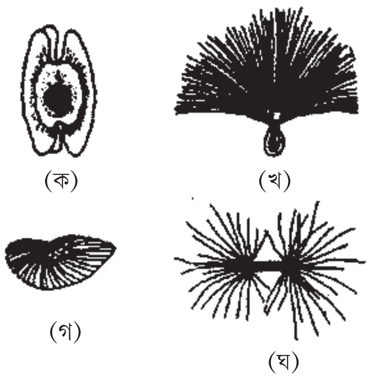

চিত্র ১৫.২ : পক্ষযুক্ত (ক, গ) এবং রোমশ (খ, ঘ) বীজ। (ক) সজিনা। (খ) আকন্দ। (গ) মাদার। (ঘ) ছাতিম।

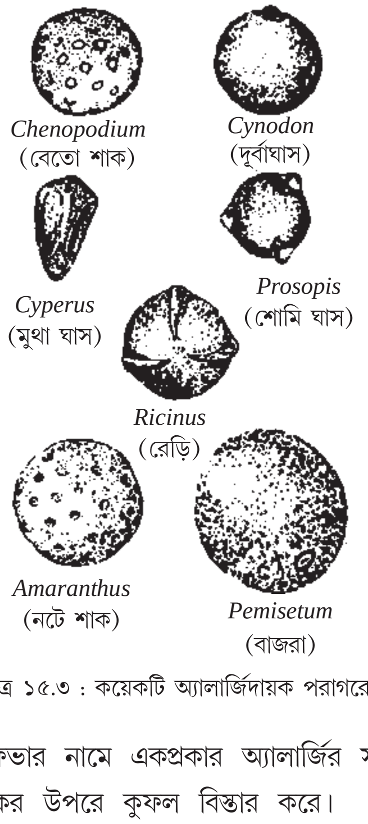

চিত্র ১৫.৩ : কয়েকটি অ্যালার্জিদায়ক পরাগরেণু

অনুরূপভাবে, যেসব জায়গার কাছে কখনও মানববসতি নেই, সেখানেও দেখি বিভিন্ন ধরনের ছোট উদ্ভিদ গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মেছে। আবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পরে লাভা শীতল হলে সেই লাভার উপরেও বহু প্রকার উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। আপনারা বিস্মিত হয়ে ভাবতে পারেন, এই উদ্ভিদেরা এখানে কীভাবে পৌঁছাল। বায়ুতে বিদ্যমান তাদের বীজ বা রেণু এই নূতন এলাকাগুলিতে বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পেয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং ছোট ছোট গুচ্ছ গঠন করে।

যেসব ছত্রাক ও অন্যান্য উদ্ভিদের রেণু বা বীজ বায়ুতে বাহিত হয়, তারা সেগুলিকে বিশাল সংখ্যায় উৎপাদন করে, যাতে সেগুলির অন্তত কয়েকটি এমন স্থানে পৌঁছাতে পারে যেখানে জল, সূর্যালোক প্রভৃতির মতো বৃদ্ধির পক্ষে সঠিক অবস্থাগুলি মেলে এবং এই বীজ বা রেণুগুলি পূর্ণবয়স্ক জীবে বিকশিত হতে পারে। প্রজাতির অস্তিত্বরক্ষার নিশ্চয়তার জন্য এটি একটি অভিযোজন। যেসব বীজের বায়ুর দ্বারা বিস্তার ঘটে, তাদের পৃষ্ঠদেশে রোম, ডানার মতো গঠন এবং লঘু ওজনের মতো বিশেষ লক্ষণ থাকে (চিত্র ১৫.২ দেখুন)। বায়ুতে ভাসমান থাকার জন্য সুবিকশিত পদ্ধতি থাকায় কিছু কিছু রেণু, বীজ বা পরাগরেণু বায়ুস্রোতে অনেক উচ্চতায় বাহিত হয়। কাজেই অনেক উচ্চতাতেও জীবের অস্তিত্ব দেখা যায়।

আপনারা কখনও কখনও লক্ষ্য করে থাকবেন, কিছু লোক হঠাৎ হাঁচি, চোখ দিয়ে জল পড়া, ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠা এবং শ্বাসকষ্টেও আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থাকে অ্যালার্জি বলা হয়। এর কারণ কী? খালি চোখে দেখা না গেলেও বাতাসে বর্তমান, এমন কয়েকটি রেণু বা পরাগরেণুর দ্বারা কয়েক প্রকার অ্যালার্জি উৎপন্ন হয় (চিত্র ১৫.৩ দেখুন)। কয়েকটি বৃক্ষ, ঘাস বা আগাছার পরাগ প্রশ্বাসে গ্রহণ করলে হে-ফিভার নামে একপ্রকার অ্যালার্জির সৃষ্টি হয়। এগুলি সবই বায়ুবাহিত হয়ে স্পর্শকাতর (sensitive) লোকের উপরে কুফল বিস্তার করে।

বায়ুমণ্ডলের কতকগুলি ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং যে ধরনের জীবদের বায়ুমণ্ডল পোষণ করে, সে বিষয়ে বলার পরে এবারে আমরা এই বাস্তুতন্ত্রটির ক্ষতির প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১৫.৩.৩ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

যে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডল মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে অতীত থেকে পেয়েছে, তা স্বাস্থ্যকর ও নির্মল বায়ুতে পূর্ণ এবং সূর্যের অত্যধিক বিকিরণকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন, উভয়ের সংঘাতে তার অবনতি হয়ে চলেছে। কলকারখানাগুলি বায়ুতে লক্ষ লক্ষ টন ধুলা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেয়, গাড়ি ও বাস ধূম (fumes) ছড়ায় এবং রাস্তার ধুলা আলোড়িত করে বায়ুতে ওঠায়, আর কৃষিকর্মের উপদ্রবস্বরূপ কীটপতঙ্গ মারার জন্য ব্যবহৃত কীটনাশকের ছিটা এগুলির সঙ্গে মিলে আদর্শ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। বায়ুদূষণ বিরাট চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে, কারণ সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এরও বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। বড় শহর এবং অতিমাত্রায় শিল্পায়িত এলাকাগুলির নিকটে পরিস্থিতি এত মন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পাখিরা বিরল হয়েছে এবং বায়ু শ্বসনের উপযোগী নেই। গ্রামীণ এলাকাগুলি প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা ও দূষণনিয়ন্ত্রণের দিকে সমাজকে যেতে হবে, কারণ জীবনধারণের জন্য বায়ুমণ্ডল এক মহান ও বিকল্পবিহীন সম্পদ। পৃথিবীর পরিবেশের এই উপাদানের যে প্রকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা পরবর্তী এককে সবিস্তারে পড়বেন।

অনুশীলনী—২

নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

(ক) .... হল পৃথিবীর চারিপাশে এমন একটি আচ্ছাদন যা পৃথিবীকে দিবসে ঝলসে যাওয়া এবং রাতে জমে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

(খ) ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি .... স্তর আপতিত সূর্যালোকের .... রশ্মিকে অনেকটা শোষণ করে।

(গ) .... প্রাণবায়ু রূপেও পরিচিত এবং প্রাণকে অব্যাহত রাখার রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির জন্য অপরিহার্য।

(ঘ) বায়ুমণ্ডলের বিদ্যমান জীবদের অন্তর্গত হল কয়েক প্রকার .... এবং ....।

(ঙ) প্রায় চার হাজার মিটার উচ্চতার উপর অতিরিক্ত ....-এর সরবরাহ ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন।

(পরাগরেণু, অক্সিজেন, বায়ুমণ্ডল, বীজ, ওজোন, জীবাণু, অতিবেগুনি, রেণু, অক্সিজেন)

১৫.৪ অরণ্য

চিত্র ১৫.৪ : অরণ্যের একটি খণ্ডে গাছপালার কয়েকটি স্তর দেখা যাচ্ছে। এতে আছে দীর্ঘ বৃক্ষ, ছোট ছোট গুল্ম, জমির কাছে কোমল উদ্ভিদ এবং বৃক্ষ কাণ্ড বেষ্টনকারী রোহিণী লতা

অরণ্য এই গ্রহে জীবগুলির এক সুসংগঠিত, প্রভাবশালী ও সুবিবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের মোট স্থলের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক এলাকা কোনও-না-কোনও প্রকার অরণ্যে আবৃত। অরণ্যগুলি সৌরশক্তির প্রধান প্রাকৃতিক প্রয়োগকারীদের এবং বিশ্বের প্রায় নব্বই শতাংশ জৈবভরের (biomass) ভাণ্ডার। মেরু অঞ্চল ব্যতীত বিশ্বের সকল ভৌগোলিক অঞ্চলেই এগুলি অবস্থিত।

১৫.৪.১ অরণ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

অরণ্যগুলি হল গাছপালায় আচ্ছাদিত সর্বাধিক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং বিচিত্র প্রকারের জীবের আশ্রয়স্থল। অরণ্যে বৃক্ষের প্রাধান্য। বৃক্ষ ব্যতীত নানাপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, মস, ফার্ন, ছত্রাক, কয়েকরকম জীবাণু, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী এবং বিভিন্ন ধরনের পশুও অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত। এগুলি সবই অরণ্যের মাটিতে বা মাটির তলায়, জলে এবং বাতাসে বাস করে। প্রত্যেক জীবই অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের অংশবিশেষ এবং প্রত্যেকের অন্য সব জীবের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু সকলেরই জীবনধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়—এই শক্তি সূর্যালোক থেকে পাওয়া যায় এবং পর্ণরাজির দ্বারা বিধৃত হয়। অরণ্যগুলির বহু স্তরকে সজ্জিত সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস আছে (চিত্র ১৫.৪) এবং বহু বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি এখানে বসবাসের জায়গা পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অরণ্যের সর্বনিম্ন স্তরটি ক্ষুদ্র, কোমল উদ্ভিদে গঠিত। তার পরে আছে ছোট ছোট গুল্ম যেগুলি দ্বিতীয় স্তর গঠন করে। তৃতীয় স্তরে ছোট ছোট বৃক্ষ থাকতে পারে। আর যে দীর্ঘ বৃক্ষগুলি সমগ্র গাছপালার উপরে ছাদ বা ছাউনি তৈরি করে, তাদের নিয়ে গঠিত হতে পারে চতুর্থ স্তরটি। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী তাদের জীবনধারণের অভ্যাস অনুযায়ী গাছপালার বিভিন্ন স্তরে থাকে।

১৫.৪.২ অরণ্যের প্রাণরাশি

বৃক্ষগুলি অরণ্যের স্তম্ভ যার উপরে অন্যান্য অরণ্যজীবনের অনেকটাই আকার লাভ করেছে। অরণ্যের একটি ছোট অঞ্চলেও সহস্রাধিক রকমের গুল্ম, লতা, বীরুৎ, ফার্ন, মস এবং ব্যাঙের ছাতা বৃক্ষগুলির অনুসঙ্গে থাকতে পারে। বৃক্ষগুলির পোষকতায় ক্ষুদ্রতর উদ্ভিদগুলি তাদের ছায়ায় বৃদ্ধি পায়

এবং পাতার ছাউনির দ্বারা সংরক্ষিত উচ্চ আর্দ্রতার উপরে নির্ভর করে। আমরা উপরে বলেছি, এগুলি সবই গাছপালার বিভিন্ন স্তর গঠন করে। তদুপরি অরণ্যে পাখি, উভচর, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ীর মতো সকল প্রকার প্রাণীও থাকে। অরণ্য বিচিত্র ধরনের পতঙ্গ, পোকামাকড় প্রভৃতিরও আশ্রয়স্থল। কেউবা ফুলের মধু সন্ধান করে, অন্য কেউ উদ্ভিদের সবুজ পাতা ও কোমল অংশগুলি ভক্ষণ করে, কেউ কাঠের মধ্যে গভীর ছিদ্র করে, কেউবা উদ্ভিদকলায় সুড়ঙ্গ খনন করে। পিপীলিকা এবং উই সর্বত্র থাকে। এমন অরণ্য অতি বিরল যেখানে বীটল বা গুবরে পোকা, প্রজাপতি, গঙ্গাফড়িং, অন্যান্য পতঙ্গ, মাকড়সা ও কাঁকড়াবিছার চোখ-ধাঁধানো সমাবেশ আশ্রয় পায়নি। সুপ্রচুর পতঙ্গগুলি পাখিদের প্রধান খাদ্য। মানুষও অরণ্যসম্প্রদায়ের এক সদস্য, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী সদস্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ অনধিকার প্রবেশকারী—কাঠ সংগ্রহের জন্য অথবা কৃষিজমি তৈরির জন্য গাছ কেটে ফেলতেও মানুষ অরণ্যে প্রবেশ করে। অবশ্য মানব সম্প্রদায়ের উপজাতি বলে পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অরণ্যে বাস করে—অরণ্যজীবনের পরিবেশীয় অবস্থার সঙ্গে তাদের প্রকৃষ্ট অভিযোজন ঘটেছে।

অরণ্য ও তার জীবনের দিকে একটু ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি দেওয়া যাক। অরণ্যতলে কী আছে, আমরা প্রথমে তাই দেখব। অরণ্যতলে ঝরাপাতা, ডালপালা এবং ভাঙা বৃক্ষশাখা স্তূপাকারে পড়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি প্রাণহীন পচনশীল বস্তুর স্তূপের মতো দেখায়। কিন্তু বস্তুত এগুলি অরণ্যমৃত্তিকার এক প্রচ্ছন্ন জগৎকে আবৃত রাখে। অরণ্যের অন্য যে-কোনও স্তরে যত জীব দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি জীবকে এই স্তূপগুলি ঢেকে রাখে ও আশ্রয় দেয়। এগুলির তলায় যেরকম সংখ্যায় এই জৈব অধিবাসীদের বাস, তা কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। ব্যাকটেরিয়া, এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া, শৈবাল, ছত্রাক, পোকামাকড় প্রভৃতির মতো অতি ক্ষুদ্র জীব এবং কেন্নো, গুবরেপোকা, বহু প্রকার পতঙ্গ ও কেঁচোর মতো বৃহত্তর জীবও এখানে বর্তমান। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলির ক্রিয়ায় মৃত জৈব পদার্থ সরলতর আকারে ভেঙে মাটিতে মিশে যায় এবং সেভাবে উদ্ভিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। বজ্রপাত বা অন্যান্য কারণে সময়ে সময়ে ঘটা দাবানলও মৃত জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টিদ্রব্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। আগুন মৃত পদার্থকে দগ্ধ করে এবং তার পরিমাণজাত খনিজসমৃদ্ধ ভস্ম শেষ পর্যন্ত মাটিতে মিশে যায়।

অরণ্যে ক্ষুদ্র জীবগুলি ছাড়াও অনেক বৃহত্তর আকারের অন্যান্য জীবও থাকে এবং সহজেই চোখে পড়ে। অরণ্যে জীবনধারণের জন্য এদের সকলেরই লক্ষণীয় সুচতুর বৈশিষ্ট্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃক্ষশীর্ষে বিভিন্ন ধরনের পাখিরা বাস করে এবং ফল অথবা উদ্ভিদবাসী ক্ষুদ্র পতঙ্গ আহার করে। এই উদ্দেশ্যে তাদের উচ্চ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চঞ্চু ও নখর আছে; এগুলির কয়েকটিকে চিত্র ১৫.৫-এ দেখানো হয়েছে। কাঠঠোকরা বৃক্ষকাণ্ডে আরোহণ করে এবং তার শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে বল্কলের তলায় লুকানো পতঙ্গগুলিকে বার করে নেয় (চিত্র ১৫.৫ খ)। এই উদ্দেশ্যে বৃক্ষকাণ্ডকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার জন্য তার শাণিত ও বাঁকা নখরও আছে (চিত্র ১৫.৫ জ)। তাছাড়া কখন সহজে আহার করা যায় এবং সুরক্ষিত থাকাও যায়, তার উপরে নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাণীর নিশাচর বা দিবাচর অভ্যাসের অভিযোজন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, পেঁচা রাতে শিকার করে, কারণ ইঁদুর প্রভৃতি যেসব মূষিকজাতীয় প্রাণী তার ভক্ষ্য, সেগুলি ওই সময়েই খাদ্যের সন্ধানে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করে। অরণ্যে শাখাপ্রশাখার জাল বহু প্রাণীর পক্ষে, বিশেষত হাতি,

মহিষ, চিতা প্রভৃতির মতো বৃহৎ পশুগুলির পক্ষে দ্রুত চলাফেরা করা কঠিন করে তোলে। বৃক্ষতলের জঙ্গালের মধ্য দিয়ে চলাফেরার জন্য এদের প্রত্যেকেরই এক বা ততোধিক অভিযোজন ঘটেছে। এগুলির কয়েকটি হল— দেহের ওজন ও শক্তি, বলিষ্ঠ অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা এবং ত্রিকোণাকার মাথা। পেঁচার মতো যে প্রাণীগুলি রাতে শিকার করে, তাদের কাছে বৃহৎ ও সুবেদী চক্ষু এবং প্রখর শ্রবণশক্তি। বাদুড়ও রাতে উড়ে বেড়ায় এবং উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ উৎপাদন করে তার সাহায্যে শিকারের অবস্থান নির্ণয় করে। এই শব্দ ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ থেকেও প্রতিফলিত হয়ে বাদুড়কে তার অবস্থান জানিয়ে দেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অরণ্য

যেহেতু অরণ্যগুলি বিশ্বের বিভিন্ন অংশ এবং নানা জলবায়ুর পরিবেশে অবস্থিত, আমরা এখন দেখব যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ও জলবায়ুতে অবস্থিত অরণ্যে কী ধরনের জীব থাকে।

(ক) যেসব অরণ্যে উষ্ণতা –৪০° সেলসিয়াসে নেমে যায়, সেখানে জীবনের বৈচিত্র্য কম। চরম শৈত্য কেবল বৃক্ষের কলাগুলিকেই বিপদাপন্ন করে না, অধিকন্তু জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ায় জীবনের জন্য জলের অপরিহার্য সরবরাহ থেকেও বৃক্ষগুলিকে বঞ্চিত করে। তাহলে এই উদ্ভিদগুলি শৈত্যের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করে? এসব অঞ্চলে পাইনজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের থাকে মোম ঢাকা দীর্ঘ সূচ্যাকৃতি পাতা (চিত্র ১৫.৬ ক)। পাতার উপরে তুষার জমা এবং তার ভারে নত হওয়া এড়ানোর জন্য এটি একটি অভিযোজন। এসব অবস্থায় জল প্রতিস্থাপন করা কঠিন মোমের পুরু আবরণ জলক্ষয় নিবারণ করে। এই গাছগুলির গাঢ়বর্ণ পাতা মৃদু সূর্যালোক থেকেও যথাসম্ভব তাপ শোষণ করে নেয়। এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলির উপরে নির্ভর করে প্রাণিজীবনের বৈচিত্র্যেও প্রভেদ ঘটে। পাতা কঠিন, রজনে পূর্ণ এবং সহজে কামড়ানো যায় না; এজন্য বহু পতঙ্গা তাদের স্পর্শ করে না। কিন্তু কতকগুলি পাখি এমন বৃক্ষের শঙ্কু থেকে বীজ (চিত্র ১৫.৬) নিষ্কাশন করে নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করে।

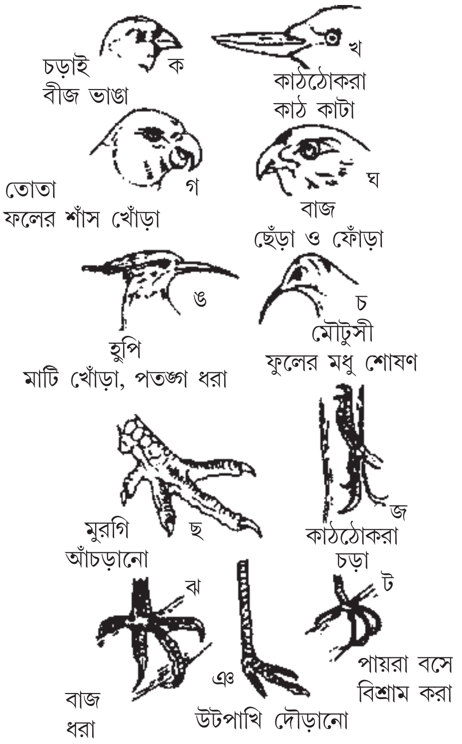

চিত্র ১৫.৫ : ক - চ : আহারের বিশেষ বিশেষ প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাখিদের চঞ্চুবৈচিত্র্য। ছ - ট : পাখিদের পায়ের কয়েকটি অভিযোজনবৈচিত্র্য (সালিম আলি থেকে)

চিত্র ১৫.৬ : (ক) একটি শঙ্কু-সহ পাইন শাখা এবং সূচ্যাকৃতি পাতা (খ) লম্বালম্বি কাটা একটি শঙ্কুতে কাষ্ঠল শল্ক দিয়ে বেষ্টিত বীজ দেখা যাচ্ছে। (গ) বীজ সহ একটি শল্ককে বার করে এনে আমাদের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে।

(খ) দীর্ঘ শীতঋতুর অঞ্চলগুলিতে বিদ্যমান জীবগুলির প্রকার সম্বন্ধে এবারে দেখা যাক। এমন অবস্থায় অধিকাংশ জলের জমে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, এজন্য এখানে উদ্ভিদের কাছে জল সহজলভ্য নয়। এই পরিস্থিতি খরা থেকে অভিন্ন। তাহলে এমন পরিস্থিতিতে উদ্ভিদেরা কী করে? এদের অধিকাংশই সোজাসুজি জলক্ষয়ের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এজন্য তারা পাতা ঝরিয়ে দিয়ে মূল, কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার কোষে বিদ্যমান জলকে সংরক্ষণ করে। যেসব উদ্ভিদ প্রাণরক্ষার এরকম পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে, তাদের পর্ণমোচী (deciduous) উদ্ভিদ বলে ইংরেজী শব্দটির লাতিন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'ঝরে পড়া'। এরকম অরণ্যের সর্বত্র শরৎকালে ঝরাপাতার স্তূপ দেখা যায়। এসময়ে উদ্ভিদ কোনও নূতন পাতা, ফুল বা ফল উৎপাদন করে না।

শীতের কঠোরতায় এবং দীর্ঘ খাদ্যাভাবে অস্তিত্বরক্ষার জন্য এরকম অরণ্যের প্রাণীরাও সমান লক্ষণীয় পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে। কতকগুলি পাখি সহস্র কিলোমিটার অভিপ্রয়াণ করে এমন সব অঞ্চলে যায় যেখানে খাদ্য কোনও সমস্যা নয় এবং উষ্মতা তাদের পছন্দসই। কতকগুলি পাখি অভিপ্রয়াণ করে না, বরং নিষ্ক্রিয় থাকে এবং তাদের হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বসনের হার অনেক কমিয়ে দেয়। এভাবে তারা প্রভূত শক্তি সংরক্ষণ করে। কতকগুলি পশুও অভিপ্রয়াণ করে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে, অর্থাৎ শীতঘুম দেয়; যথা—ভালুক কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমাতে থাকে। এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে শীতঘুমের স্থিতিকালের পার্থক্য আছে। শীতঘুমের সময়ে নিদ্রা এত গভীর হয় যে কতকগুলি প্রাণীকে খোঁচা বা ঝাঁকানি দিলেও তারা জেগে ওঠে না।

(গ) যেসব অঞ্চলে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয় এবং সারা বছর উষ্মতা বেশি থাকে, সেখানে ঘন অরণ্য বর্তমান, কারণ এসব অবস্থা প্রচুর বৃদ্ধির পক্ষে আদর্শস্থানীয়। পৃথিবীর যে-কোনও স্থানে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায়, তাদের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও বিচিত্র আকারগুলি এমন সব অরণ্যে থাকে। এমন অরণ্যের এক হেক্টরে সাধারণভাবে শতাধিক বিভিন্ন প্রকারের দীর্ঘ বৃক্ষ এবং কয়েক প্রকারের ক্ষুদ্র উদ্ভিদ দেখা যায়। এই সমৃদ্ধি কেবল উদ্ভিদেই সীমাবদ্ধ নয়। এসব অরণ্যে ষোলশো-র অধিক প্রজাতির পাখি বাস করে, আর পতঙ্গের সংখ্যা তো গণনার অতীত! এরকম অরণ্যের ছাউনিটি হল সবুজ পাতার ছ-সাত মিটার পুরু, ঘন এবং অবিচ্ছিন্ন স্তর। প্রতিটি পাতা এমন কোণে বিন্যস্ত যে সর্বাধিক পরিমাণে সূর্যালোক সংগ্রহ করে। ফলে অরণ্যতলে প্রত্যক্ষ সূর্যালোক মাত্র অল্প পরিমাণেই পৌঁছায়; কাজেই সেখানটি বড় অন্ধকার। নিবিড় গাছপালার জন্য প্রবল বায়ু অনুরূপভাবেই অরণ্যমধ্যে হ্রাস পেয়ে মৃদুমন্দ বাতাসে পরিণত হয়। বৃষ্টিধারার অনেকটাই ছাউনিটিতে বাধা পায়। কেবল যখন পাতাগুলি সম্পূর্ণ ভিজে যায়, বিন্দু বিন্দু জল ধীরে ধীরে অরণ্যতলে পড়ে। সুস্পষ্ট ঋতুভেদ না থাকায় সকল বৃক্ষের পাতা যুগপৎ ঝরে পড়ে না। পাতা ঝরানোর জন্য প্রত্যেক প্রজাতির নিজস্ব ঋতু আছে। কারো পাতা ঝরে প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর, কারো বা বারো মাসেরও পরে। সুতরাং সারা বছরই বিভিন্ন প্রকার ফুল দেখা যায়।

এমন উষ্ণ ও আর্দ্র অরণ্যে বিদ্যমান অর্কিড ও ব্রোমেলিয়াডের মতো বায়ব উদ্ভিদ এবং পরস্পরবিজড়িত লতাগুলি চিত্তাকর্ষক উদ্ভিদ (চিত্র ১৫.৭)। এই উদ্ভিদগুলি দীর্ঘতর বৃক্ষে আরোহণ করে আলোকে পৌঁছায়; পরস্পরবিজড়িত লতাগুলি দীর্ঘবৃক্ষকাণ্ডে তাদের ঊর্ধ্বগামী শাখাগুলি ভর করে এমন স্থানে পৌঁছায় যেখানে

সূর্যালোক পাওয়া যায়। অরণ্যতলের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদও বৃদ্ধি পায়। এমন সব উদ্ভিদের বৃহৎ ও গাঢ়বর্ণ পাতা থাকে, যাতে সামান্য যেটুকু আলোক পাওয়া যায় তাকেই যেন ধরে ফেলা যায়।

চিত্র ১৫.৭

মাটির কাছে ভক্ষ্য উদ্ভিদ পদার্থের আপেক্ষিক বিরলতার জন্য এমন সব অরণ্যে অধিকাংশ প্রাণী মাটি থেকে অনেক উপরে ছাউনিটির সবুজ জগতে বাস করে। এর মধ্যে আছে বহু পাখি, বানর, পতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাণী। বস্তুত বৃক্ষশীর্ষগুলি অগণিত পাখির বর্ণ ও কূজনে প্রাণবন্ত। বৃক্ষজীবনের জন্য প্রাণীরা কতকগুলি অভিযোজনের বিকাশ ঘটিয়েছে। দ্রুত চলাফেরার প্রয়োজনে তাদের গঠন কৃশ। এই প্রাণীগুলি কখনও অরণ্য ছেড়ে না গিয়ে সেখানেই খাদ্যবস্তু শিকার বা অপহরণ করে, আবর্জনায় খাদ্যের অনুসন্ধান করে, প্রজনন করে এবং মৃত্যুবরণ করে। খাদ্যের জন্য তীব্র দ্বন্দ্ব এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাখিদের দ্বারা ভুক্ত হওয়ার অবিরাম আশঙ্কা সত্ত্বেও এই অরণ্যগুলিতে পতঙ্গসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে। তারা কামোফ্লেজ নামে পরিচিত একটি সুরক্ষা কৌশলের আকারে কয়েকটি পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে। এগুলির দ্বারা তারা পরিবেশের অনুরূপ বর্ণধারণ করে, তাদের দেহকে পাতার মতো আকার দেয়, ইত্যাদি—যাতে তাদের সহজে চেনা না যায়।

(ঘ) যেখানে গ্রীষ্মে উষ্মতা অত্যধিক, সেসব অঞ্চলের অরণ্যে অত্যধিক আর্দ্রতা হারানোর আশঙ্কা থাকে। এরকম এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদের পাতায় থাকে মোমে-ঢাকা জলরোধক পৃষ্ঠ এবং স্বল্পতর রন্ধ্র—রন্ধ্রগুলি আবার প্রায়ই থাকে প্রধানত পাতার তলায়। অত্যধিক সূর্যতাপ যাতে না লাগে সেজন্য দিনের উষ্মতর ভাগে অনেক পাতাই শাখাপ্রশাখা থেকে নিম্নমুখে ঝুলে থাকে। পাতার এমন অবস্থানের দরুন এসব বৃক্ষ সামান্যই ছায়া দেয়—কাজেই অধিকাংশ আলোক মাটিতে পৌঁছায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন প্রকার অরণ্যে নানাবিধ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

অরণ্যের জীবন সম্বন্ধে আলোচনার পরে আমরা এবারে দেখব, অরণ্য কেন পৃথিবীর পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়েছে। অরণ্য কেবল যে স্থলের নিসর্গশোভাই বাড়ায় এমন নয়, অধিকন্তু জলবায়ুকে স্বাস্থ্যকর রাখে এবং বন্যজীবনের জন্য উপযুক্ত আবাসের ব্যবস্থা করে। অরণ্য পরিবেশীয় আঘাতরোধক রূপেও বর্ণিত হয়। উদ্ভিদের মূলের মাধ্যমে অরণ্য বহু পরিমাণে জল ব্যবহার করে এবং শ্বসনের মাধ্যমে তাকে পাতা দিয়ে হারায়।

বিস্তীর্ণ অরণ্য বৃষ্টিপাতকেও কিছু পরিমাণে বাড়ায়। তারা ভারী বর্ষণের পথে অবরোধের সৃষ্টি করে এবং জলের খরস্রোতে মৃত্তিকার ধুয়ে বেরিয়ে যাওয়া নিবারণ করতে জলকে নীচের জমিতে ধীর ও অবিচল হারে মুক্ত করে দেয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ এবং বৃক্ষের মূল মৃত্তিকাকে স্বস্থানে ধরে রাখে।

গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে এবং নিউজপ্রিন্টের কাগজ, প্লাইউড প্রভৃতি উৎপাদনের শিল্পেও ব্যবহৃত কাঠের উৎস হিসাবে অরণ্যের গুরুত্ব আছে। কাগজের জন্য মণ্ড উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একশো বা ততোধিক প্রজাতির বৃক্ষের কাঠ কেটে নেওয়া হয়। অরণ্যের ভিতরে বা নিকটে বসবাসকারী লোকেদের জন্য অপরিহার্যভাবে আবশ্যক খাদ্য, পশুখাদ্য, তন্তু ইত্যাদিও অরণ্য সরবরাহ করে থাকে। লাক্ষা, রজন এবং উদ্বায়ী তৈলের মতো বাণিজ্যিক দিক দিয়ে মূল্যবান বহু বিচিত্র বস্তু অরণ্য থেকে মেলে। অরণ্য ভেষজ উদ্ভিদেরও ভাণ্ডার—এদের অনেকগুলি এখনও পরীক্ষিত বং সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়নি।

১৫.৪.৩ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

অরণ্যের সম্পদ মাত্রাধিক পরিমাণে শোষিত হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে অরণ্যগুলি সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। হিসাব করা হয়েছে, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দশ বছরে অরণ্যাঞ্চল পনেরো শতাংশ হ্রাস পেয়ে বিশ্বের সকল অঞ্চলের উপরেই কুফল বিস্তার করেছে। ভারত চরম দ্রুত হারে অরণ্য হারাচ্ছে। উপগ্রহের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে প্রতি বছর ভারত তেরো লক্ষ হেক্টর অরণ্য হারিয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যের আবরণ সম্বন্ধে জাতীয় অরণ্যনীতিতে ১৯৫২ সালে নির্দিষ্ট শর্তটি কেবল অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলেই পূরণ করা হয়েছে। সর্বাধিক অরণ্যনাশ (deforestation) ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে, যেখানে প্রায় বিশ লক্ষ হেক্টর অরণ্য লোপ পেয়েছে। মহারাষ্ট্র হারিয়েছিল দশ লক্ষ হেক্টর। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর উল্লিখিত কালের মধ্যে হারিয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ হেক্টর অরণ্যাঞ্চল।

এবারে দেখা যাক, কোন্ কোন্ বিষয় আমাদের দেশে অরণ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে।

(ক) বদলি চাষ, অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে বন কেটে পরিষ্কার করা হয়, কাটা গাছপালার অনেকটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এবং দু-তিন বছর ধরে মিশ্র ফসলের চাষ করা হয়, যতক্ষণ না মাটি তার উৎপাদনশক্তি হারায়। তার পরে অন্যত্র এই পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। ভারতের বহু পার্বত্য অঞ্চলে বদলি চাষ ব্যবহৃত হয়।

(খ) অরণ্যকে গবাদি পশুর চারণক্ষেত্রে পরিণত করা।

(গ) মাত্রাধিক পশুচারণ—ভারতের অধিকাংশ অরণ্যাঞ্চলে পশুচারণের আতিশয্য আছে। এর ফলে বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চল লোপ পেয়েছে। গাছপালার আচ্ছাদন লোপ পাওয়া ছাড়াও গবাদি পশুর পদদলনে মাটি কঠিন হয়ে যায় এবং অরণ্যের পুনঃসৃজন নিবারিত হয়। কোনও গাছ না থাকলে মাটি আলগা হয়ে পড়ে এবং বাতাসে উড়ে বা ভারী বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়।

(ঘ) অরণ্য ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হল কাঠের বাণিজ্যিক ব্যবহার। গৃহনির্মাণ, ফল পরিবহনের বাক্স তৈরি করা, কাগজ উৎপাদন এবং শুধুমাত্র জ্বালানোর জন্যও কাঠের বিরাট চাহিদা আছে; আমাদের সজল সবুজ অরণ্যগুলির পক্ষে এটি একটি মুখ্য আশঙ্কার বিষয়। সরকার গাছকাটার উপরে যেসব বিধিনিষেধ

আরোপ করেন, লোভী কন্ট্রাক্টর ও লাভের অংশীদারেরা সেগুলিকে ফাঁকি দিয়ে বিফল করে দেয়। এই হারে চললে অরণ্যগুলি একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নূতন লাগানো গাছপালা কাজে আসবে, কিন্তু তারা সুদীর্ঘকাল বর্তমান অরণ্যগুলির স্থান পূরণ করতে পারে না—নূতন গাছপালার সমাবেশ অরণ্য হয়ে উঠতে অন্তত একশো বছর লাগবে। মনে রাখতেই হবে, অরণ্য ঊষর জমিতে পর্যবসিত হলে কেবল প্রাণিজীবন এবং তার সাম্যই নয়, অধিকন্তু যেসব উপজাতি বহু শতাব্দী ধরে অরণ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনধারণ করে আসছে তাদের জীবনও বিপর্যস্ত হবে।

(ঙ) সেচপ্রকল্প, পথনির্মাণ প্রভৃতির মতো বিকাশমুখী কাজকর্মের ফলে অরণ্যের বিনাশ ঘটেছে। এর অর্থ হল, যা আরও ভালো এমন কিছু হারিয়ে পথঘাটের মতো ভালো জিনিস অর্জন করা।

অরণ্যনাশের (deforestation) কারণগুলি আমরা যখন জানি, এর ফলাফলগুলি আলোচনা করা যাক। অরণ্যের অপসরণের ফলে ঘটে থাকা ভূমিক্ষয়, হ্রদ ও নদীগুলিতে পলি জমা এবং পরিণামে বিধ্বংসী

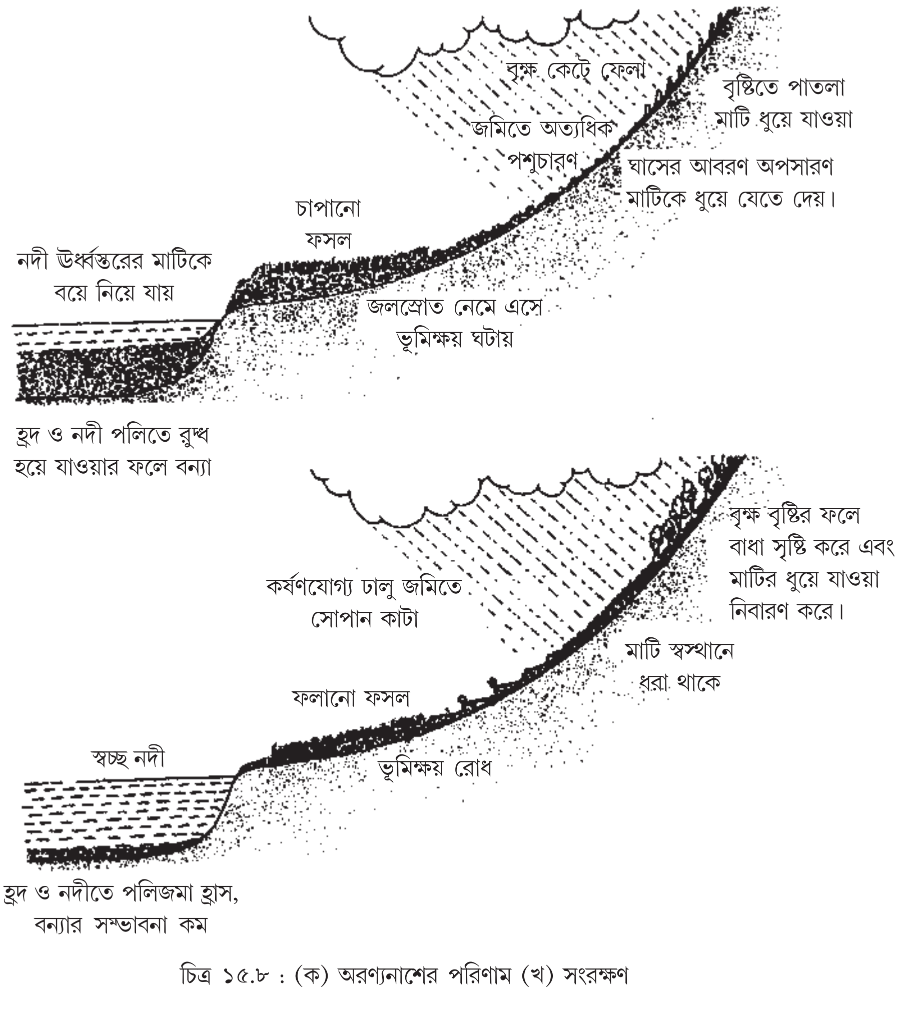

চিত্র ১৫.৮ : (ক) অরণ্যনাশের পরিণাম (খ) সংরক্ষণ

বন্যা ও চিরকালের জন্য সহস্র উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অবলুপ্তি। এই ফলাফলের মধ্যে কয়েকটিকে চিত্র ১৫.৮-এ রেখাচিত্রের আকারে দেখানো হয়েছে। একটি উদ্ভিদ প্রজাতি লুপ্ত হলে সে বহু নির্ভরশীল জীবকে—কখনও কখনও এমনকি তিরিশটির মতো জীবকে—তার সঙ্গে নিয়ে যায়।

মৃত্তিকাস্তর বেশ পাতলা হলেও পর্বতগাত্রে বৃক্ষ জন্মাতে পারে। চাষের জন্য জমি পরিষ্কার করতে বৃক্ষ কেটে ফেললে এবং জমিতে হলকর্ষণ করলে বায়ু ও বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা হ্রাস পায়। ভারী বর্ষণ পর্বতগাত্র থেকে মাটিকে ধুয়ে নদীতে নিয়ে যায়। এভাবে পর্বতগাত্র নগ্ন ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ে এবং অন্যদিকে নদীগুলি পঙ্ক ও পলিতে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্যা হয়। আমাদের দেশের সর্বনাশী বন্যাগুলির দায়িত্ব বহু ক্ষেত্রেই অরণ্যনাশের উপরে অর্পিত হয়েছে। জাতীয় বন্যা আয়োগের (১৯৮০) হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৭-৭৮ সালে বন্যার জন্য বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল এক হাজার কোটি টাকার অধিক। আশির দশকে মোট বন্যাকবলিত অঞ্চল দ্বিগুণ হয়েছে।

অরণ্যের অবনতির পরিণামে বন্যজীবের বহু প্রজাতির বসতির বিনাশ ঘটে। বর্তমানে বন্যপ্রাণীর একশোর অধিক প্রজাতির অবিলম্বে সুরক্ষার প্রয়োজন আছে, কারণ তাদের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে নিম্নমাত্রায় নেমে গেছে। মানুষের ক্রিয়াকলাপের আক্রমণে বহু উদ্ভিদও অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতীয় উদ্ভিদ সর্বেক্ষণের প্রণীত একটি সাম্প্রতিক তালিকায় ভারতীয় উদ্ভিদের এমন একশো পঁয়ত্রিশটি প্রজাতির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যাদের অবিলম্বে সুরক্ষার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, সারা বিশ্বে দু'শোরও অধিক প্রাণিপ্রজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে প্রতি বছর অন্তত একটি প্রজাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত আটশো প্রাণিপ্রজাতি লোপ পাওয়ার বিরাট বিপদের মধ্যে রয়েছে। এই তালিকার ভিতরে আছে ওরাংওটান, পিগ্‌মি, শিম্পাঞ্জি, পার্বত্য গরিলা, চিতা, তিমির আটটি প্রজাতি, গণ্ডারের পাঁচটি প্রজাতি, মেরু অঞ্চলের ভালুক ও গ্রিজলি ভালুক এবং বহু প্রজাতির পাখি।

আপনার কি মনে হয় না, পরিস্থিতিটি উদ্বেগজনক? বহু লোক উপলব্ধি করেছেন, পরিবেশের ধ্বংসকে বিলম্বিত করার জন্য সংরক্ষণের দিকে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আশা করা যায়, এখনও এসব পদক্ষেপ নিলে প্রজাতিগুলির লোপ থামাতে এবং বিশ্বের সুন্দর অঞ্চলগুলিকে সংরক্ষণ করতে অনেকটা সাহায্য হবে। আমাদের দেশেও অনেকে পরিস্থিতিটি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং এইদিকে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিপন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বা নিকটে বসবাসকারী লোকেদের দ্বারা বেশ কয়েকটি অরণ্য সংরক্ষণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে।

চিপ্‌কো আন্দোলন : বৃক্ষকে আলিঙ্গন করার আন্দোলনটি সংরক্ষণের একটি সুপরিচিত আন্দোলন। কীভাবে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, সেই কাহিনীটি এরকম। ১৯৭০ সালে অলকানন্দা নদীর এক আকস্মিক বন্যায় উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল অঞ্চলে গোপেশ্বর এবং তার নিকটবর্তী প্রায় কুড়িটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই বন্যাগুলি যে মানবপ্রসূত ভূমিক্ষয়ের জন্য ঘটেছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। এই অঞ্চলের মানুষ উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের এসব নাশক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকলে তা পরিণামে পাহাড়ী মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। গোপেশ্বরের মানুষজন এবং তাঁদের নেতা শ্রী চণ্ডীপ্রসাদ ভাট একটি আন্দোলন সংগঠন করলেন এবং শপথ নিলেন যে ওই অঞ্চলে আর কোনও গাছ কাটতে দেওয়া

হবে না। কাজেই যখনি কন্ট্রাক্টরেরা গাছ কাটার জন্য অরণ্যের নিকটে আসত, এই স্থানীয় লোকেরা গিয়ে বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করে থাকতেন। তাঁরা বলতেন, কন্ট্রাক্টরদের গাছ কাটতে হলে তাদের কুঠার প্রথম তাঁদেরই উপরেই পড়তে হবে। ফলে কন্ট্রাক্টরদের একাজ ছেড়ে দিতে হল এবং স্থানীয় লোকেরা বহু বৃক্ষ ও উদ্ভিদ রক্ষা করতে সফল হলেন।

চিপ্‌কো অন্দোলনটি হিমালয় থেকে যাযাবর পাখির মতো কর্ণাটকের পাহাড়ী জেলাগুলি, মধ্যভারতের পাহাড়-পর্বত এবং রাজস্থানের আরাবল্লী পাহাড়ের মতো ভারতের নানা কোণে ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলনটি পশ্চিমঘাটের অন্যান্য এলাকাতেও বিস্তারলাভ করছে।

অনুশীলনী—৩

নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হয়েছে। এগুলিকে নিম্নলিখিত উক্তিগুলির শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথভাবে বসান :

(ক) সৌরশক্তির প্রধান প্রয়োগকারী হল ....।

(খ) অরণ্যের প্রধান জীবগুলি হল ....।

(গ) .... অঞ্চলগুলি ব্যতীত সারা বিশ্বে অরণ্য বর্তমান।

(ঘ) অরণ্যে নানাপ্রকারের ও দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে এমন সজ্জিত হয়ে থাকে যে সেগুলি পৃথক পৃথক স্তর গঠন করে। এরকম পরিস্থিতিকে .... বলে উল্লেখ করা হয়।

(ঙ) বিশেষ করে .... ও .... হল এমন উদ্ভিদ যেগুলি উষ্ম ও আর্দ্র অরণ্যে দেখা যায়।

(মেরু, স্তরবিন্যাস, অরণ্য, অর্কিড, বৃক্ষ, ব্রোমেলিয়াড)

১৫.৫ সারাংশ

এই এককটিতে আপনারা শিখেছেন যে :

- সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ও অরণ্য পৃথিবীর পরিবেশের তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান।
- সমুদ্রগুলি বিপুল পরিমাণে লবণাক্ত জল ধারণ করে এবং ভূপৃষ্ঠের উপর একটি অবিচ্ছিন্ন জলভাগ গঠন করে। সমুদ্রের গভীরতায় সর্বত্র জীব দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ফাইটোপ্ল্যাংকটন বা উদ্ভিদকণাগুলি থাকে পৃষ্ঠের নিকটস্থ জলস্তরে, যেখানে সূর্যালোক পাওয়া যায়। সমুদ্রজলের বিভিন্ন গভীরতায় বিদ্যমান জীবগুলির এমন সব বিশেষ অভিযোজনঘটিত বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি স্তিমিত আলোক, নিম্ন উষ্মতা, উপরের জলের জন্য উচ্চ চাপ প্রভৃতির মতো কঠোর অবস্থাকে সহ্য করতে

তাদের সক্ষম করে। সমুদ্রতট থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে জীবের সংখ্যাও স্বল্প থেকে স্বল্পতর হতে থাকে।

- এখন দেখতে পাই যে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র অত্যধিক বিপর্যস্ত। এর কারণ হল : নানা শিল্পসংস্থা থেকে অশোধিত বর্জ্য পদার্থ সোজাসুজি সমুদ্রে অথবা নদীতে ঢেলে দেওয়া, উপকূলের ভূমিক্ষয়ের ফলে পলি জমা, গরান-জাতীয় গাছ কেটে ফেলা, পাথর কাটা প্রভৃতি।
- বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে একটি সুরক্ষক আবরণ দেয় এবং পৃথিবীর প্রাণকে সমৃদ্ধ করার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলে জীবাণু থেকে নানাপ্রকার পাখি পর্যন্ত বিচিত্র ধরনের জীবের অস্তিত্ব আছে।
- শিল্প ও যানবাহন থেকে আসা ধোঁয়া ও ধুলা, কৃষির উপদ্রবস্বরূপ পতঙ্গ মারার জন্য ছিটানো কীটনাশক প্রভৃতির জন্য আবহমণ্ডলের বায়ুর গুণের অবনতি ঘটছে।
- অরণ্যগুলি বিশ্বের মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক আবৃত করে রাখে। মেরু অঞ্চলগুলি ছাড়া সকল ভৌগোলিক অঞ্চলেই অরণ্য অবস্থিত। খাদ্য, সূর্যালোক ও জলের সহজপ্রাপ্যতার উপরে নির্ভর করে অরণ্যের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জীব বাস করে। অরণ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রীয় ভূমিকা পালন করে। তাদের বর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে। বৃষ্টিপাতের সময়ে বিরাট পরিমাণে জল অরণ্যের দ্বারা শোষিত হয়, তারপরে ধীরে ধীরে তলার মাটিতে এবং নদনদীতে নিঃসৃত হয়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- সাম্প্রতিক জরিপগুলিতে দেখা গেছে, মানুষের অবিবেচক বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে এবং অন্যান্য কারণে বিশ্বের সর্বত্র অরণ্যাবৃত অঞ্চল দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। অরণ্যনাশের ফলাফল পরিণামে পৃথিবীতে জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। বেশ কয়েকটি অরণ্যসংরক্ষণ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু এসবই তো সমুদ্রে মাত্র ক্ষুদ্র এক জলবিন্দুর মতো। পৃথিবীর পরিবেশীয় উপাদানগুলি সংরক্ষণের জন্য আমাদের যথাসাধ্য করতেই হবে।

১৫.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(১) যদিও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সকল জীবেরই তাদের ভৌত পরিবেশ থেকে অপরিহার্যভাবে একই সম্পদসমূহে প্রয়োজন হয়, কতকগুলি বাস্তুতন্ত্রে অন্যগুলির তুলনায় কোনও কোনও সম্পদের আধিক্য থাকে। নিম্নলিখিত সম্পদগুলির প্রত্যেকটি অধিক পরিমাণে আছে, এমন দুটি করে বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিন : আলোক, জল, অক্সিজেন, পুষ্টিদ্রব্য এবং স্থান।

(২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর চার-পাঁচ ছত্রে লিখুন।

(ক) সমুদ্রের কোথায় প্রাণের প্রাচুর্য অধিক এবং কেন?

(খ) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছানো সৌরশক্তির কী ঘটে, তা বর্ণনা করুন।

(গ) অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে স্তরবিন্যাসের প্রধান কারণ কী?

(৩) সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল ও অরণ্যে যে বাস্তুতন্ত্রীয় সঙ্কটগুলির কথা এখনি পড়েছেন, তাদের কয়েকটি নীচে দেওয়া হল। এই অনুশীলনীতে আপনাকে যা করতে হবে তা হল, প্রথম স্তম্ভের বিবৃতিগুলিকে দ্বিতীয় স্তম্ভের কারণগুলির সঙ্গে মেলানো। সঠিক মিল হওয়া কারণটির ক্রমিক সংখ্যাটি প্রদত্ত প্রকোষ্ঠে লিখুন।

স্তম্ভ ১	স্তম্ভ ২
১. উপকূলের ভূমিক্ষয়	১. নদী দিয়ে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে বয়ে আসা জল
২. গাছপালার আবরণ কমা, পদদলন ও মাটির তজ্জনিত কাঠিন্য এবং সেকারণে উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবনের প্রতিরোধ	২. বদলি চাষ
৩. বাতাসে প্রভূত পরিমাণে ধুলা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া	৩. ড্রিলিং কাজকর্মের সময়ে এবং তৈলবাহী ট্যাংকার থেকে ছড়িয়ে পড়া তেল।

৪. উপকূলের কাছে পলি জমা	৪. যানবাহন, শিল্প এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অত্যধিক ব্যবহার।
৫. কোনও এলাকায় গাছপালা কেটে পরিষ্কার করা, কাটা গাছপালা পোড়ানো এবং বছর দুয়েক ফসল ফলানো। তার পরে অন্যত্র একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি।	৫. অরণ্যনাশ
৬. সমুদ্রজলের বৃহৎ এলাকার উপরে তেলের স্তর ছড়িয়ে পড়া।	৬. মাত্রাধিক পশুচারণ
৭. ভূমিক্ষয়, হ্রদ ও নদীতে পলি জমা এবং তজ্জনিত বন্যা।	৭. জ্বালানি, পশুখাদ্য ইত্যাদির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে জন্মানো উদ্ভিদ বিনষ্ট করা।

১৫.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১. (ক) সমুদ্র (খ) জোয়ার-ভাঁটা, ঢেউ, স্রোত (গ) শক্তি, পুষ্টিদ্রব্য (ঘ) ঊর্ধ্বকূপন (ঙ) সবুজাভ

২. (ক) বায়ুমণ্ডল (খ) ওজোন, অতিবেগুনি (গ) অক্সিজেন (ঘ) পরাগরেণু, বীজ, রেণু, জীবাণু (ঙ) অক্সিজেন

৩. (ক) অরণ্য (খ) বৃক্ষ (গ) মেরু (ঘ) স্তরবিন্যাস (ঙ) অর্কিড, ব্রোমেলিয়াড

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. (ক) আলোক—বায়ুমণ্ডল, তৃণভূমি

(খ) জল—হ্রদ, সমুদ্র

(গ) অক্সিজেন—বায়ুমণ্ডল, অরণ্য

(ঘ) পুষ্টিদ্রব্য—অরণ্য, নদীমোহানা

(ঙ) স্থান—বায়ুমণ্ডল, মরুভূমি

২. (ক) মহাদেশ ও দ্বীপগুলির সীমানা ঘিরে সমুদ্রে প্রাণ সুপ্রচুর, কারণ এখানে প্রভূত পুষ্টিদ্রব্য পাওয়া যায়। এটি উৎপাদকদের এবং তাদের উপরে নির্ভরশীল অন্য জীবগুলির প্রচুর বৃদ্ধি সম্ভবপর করে।

(খ) ওজোন সমন্বিত উচ্চতর বায়ুমণ্ডলীয় স্তরগুলিতে সূর্যালোক পৌঁছালে অতিবেগুনি রশ্মির মতো সূর্যের অনেক অনিষ্টকর রশ্মি শোষিত হয়ে গিয়ে সূর্যালোককে জীবনের পক্ষে নিরাপদ করে।

(গ) স্তরবিন্যাস অরণ্যের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিদ্যমান নানাবিধ জীবকে তাদের প্রয়োজনমতো আলোক, উষ্ণতা প্রভৃতি জীবনের মূল চাহিদাগুলি পেতে সমর্থ করে।

৩. ১-৭ ৪-১ ৭-৫

২-৬ ৫-২

৩-৪ ৬-৩

একক ১৬ □ পরিবর্তনশীল পরিবেশ

গঠন

১৬.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১৬.২ দূষণ

১৬.২.১ বায়ুদূষণ

১৬.২.২ জলদূষণ

১৬.২.৩ মৃত্তিকাদূষণ

১৬.২.৪ শব্দদূষণ

১৬.২.৫ বিকিরণজনিত দূষণ

১৬.৩ পরিবেশের উপর প্রযুক্তির প্রভাব

১৬.৪ পরিবেশের উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রভাব

১৬.৫ সারাংশ

১৬.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১৬.৭ উত্তরমালা

১৬.১ প্রস্তাবনা

অতীতে মানুষ ছিল যাযাবর প্রকৃতির। খাদ্য অন্বেষণেই তার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হত। জীবনধারণের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর উপর সরাসরি নির্ভরশীল হওয়ায় মানুষ ছিল প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। পরবর্তীকালে অরণ্যচারী মানুষ পশুশিকার ও খাদ্য সংগ্রহের স্তর পেরিয়ে পৌঁছল কৃষিকার্যে, যার ফলে বসবাসের উপযোগী ছোট ছোট গ্রামাঞ্চল গঠনের মতো অবস্থার সৃষ্টি হল। আমরা যদি অতীতের মানুষের সাথে বর্তমান সভ্য মানুষের জীবনযাত্রার তুলনা করি তবে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হবে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ খাদ্য ও জীবনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য মৌলিক বস্তুর সাপেক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সচ্ছল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে এবং স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য পরিষেবায় যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ নদীতে বাঁধ নির্মাণ করেছে, প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল নিধন করে তৈরি করেছে কৃষিক্ষেত্র। গড়ে উঠেছে ছোটবড় শহর, খাল ও রাস্তাঘাট। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সকল উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই মানুষের জীবনে এসেছে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু অন্যদিকে উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া অনুসৃত

হচ্ছে তার প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। ব্যাপক পরিবেশগত অবক্ষয় ঘটছে। মানুষের বিভিন্ন অপরিণামদর্শী ও অবিবেচক কাজকর্মের দরুন পরিবেশের বিভিন্ন স্তরে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তার সাক্ষ্য হিসাবে আমরা দেখতে পাই জল, মাটি, বায়ু আজ মাত্রাতিরিক্ত দূষিত, জীবমণ্ডলের বাস্তুতন্ত্র ভীষণভাবে বিপর্যস্ত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত হওয়ার পথে।

সুতরাং, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ যেসব ক্ষেত্রে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটেছে সেগুলির শনাক্তকরণ ও সেই অবক্ষয়ের কারণসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক।

পূর্ববর্তী দুইটি একক অধ্যয়ন করে আপনারা পরিবেশের মূল উপাদানসমূহ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানতে পেরেছেন। এই এককে আমরা পরিবেশগত বিভিন্ন সার্বজনীন সমস্যার কিছু অংশ আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করবার পর যে কাজগুলি আপনি করতে পারবেন সেগুলি হল :

- দূষণের সম্যক ব্যাখ্যা দিতে ও বায়ুদূষণে প্রাথমিক দূষণকারী পদার্থগুলির উৎস এবং বায়ুদূষণে সেগুলির বিরূপ প্রভাবের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- জলদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, শব্দদূষণ ও বিকিরণজনিত দূষণের প্রধান উৎসগুলির তালিকা দিতে এবং পরিবেশের উপর এগুলির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রযুক্তির ব্যবহার বছরের পর বছর ধরে কীভাবে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটিয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- আমাদের দেশে মাত্রাতিরিক্ত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার ভূমিকা কী তা বুঝতে পারবেন।

১৬.২ দূষণ

দূষণ সম্বন্ধে আপনি হয়তো অনেককেই কিছু-না-কিছু বলতে শুনেছেন। হয়তো অনেকেই রাস্তাঘাটে, ট্রামে বাসে, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে দূষণ সম্পর্কিত নানা ধরনের আলোচনা শুনেছেন। কিন্তু দূষণ বলতে আমরা কী বুঝি? আমাদের পরিবেশের জল, স্থল ও বায়ুর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন যা মানুষের তথা জীব ও উদ্ভিদ জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাকেই দূষণ বলা হয়। মাত্রাতিরিক্ত হারে ও পরিমাণে বিভিন্ন পদার্থ ও শক্তির (তাপ, শব্দ ও তেজস্ক্রিয়তা) পরিবেশে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের

ফলেই দূষণ ঘটে। দূষণের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যখন থেকে অধিকসংখ্যক মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে তখন থেকেই দূষণ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পরিকল্পনাবিহীনভাবে শহরাঞ্চল গড়ে ওঠায় গৃহস্থালীর দৈনন্দিন আবর্জনা, ময়লা ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। শহরাঞ্চলে গড়ে উঠছে ব্যাপক বস্তি এলাকা। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী একই ছাদের তলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে এমন দৃশ্য ভারতবর্ষের বহু বস্তি অঞ্চলে এখনও দেখা যায়। কাদা ও ধূলিতে পূর্ণ রাস্তাঘাট পরিবেশের দূষণ বৃদ্ধি করেছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মের ফলে সৃষ্টি ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ জল, স্থল ও বায়ুতে মিশে পরিবেশকে কলুষিত করে তুলেছে।

যে সকল পদার্থ পরিবেশকে দূষিত করে তাদের দূষণকারক পদার্থ বলা হয়। সাধারণত দূষণকারক পদার্থ দুই ধরনের—

১। যে সমস্ত দূষণকারক পদার্থ পরিবেশে অনুপ্রবেশ করবার পর দীর্ঘকাল যাবৎ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকে তাদের স্থায়ী দূষণকারক পদার্থ বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশক পদার্থ, পারমাণবিক বর্জ্য এবং প্লাস্টিক সামগ্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল পদার্থের অনেকগুলি বিষক্রিয়াও সৃষ্টি করে।

২। যে সমস্ত দূষণকারক পদার্থ পরিবেশে অনুপ্রবেশের পর বিয়োজনের ফলে সরলতর বস্তুতে পরিণত হয়, তাদের অস্থায়ী দূষণকারক পদার্থ বলা হয়। গৃহস্থালীর জঞ্জাল এর উদাহরণ। যে সমস্ত দূষণকারক পদার্থের বিয়োজন জীবের (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি) প্রভাবে ঘটে তাদের জৈব অবনমনযোগ্য দূষণকারক পদার্থ বলা হয়। প্রাণিজ সার এই শ্রেণীভুক্ত।

দূষণের প্রভাবে পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় সারা বিশ্বে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণী ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন। বর্তমানে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে পরিবেশ রক্ষা আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই এককে পরবর্তী আলোচনায় আপনারা জানতে পারবেন কীভাবে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ প্রবেশ করে পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে এবং কীভাবে শব্দ ও বিকিরণজনিত দূষণ আমাদের পরিবেশ তথা মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে।

১৬.২.১ বায়ুদূষণ

বর্তমান সমাজে সভ্য মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের ফলে উদ্ভূত উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সমস্যাগুলির মধ্যে বায়ুদূষণ অন্যতম। হিসাব অনুযায়ী প্রতি বৎসর প্রায় ১০ কোটি টন বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়। কলকারখানা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, যানবাহন, গৃহস্থালী, জীবাশ্ম জ্বালানি দহন প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত ধোঁয়া, ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ায় বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন ধরনের আকাশযান থেকে বায়ুমণ্ডলের প্রচুর পরিমাণ দগ্ধ এবং অদগ্ধ জ্বালানি নির্গত হয়। আকাশে জেট বিমানগুলির পশ্চাতে সাদা ধোঁয়ার পুচ্ছ আপনারা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

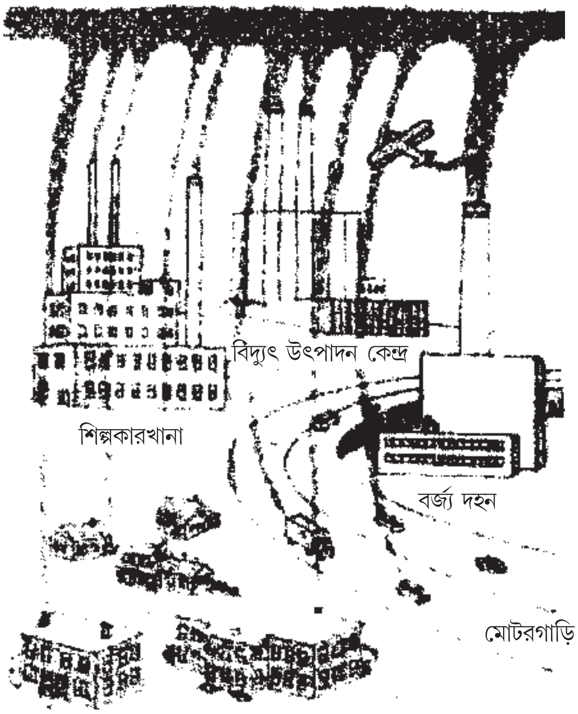

চিত্র ১৬.১ : অধিকাংশ শহরে বায়ুদূষণের কারণ

কয়লা, কাঠ, ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল প্রভৃতি জ্বালানি দহনে নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের দূষণকারক পদার্থ তৈরি হয়।

১. কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস

২. বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন

৩. বিভিন্ন ধরনের বস্তুকণা

৪. সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস

৫. নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড।

এই পাঁচ ধরনের প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থসমূহের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের দূষণকারক পদার্থ তৈরি হয়, যেগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর। আমরা প্রথমে প্রত্যেকটি প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

কার্বন মনোক্সাইড :

কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি ও জৈব আবর্জনার অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়। সমস্ত ধরনের উনুন, কলকারখানার চুল্লি, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, বায়ুমণ্ডলে কার্বন মনোক্সাইডের প্রধান উৎস। এছাড়াও ধূমপান করলে তামাকের অসম্পূর্ণ দহনে উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড শরীরে প্রবেশ

করে। কার্বন মনোক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তে উপস্থিত হিমগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় রক্তের অক্সিজেন পরিবাহিতা কমে যায় ফলে মাথাধরা, দৃষ্টিতে অস্পষ্টতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। অতিমাত্রায় কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ার ফলে মানুষ অচৈতন্য হয়ে পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

হাইড্রোকার্বন :

হাইড্রোকার্বন হল কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত এক শ্রেণীর জৈব যৌগ। যানবাহন ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্বালানির বাষ্পীভবন বা অসম্পূর্ণ দহনের ফলে বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোকার্বন বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়। কার্বনঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দহনের ফলেও হাইড্রোকার্বনসমূহ বায়ুমণ্ডলে মেশে। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হাইড্রোকার্বনগুলি বৃষ্টির ধারার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত জলাশয়ে পৌঁছে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের জলতলের উপর একটি পাতলা তৈলাক্ত আবরণ সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতিতে অবশ্যই বিরক্তিকর অনুভূতির উদ্রেক হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাইড্রোকার্বনসমূহ সরাসরি জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। সূর্যালোকের প্রভাবে এই হাইড্রোকার্বনগুলি বায়ুমণ্ডলে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর নানাবিধ গৌণ দূষণকারক পদার্থ তৈরি করে।

বস্তুকণা :

বিভিন্ন ধরনের বস্তুকণা হল তৃতীয় শ্রেণীর বায়ুদূষণকারক। এগুলি প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে উৎপন্ন সূক্ষ্ম কার্বনের কণা, ব্যাসে .০০২ মিমিরও কম।

মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানির ব্যবহার কলকারখানায় সৃষ্ট ধোঁয়া, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই, খনি খনন প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার প্রধান উৎস। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা, ছত্রাক ও পরাগের কণা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উৎপন্ন ধোঁয়া ও ছাই বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। বাতাসে প্রলম্বিত এই সমস্ত কণা বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ যেমন, সীসা, গন্ধক, হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড শোষণ করে। এই সমস্ত কণা শ্বাসক্রিয়ার ফলে ফুসফুসে প্রবেশ করলে ফুসফুসের ক্যান্সার এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। ডিজেল-চালিত মোটরগাড়ি ও ট্রাক অন্য গাড়ির তুলনায় ৩০ থেকে ১০০ গুণ বেশি কার্বন কণা নির্গত করে। অ্যাসবেস্টস্ সমন্বিত বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে অ্যাসবেস্টস অতি ক্ষুদ্র কণার আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। অতিমাত্রায় অ্যাসবেস্টস কণা ফুসফুসে প্রবেশ করার ফলে অ্যাসবেস্টস নিয়ে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে প্রায়ই অ্যাসবেস্টসিস্ নামক ক্যান্সার উদ্দীপক রোগের সৃষ্টি হয়। বিহারের সিংভূম অঞ্চলে বহু খনি-শ্রমিক এই রোগের প্রভাবে মারা গেছে। কারখানা আইন অনুসারে এই রোগটি এখন প্রাণান্তকারী রোগ হিসাবে চিহ্নিত।

অপরদিকে কাচশিল্প, মৃৎশিল্প, খনিতে কর্মরত ও পাথরকাটা ও ঘষার যুক্ত শ্রমিকদের ফুসফুসে অনবরত সিলিকা কণা সঞ্চিত হওয়ায় সিলিকোসিস নামে একটি প্রাণান্তকারী রোগ সৃষ্টি হয়।

শহরাঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঞ্জাল বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে ফলে বাতাসে ধূলিকণা, বিভিন্ন রোগজীবাণু ও নানাবিধ অবাঞ্ছিত পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ক্রমবর্ধমান যানবাহন নিঃসৃত ও শিল্পজাত ধোঁয়া এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি ধূলিকণা ভারতের অধিকাংশ শহরাঞ্চলে পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করছে। ধোঁয়া ও কুয়াশার সমন্বয়ে তৈরি ধোঁয়াশা শহরাঞ্চলের পরিবেশের যেন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি নগরীতে কর্মব্যস্ত সকাল ও সন্ধ্যায় যানবাহন থেকে এত বেশি পরিমাণ ধোঁয়া নির্গত হয় যে ওই সময়ে কোনো যানজটে আবদ্ধ হয়ে পড়লে মানুষের পক্ষে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

সালফার ডাই-অক্সাইড :

সালফার ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট অত্যন্ত ক্ষতিকর দূষণকারক পদার্থসমূহের অন্যতম। এটি সালফার ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ। সালফার বা গন্ধকযুক্ত বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি দহনে এই গ্যাস তৈরি হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস এবং এটি শ্বাসনালীতে অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে। সালফার ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফারযুক্ত বিভিন্ন অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিডগুলি বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অন্যান্য কণার সাথে যুক্ত হয়। শ্বাসগ্রহণের সময় এই সমস্ত অ্যাসিডযুক্ত কণা ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুসের টিসুর ক্ষয় সৃষ্টি করে। সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বাধা পায়। সালফারযুক্ত বায়ুতে ইস্পাত দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

সালফার ডাই-অক্সাইড যুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে অন্যান্য ধাতু, যেমন দস্তা এবং ঘরবাড়ি তৈরির পাথরও ক্ষয়িত হয়।

নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ :

নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ মুখ্য প্রাথমিক বায়ুদূষণকারক পদার্থ হিসাবে চিহ্নিত। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরি করে। কলকারখানা ও বিভিন্ন ধরনের মোটরগাড়ির ইঞ্জিন নাইট্রোজেন অক্সাইডের প্রধান উৎস। নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলির মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বায়ুদূষণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত অন্যান্য পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা তৈরি করে।

আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা :

বিভিন্ন প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থের সমন্বয়ে উৎপন্ন আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর দ্বিতীয় পর্যায়ের দূষণকারক পদার্থ। গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে নির্গত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2), ওজোন (O_3) এবং পারঅক্সিল অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (Peroxyl acetyl nitrate, PAN) নামক একটি জটিল

যৌগ তৈরি করে। এই সমস্ত পদার্থের মিশ্রণে বায়ুমণ্ডলে যে হলুদাভ ধোঁয়াশার আবরণ সৃষ্টি হয় তাকেই আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা বলা হয়। প্রশ্বাসের সাথে গৃহীত ওজোন মানুষের শ্বাসযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে। ওজোনের সংস্পর্শে রবারের তৈরি সামগ্রী ও বস্ত্রাদির ক্ষতি হয় এবং রঙিন চিত্রাদি বিরঞ্জিত হয়। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, ধোঁয়াশা কাঠের সামগ্রীর পক্ষেও ক্ষতিকর। পারঅক্সিল অ্যাসিটাইল নাইট্রেট উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর প্রভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বিঘ্নিত হয়, গাছের পাতা স্থানে স্থানে বিবর্ণ হয়ে যায়।

অম্লবর্ষণ :

প্রাকৃতিক বৃষ্টি বিশুদ্ধ জলের মতো অম্ল বা ক্ষারভাব বর্জিত নয়। বরং বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে বৃষ্টির জলের বিক্রিয়ায় মৃদু কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ায় প্রাকৃতিক বৃষ্টির জল সামান্য অম্লভাব সম্পন্ন হয়। বৃষ্টির জলের pH-এর মান সাধারণত ৫.৬ হয়। বৃষ্টির জলের অম্লভাব (pH-এর মান) একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে তাকে আমরা অম্লবৃষ্টি বলি। অম্লবর্ষণ বায়ুদূষণের একটি পার্শ্ব প্রভাব।

বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন আম্লিক গ্যাস যেমন সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়ায় যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও বিভিন্ন নাইট্রোজেনযুক্ত অ্যাসিড তৈরি করে। বৃষ্টির সঙ্গে এই সমস্ত অ্যাসিড ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। অম্লবর্ষণের অম্লভাব বা pH-এর মান বায়ুমণ্ডলীয় সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের গাঢ়ত্বের উপর নির্ভরশীল এবং এটি ৫.৬ থেকে শুরু করে ৩.০ অবধি হতে পারে।

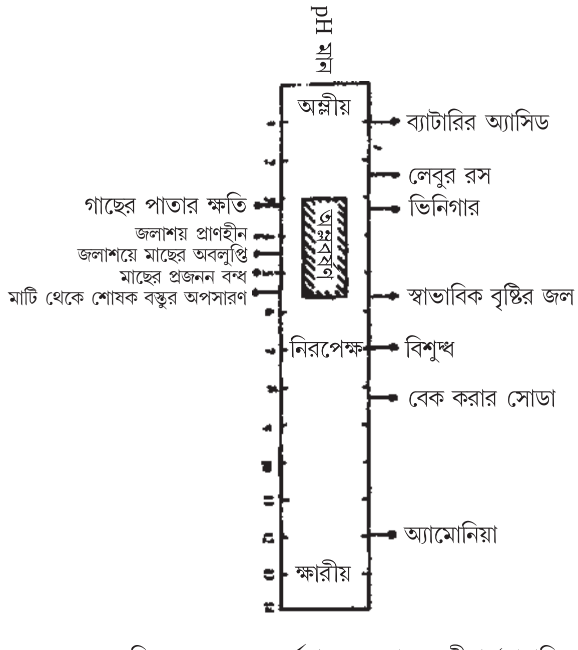

pH হল কোনও জলীয় দ্রবণের অম্লতা বা ক্ষারের পরিমাণ প্রকাশের জন্য একটি গাণিতিক মান। এই মান শূন্য থেকে চোদ্দোর মধ্যে থাকে। (০-১৪)। বিশুদ্ধ জলের pH-এর মান সাত (৭)। দ্রবণের pH-এর মান সাতের নীচে থাকলে দ্রবণটি আম্লিক হয়, আবার যে সমস্ত দ্রবণের pH-এর মান সাতের অধিক তারা ক্ষারীয়।

চিত্র ১৬.২ : অম্লবর্ষণের pH মানের সীমা (ছায়াঙ্কিত অংশ)। বিভিন্ন বস্তুর pH মান ও বাস্তুতন্ত্রের উপর অম্লবর্ষণের প্রভাব দেখানো হয়েছে।

এখন আমরা বাস্তুতন্ত্রের উপর অম্লবর্ষণের প্রভাবসমূহ আলোচনা করব। অম্লবৃষ্টিতে অম্লের ভাগ অনেক সময় এত বেশি থাকে যা সরাসরি গাছের পাতার ক্ষতি করে। বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তী বনাঞ্চল অম্লবর্ষণের প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। গাছপালার বৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি পুষ্টিকারক পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অম্লবর্ষণের ধারায় মাটি থেকে ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং নদীনালা ও জলাশয়ের জলে মেশে। ফলে গাছের পুষ্টি আহরণ ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অত্যধিক অম্লবাহী বৃষ্টির জল জলাশয়ে মেশার ফলে তলায় জন্মানো কিছু শ্যাওলা ও ছত্রাক ছাড়া অন্য প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অম্লভাব বৃদ্ধির কারণে জলাশয়ের জলে বিভিন্ন ধাতু বিশেষত অ্যালুমিনিয়ামের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়। মাছের ফুলকার উপর দ্রবীভূত অ্যালুমিনিয়ামের প্রভাবে শ্বাসরোধে মাছ মারা যায়। এই সমস্ত জলাশয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী পাখি বিভিন্ন জলজ পোকামাকড় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করায় এদের শরীরেও অতিমাত্রায় অ্যালুমিনিয়াম সঞ্চিত হয় এবং অ্যালুমিনিয়ামজনিত বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

অম্লবর্ষণের প্রভাবে মার্বেল পাথরের মূর্তি বা সৌধ ও অন্যান্য ধাতব সামগ্রী ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

পরিবেশের উপর অম্লবর্ষণের প্রভাব আলোচনা করার পর এখন দেখা যাক অম্লবর্ষণ কীভাবে রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সালফারযুক্ত কয়লা দহনের ফলে উৎপন্ন সালফার ডাই-অক্সাইডই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অম্লবর্ষণের প্রধান কারণ। তাই অতিমাত্রায় সালফারযুক্ত কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম সালফারযুক্ত কয়লা ব্যবহার করা উচিত এবং সালফার নির্মুক্তকরণের জন্য পোড়ানোর আগে কয়লা ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। কলকারখানার লম্বা চিমনির মুখে স্ক্রাবার জাতীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রবেশ রোধ করা সম্ভব। বায়ুমণ্ডলে অবাঞ্ছিত সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কয়লা দহনের এক নূতন পদ্ধতি বিকাশলাভের পথে। এই পদ্ধতিতে চুল্লিতে শুধুমাত্র কয়লার পরিবর্তে কয়লা ও চুনাপাথরের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। অম্লবর্ষণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন জলাশয়, নদীনালা ও মাটির স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অম্লবর্ষণের ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে জলাশয় ও শস্যক্ষেত্র অতিমাত্রায় আম্লিক হয়ে পড়েছে, সেখানে অম্লের পরিমাণ হ্রাস করবার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী চুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও এতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায় না। এছাড়া সমগ্র অরণ্যে চুনাপাথর ছড়ানোও সম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন উৎস থেকে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের নির্গমন হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই অম্লবর্ষণ রোধ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই একমত হবেন।

আবহাওয়া :

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কার্বনকণা ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, উভয়ের জন্যই যে বায়ুদূষণ ঘটে তার ফলে আগামী দিনে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এও অনুমান করা হয় যে গ্রীনহাউস ক্রিয়ার দরুন ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

সূর্য থেকে যে তাপ ও আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডলে আপতিত হয় তার কিয়দংশ বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যায় কিন্তু বেশিরভাগই পৃথিবীতে পৌঁছায় এবং ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গের তাপ বিকিরণ উদ্‌গত হয়। এই বিকীর্ণ তাপের অনেকটাই বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। এই পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠ দিনের বেলায় কিছুটা তাপ লাভ করে এবং ভূপৃষ্ঠে উষ্মতার সাম্য অবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু গ্যাস যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতির পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত বাড়তি তাপ এবং ভূপৃষ্ঠের উষ্মতা বেড়ে যাবে। এই ঘটনাকে গ্রীনহাউস ক্রিয়া বলা হয়। গ্রীনহাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাসসমূহকে বলা হয় গ্রীনহাউস গ্যাস। গ্রীনহাউস হল ছিদ্রহীন কাচঘর। অত্যধিক শীতে উষ্ম অঞ্চলের গাছপালার সংরক্ষণ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়। গ্রীনহাউসের কাচের ছাদ ও দেওয়াল সূর্যরশ্মিকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু ভিতরের তাপকে সহজে বাইরে বেরোতে দেয় না, ফলে ঘরের ভিতরে ক্রমশ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট উষ্মতার সৃষ্টি হয়। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে রাখা চারিদিক আবদ্ধ মোটরগাড়ির ভিতরে অসহনীয় তাপ অনুভব করবার অভিজ্ঞতা হয়তো আপনাদের অনেকেরই আছে। গ্রীনহাউস ক্রিয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটে।

আবহাওয়ামণ্ডল পরিবর্তনে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেখা যায় যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী ৩০ বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব প্রায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আশঙ্কা করা হয় যে ভবিষ্যতে এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কেন বৃদ্ধি পায় তা আমরা এখন আলোচনা করব। ১৪নং একক থেকে আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, গাছপালা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও খাদ্য প্রস্তুত করতে তা ব্যবহার করে। অরণ্যে আশ্রিত অসংখ্য উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয়। ফলে ব্যাপক অরণ্য সংহার বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। শিল্পক্ষেত্রে, গৃহস্থালিতে ও যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে বায়ুমণ্ডলে আরও কার্বন ডাই-অক্সাইড যোগ হচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে, ফলে পৃথিবীর বার্ষিক গড় উষ্মতা ৩° থেকে ৮° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। পৃথিবীর এই উষ্মতা বৃদ্ধিতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে। এতে কৃষিকার্যের ক্ষতি হবে এবং তার ফলে খাদ্যসংস্থান ও কৃষিনির্ভর অন্যান্য ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেবে। মেরু অঞ্চল ও পর্বতগাত্রে সঞ্চিত বরফের স্তর অনেকটাই গলে সমুদ্রে চলে আসবে। এতে সমুদ্রের জলস্তর স্থায়ীভাবে বেশকিছুটা বেড়ে যাবে। উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ লোকালয় ও শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হয়ে পড়বে। আশঙ্কা করা হয় যে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে লন্ডন, গ্লাসগো, ফ্লোরিডা, টোকিও, ওসাকা, মন্ট্রিয়ল, স্টকহোম, কোপেনহাগেন ও কলকাতা শহরের অনেকটাই জলের তলায় চলে যাবে।

ব্যাপক বায়ুদূষণের প্রভাবে একদিকে যেমন পৃথিবীর উষ্মতা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে তেমনি অন্যদিকে আবার বাতাসে প্রলম্বিত কণার পরিমাণবৃদ্ধির ফলে উষ্মতা হ্রাসেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান। ভূমিক্ষয়

ও ধূলিকণা ছাড়াও এর কারণ কলকারখানা ও যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, দাবানল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎক্ষিপ্ত বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া, ঝুল ও অন্যান্য পদার্থ। এগুলি বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটি অস্বচ্ছ মেঘের আস্তরণ তৈরি করবে। ফলে সূর্যের আলো ও তাপ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধা পাবে। পর্যাপ্ত সূর্যতাপের অভাবে ভূপৃষ্ঠের স্থল ও জলভাগের উষ্মতা হ্রাস পাবে। হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তিশালী দেশ, রাশিয়া ও আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডারে ৫০,০০০-এর মতো পারমাণবিক বোমা মজুত আছে, তার সামান্য ভগ্নাংশও যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় তবে বিভিন্ন জ্বালানি ভাণ্ডারের দহন, ইমারত, সেতু প্রভৃতি ধ্বংসের ফলে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা, ধোঁয়া ও আবর্জনা বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হবে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দীর্ঘদিন ধোঁয়া ও ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। সূর্যের আলো ও তাপ যথেষ্ট পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে আসতে না পারায় পৃথিবীর উষ্মতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। পৃথিবীতে ‘নিউক্লীয়’ শীতঋতু নামে কথিত এক হিমযুগের সৃষ্টি হবে। অত্যধিক শৈত্য সমস্ত উদ্ভিদকে ধ্বংস করবে যার ফলে গ্রহের সর্বত্র সব প্রাণীই খাদ্যাভাবে মারা যাবে।

সমগ্র বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য বিপদ ও ভয়ানক পরিণতির সম্পর্কে অত্যন্ত শঙ্কিত ও বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের মানুষ আশা করে যে পৃথিবীর পরস্পরবিরোধী শক্তিশালী দেশসমূহ শান্তিপূর্ণ পথেই তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিরসনে সমর্থ হবে। পারমাণবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী প্রভাব থেকে মানুষ ও তার পরিবেশকে মুক্ত রাখার জন্য একদিকে যেমন নূতন করে পারমাণবিক অস্ত্রাদি তৈরি বন্ধ করতে হবে তেমনি অন্যদিকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের অস্ত্রভাণ্ডারে মজুত পারমাণবিক অস্ত্রাদির ধ্বংস ও বিলোপের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ওজোন স্তর হ্রাস :

বিগত একাধিক দশক ধরেই ওজোন স্তর হ্রাসের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগের সঞ্চার হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল কী কারণে ওজোন স্তর হ্রাস পায়? ওজোন স্তর সঙ্কুচিত হওয়ার পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহারই এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় গ্যাসীয় কিন্তু চাপ প্রয়োগে অতি সহজেই এদের তরলে পরিণত করা যায়। এজন্য এই যৌগগুলি রেফ্রিজারেটরের হিমায়ক হিসাবে, এরোসল স্প্রে ও প্লাস্টিক ফোম তৈরিতে ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত। এই স্থায়ী যৌগগুলি বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘকাল যাবৎ অবস্থান করে। বিভিন্ন উৎস থেকে নির্মুক্ত এই ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনসমূহ বায়ুমণ্ডলের নীচু স্তরে কোনো বিক্রিয়া করে না। কিন্তু অতি ধীরে ধীরে (প্রায় ৭-৮ বছর বা আরও দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে) এরা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তর অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে এবং সেখানে বর্তমান ওজোন স্তরের বিনাশ ঘটায়। সূর্যালোকে উপস্থিত অতিবেগুনি রশ্মির

প্রভাবে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের অণু ভেঙে যায় এবং এর ক্লোরিন পরমাণু নির্মুক্ত হয়। পরবর্তী ধাপে এই ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে এবং ওজোন ভেঙে অক্সিজেন তৈরি হয়।

নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডও ওজোন ধ্বংসের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। মনে হয়, বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরগুলিতে চলাচলকারী জেট বিমান থেকে যে বিপুল নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয় তাদের প্রভাবেও ওজোন স্তরের বিনাশ ঘটছে।

বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বর্তমান কয়েক কিলোমিটার পুরু ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে নেওয়ায় এই রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। আশঙ্কার কথা এই যে, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের প্রভাবে ব্যাপকহারে ওজোনস্তর হ্রাস পাওয়ার দরুন আরও বেশি অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাবে। এর ফলে ত্বকের ক্যান্সার, শস্যের ক্ষতি, অক্সিজেন চক্রের বিপর্যয়, এমনকি আবহাওয়ামণ্ডলের বিকৃতিও ঘটতে পারে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ :

এ পর্যন্ত আপনারা বায়ুদূষণের বিভিন্ন উৎস ও বায়ুদূষণজনিত প্রভাব সম্পর্কে জেনেছেন। এখন দেখা যাক এই বায়ুদূষণ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

১। বায়ুমণ্ডলে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার উপস্থিতি রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। আজকের কর্মব্যস্ত সভ্যজগতে মানুষ দ্রুততর পরিবহন ব্যবস্থাই অধিক পছন্দ করে। রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের মোটরগাড়ির সংখ্যা প্রতি বছর লক্ষাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফল বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন ও আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার বর্ধিত হারে উৎপাদন। এই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রয়োজন দূষণমুক্ত বিকল্প যানবাহনের প্রবর্তন। পেট্রল বা ডিজেল চালিত মোটরগাড়ি ও দ্বিচক্রযানের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত দূষণহীন যানবাহন উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে অথবা মোটরগাড়ি শিল্পে এমন যন্ত্র উদ্ভাবন করতে হবে যা যানবাহনে যুক্ত করে দূষণকারক বিভিন্ন পদার্থের নির্গমন যথাসম্ভব কমানো যায়।

২। বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত বস্তুকণার বেশিরভাগই বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়। স্ক্রাবার, ফিলটার, প্রেসিপিটেটর প্রভৃতি আধুনিক দূষণকারী যন্ত্রাদির ব্যবহারে বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই সমস্ত দূষণরোধী ব্যবস্থা অবশ্যই অর্থব্যয়সাপেক্ষ কিন্তু এগুলি প্রাণ রক্ষা করে। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ শিল্পমালিক শুধুমাত্র ব্যয় ও বাণিজ্যিক মুনাফার কথাই চিন্তা করেন কিন্তু তাঁদেরই কলকারখানার ধোঁয়া ও ভুসোয় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

৩। প্রধানত বিভিন্ন ধরনের চুল্লিতে কয়লাদহনের ফলেই বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রথমত অধিক

সালফারযুক্ত জ্বালানির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম সালফারযুক্ত জ্বালানি যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিকল্প ব্যবস্থা কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হতে পারে না, কারণ স্বল্পমাত্রায় সালফারযুক্ত জ্বালানির সরবরাহ অপেক্ষাকৃত কম এবং অন্যদিকে পারমাণবিক জ্বালানির নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। সুতরাং দ্বিতীয় বিকল্প হিসাবে যে ব্যবস্থাটি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য তা হল কয়লা ব্যবহারের পূর্বে কয়লা থেকে সালফার অপসারণ। তৃতীয় বিকল্প হল গ্যাস নির্গমনের পথে স্ক্রাবার ব্যবহার, যার সম্বন্ধে আপনি আগেই জেনেছেন।

৪। গৃহস্থালিতে রান্নার উনুনের ধোঁয়া বায়ুদূষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধোঁয়াহীন চুল্লি, সৌরচুল্লি ও জৈবগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে রান্নাঘর থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব। এই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দুই ধরনের সুবিধা রয়েছে। প্রথমত রান্নার কাজে ব্যবহার্য এই সমস্ত বিকল্প সামগ্রী সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত এদের ব্যবহারে উদ্ভূত বায়ুদূষণেও অত্যন্ত কম।

সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন যে প্রযুক্তির অগ্রগতি ও শিল্পায়নের সঙ্গে বায়ুদূষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতীতে মূলত যানবাহনে গতি বৃদ্ধি ও জীবাশ্ম জ্বালানি দহনে প্রাপ্ত শক্তিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগানোর জন্যই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হত। উদ্ভূত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে মানুষ ছিল নিরুদ্বেগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে তার থেকে বিপদের সম্ভাবনা এত বেড়ে গেছে যে তা আর উপেক্ষা করা যায় না।

পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশসমূহের অসংখ্য মানুষের কাছে বায়ুদূষণ অন্য অনেক অর্থ বহন করে। এই সকল দেশে গ্রামাঞ্চলে শুকনো পাতা, গাছের ডালপালা ও গোবর ঘুঁটে আজও রান্নার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন রান্নার কাজে যুক্ত গৃহবধূরা এইসব জ্বালানি দহনে উদ্ভূত অপরিমিত তাপ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেখা গেছে যে, গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষ এই কারণে প্রায় অন্ধ হয়ে যান। আবার, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলেই মানুষ অত্যন্ত ধূলিপূর্ণ বাতাবরণের মধ্যে বাস করেন যার ফলে প্রায়ই তাঁদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতাসে উপস্থিত নানা ক্ষতিকারক পদার্থ প্রতিনিয়ত শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে ছোট ছোট কলকারখানা ও খনিতে কর্মরত শ্রমিকের দেহে প্রবেশ করছে। ফলে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের নানা অসুখ, এমনকি অকালমৃত্যুও ঘটছে। এছাড়াও মশা, মাছি ও দুর্গন্ধ বাহিত বাতাস এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে বায়ুদূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নির্ণয় করতে হবে।

এটা বোধহয় বলা সঙ্গত হবে যে দারিদ্র্যই বিপদের সবচেয়ে বড় কারণ, কেননা এর জন্যই মানুষ নোংরা আবর্জনার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয় এবং যে অবস্থায় পশুদেরও রাখা অনুচিত এমন অবস্থায় তাদের কাজ করতে হয়।

এর পর আরও এগোনোর আগে দুটি অনুশীলনীর উত্তর করে নিন।

অনুশীলনী—১

নীচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে উক্তিগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

(ক) মানুষের তৈরি কোনোকিছু যখন এমন পরিমাণে উৎপন্ন হয় যাতে প্রাণীর সুস্বাস্থ্য ব্যাহত হয় তখনই .... ঘটে।

(খ) প্রধান প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থগুলি হল ...., ..., ..., ... এবং ....।

(গ) .... এবং .... এর সমন্বয়ে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা তৈরি হয়।

(ঘ) .... এর প্রভাবে মাটি থেকে বিভিন্ন পুষ্টিকারক পদার্থ ধুয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুসংখ্যক ধাতু যেমন, অ্যালুমিনিয়ামের ফলে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদে বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

(ঙ) বায়ুমণ্ডলে .... গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি গ্রীনহাউস ক্রিয়া সৃষ্টির অন্যতম কারণ এবং এর দরুন পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের .... উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।

(চ) ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে চলাচলকারী জেট বিমান নিঃসৃত .... এবং রেফ্রিজারেটরে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বর্তমান ওজোন স্তর বিনাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন, ওজোন, সালফার ডাই-অক্সাইড দূষণ, হাইড্রোকার্বন, পারঅক্সিল অ্যাসেটাইল নাইট্রেট, বস্তুকণা, অম্লবর্ষণ, নাইট্রোজেন-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, উষ্মতা, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড)।

অনুশীলনী—২

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের তিনটি ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করুন।

১৬.২.২ জলদূষণ

টাটকা জলের উৎসে জলদূষণ আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি ভয়াবহ পরিবেশ সমস্যা হিসাবে দেখা গিয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদী, হ্রদ ও জলাশয়ের জল বর্তমানে ভীষণভাবে দূষিত এবং পানের উপযোগী নয়। হিসাব করে দেখা গেছে ভারতে সমস্ত অসুখের দুই-তৃতীয়াংশই টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, জন্ডিস,

কলেরা, উদরাময় ও আমাশয়ের মতো জলবাহিত রোগ। ফলে বছরে প্রায় ৭.৩ কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত জলদূষণকারক পদার্থসমূহ কীভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিতলে জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে তুলছে তা ১৬.৩ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এখন আমরা পৃথকভাবে প্রতিটি উৎস এবং এই সকল উৎসের মাধ্যমে জলদূষণ প্রক্রিয়া একে একে আলোচনা করব।

১। শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। শিল্প-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কাজে যেমন শীতলীকরণ, ধৌতকরণ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের গাঢ়ত্ব হ্রাস প্রভৃতি কারণে বিপুল পরিমাণে জল ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার তৈরির কারখানা, ইস্পাত কারখানা, তৈল পরিশোধনাগার, কাগজের কল, চিনি কল প্রভৃতি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শিল্পজাত বর্জ্য প্রায়ই নদী, নালা, জলাশয় ও সাগরের জলে ফেলা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, কারখানার চারদিকে দুর্গন্ধপূর্ণ রাসায়নিক মিশ্রিত জল দাঁড়িয়ে আছে যেন নাগরিক কর্তব্যবোধের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞার এক মূর্ত প্রতীক। এই দূষিত জল বৃষ্টির জলের সাথে মেশে এবং নদী, জলাশয় ও সমুদ্রে প্রবেশ করে, ফলে জলদূষণ ঘটে।

২। শহর ও গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালিজাত মোট বর্জ্য পদার্থের অর্থাৎ ময়লা জল ও জঞ্জালের পরিমাণ শিল্পজাত বর্জ্যের প্রায় ৪ গুণ। এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থের অধিকাংশই অপরিশোধিত অবস্থায় নদী, জলাশয় ও সাগরের জলে গিয়ে মেশে। ভারতবর্ষের ৩,১১৯টি ছোট-বড় শহরের মধ্যে মাত্র ২১৭টিতে আংশিক (২০৯) বা সম্পূর্ণ (৮) আবর্জনা শোধন ব্যবস্থা বর্তমান। এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যেখানে সমস্ত বস্তি এলাকা জুড়ে নোংরা বর্জ্য জল দাঁড়িয়ে আছে।

৩। কৃষিতে নানা ধরনের রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত জল এই সমস্ত পদার্থের সংস্পর্শে এসে দূষিত হয়ে পড়ে। আবার এই দূষিত জল মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলে দূষণ ঘটায়।

৪। তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত জল, যার সঙ্গে অনেক সময় নানা রাসায়নিক পদার্থও মিশ্রিত থাকে, তা উত্তপ্ত অবস্থায় পুনরায় মূল জলস্রোতে ফেরত পাঠানো হয়। উষ্মতা বৃদ্ধির ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। নদী ও সাগরের জলে চলাচলকারী বিভিন্ন ধরনের পারাপারের যন্ত্রচালিত নৌকা, স্টিমার ও জাহাজ নিঃসৃত তেল জলের উপরিতলে তেলের একটি পাতলা আস্তরণ তৈরি করে। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। সমুদ্রে তেল অনুসন্ধান এবং দুর্ঘটনাবশত সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়ার ফলেও জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

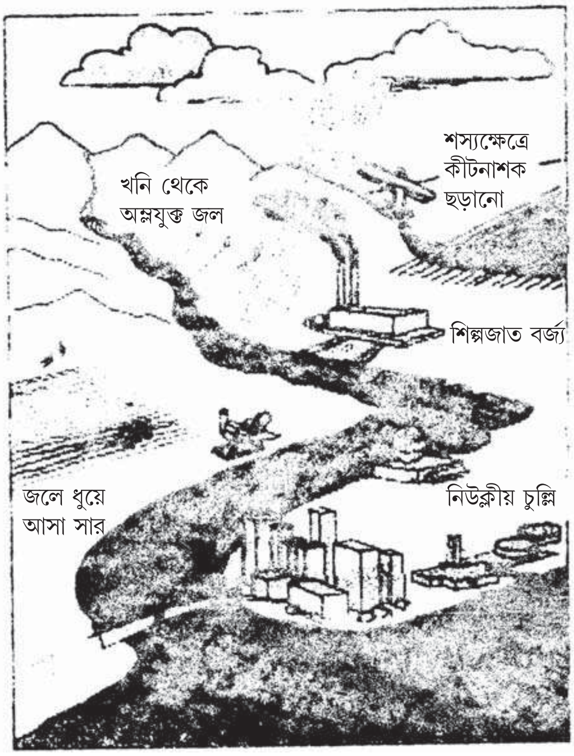

চিত্র ১৬.৩ : মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দরুন জল কীভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে তা এই চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

৬। খনি অঞ্চল থেকে নির্গত অম্লযুক্ত জল ও বায়ুদূষণের ফলে সৃষ্ট অম্লবর্ষণের প্রভাবে নদী, জলাশয় ও সমুদ্রের জল দূষিত হয়।

৭। বিমান থেকে স্প্রে করা কীটনাশকের মতো যে সমস্ত সূক্ষ্ম কণা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, সেগুলি বৃষ্টির সঙ্গে নেমে এসে নদীনালা ও জলাশয়ে গিয়ে মেশে ও সেখানকার জলের দূষণ ঘটায়।

এ পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত জলরাশি কীভাবে বিভিন্ন উপায়ে দূষিত হয়ে পড়ছে। এখন ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যায় এই জল কতখানি দূষণমুক্ত ও নিরাপদ।

মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের প্রভাবে দূষিত জল মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভের জলস্তরে পৌঁছানোর আগেই অধিকাংশ ক্ষতিকারক পদার্থ জল থেকে অপসারিত হয়। সুতরাং আশা করা যায় যে ভূগর্ভস্থ জল স্বাভাবিক অবস্থায় দূষণমুক্ত থাকবে। কিন্তু কখনও কখনও ভূগর্ভস্থ জলও ভারী ধাতু, বিভিন্ন নাইট্রেট ও ক্লোরাইড দ্বারা দূষিত হতে দেখা যায়।

নিশ্চয়ই ভাবছেন ভূগর্ভস্থ জলে এই সমস্ত দূষণকারক পদার্থগুলি আসছে কীভাবে?

আগে বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য ও দূষিত জল নিয়মিতভাবে মাটির নীচে গর্তে জমা করা হত। আবার অনেক সময়ে মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বর্জ্য পদার্থ পুঁতে ফেলা হত। এই সমস্ত জায়গা থেকে

বিভিন্ন দূষণকারক পদার্থ মাটি চুঁইয়ে ধীরে ধীরে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে পৌঁছায়, ফলে ভূগর্ভের জল দূষিত হয়ে ওঠে। শস্যক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত হারে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারও ভূগর্ভস্থ জল দূষণে অংশগ্রহণ করে, কেননা এগুলিও ক্রমশ মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে।

ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত ও ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ প্রক্রিয়া জানবার পর আমরা এখন উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর জলদূষণের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

সবচেয়ে বড় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্গত ভারী ধাতু, যেমন পারদ ও সীসা নদীনালার জলে মেশায়। এই সমস্ত দূষণকারক পদার্থের প্রভাবে ওইসব নদীর জল স্নান ও পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দূষিত জলের মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করাও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

প্রধানত প্লাস্টিক তৈরির কারখানা, কাগজ কল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও ব্যাটারি তৈরির কারখানা ও ক্লোরো-অ্যালকালি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি জলে পারদের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটায়। এই পারদ ক্রমে নদী ও জলাশয়ের জলের খাদ্যশৃঙ্খলে উপস্থিত হয়। একবার খাদ্যশৃঙ্খলে অনুপ্রবেশের পর শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরেই পারদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশৃঙ্খলের সবচেয়ে নীচের ধাপে উপস্থিত উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত পারদ খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন পথ বেয়ে (উদ্ভিদ $\rightarrow$ মাছ $\rightarrow$ মানুষের দেহ) পরিশেষে মানুষের দেহে উপস্থিত হয়।

জাপানের মতো যেসব দেশ মাছ ও অন্য সমুদ্রজাত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল, সেখানে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিল্পজাত বর্জ্যপদার্থ থেকে পারদ বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। পঞ্চাশের দশকে জাপানে এক ব্যাপক পারদ বিষক্রিয়ার ঘটনার পর এ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে মিনামাতা উপসাগরের জল মিথাইল পারদ দ্বারা দূষিত হওয়ার পর সেখানকার যে সমস্ত অধিবাসী ওই উপসাগরের খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের, ওষ্ঠের ও জিহ্বার অসাড়ভাব এবং পেশী নিয়ন্ত্রণের শক্তির অভাব দেখা দেয়। এছাড়া বধিরতা, দৃষ্টির অস্পষ্টতা, নানারকম মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটেছিল। আক্রান্ত ৫২ জনের মধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু ঘটে ও ২৩ জন চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান।

আর্সেনিক দূষণ :

বিগত দুই দশক যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিকের সন্ধান মিলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পানীয় জলে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা হল প্রতি লিটারে ১০-৫০ মাইক্রোগ্রাম। জলে আর্সেনিকের পরিমাণ এই মাত্রা অতিক্রম করলে এবং ক্রমাগত এই আর্সেনিক সমৃদ্ধ জল পান করলে শরীরে আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়া দেখা দেয়। জাপান, চিলি, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, ব্রাজিল ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিকের প্রভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গেছে যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে ও কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় নলকূপের জলে সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমার উপরে আর্সেনিক বর্তমান।

আর্সেনিক দূষণের বিশেষ লক্ষণগুলি হল শরীরে কালো কালো দাগ, হাত ও পায়ের তলায় ছোট ছোট ফুস্কুরি, আঙুলের নখে পচন, চুল ওঠা ইত্যাদি। দীর্ঘকাল যাবৎ আর্সেনিক দূষণের প্রভাবে লিভার, কিডনি, মূত্রস্থলী ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

বিজ্ঞানীদের ধারণা যে মাটির একটি বিশেষ স্তরে বর্তমান একপ্রকার শিলাস্তরই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের জন্য সম্ভবত দায়ী। বিভিন্ন প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ জল আহরণের ফলে বিশেষ করে চাষের কাজে ব্যাপক হারে জল তোলার জন্য ভূগর্ভের জলস্তর অনেক নীচে নেমে যায়। এই অবস্থায় ভূগর্ভস্থ আর্সেনোপাইরাইট স্তর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং এই স্তরের অজৈব আর্সেনিক যৌগ জলের সঙ্গে মিশে যায়। বিজ্ঞানীদের অভিমত, অবিলম্বে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়াসে আর্সেনিক দুর্গত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পেট্রোলিয়ামের কূপ খনন, আহরণ, শোধন প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের ফলে বন্দর থেকে ও তেলবাহী জাহাজ থেকে উপচে পড়ে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ নদী ও সাগরের জলে প্রবেশ করে। ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বিনাশ ঘটে এবং জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে। সামুদ্রিক পাখির ডানা সাগরের জলে ভেসে থাকা তেলে ভিজে যাওয়ায় ভারী হয়ে ওঠে ফলে এরা ভাসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং জলে ডুবে মারা যায়। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি শীতল করার জন্য জলের ব্যবহার হয়। সেখানকার গরম জল নদী বা জলাশয়ের জলে মেশায় নিকটবর্তী অঞ্চলের জলের উষ্মতা বেড়ে যায়। যেসব জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের সহনক্ষমতা কম তারা অনেকেই এর ফলে মারা পড়ে।

অতিপৌষ্টিকতা (Eutrophication)

দুগ্ধকেন্দ্র, খাদ্যদ্রব্য টিনজাত করার কারখানা, কাগজ কল, শ্বেতসার তৈরির কারখানা, কসাইখানা, চিনিকল প্রভৃতি শিল্পের বর্জিত ময়লা জলে এবং শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলে নানারকম পুষ্টিকারক পদার্থ বর্তমান থাকে। এই সমস্ত জল প্রবেশ করায় জলাশয়ের জলের পৌষ্টিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ, মূলত নীলচে সবুজ-শ্যাওলা (algae) দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকেই 'অতিপৌষ্টিকতা' বলা হয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে অনেক সময় সমস্ত জলাশয়ই পুষ্টিকর পদার্থে পূর্ণ এক সবুজ তরলে পরিণত হয় এবং জলতল শ্যাওলায় আবৃত হয়ে যায়। একে বলে শৈবাল-বিকাশ (algal bloom)। অবশেষে এই সমস্ত শ্যাওলার মৃতাবশেষ পচে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। জলাশয়ের জলে শ্যাওলার মৃতাবশেষ বিয়োজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের প্রভাবে শ্যাওলার মৃতাবশেষ বিয়োজিত হওয়ার সময়ে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও সজীব শ্যাওলা রাতের বেলায় তাদের শ্বসন ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জল থেকেই গ্রহণ করে। এসবের ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পায়, ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের

অভাবে মারা যায়। অতিপৌষ্টিকতা শুধুমাত্র পুকুর বা আবদ্ধ জলাশয়েই পরিলক্ষিত হয়। প্রবহমান জলধারায় অতিপৌষ্টিকতা ঘটে না।

এখন প্রশ্ন হল অতিপৌষ্টিকতাজনিত সমস্যা সমাধানের উপায় কী? প্রথম উপায় হল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস নির্গত বর্জ্যবাহী জল থেকে পুষ্টিকারক পদার্থের অপসারণ। কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় সমস্যা সমাধানের ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের কথা ভাবা হচ্ছে। এই পুষ্টিসমৃদ্ধ জল শস্য উৎপাদনের জন্য সেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার অগভীর পুকুর ও জলাশয়ে এই জল জমিয়ে শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ উৎপাদনের মাধ্যমে জৈব গ্যাস তৈরি করাও সম্ভব।

অনুশীলনী—৩

নীচের শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

জলদূষণের প্রধান উৎসগুলি হল ...., ... এবং ....। জলে উপস্থিত জৈব পদার্থসমূহের বিয়োজন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে .... এর প্রয়োজন। জলে দ্রবীভূত .... এর পরিমাণ হ্রাসের ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যায়। জৈব পদার্থ ও কিছু শিল্পজাত বর্জ্য জলাশয়ের জলে মেশায় জলাশয় .... দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ফলে .... ঘটে। পুষ্টিসমৃদ্ধির কারণে উদ্ভূত শৈবাল বিকাশ শুধুমাত্র .... জলাশয়েই পরিলক্ষিত হয়।

(অক্সিজেন, পৌর বর্জ্য, পুষ্টিকারক পদার্থ, শিল্পজাত বর্জ্য, অতিপৌষ্টিকতা, আবদ্ধ, অক্সিজেন, শস্যক্ষেত্রের আবর্জনা।)

১৬.২.৩ মৃত্তিকা দূষণ

মানুষের অবিবেচক ও অবৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ফলে গ্রাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলে মৃত্তিকা দূষণ দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে। গৃহস্থালি ও শিল্পজাত কঠিন বর্জ্য পদার্থ অপরিকল্পিতভাবে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক মৃত্তিকা দূষণ ঘটে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা না থাকায় হাজার হাজার মানুষ উন্মুক্ত জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে প্রতিনিয়ত মাটিকে দূষিত করে তুলছে। শিল্পাঞ্চলে ভারী ধাতু, নানা ধরনের প্লাস্টিক এবং কীটনাশকের মতো দীর্ঘস্থায়ী জৈব যৌগই মৃত্তিকা দূষণের প্রধান কারণ। অনেক সময় মাটির বিষাক্ত ও বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে এবং মলমূত্রের সঙ্গে বার না হয়ে দেহের মধ্যে জমা হতে থাকে। একবার খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করার পর প্রত্যেক স্তরে এগুলির ঘনত্ব বাড়তে থাকে। কীটনাশক ডি.ডি.টি-র কাহিনী আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন। ডি.ডি.টি. একটি অত্যন্ত স্থায়ী যৌগ এবং প্রকৃতিতে সহজে এর অবনমন বা বিয়োজন ঘটে না। একবার প্রয়োগ করার পর প্রায় ১৫ বৎসর কাল অবধি এটি পরিবেশে অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করে। মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন কীট, পতঙ্গ ও জীবাণুর দেহে সঞ্চিত ডি.ডি.টি.

ক্রমে খাদ্যশৃঙ্খল বেয়ে পাখিদের দেহে প্রবেশ করে। খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে (উৎপাদক থেকে শুরু করে খাদক অবধি) ডি.ডি.টি-র উত্তরোত্তর পরিমাণ বৃদ্ধি ১৬.৪ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। অতিমাত্রায় সঞ্চিত ডি.ডি.টি-র প্রভাবে পাখিদের প্রজনন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাখির ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যায় এবং পাখির বাসায় সহজেই সেগুলি ভেঙে যায়। একইভাবে খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদির মাধ্যমে ডি.ডি.টি. অন্যান্য প্রাণীদেহে ও মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ও স্থায়ীভাবে সঞ্চিত হয়। অন্যান্য কীটনাশক পদার্থসমূহও অনুরূপভাবে মাটিকে দূষিত করে তোলে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবদেহের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কীটনাশক পদার্থগুলি শুধুমাত্র অভীষ্ট কীট ও পতঙ্গগুলিকেই দমন করে না, অনেক নির্দোষ ও উপকারী কীটপতঙ্গও কীটনাশকের প্রভাবে মারা যায়। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডি.ডি.টি-সহ অন্যান্য অনেক ক্ষতিকারক কীটনাশকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

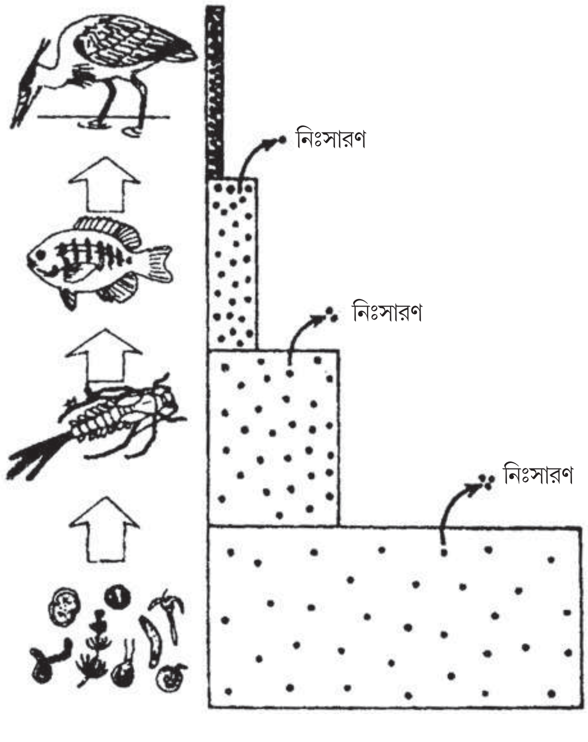

চিত্র ১৬.৪ : খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবদেহে ডি.ডি.টি-র সঞ্চয়। কালো বিন্দুগুলি প্রতিটি খাদ্যস্তরে সঞ্চিত ডি.ডি.টি-র পরিমাণ নির্দেশ করে।

এখন দেখা যাক মৃত্তিকা দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমত, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শৌচাগার নির্মাণ ও উন্মুক্ত মাঠ, নদী, পুকুর ও জলাশয়ের তীরে মানুষের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত

বর্জ্য মাটিতে স্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। প্লাস্টিক, ভারী ধাতু, কীটনাশক ও অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষতিকারক পদার্থ পরিবেশে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে তাদের মাটিতে সরাসরি নিক্ষেপ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে পুনরাবর্তন-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থকে পুনর্ব্যবহার করার ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে ন্যূনতম পরিমাণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দ্রুত কীটপতঙ্গের জৈবনিয়ন্ত্রণ ও নাইট্রোজেন সংবন্ধনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে বিষাক্ত ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যাপক ব্যবহারের উপর আমাদের নির্ভর করতে না হয়।

অনুশীলনী—৪

মৃত্তিকা দূষণে অংশগ্রহণকারী তিনটি দূষণকারক পদার্থের নাম লিখুন।

অনুশীলনী—৫

নীচের শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন। এখানে মৃত্তিকা-দূষণকারক বস্তুগুলি কীভাবে প্রাণীর ক্ষতি করে তা আলোচিত হয়েছে।

প্রথমত, মাটিতে সঞ্চিত বিভিন্ন দূষণকারক পদার্থ .... প্রবেশ করে এবং খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপেই এদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। .... মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত ক্ষতিকারক পদার্থসমূহ জীবদেহের প্রচণ্ড .... করে। দ্বিতীয়ত, ... এর মতো দূষণকারক পদার্থ শুধুমাত্র অভীষ্ট কীটপতঙ্গগুলিকে দমন করে ক্ষান্ত হয় না অন্যান্য অনেক নির্দোষ ও কৃষিতে উপকারী কীটপতঙ্গও এদের প্রভাবে মারা যায়।

(কীটনাশক, খাদ্যস্তরে, খাদ্যশৃঙ্খলে, ক্ষতি)

১৬.২.৪ শব্দদূষণ

যোগাযোগ স্থাপনের অর্থাৎ ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিজ্ঞানের ভাষায় শ্রুতিকটু ও অবাঞ্ছিত শব্দকেই আওয়াজ বলা হয়। কিন্তু অত্যন্ত তীব্র শব্দ শ্রবণশক্তি হ্রাস করা ছাড়াও কাজে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে। এ ধরনের ক্ষতিকর শব্দ বসবাসের পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি হলে তাকে শব্দদূষণ বলে। শব্দের প্রাবল্য সাধারণত মাপা হয় ডেসিবেলের (db) হিসাবে। মোটামুটি মানুষের কানে ক্ষীণতম যে শব্দ ধরা পড়ে তার প্রাবল্যের মাত্রা শূন্য ডেসিবেল। বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দের ডেসিবেল মাত্রা নীচের সারণিতে দেওয়া হল :

উৎস	ডেসিবেল মাত্রা
১. রাতের বেলায় নির্জন ও নিস্তব্ধ এলাকা	২০
২. পাঠাগার (যেখানে মানুষ সাধারণত উচ্চস্বরে বাক্যালাপ করে না)	৪০
৩. সাধারণ কথাবার্তা	৪৫-৫৫
৪. রেডিও-র আওয়াজ	৫০-৬০
৫. মোটর সাইকেল বা কারখানার অস্বস্তিকর শব্দ	১০০
৬. জেট এঞ্জিনের কষ্টকর আওয়াজ	১২০

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৮০ ডেসিবেল-এর অধিক প্রাবল্যযুক্ত শব্দ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। সাধারণত দীর্ঘসময় যাবৎ (৮ ঘণ্টা ও তার বেশি) ৮০-৯০ ডেসিবেল শব্দের মধ্যে থাকলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে। শব্দদূষণ শারীরিক ও মানসিক, দুধরনের ক্ষতিই ঘটাতে পারে। অতি প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী শব্দ যেমন হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে তেমনি আকস্মিক প্রবল শব্দ মানুষের ভীতি ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। মাথাধরা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, ক্ষুধার অভাব, বমির উদ্রেক প্রভৃতিও শব্দদূষণের ফলে দেখা দিতে পারে।

ভেবে দেখতে পারেন, শব্দের মাত্রা কোন্ কোন্ জায়গায় সবচেয়ে বেশি হয়। কোনও কোনও শিল্পে অত্যন্ত বেশি মাত্রার শব্দের সৃষ্টি হয়, যেমন লোহা ও ইস্পাত-শিল্প, মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা, ধাতুনির্মিত সামগ্রীর কারখানা, ছাপাখানা, করাতকল ও কাঠের সামগ্রী তৈরির শিল্প ও কাপড়ের কল। বড় বড় শহরের ব্যস্ত রাজপথ আর রেললাইনের কাছাকাছি জায়গায় শব্দের মাত্রা এত বেশি হয় যে আপনার বাড়ি সেরকম জায়গায় হলে আপনার পক্ষে ঘুমানোই শক্ত হত। এছাড়া লাউড স্পীকার, গাড়ির হর্ন, জেনারেটর, বাজি-পটকা, মিটিং-মিছিল এসবও শব্দদূষণের জন্য সমানভাবে দায়ী।

অন্যান্য দূষণের সাপেক্ষে শব্দদূষণের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে। বায়ু, জল ও মৃত্তিকা দূষণকারক অধিকাংশ পদার্থ বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত হয়ে একবার পরিবেশে প্রবেশ করবার পর দীর্ঘকাল যাবৎ পরিবেশে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। অপরদিকে শব্দদূষণকারী আওয়াজের পুনরুৎপত্তি না ঘটলে মুহূর্তেই তা পরিবেশে বিলীন হয়ে যায়, তার কোনো অবশেষ পড়ে থাকে না।

এখন প্রশ্ন হল, এই শব্দদূষণ হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কীভাবে? উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যানবাহন ও কলকারখানার যন্ত্রাদির ভালো অবস্থা বজায় রেখে অবাঞ্ছিত শব্দ হ্রাস করা সম্ভব। নানা উৎসব ও সমাবেশে দিনে ও রাত্রিতে লাউড স্পীকারের ব্যবহার সমগ্র এলাকায় দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করে। এ ধরনের শব্দদূষণ রোধে প্রবর্তিত আইনকানুন ও নির্দেশিকা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় গাছপালা শব্দশোষণ করে। সুতরাং কর্মব্যস্ত শিল্প-বাণিজ্য এবং আবাসিক এলাকায় রাস্তার দুধারে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

অনুশীলনী—৬

এমন তিনটি স্থানের নাম উল্লেখ করুন যেখানে অতিমাত্রার শব্দ আপনার শ্রবণ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

১৬.২.৫ বিকিরণজনিত দূষণ

বর্তমান কালে সারা বিশ্বে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত ও আলোচিত সমস্যাগুলির একটি হল বিকিরণজনিত দূষণ বা তেজস্ক্রিয় দূষণ। তেজস্ক্রিয় দূষণের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহকোষে জীনগত বিকৃতি ঘটে যেজন্য এই দূষণের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তেজস্ক্রিয় দূষণও অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। সমস্ত পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে নিউক্লিয় বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় যা বিপজ্জনকভাবে তেজস্ক্রিয় এবং যার তেজস্ক্রিয়তা দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় থাকে। এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থ পরিবেশে এমনভাবে মজুত করা ও সরিয়ে ফেলা উচিত যাতে এরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে দূষিত না করে। কিন্তু সমস্যা হল এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থকে দীর্ঘকাল নিরাপদভাবে পরিবেশে মজুত করার কোনো সন্তোষজনক পদ্ধতি এখনও অবধি উদ্ভাবন করা যায়নি। বিভিন্ন দেশে পদার্থগুলিকে সুদৃঢ় পাত্রে আবদ্ধ করে গভীর ভূগর্ভে প্রোথিত করার ব্যবস্থা চালু আছে। তবে সেখান থেকেও যে তেজস্ক্রিয়তা পারিপার্শ্বিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থসমূহে এমন সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ বর্তমান থাকে যারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সৃষ্টির মাধ্যমে হাজার হাজার বৎসরকাল যাবৎ পরিবেশ দূষণ ঘটাতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্লুটোনিয়াম -২৩৯ তেজস্ক্রিয় মৌলটি তার তেজস্ক্রিয়া ও যাবতীয় অপপ্রভাব হারাবার আগে জীবমণ্ডলে প্রায় দুই লক্ষ বছর টিকে থাকে। এই পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থসমূহের বেশিরভাগই তৈরি হয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অতি সুচতুরভাবে এগুলি মজুত করা হয় গরিব ও অনুন্নত দেশসমূহে। ফলে এই সমস্ত অনুন্নত দেশে বসবাসকারী মানুষ পারমাণবিক শক্তির ইতিবাচক দিকসমূহের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে বঞ্চিত থেকে শুধুমাত্র বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার হয়ে পড়ে।

উন্মুক্ত স্থানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে দূর-দূরান্তের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। মাটিতে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় মৌল ক্রমে মাটি থেকে উদ্ভিদদেহে সঞ্চারিত হয়। তেজস্ক্রিয় মৌল সমন্বিত উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করায় বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের দেহে এই মৌলগুলি প্রবেশ করে এবং মাংসপেশী, হাড় ও মাতৃদুগ্ধে সঞ্চিত হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ঘনত্ব এক নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছালে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেহকলার ধ্বংস ও ক্যান্সারের ফলে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে জীবদেহে যে কোষ বিকৃতি ঘটে তা জননকোষের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে জীনগত বিকৃতির কারণে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৯৪৫ সালের বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের আঘাতে ও উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও বিকিরণের প্রভাবে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তরকালে যে সমস্ত শিশু জন্মায় তাদের দেহকোষে জীনগত বিকৃতি লক্ষ্য করা গেছে। মাটির উপর পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাও বিকিরণজনিত বিপদ ডেকে আনে। এজন্য সারা বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার আন্দোলন শুরু হয়েছে। ভারত পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের এক দৃঢ় সমর্থক। পারমাণবিক যুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব ও ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষ আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর সমস্ত সামরিক ঘাঁটি, শিল্পাঞ্চল ও বড় বড় শহর ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অস্ত্রভাণ্ডারে ইতিমধ্যেই মজুত আছে। এই সমস্ত মজুত পারমাণবিক অস্ত্রাদির এক শতাংশও যদি কোনো যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় তবে বিস্ফোরণের পর কয়েক মাস ধরে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় ছাই পড়তে থাকবে। যে পরিমাণ ছাই, ধূলিকণা ও আবর্জনা বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে তা দীর্ঘকাল যাবৎ সূর্যকে আড়াল করে রাখবে। আমরা আগেই দেখেছি, এর ফলে যে নিউক্লীয় শীতঋতুর আবির্ভাব ঘটবে তার প্রভাবে পৃথিবীর সকল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হবে, অবসান ঘটবে আধুনিক সভ্যতার। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের এই সম্ভাব্য পরিণতিতে অশ্রুপাত করবার জন্য সেদিন আক্রান্ত, আক্রমণকারী অথবা বিশ্বের অন্য কোনও দেশে কোনও মানুষই বেঁচে থাকবে না। সুতরাং পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ও মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখার তাগিদে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস আজ অত্যন্ত জরুরি।

অনুশীলনী—৭

নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি ভুল তা শনাক্ত করুন। পাশের ফাঁকা স্থানগুলিতে সঠিক বিবৃতির জন্য, ✓ এবং ভুল বিবৃতির জন্য × বসান।

(ক) পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ( )

(খ) মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে জীবদেহে বহু ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। ( )

(গ) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থগুলির জৈব অবনমন ঘটে। ( )

(ঘ) তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে জীবদেহে জীনগত বিকৃতি ঘটে। ( )

(ঙ) পারমাণবিক বর্জ্যসমূহ স্থায়ী দূষণকারক পদার্থ। ( )

১৬.৩ পরিবেশের উপর প্রযুক্তির প্রভাব

উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় শিল্প, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটায় পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মানুষের জীবনে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। কিন্তু পরিবেশের

উপর প্রযুক্তি যে চাপ সৃষ্টি করছে তার ফলে নূতন কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পজাত বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ও কৃষিতে ব্যবহৃত নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ একদিকে যেমন পরিবেশে উপস্থিত হয়ে পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে তেমনি অপরদিকে শব্দ ও তেজস্ক্রিয় দূষণ, ব্যাপক হারে বনাঞ্চল বিলোপ, চাষযোগ্য জমি ধ্বংস করে কংক্রীটের রাস্তাঘাট, অট্টালিকা ও বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির ফলে পরিবেশগত অবক্ষয় অতি দ্রুততার সাথে বেড়ে চলেছে। পরিবেশের উপর এতবড় আঘাত মানুষের ইতিহাসে আগে কখনও আসেনি।

শক্তির উৎস হিসাবে তেল ও কয়লার ব্যবহার বেড়েই চলেছে। শিল্প থেকে নিষ্কাশিত কিছু চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বর্জ্য পদার্থ এবং প্লাস্টিক ও নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত ধাতুসংকরের মতো কিছু শিল্পজাত বস্তু পরিবেশে সঞ্চিত হতে থাকে। এগুলি যেমন পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে তেমনি প্রথাগত উৎপাদন পদ্ধতিও পরিবেশ দূষণে দায়ী। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদনের তাগিদে অধিক পরিমাণ কৃষিক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্য বিগত ১০০ বৎসর যে পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়েছে তার পূর্বে মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাসে তত অরণ্যনিধন ঘটেনি। বনাঞ্চল বিলোপে বহুসংখ্যক প্রজাতির বনজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বিনষ্ট হয়, ফলে বাস্তুতন্ত্রের জৈব বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা যেসব জীনগত উপাদানের সাহায্যে রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নত ধরনের ফসল সৃষ্টি করতে পারতেন, এর ফলে তা চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি যেসব প্রজাতি তখন পর্যন্ত পরীক্ষিত হয়নি সেগুলি হারিয়ে যাওয়ায় আমরা ঔষধ ও অন্য রাসায়নিকের অনেক উৎস থেকেই বঞ্চিত হতে চলেছি। এছাড়া বনাঞ্চল ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার ফলে ব্যাপক ভূমিক্ষয়, নদীর নাব্যতা হ্রাস, বন্যা, জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন প্রভৃতি পরিবেশগত সমস্যারও সৃষ্টি হবে।

মানবসভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীজলকে সবথেকে উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে। অতীতে মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিতে সেচের প্রয়োজনেই বাঁধ নির্মাণ করা হত। বর্তমানে সেচব্যবস্থা ছাড়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নদীর নাব্যতা রক্ষা প্রভৃতি বহুমখী পরিকল্পনা রূপায়ণে বড় বাঁধ নির্মাণ করা হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ বড় বাঁধগুলি নির্মিত হয়েছে ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে। বড় বাঁধ নির্মাণের ফলে বিশাল এলাকা জুড়ে নদীর জল আবদ্ধ করে রাখা হয়। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, বনাঞ্চল জলে নিমজ্জিত হওয়ায় বহু মানুষ গৃহহারা হয়, বহু বন্যপ্রাণী বিতাড়িত হয় এবং অসংখ্য বৃক্ষের বিনাশ ঘটে।

আমাদের উৎপাদনকারী ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহৃত প্রযুক্তির ফলে যেসব বিপদ দেখা দেয় তা রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলি অনেক সময় সারা পৃথিবীর বিপদ ডেকে আনে। যেসব ক্রিয়াকলাপ এ ধরনের বিপদের জন্ম দেয় তা দু-একটি দেশে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার ঝুঁকির ভাগ ধনী দরিদ্র সব দেশকেই নিতে হয়, তারা এসবের ফলে উপকৃত হোক বা না হোক।

বিভিন্ন উৎস থেকে নিঃসৃত নানা ধরনের বায়ুদূষণকারক পদার্থ নিকটের এবং কখনও কখনও হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছে। বিনষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, দূষিত হচ্ছে

জলাশয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অট্টালিকা, ইমারত, স্মৃতিসৌধ ও মানুষের অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত পরিবেশের অম্লীভবন ও গ্রীনহাউস ক্রিয়া প্রাণের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। অন্যদিকে রেফ্রিজারেটরে হিমায়ক হিসাবে ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়ে ওজোন স্তর ক্ষয় করায় আরও এক ধরনের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যাপকহারে ওজোন স্তর হ্রাস পেলে জীবমণ্ডলের উপর তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উচ্চাশা যে বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেছে তা শুধু দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক অস্ত্রাদির উৎপাদন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট ও বিমানে ব্যবহৃত দগ্ধ জ্বালানি বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে নির্মুক্ত হয় এবং ওজোন স্তর হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা এর আগেই আমরা আলোচনা করেছি। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিশালী দেশগুলির অস্ত্রভাণ্ডারে মজুত পারমাণবিক অস্ত্রাদি যদি কোনও যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তার বিধ্বংসী প্রভাবে মানুষসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বিনাশ ঘটতে পারে। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, স্থলভাগ ও সমুদ্র এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যে হয়তো কোনোদিনই তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্প থেকে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে তা অনেক সময়ই এমন বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে যা মেনে নেওয়া যায় না। পারমাণবিক শিল্পজাত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থে শত শত বৎসর ধরে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়া বর্তমান থাকে। ক্ষতিকর বর্জ্যের প্রভাবে এমন অনেক মানুষ বিপদের মুখোমুখি হন যাঁরা ওই বর্জ্য উৎপাদনকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন না।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির জন্য যেসব ঘটনা দায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বনাঞ্চল হ্রাসের কারণে মাটির উপর জলপ্রবাহ বাড়ে। ফলে ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং নদী ও জলাশয় পলিতে ভরে ওঠায় দেখা দেয় বিধ্বংসী বন্যা। অন্যদিকে ব্যাপক বায়ুদূষণের ফলেই অম্লবর্ষণ দেখা দেয়। অম্লবর্ষণের প্রভাবে বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জলাশয়ের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিপন্ন হয়ে পড়ে।

সুতরাং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত নীতি ও কার্যপদ্ধতি একই সাথে গ্রহণ করা উচিত। কোনও একটি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যেমন, বনাঞ্চল সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় হ্রাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব।

শিল্পক্ষেত্রগুলি একদিকে যেমন বিভিন্ন দূষণকারক পদার্থ নির্গমনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তেমনই অন্যদিকে কখনও কখনও এইসব শিল্পক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ফলেও বিপদের সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও এই ধরনের দুর্ঘটনা রোজ ঘটে না তবুও শিল্প-দুর্ঘটনা পরিবেশ দূষণের বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করে যার প্রভাবে দুর্ঘটনাস্থলের নিকটে ও দূরে বহু মানুষ বিপদগ্রস্ত হন।

আমরা এখানে অতি পরিচিত দুটি শিল্প-দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভূপাল দুর্ঘটনা :

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ভারতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপাল শহরের ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনার কথা আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন। ভূপালের এই দুর্ঘটনা আজ অবধি পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প-দুর্ঘটনা হিসাবে বিবেচিত। কী ঘটেছিল সেদিন ভূপালে? বহুজাতিক সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইডের মালিকানাধীন একটি শিল্প-কারখানায় নিরাপত্তাজনিত ত্রুটির কারণে কীটনাশক উৎপাদনের কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট (MIC) গ্যাস বেরিয়ে এসে বাতাসে মেশে এবং অতি দ্রুত প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ এই বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে আক্রান্ত হন। গ্যাসের তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়ায় ও কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ২,৯০০ মানুষ মারা যান। গ্যাসের প্রভাবে বহুসংখ্যক মানুষ চিরতরে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। স্বল্পমাত্রায় গ্যাসে আক্রান্ত লক্ষাধিক মানুষ প্রাণে বেঁচে গেলেও ফুসফুস, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, অন্ত্র ও জননতন্ত্র সংক্রান্ত গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে কোনওক্রমে বেঁচে আছেন। গ্যাসে আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলারা অনেকে বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছেন।

যথোপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনার অভাব ভূপাল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। শহরের মধ্যবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিকের কারখানা নির্মাণ পরিবেশ-বিরোধী অপরিকল্পিত শিল্পায়নের নজির বহন করে।

ভূপালের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরও আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ছোটখাটো শিল্পবিপর্যয় একাধিকবার ঘটেছে। অপরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠায় ভূপালের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ভারতের অন্যান্য স্থানেও যে-কোনও সময়ে ঘটতে পারে। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক ভারী পেট্রো-রাসায়নিকের কারখানা আছে বরোদায়, যেখানে দশ লক্ষ মানুষের বাস। পশ্চিমবঙ্গেও ৪০০ রাসায়নিকের কারখানা আছে যেখানে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে কাজ চলে। এসব কারখানায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হলেও এগুলি জনবসতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা উচিত ছিল। এছাড়া প্রত্যেক কারখানায় এমন সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত যা দুর্ঘটনা ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। বড় শিল্পপ্রকল্প কার্যকর করার ক্ষেত্রে পরিবেশ মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

চেরনোবিল দুর্ঘটনা :

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান ইউক্রেনের চেরনোবিল শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে এক ভয়াবহ পরমাণু দুর্ঘটনা ঘটে। চেরনোবিল দুর্ঘটনার মাধ্যমেই তেজস্ক্রিয় দূষণের ভয়াবহতা জনসমক্ষে সর্বপ্রথম প্রকট হয়। যতদূর জানা যায়, অসাবধানতাবশত শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের চারটি পরমাণু চুল্লির মধ্যে একটির উষ্মতা বিপদসীমা অতিক্রম করে এবং সেটি গলে যায়। তেজস্ক্রিয় কণা ও ছাই বায়ুপ্রবাহ

ও মেঘের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে এমনকি পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহেও পৌঁছে যায়। দুর্ঘটনার নিকটবর্তী অঞ্চলে ৩১ জনের মৃত্যু ঘটে এবং বহুসংখ্যক মানুষ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুমান করা যায় যে, দুর্ঘটনা কবলিত আরও প্রায় ৬০০০ মানুষ ক্যান্সারের প্রভাবে মারা যেতে পারেন। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ইতিহাসে চেরনোবিলের দুর্ঘটনাই এ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম পরমাণু দুর্ঘটনা।

শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশনের সমস্যা :

দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাবে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন। বর্তমানে পেট্রলিয়ামজাত পদার্থ, নাইট্রোজেন সার, কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পসামগ্রীর উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রযুক্তি ও উৎপাদনের এই ধারা অপরিবর্তিত থাকলে আগামী দিনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, জল ও স্থলভাগের দূষণের মাত্রা সহনসীমা ছাড়িয়ে যাবে।

গঙ্গা উন্নয়ন প্রকল্প :

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে গঙ্গা উন্নয়ন প্রকল্প তাদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও সাহসী প্রকল্প। কলুষনাশিনী গঙ্গা আজ নিজেই কলুষকবলতি। শিল্প-নিষ্কাশিত ময়লা জল, শহরের আবর্জনা, অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গার জলকে কলুষিত করছে। হাজার হাজার লোকের গঙ্গাস্নানের জন্যও রোগসংক্রমণকারী বহু পদার্থ গঙ্গার জলে মিশছে। গঙ্গার জলকে এখন মানুষের তথা শিল্পে ও কৃষিতে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের পরিবেশ দফতরের সহায়তায় ১৯৮৪-তে গঙ্গা উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি কয়েকটি ধাপে বাস্তবায়িত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রথম ধাপে গঙ্গার তীরবর্তী বড় বড় শহরের গার্হস্থ্য ময়লা পরিশোধনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পজাত ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ যাতে গঙ্গাজলে না মিশতে পারে সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যাপক গঙ্গা দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্যানিটারি পায়খানা নির্মাণ, বৈদ্যুতিক শ্মশান-চুল্লি স্থাপন, ভাঙা ঘাট মেরামতি ও ভূমিক্ষয় রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

অনুশীলনী—৪

বামদিকের স্তম্ভের বিষয়গুলির সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভের যে বিষয়গুলির মিল আছে তার ক্রমিক সংখ্যা প্রদত্ত বন্ধনীর মধ্যে লিখুন।

স্তম্ভ ১		স্তম্ভ ২
১. গঙ্গা উন্নয়ন প্রকল্প	☐	১. মিথাইল আইসোসায়ানেট বাষ্প
২. চেরনোবিল দুর্ঘটনা	☐	২. প্রযুক্তির ব্যবহার
৩. মাটিতে শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন	☐	৩. উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জলকে মানুষের তথা শিল্প এবং কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রয়াস।
৪. ভূপাল দুর্ঘটনা	☐	৪. তেজস্ক্রিয় পদার্থ পারমাণবিক চুল্লি থেকে বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।
৫. মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	☐	৫. ভূগর্ভস্থ জলদূষণ।

১৬.৪ পরিবেশের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাব

আদিম যুগে শিকারের মাধ্যমে সংগৃহীত বন্যপ্রাণীর মাংস ও নানাবিধ ফলমূল, গাছপালা ও উদ্ভিদই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য। প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ানোয় মানুষের কোনো স্থায়ী বাসস্থান গড়ে ওঠেনি। এককথায় সেদিনের অরণ্যচারী মানুষ ছিল যাযাবর। যখন থেকে মানুষ আবিষ্কার করল যে কৃষিকার্য দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং পশুপালনের মাধ্যমে জীবজন্তু আবদ্ধ রেখে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব তখন থেকেই তার যাযাবর জীবনের অবসান ঘটল। অল্প জায়গায় আরও মানুষ বাস করতে পারল এবং ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। জন্মের সংখ্যা জনসংখ্যার সমানুপাতী হওয়ায় প্রতি বছর জনসংখ্যার বৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হতে লাগল।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বৎসর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৫০ কোটিতে পৌঁছায়। সুতরাং দেখা যায় প্রায় ৪৬০০ বৎসর সময়কালে জনসংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক ২৫০ কোটি। লক্ষ্য করবার বিষয়টি হল যে এক্ষেত্রে জনসংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৩০০ বৎসরে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩০ কোটি। অনুমান করা হয় যে, আগামী ২০১০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ সংখ্যাটি ৭০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলিতে বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। ভারত ও চীনে জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বা রাশিয়ায় এই বৃদ্ধির হার তার তুলনায় অনেক কম। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দরিদ্র পরিবারগুলির তুলনায় সচ্ছল পরিবারে সদস্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আবার যে সমস্ত রাজ্যে শিক্ষিতের হার বেশি সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অন্য রাজ্যের তুলনায় কম।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষা যেহেতু মানুষকে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্মের ফলে উদ্ভূত খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও সন্তানদের শিক্ষার সমস্যার সম্বন্ধে সচেতন করে তাই এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। শিক্ষার ফলে যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণের সুলভ ও সহজ পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় তেমনি পুত্রসন্তান লাভের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার মতো যেসব সামাজিক রীতি-নীতির ফলে বড় পরিবারের সৃষ্টি হয়, শিক্ষা সেগুলিকেও অতিক্রম করতে সাহায্য করে। পুত্রসন্তানের আশায় অনেক সময় একটি পরিবার তিন-চারটি সন্তানের জন্ম দেয়। শিক্ষার ফলে সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্ন নেওয়াও সম্ভব হয়, যাতে যে শিশুর জন্ম হয় তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। জনসাধারণ শিক্ষিত হলে দেশের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়। আবার এর ফলে উৎপাদনের সুফল বণ্টনের জন্যও অধিকতর চাপ সৃষ্টি হয়, যা দেশকে সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

অবশ্য এখানে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা বিশ্বের সহায়-সম্পদ তথা পরিবেশের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে সেটাই আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কয়লা, লোহা, খনিজ তেল, তামা প্রভৃতি যেসব জিনিস আমরা ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করি তার পরিমাণ সীমিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেগুলি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে সারা বিশ্বে এগুলির ব্যবহারও বাড়তে থাকবে। যার ফলে সেগুলি আরও দ্রুত নিঃশেষিত হবে। শক্তির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এক বিশ্বজোড়া সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যেজন্য আমাদের সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির মতো নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের কথা ভাবতে হয়েছে। কয়লা, ডিজেল ও পেট্রলিয়ামের বদলে আমাদের আরও বেশি করে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও বাড়ে। অনেক দেশেই জনসংখ্যা দুই বা তিনগুণ বৃদ্ধি পেলে তাদের খাদ্য যোগানের জন্য যে জমি লাগবে তা পাওয়া যাবে না। পানীয় জলের উৎস এবং আবর্জনা নিষ্কাশনের সুযোগ-সুবিধার উপরেও প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যা যত বাড়ে, আবাসনের অভাব এবং পথেঘাটে ভিড় তত বাড়ে, বস্তি অঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং যে পরিবেশদূষণ নিয়ে এই এককে আলোচনা করা হল তা ক্রমাগত আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন এই যে আমরা কি শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ুকে বিষাক্ত করেই চলব? যে জল আমরা পান করি বা সব কাজে ব্যবহার করি, যে মাটি আমাদের ধারণ ও পোষণ করে সেগুলির দূষণ কি আমরা বাড়িয়েই চলব? বিশ্বের ধনী দেশগুলি অত্যধিক পরিমাণে গ্রহের সঞ্চিত সম্পদ ব্যবহার করছে, যা তাদের কমাতে হবে। তাদের এমন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে যাতে আমাদের প্রশ্বাসের বায়ু এবং খাদ্য ও ভেষজের জন্মদাতা জল দূষিত ও বিষাক্ত না হয়। অন্যদিকে দরিদ্র দেশগুলিকে প্রবল ও আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে যাতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এমন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি না হয় যাতে ধনীরা আরও ধনী এবং দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হতে থাকে। দূষণ এবং সম্পদের সীমিত যোগান একসময় তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তখন যে প্রযুক্তি চালু ছিল দরিদ্র দেশগুলিকে তার নকল না করে এমন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে যা পরিবেশ ও জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ধারার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী—৯

১. বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে মাত্রাধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি উল্লেখ করুন।

২. কোন্ কোন্ বিষয় আপনার মতে পরিবারকে ছোট রাখতে প্রেরণা যোগায়?

১৬.৫ সারাংশ

এই এককে আপনি যে বিষয়গুলি পড়লেন সেগুলি হল :

- যেখানেই প্রাণীর বাস, সেখানেই পরিবেশের উপর তার প্রভাব পড়ে। মানুষের গৃহস্থালি, শিল্প ও কৃষিজাত আবর্জনা শেষ পর্যন্ত জল, বায়ু ও মাটিতে গিয়ে মেশে।
- যে সমস্ত দূষণকারক পদার্থ পরিবেশে অনুপ্রবেশ করবার পর দীর্ঘকাল যাবৎ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকে তাদের স্থায়ী দূষণকারক পদার্থ বলা হয়। অধিকাংশ স্থায়ী দূষণকারক পদার্থই বিষাক্ত। অন্যদিকে অস্থায়ী দূষণকারক পদার্থগুলি বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশে বিয়োজিত বা অবনমিত হয়। যে সমস্ত দূষণকারক পদার্থের অবনমন জীবাণুর প্রভাবে ঘটে তাদের জৈব অবনমনযোগ্য দূষণকারক পদার্থ বলা হয়।
- কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, বস্তুকণা, সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থ। বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশে এই সমস্ত প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় নানাবিধ দ্বিতীয় পর্যায়ের দূষণকারক পদার্থ তৈরি হয়। এই ধরনের কিছুসংখ্যক দূষণকারক পদার্থ জীবজগতের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- শিল্পজাত বর্জ্য, গার্হস্থ্য বর্জ্য ও কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন আবর্জনা ও ময়লা জল দূষণের প্রধান উৎস। এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থে বর্তমান বিভিন্ন জৈব পদার্থের বিয়োজন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন আবশ্যক। এই অক্সিজেন জল থেকেই সংগৃহীত হয় ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। অক্সিজেনের অভাবে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। গার্হস্থ্য ও কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্যবাহী জলের মাধ্যমে অত্যধিক পরিমাণ পুষ্টিকারক পদার্থ জলাশয়ে প্রবেশ করায় অতিপৌষ্টিকতার মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়।

- শিল্পজাত ক্ষতিকারক বর্জ্যের প্রভাবে জীবজগৎ আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থকে নিরাপদ করে তোলা অথবা এগুলির সংস্পর্শ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে এগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ সঞ্চিত হওয়ায় পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই বিপদের মুখে। ওজোন স্তর হ্রাস, ভূমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, নিউক্লীয় শীতের পরিণতি প্রভৃতি সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে এদের প্রতিকারের জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি আবশ্যক।
- প্রযুক্তিগত উন্নতি ও শিল্পের ব্যাপক প্রসার একদিকে যেমন মানুষের জীবনে এনেছে বিপুল বৈষয়িক প্রাচুর্য, বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য, অন্যদিকে তেমনি ঘটেছে ব্যাপক পরিবেশগত অবক্ষয়। শিল্পজাত দূষণের প্রভাবেই পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূপাল ও চেরনোবিলের মতো ভয়ানক শিল্প-দুর্ঘটনায় শুধু যে অসংখ্য লোক হতাহত হয়েছেন তাই নয়; পরিবেশের উপর এগুলি দীর্ঘস্থায়ী অপপ্রভাব সৃষ্টি করেছে।
- অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা, সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, জন্ম ও মৃত্যুর হারের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা কারণে বর্তমানে অধিক সংখ্যক মানুষ পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠছেন। স্বভাবতই আশা করা যায় যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে ও পরিবেশ-অনুকূল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনে আমরা পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সক্ষম হব।

১৬.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণে আপনি এবং আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা কতখানি দায়ী? আপনার বাড়ির চারিদিক ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এবং আপনার পরিবার যে সমস্ত পদার্থ প্রতিনিয়ত জল, বায়ু ও মাটিতে ত্যাগ করছেন সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। স্থানীয় পরিবেশ দূষণে আপনার পরিবারের অবদান হ্রাসের বিষয়ে আপনার মতামত লিখুন।

২. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি সঠিক তার পাশে ✓ চিহ্ন এবং যেগুলি ভুল তার পাশে × চিহ্ন বসান।

(ক) কলকারখানার চিমনী নির্গত ধোঁয়া অম্লবর্ষণের সমস্যা সৃষ্টি করে।

(খ) শৈবাল-বিকাশ না ঘটাই অতিপৌষ্টিকতার কারণ।

(গ) কৃষিকার্যে প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতির সঙ্গে জলদূষণের সম্পর্ক আছে।

(ঘ) জৈব পদার্থবাহী বর্জ্য পুকুর ও অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়ের জলে মেশবার ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(ঙ) প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও শিল্পের বিস্তার কোনোভাবেই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী নয়।

(চ) আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশাকে প্রাথমিক দূষণকারক পদার্থ বলা যায়।

(ছ) বায়ুদূষণ সৃষ্টির পর মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যায় কিন্তু শব্দদূষণ দীর্ঘস্থায়ী।

(জ) মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ খাদ্যশৃঙ্খল বেয়ে ক্রমে জীবদেহে সঞ্চিত হয়।

(ঝ) ভারতের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের বাতাসে অত্যধিক পরিমাণ ধোঁয়া ও বস্তুকণা উপস্থিত থাকে।

(ঞ) যথার্থ শিক্ষার অভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

১৬.৭ উত্তরমালা

১. (ক) দূষণ

(খ) কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, বস্তুকণা, নাইট্রোজেন-অক্সাইড

(গ) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, ওজোন, পারঅক্সিল অ্যাসিটাইল নাইট্রেট

(ঘ) অম্লবর্ষণ

(ঙ) কার্বন ডাই-অক্সাইড, উষ্ণতা

(চ) নাইট্রোজেন অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন।

২. মাথাধরা, চোখের ঝিল্লীতে ক্ষতের সৃষ্টি ও প্রদাহ, শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ এমনকি ফুসফুসের ক্যান্সার।

৩. শস্যক্ষেত্রের আবর্জনা, পৌর বর্জ্য, শিল্পজাত বর্জ্য, অক্সিজেন, পুষ্টিকারক পদার্থ, অতিপৌষ্টিকতা, আবদ্ধ।

৪. ভারী ধাতু, প্লাস্টিক, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক।

৫. খাদ্যশৃঙ্খলে, খাদ্যস্তরে, ক্ষতি কীটনাশক।

৬. তাঁতকল, সংবাদপত্রের ছাপাখানা, ধাতব সামগ্রী তৈরির কারখানা।

৭. (ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

৮. ১. [৩]

২. [৪]

৩. [৫]

৪. [১]

৫. [২]

৯. (১) দারিদ্র্য, যথার্থ শিক্ষার অভাব ও সামাজিক কুসংস্কার।

(২) শিক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধ।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলীর উত্তর

১. রান্নার কাজে ব্যবহৃত জ্বালানি দহনে উদ্ভূত ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে তুলছে। স্নানাগার ও শৌচাগার নির্গত বর্জ্যবাহী জল পুকুর ও জলাশয়ের জলে মিশে জল দূষণ ঘটাচ্ছে।

গৃহস্থালির বিভিন্ন বর্জ্য, যেমন বিভিন্ন সামগ্রীর মোড়ক, কাগজ, তন্তুজ বস্তু, প্লাস্টিকের ব্যাগ ও পাত্র, কাচ, টিন প্রভৃতি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় মাটি দূষিত হয়ে উঠছে। এছাড়াও বাড়ি সংলগ্ন বাগান ও কৃষিজমিতে অত্যধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটি দূষিত হয়।

২. (ক) ✓ (খ) × (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) × (চ) × (ছ) × (জ) ✓ (ঝ) × (ঞ) ✓

একক ১৭ □ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ

গঠন

১৭.১ প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
১৭.২ প্রাকৃতিক সম্পদ
১৭.২.১ পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ
১৭.২.২ পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য সম্পদ
১৭.৩ শক্তি : অচিরাচরিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস
১৭.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান
১৭.৪.১ প্রথাগত পদ্ধতি
১৭.৪.২ দূরসন্ধান পদ্ধতি
১৭.৪.৩ সম্পদ মানচিত্রের প্রকারভেদ
১৭.৫ সারাংশ
১৭.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
১৭.৭ উত্তরমালা

১৭.১ প্রস্তাবনা

১৬নং এককে আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে বিশ্বের বিশাল ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের সঠিক পরিবেশ কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি কী তা জানবার জন্য নিশ্চয়ই আপনারা আগ্রহী। সজীব ও জড় উভয় ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদই ভূপৃষ্ঠের উপরে ও সমুদ্রে মজুত রয়েছে। বন, বন্যপ্রাণী, ভূপৃষ্ঠের উপরে ও সমুদ্রে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জীব সজীব সম্পদের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে মাটি, নদী ও সাগরে প্রবহমান জলধারা, ভূগর্ভস্থ জল ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ আমাদের প্রাকৃতিক জড় সম্পদের শ্রেণীভুক্ত। কতকগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। আবার কতকগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত এবং সেগুলিও জল এবং স্থলের বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা দেখব কীভাবে সম্পদের অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। পরের এককে এই সম্পদগুলি কোন্ সর্বোত্তম উপায়ে ব্যবহার করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য

এই পরিচ্ছেদ পাঠ করবার পর আপনি যে কাজগুলি করতে পারবেন সেগুলি হল :

- পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংজ্ঞা দিতে।
- পৃথিবীতে বর্তমান বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের বিবরণ দিতে।
- প্রথাবহির্ভূত বা অচিরাচরিত বিভিন্ন শক্তির উৎস এবং গার্হস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে এই সমস্ত শক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার বর্ণনা করতে।
- প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সম্পদ মানচিত্র গঠনের নানাবিধ পদ্ধতির রূপরেখা দিতে।

১৭.২ প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ প্রকৃতির দান। মানব সভ্যতার বিকাশে অপরিহার্য এই সম্পদগুলি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু মনে করা হয় যে এই সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার চলছে। কারণ একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অন্যদিকে এই সম্পদ একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে এই সচেতনতার অভাব। বিশ্বে শিল্প ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যে উন্নয়ন ঘটেছে তার ফলে সম্পদ ব্যবহারের হার বেড়ে গিয়েছে। পৃথিবীর কোনও কোনও দেশের নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল হিসাবে বিগত কয়েক শতক যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাবশালী বা সাম্রাজ্যবাদী দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। দরিদ্র দেশগুলি থেকে তথাকথিত শিল্পোন্নত দেশে এখনও কাঁচামাল হিসাবে মূল্যবান খনিজ রপ্তানি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের ক্যাডমিয়াম নামে নরম, রূপালি একটি ধাতু বিশ্বের নানা দেশে রপ্তানি করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্যাডমিয়াম-সিলভার কোষ তৈরিতে ক্যাডমিয়াম ধাতুর ব্যবহার হয়। উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে বিভিন্ন শিল্পে ক্যাডমিয়াম ধাতুর পর্যাপ্ত ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রপ্তানির ফলে ভারতবর্ষে এই ধাতুর ভাণ্ডার আগামীদিনে নিঃশেষিত হয়ে পড়লে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে আমরা অন্য দেশ থেকে অধিক মূল্যে ক্যাডমিয়াম আমদানি করতে বাধ্য হব। দুঃখের বিষয় হল বিশ্বের যে সমস্ত দেশ বর্তমানে আমাদের এই খনিজ সম্পদটি আমদানি করছে তাদের কেউ হয়তো এটি মজুত করে চলেছে এবং একদিন তারাই আমাদের প্রয়োজনে অতি চড়াদামে ওই ক্যাডমিয়াম ধাতু আমাদের কাছে বিক্রি করবে। সুতরাং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের স্বরূপ ও ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কীভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। সুপরিকল্পিতভাবে ও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যবহার করলে নিঃসন্দেহে আমাদের সম্পদের ভাণ্ডার দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও প্রকৃতির ভাণ্ডারে এদের মজুত পরিমাণ অনুমান করার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও আহরণ সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলি মূলত দুই ধরনের—পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য। দেখা যাক এই দুই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি কী।

গাছপালার মতো কোনও কোনও সম্পদ স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির ফলেই সময়ের সঙ্গে পুনঃস্থাপিত হয়। ফুরিয়ে যায় না বলেই এই সম্পদগুলিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য বলা হয়। অরণ্য, চারণভূমি, বন্যপ্রাণী ও জলচর প্রাণী এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। খনিজের মতো আরও কিছু সম্পদ আছে যেগুলি একবার ব্যবহৃত হলে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। এদের পুনঃস্থাপন বা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট খনিজের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে পড়লে তা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পেট্রোল একবার পুড়িয়ে ফেললে সেই পেট্রোল কখনোই পুনঃস্থাপন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে, হাজার হাজার বৎসর ধরে খুব মন্থর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি আজকের মাটি যদি কোনোভাবে বিনষ্ট হয় তবে আগামী বহুসংখ্যক মানব প্রজন্মের জীবদ্দশায় তার পুনর্গঠন সম্ভব হবে না। সুতরাং মাটিও একটি পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

এখন আমাদের দেশের কয়েকটি পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

১৭.২.১ পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ

আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যবহারের ফলে নিঃশেষিত হয় না। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই এরা পুনর্গঠিত হয় অথবা এদের প্রকৃতিতে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ও বেপরোয়া ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নানাভাবে বিঘ্নিত হয় এবং আমাদের সার্বিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জল এবং অরণ্য আমাদের দুইটি প্রধান পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

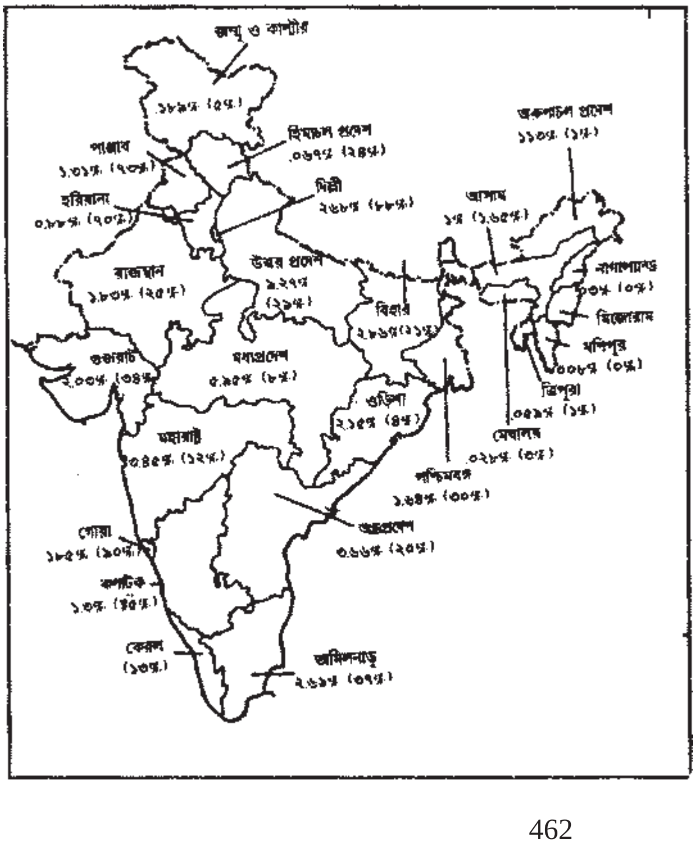

চিত্র ১৭.১ : ভারতে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারযোগ্যতা শতাংশের হিসাবে ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ জল
(বন্ধনীতে ব্যবহারযোগ্য ভূগর্ভস্থ জল।)

জলসম্পদ

জীবনধারণের পক্ষে জল একটি অপরিহার্য উপাদান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সমগ্র পৃথিবীতে রয়েছে জলের অঢেল যোগান। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমাদের এই গ্রহে ব্যবহারযোগ্য জলের ভাণ্ডার নেহাতই সীমিত। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে বিশ্বের সমগ্র জলসম্পদের মাত্র ২.৭ শতাংশ মিষ্টি বা স্বাদু জল যা পানীয় হিসাবে এবং কৃষিতে সেচব্যবস্থায় ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারযোগ্য। জলসম্পদের বেশিরভাগই, প্রায় ৯৭ শতাংশ রয়েছে সমুদ্রে নোনা জল হিসাবে। বিভিন্ন নদনদীতে প্রবহমান জলের পরিমাণ সমগ্র জলসম্পদের প্রায় ০.০১ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার বালতি জলের মধ্যে এক বালতি জলের সমতুল। জলাশয় ও হ্রদগুলিতে সঞ্চিত সুস্বাদু বা মিষ্টি জলের পরিমাণ সমগ্র জলের ০.০০৯ শতাংশ। ১৫০ মিটার গভীরতা অবধি ভূগর্ভে যে পরিমাণ জল সঞ্চিত রয়েছে তা সমগ্র জলসম্পদের প্রায় ০.৬২৫ শতাংশ। মেরু অঞ্চলে, পাহাড়ের গায়ে ও চূড়ায় বরফ, হিমবাহ ও তুষার আকারে জমাটবাঁধা জল সরাসরি ব্যবহারযোগ্য নয় এবং এর পরিমাণ সমগ্র জলসম্পদের প্রায় ২.১৫ শতাংশ।

ভূগর্ভে জলবাহী স্তরসমূহে যে জল সঞ্চিত রয়েছে তার পরিমাণ আনুমানিক ৪২.৩×১০^{১০} ঘনমিটার। এই সঞ্চিত জলের এক-চতুর্থাংশ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বাকি অংশ ভবিষ্যতে সেচব্যবস্থায়, শিল্পে ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারবে। জল অনুসন্ধান সম্পর্কিত মানচিত্র (চিত্র ১৭.১) থেকে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে মজুত জলের পরিমাণ বেশ কম।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে জলসেচ, নৌচালন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে ও বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য জলের ভাণ্ডার পৃথিবীতে সীমিত। সুতরাং মহামূল্যবান এই প্রাকৃতিক সম্পদটি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

অরণ্যসম্পদ

অরণ্য আমাদের সম্পদ। জ্বালানি-কাঠ, পশুখাদ্য, ফল, বনজ ঔষধ এবং কাঠনির্ভর শিল্পের নানাবিধ

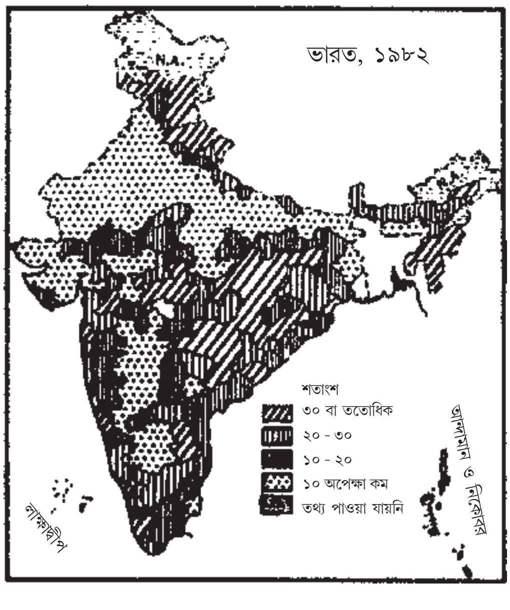

চিত্র ১৭.২ : ভারতে মোট ক্ষেত্রফলের হিসাবে অরণ্য আচ্ছাদন।

কাঁচামাল অরণ্য থেকেই সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও, অরণ্যে বসবাস করে নানা প্রজাতির অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ যারা পৃথিবীর জীবন্ত সম্পদ। আমাদের শ্বাসক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে ও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণে অরণ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত চিত্রের সাহায্যে জানা যায় যে ১৯৮২ সালে আমাদের দেশের সমগ্র ভূভাগের প্রায় ১৪ শতাংশ অঞ্চল অরণ্য দ্বারা আবৃত ছিল যার মধ্যে প্রায় ১১ শতাংশ অঞ্চল ছিল ঘন অরণ্য এবং ৩ শতাংশ অঞ্চল ছিল হ্রাসপ্রাপ্ত অরণ্য। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সামগ্রীর অত্যধিক ব্যবহারের ফলে ও সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুনর্নবীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় অরণ্যাঞ্চল দ্রুত হারে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

বৃষ্টির জল পাহাড়ের ঢালে অবাধে প্রবাহিত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে আসছে। মাটির স্তর সরে যাওয়ায় জমি ঊষর হয়ে পড়ছে ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। অরণ্যনিধনের এই ক্ষতিকর দিকগুলির কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার অরণ্যরক্ষণ ও বনসৃজনের একটি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেছেন।

১৭.২.২ পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য সম্পদ

পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার পর নিশ্চয়ই আপনি পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে আগ্রহী। পৃথিবীর ভূমি, মাটি, সামুদ্রিক ও খনিজ সম্পদসমূহ পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য সম্পদের শ্রেণীভুক্ত। এই সম্পদগুলিকে যেমন প্রকৃতিতে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয় না, তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে না।

ভূমি-সম্পদ

ভূপৃষ্ঠের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত স্থলভাগ বা ভূমি আমাদের বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ এবং মানুষ সহ বিশ্বের যাবতীয় স্থলচর প্রাণী ও স্থলজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বাসস্থান।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর স্থলভাগ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ১৯০১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২৩.৮ কোটি। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর শেষে এই সংখ্যাটি বেড়ে প্রায় ১০০ কোটির কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। সীমিত স্থলভাগের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ নিশ্চয়ই আপনি অনুধাবন করতে পারছেন। অনুমান করা হয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে মাথাপিছু ভূমি-সম্পদের গড় পরিমাণ দাঁড়াবে মাত্র ০.৩৩ হেক্টরের কাছাকাছি।

মৃত্তিকা সম্পদ

ভূত্বকের সবচেয়ে উপরের স্তর হল মাটি। প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে মাটিই সবচেয়ে মূল্যবান। মাটির জৈবিক গুরুত্ব অপরিসীম। মাটিকে আশ্রয় করে বসবাস করে অসংখ্য জীব। যে উদ্ভিদজগৎ মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য যোগায় তার প্রধান আশ্রয়স্থল হল মাটি। জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য জল মাটিতেই সঞ্চিত থাকে। এককথায় বলা যায় সমস্ত ধরনের প্রাণের প্রতিপালন মাটিতেই হয়।

মাটি একপ্রকার মিশ্র পদার্থ। মাটির বিভিন্ন উপাদানগুলি হল বালি, পলি, কাদা, খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ বা হিউমাস, মাটির জীব এবং বায়ু ও জল।

অঞ্চল বিশেষে মাটির গঠন ও প্রকৃতিগত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি সাধারণত উর্বর প্রকৃতির। এছাড়াও মাটির জল ও অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতার উপরেও উর্বরতা নির্ভর করে। মাটির গঠন, রঙ, খনিজ ও জৈব পদার্থের পরিমাণ ও জলধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মাটিকে বহুভাগে ভাগ করা হয়। ভারতে প্রধানত যে বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখা যায় সেগুলি হল (চিত্র ১৭.৩) :

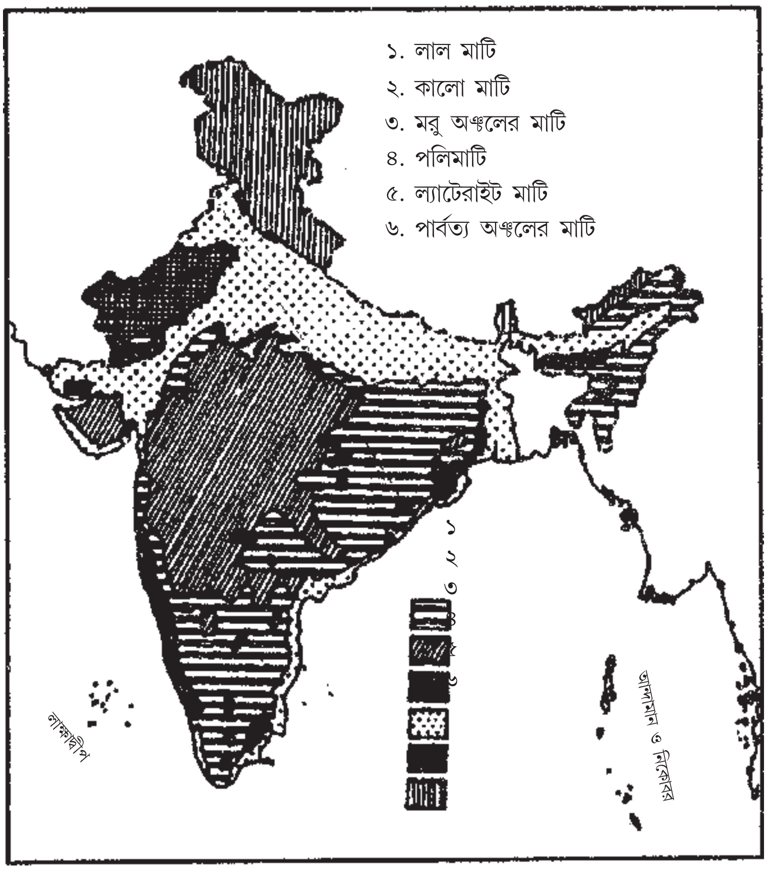

চিত্র ১৭.৩ : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির প্রকারভেদ

১. লাল মাটি

দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্তর্গত কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণ পূর্ব মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বছরে ১০০-৩০০ সেমি ও উষ্ণতা ২২° সেলসিয়াস অপেক্ষা অধিক সেখানে এই ধরনের মাটি দেখা যায়। লোহার ভাগ বেশি থাকায় এই মাটির রঙ লাল। এই মাটি বর্ষণ-অরণ্য ও তৃণভূমি ধারণে সক্ষম। আলু, কলা, আনারস, রবার চাষের জন্য এই মাটি উপযুক্ত।

২. কালো মাটি

পশ্চিম ও মধ্যভারতের দাক্ষিণাত্য ও মালবের মালভূমি অঞ্চলের মাটির উপরের অংশ কাদামাটি। কালো ও দো-আঁশ জাতীয় এই মাটি উর্বর প্রকৃতির, ফলে এই মাটিতে কৃষিকাজ ভালো হয়। আখ, চিনাবাদাম, সোয়াবিন, তুলা, ধান ও ডাল এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই মাটি বনাঞ্চল ও তৃণভূমি ধারণের পক্ষেও সহায়ক।

৩. মরু অঞ্চলের মাটি

পশ্চিম ভারতের মরু অঞ্চলে জৈব পদার্থের ভাগ কম থাকায় এই মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর। বালির ভাগ বেশি থাকায় এ মাটির জলধারণ ক্ষমতাও বেশ কম। যথোপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব। অত্যধিক জলসেচের ফলে এই মাটি অধিক মাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়ে এবং জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

৪. পলিমাটি

পশ্চিমে পাকিস্তান সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে পূর্বে আসাম অবধি বিস্তৃত সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। সাধারণত এই মাটি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি দিয়ে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল ও গুজরাটের উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলেও এই মাটি দেখা যায়। অঞ্চল বিশেষে এই পলিমাটির গঠনগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাদা ও বালির পরিমাণগত তারতম্য অনুযায়ী পলিমাটিতে দো-আঁশ, এঁটেল ও বেলে মাটি, এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে-কোনো ধরনের ফসলই পলিমাটিতে উৎপাদন করা সম্ভব। অতি শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতহীন পরিবেশে এই মাটি স্থানীয়ভাবে ক্ষারীয় বা লবণাক্ত হয়ে পড়ে ফলে মাটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

৫. ল্যাটেরাইট মাটি

এই মাটি ইঁটের মতো শক্ত এবং লোহার অক্সাইড থাকার ফলে এর রং লাল। পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট ও রাজমহল পাহাড়ের উচ্চ অংশে এবং মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্ণাটক, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। এই মাটি অত্যন্ত অনুর্বর এবং কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে ও জলসেচের সহায়তায় এই মাটিতে সামান্য পরিমাণ ধান, রাগি, চা, কফি ও রবার চাষ করা হয়।

৬. পার্বত্য অঞ্চলের মাটি

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এই বিশেষ ধরনের মাটি লক্ষ্য করা যায়। এই মাটি সাধারণত ছাই-ধূসর থেকে হালকা হলুদাভ-বাদামী রঙের হয়। এই মাটির উর্বরতা কম। এই মাটিতে বিভিন্ন শাঙ্কব শীর্ষ বৃক্ষ যেমন, পাইন, দেবদারু, ওক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই মাটিতে চা, কফি, বিভিন্ন ধরনের ফল ও মশলা ফলানো সম্ভব।

৭. উপকূলীয় মাটি

গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্মা, কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে নীচু জলাজমিতে ও কেরলের নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চলে এই মাটি পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে পচা খামারের সার ও বৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ বা পীট প্রভৃতি জৈব পদার্থ থাকে। এর ফলে এই মাটি অত্যন্ত উর্বর হয়।

খনিজ সম্পদ

পৃথিবীর বুকে খননকার্যের দ্বারা আমরা যে সমস্ত খনিজ পদার্থ আহরণ করি সেগুলি আমাদের শিল্পের মেরুদণ্ড। সেগুলির বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম।

বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থ যেমন কয়লা, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ও পেট্রলিয়াম প্রভৃতি আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে অপরিহার্য। শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির উপরই আমরা প্রধানত নির্ভরশীল। কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা, পেট্রলিয়াম প্রভৃতি সীমিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে আসছে। বিকল্প হিসাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে খনিজ উৎপাদনে খনিজ সম্পদও ব্যবহার করা হয়।

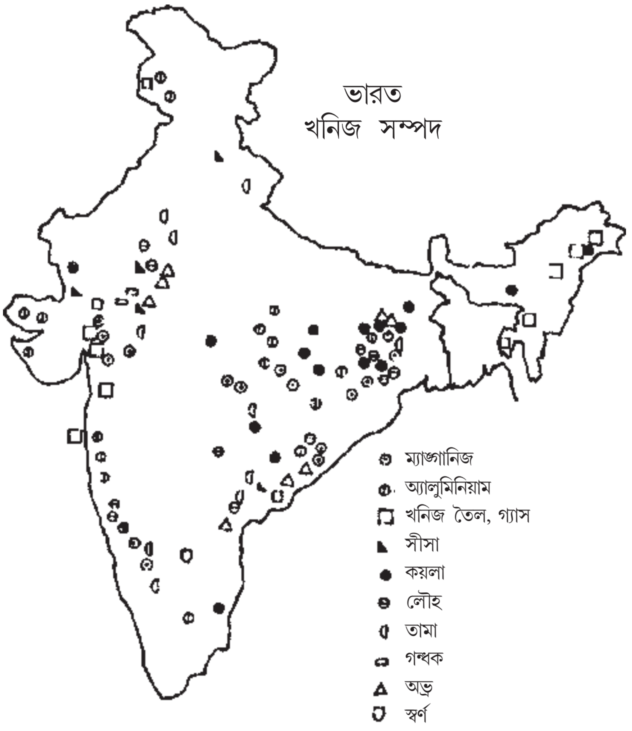

চিত্র ১৭.৪ : ভারতের খনিজ উৎপাদক অঞ্চল

বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারযোগ্য ৩৫টি খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে ভারত স্বনির্ভর। লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, কয়লা প্রভৃতি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে। কিন্তু সার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ফসফেট, অশোধিত খনিজ তেল ও তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি লৌহেতর ধাতুর ক্ষেত্রে আমরা বিদেশ থেকে আমদানির উপর কিছুটা নির্ভরশীল।

আমাদের দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি হল বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ (চিত্র ১৭.৪)। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় স্থলভাগ ও সমুদ্রের তলায় পেট্রলিয়ামের ভাণ্ডার অনুসন্ধান ও তার যথাযথ অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত চিত্রের সাহায্যে আমরা জানতে পারি কোন্ অঞ্চলসমূহে খনিজের প্রাচুর্য থাকা সম্ভব। মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপনের পূর্বে এটা সম্ভব ছিল না।

সামুদ্রিক সম্পদ

সমুদ্রতল বহু খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। সমুদ্রপৃষ্ঠের ৪-৫ হাজার মিটার গভীরে যেসব খনিজ সমুদ্রের তলদেশে পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (চিত্র ১৭.৫) এবং কোবাল্ট, নিকেল, তামা ও লৌহের সালফাইডের নডিউল বা পিণ্ড। ভারত এই খনিজ ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগ নিয়েছে। সমুদ্রতলস্থ খনিগুলি থেকে বর্তমানে বিশ্বের উৎপাদিত মোট পেট্রলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আহরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বোম্বাই দরিয়ায় সঞ্চিত পেট্রলিয়ামের পরিমাণ আনুমানিক ৭৪০ কোটি টন। কাবেরী, গোদাবরী ও মহানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত রয়েছে। কেরল এবং ওড়িশার সমুদ্র উপকূলের বালিতে ছড়িয়ে রয়েছে জার্কন ও পরমাণুশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল মোনাজাইটের মতো মূল্যবান খনিজ। সোনা, প্লাটিনাম, টিন প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুও সমুদ্র উপকূলে সঞ্চিত রয়েছে। সমুদ্রের সজীব সম্পদ, যেমন বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী, মাছ ও উদ্ভিদ, অসংখ্য মানুষের সুখাদ্য যোগায় আবার প্রয়োজনীয় ঔষধি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

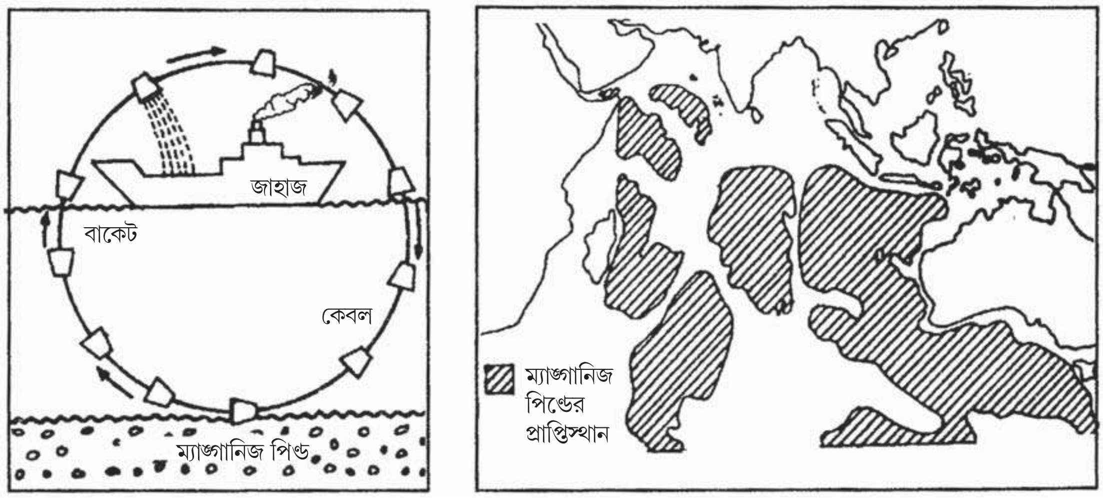

চিত্র ১৭.৫ : (ক) ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড উত্তোলনের কৌশল (খ) ভারত মহাসাগরে ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ডের প্রাপ্তিস্থান

অনুশীলনী—১

(ক) নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

১. যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত হয়ে যায় না তাদের .... এবং যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহার করলে চিরতরে হারিয়ে যায় তাদের .... সম্পদ বলা হয়।

২. বন, বন্যপ্রাণী, চারণভূমি এবং জলচর প্রাণী .... সম্পদের শ্রেণীভুক্ত।

৩. মাটির উর্বরতা তার .... এবং .... ধারণক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

৪. ভূমির উচ্চতম স্তরে থাকে ....।

৫. হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মাটি সাধারণত .... রঙের হয়।

৬. পূর্ববিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের মালভূমি ও নিম্নভূমি অঞ্চলে যে গাঢ় লাল রঙের মাটি দেখা যায় তা .... চাষের জন্য উপযুক্ত।

(খ) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। পৃথিবীতে জলের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারযোগ্য জলের অভাব দেখা যায় কেন?

২। অরণ্য সংহারের ফলে উদ্ভূত পরিবেশগত ভারসাম্যহানির দুইটি প্রধান দিক উল্লেখ করুন।

৩। আমাদের দেশে শিল্প উৎপাদনে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় এমন চারটি প্রধান খনিজ পদার্থের নাম উল্লেখ করুন।

৪। সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের গুরুত্ব বৃদ্ধির দুইটি কারণ উল্লেখ করুন।

১৭.৩ শক্তি : অচিরাচরিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস

বিশ্বে প্রতি ১৪ বৎসর অন্তর শক্তির চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু শক্তি ব্যবহারের পরিমাণই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ মানুষ ভারতে বাস করে। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬.২৫ শতাংশ। অথচ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেখানে সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত শক্তির ১.৫ শতাংশ ভারতে খরচ হয়

সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে খরচ হওয়া শক্তির পরিমাণ হল মোট উৎপাদিত শক্তির ৩৩ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ কত পিছিয়ে। এও বোঝা যায় যে শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদনে আমাদের উৎসাহী হওয়া কত দরকারী। আজও আমাদের দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ কাঠ, গোবর ও শস্যক্ষেত্রের শুষ্ক আবর্জনা গার্হস্থ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। আমরা জানি যে পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি, কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসছে। আবার যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বনাঞ্চল অতি দ্রুতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শক্তির চাহিদা মেটাতে তাই আজ বিকল্প অচিরাচরিত শক্তির উৎসের কথা ভাবা হচ্ছে। এখানে এ ধরনের কয়েকটি উৎস সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

সৌরশক্তি

কয়লা প্রভৃতি জীবাশ্ম-জ্বালানি থেকে আজ আমরা যে শক্তি পাই তাও প্রকৃতপক্ষে সৌরশক্তি, যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমা হয়ে রয়েছে। সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য তৈরি করে ও বেড়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বিশাল বনাঞ্চল মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং ভূগর্ভস্থ অত্যধিক চাপ ও উষ্মতার প্রভাবে নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমশ কয়লা ও তেলে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গাছপালা ও উদ্ভিদ যা আমাদের খাদ্য ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা উৎপাদনের প্রধান উৎস হল সৌরশক্তি।

বর্তমানে আমরা সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারছি। সৌরশক্তি ব্যবহারের একটি প্রধান সুবিধা হল এই শক্তি অফুরন্ত, চিরস্থায়ী ও সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। সৌরশক্তি সরাসরি ব্যবহার করে শীতকালে জল গরম করা যায় (চিত্র ১৭.৬), জল লবণমুক্ত করা যায় এবং রেফ্রিজারেটর চালানো যায়। শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখবার জন্য সৌরশক্তি সরাসরি ব্যবহার করা হয়। ফটোসেল বা আলোক কোষের সাহায্যে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করে একদিকে যেমন যানবাহন চালানো যায়, বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে খাবার জল ও ছোটখাটো সেচ প্রকল্পের জল তোলা যায়, অন্যদিকে তেমনি রাস্তাঘাট ও গ্রামাঞ্চল আলোকিত করা যায়। সৌরশক্তির সাহায্যে বাষ্প উৎপন্ন করে ও তার সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় (চিত্র ১৭.৮)। আমাদের দেশে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রে প্রায় ১.৪ কিলোওয়াট সৌরশক্তি আপতিত হয়। সৌরশক্তি নিয়মিতভাবে এবং ঠিক যেখানে প্রয়োজন সেখানেই উৎপন্ন করা সম্ভব। তাই সুলভ ও অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ফটোসেল উদ্ভাবনের মাধ্যমে আগামী দিনে স্বল্প ব্যয়ে সৌরশক্তির উৎপাদন করতে পারলে তা অত্যন্ত লাভজনক হবে। ইতিমধ্যেই অনেক গৃহে রন্ধনকার্যে সৌর-কুকার ব্যবহৃত হচ্ছে। ফটোসেলের ব্যবহারও প্রচলিত হচ্ছে, তবে তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের প্রয়োজন আছে।

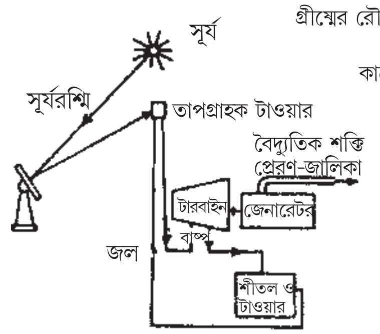

চিত্র ১৭.৬ : জল গরম করতে সৌরশক্তির ব্যবহার

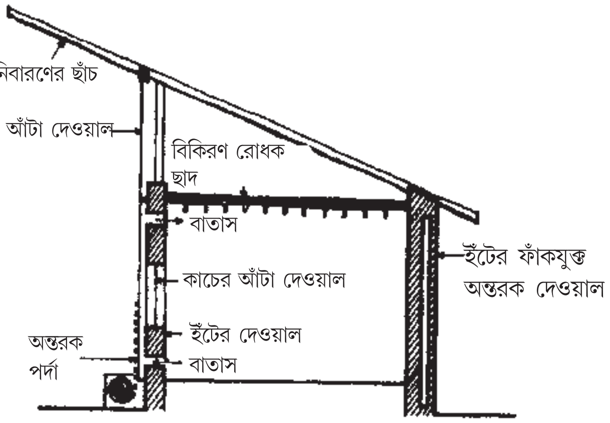

চিত্র ১৭.৭ : সৌরশক্তি দ্বারা তাপিত কক্ষ

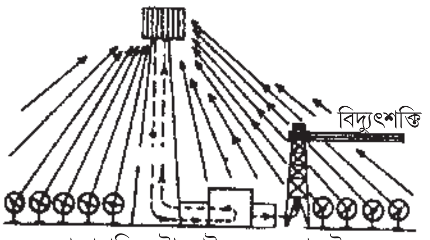

বাষ্পচালিত টারবাইন ও জেনারেটর

চিত্র ১৭.৮ : সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কয়েক হাজার আয়না ৩০০ ফুট উচ্চ টাওয়ারের উপর বসানো বয়লারে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে বাষ্প উৎপাদন করে। এই বাষ্প ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

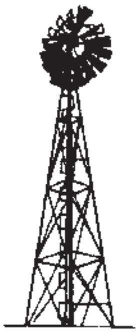

চিত্র ১৭.৯ : বায়ুকল বা উইন্ডমিল

বায়ুশক্তি

সৌরশক্তির মতো বায়ুশক্তিকেও কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কূপ বা নদী থেকে জল তোলা যায়। উইন্ডমিল বা বায়ুকল যখন বাতাসের বেগে ঘোরে তখন তার সঙ্গে জেনারেটর যোগ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বায়ুশক্তি থেকে শক্তি উৎপাদন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভর করে প্রধানত বায়ুপ্রবাহের উপর। পার্বত্য অঞ্চলে ও বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে বায়ু বেগে প্রবাহিত হয় সেখানে বায়ুকলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি ছোট ছোট শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বায়ুকলের ব্যবহার অনেক দেশেই বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। তবে ভারতে বায়ুকলের প্রচলন সম্প্রতি ঘটেছে।

সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ার-ভাঁটার শক্তি

জোয়ার-ভাঁটা ও সমুদ্রের ঢেউ আর একটি চিরস্থায়ী বিকল্প শক্তির উৎস। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল নদীপথে প্রবল বেগে ধাবিত হয় এবং ভাঁটার টানে ফিরে যায়। বিশেষত নদীর মোহানায় যেখানে সাগরের জল অপ্রশস্ত খাড়িতে প্রবাহিত হয় সেখানে এই জলশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় জলপ্রবাহের শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। নদী, জলপ্রপাত বা ঝর্নার জলস্রোতের সাহায্যে টার্বাইনের চাকা ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কাশ্মীরে বহু আগে থেকেই এভাবে ছোট ছোট ময়দাকল চালানো হয়ে থাকে। বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিও আসলে একই নীতিতে কাজ করে থাকে।

ভূগর্ভস্থ তাপশক্তি

উষ্মপ্রস্রবণ থেকে উষ্ম জল ও অতিতাপিত বাষ্প পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪৬টি জলতাপীয় (hydrothermal) অঞ্চল রয়েছে যেখানকার উষ্মপ্রস্রবণগুলির জলের উষ্মতা ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক। এই সমস্ত উষ্ম প্রস্রবণজাত বিদ্যুৎ বাসগৃহ বা ফসল ফলানোর জন্য কাচঘর গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পারমাণবিক শক্তি

পৃথিবীতে পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য শক্তির ভাণ্ডার দ্রুতহারে নিঃশেষিত হয়ে আসায় এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার দহনে উদ্ভূত দূষণে বিপর্যস্ত হয়ে মানুষ বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছে। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরের উপরে বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সর্বপ্রথম পরমাণু শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। বস্তুত এরপর থেকেই পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পারমাণবিক চুল্লিতে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে বাষ্প তৈরি করে এই বাষ্পের সাহায্যে টার্বাইন ও জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। হিসাব করে দেখা যায় যে, এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম ২৩৫ থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তা প্রায় ৩৫,০০০ কিলোগ্রাম কয়লার দহনে উৎপন্ন শক্তির সমতুল। আবার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে প্রতিদিন বিশাল পরিমাণ কয়লা বা ডিজেলের মতো কাঁচামালের প্রয়োজন হয় না যার ফলে পদ্ধতিটি অনেক সুবিধাজনক।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি জনবসতি থেকে দূরবর্তী নিরাপদ অঞ্চলে স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। দুর্ঘটনাজনিত কারণে যাতে পারমাণবিক চুল্লিগুলি থেকে কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে আসতে না পারে তার জন্য জোরদার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আবশ্যক। পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ও স্থাপনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত।

ভারতে বিদ্যুৎশক্তি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং লোডশেডিং শব্দটি হয়তো অনেকের কাছেই পরিচিত। প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা মেটাতে আমাদের দেশে অনেকগুলি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে মোট শক্তির চাহিদার অনেকটাই পারমাণবিক শক্তির দ্বারা মেটানো যায়।

বর্তমানে ভারতে যে ৫টি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে সেগুলি হলো—তারাপুর (মহারাষ্ট্র), কলপক্কম (তামিলনাড়ু), কোটা (রাজস্থান), নারোরা (উত্তরপ্রদেশ) ও কাকরাপারা (গুজরাট)।

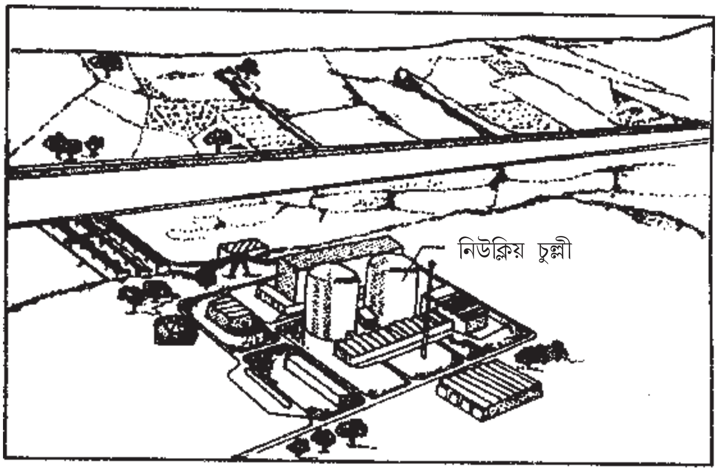

চিত্র ১৭.১০ : নারোরা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের দৃশ্য

বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস

আপনি হয়তো জানেন যে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গ্রামের গৃহপালিত পশুদের মল কাজে লাগিয়ে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরিপানা, সালভিনিয়া, ঝাঁঝি, শৈবাল প্রভৃতি গোবরের উপযোগী সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বায়োগ্যাস রান্নার কাজে (চিত্র ১৭.১১) ও আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও বায়োগ্যাস ব্যবহারের সাহায্যে উৎপন্ন বাষ্পের দ্বারা ইঞ্জিন বা যন্ত্র চালানো এবং টারবাইন ঘরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। দেখা গিয়েছে যে বড় মাপের বায়োগ্যাস উৎপাদক বেশ কয়েকটি পরিবার বা ছোট গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

চিত্র ১৭.১১ : বায়োগ্যাস উনানে রন্ধনরত গ্রাম্য মহিলা

বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর যে বর্জ্য পদার্থ পড়ে থাকে তা উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং শক্তি উৎপাদনের জন্য এটি একটি অর্থসাশ্রয়ী পদ্ধতি। এজন্যই ভারত ও চীনের মতো দেশে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য বায়োগ্যাস উৎপাদক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এতক্ষণ আপনি নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা পড়লেন। এবার নিশ্চয়ই আপনি এগুলি অনুসন্ধানের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধেও জানতে চাইবেন। কিন্তু তার আগে নীচের অনুশীলনীটির উত্তর করতে আপনার বোধহয় ভালোই লাগবে।

অনুশীলনী—২

নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেগুলি সঠিক তার পাশে চিহ্ন ✓ দিন।

১। সৌরশক্তি হল

(ক) পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি

(খ) পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য শক্তি

২। উদ্ভিদ তার খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করে

(ক) জীবাশ্ম-জ্বালানিজাত শক্তি

(খ) সৌরশক্তি

(গ) জৈব-পুষ্টিজাত শক্তি

৩। কাঠ, কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি জ্বালানি দহনে উৎপন্ন প্রচলিত শক্তির তুলনায় অচিরাচরিত বিভিন্ন শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জৈব গ্যাস প্রভৃতির ব্যবহার অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করছে কারণ অচিরাচরিত শক্তিগুলি

(ক) স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়

(খ) দূষণমুক্ত

(গ) স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও দূষণমুক্ত উভয়ই।

৪। রিঅ্যাকটরের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয়।

(ক) জৈব গ্যাস

(খ) ভূ-তাপীয়শক্তি

(গ) পরমাণু শক্তি

(ঘ) জোয়ার-ভাঁটার শক্তি

১৭.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধানকাজে প্রযোজ্য জটিল পদ্ধতিগুলি সাধারণত সম্পদগুলির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব ধর্মের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে আমাদের দেশে সম্পদ অনুসন্ধানের অনেকটাই করা

হয় বিমান অথবা উপগ্রহ থেকে নেওয়া ফটোগ্রাফ অথবা সেগুলিতে বসানো সংবেদী যন্ত্রপাতি দ্বারা পাঠানো উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিটিকে দূরসন্ধান বলা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানতে আপনি নিশ্চয়ই আগ্রহী। এই অংশে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৭.৪.১ প্রথাগত পদ্ধতি

অতীতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কার ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক। এই পদার্থগুলির আবিষ্কার বা অনুসন্ধানের পিছনে সেদিন মানুষের কোনও সুপরিকল্পিত প্রয়াস কার্যকর ছিল না। ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধানে অথবা গৃহাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়বার সময় মানুষ প্রথমে প্রকৃতির গর্ভে লুকানো প্রাকৃতিক সম্পদ জানতে পারত। আবার কখনও কখনও জমি চাষ করবার সময় চাষীরা সৌভাগ্যবশত অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু কিছু মূল্যবান ধাতু ও খনিজের সন্ধান পেয়ে যেত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তারা কেবল মাটির অল্প গভীরে থাকা খনিজের সন্ধান পেত, বর্তমানে নানাবিধ উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি ও সঞ্চয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্পর্কিত সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের পরই মাটি খুঁড়ে অথবা মাটিতে ছিদ্র করে সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৭.৪.২ দূরসন্ধান (remote sensing) পদ্ধতি

ভূপৃষ্ঠের উপরে এবং ভূগর্ভে বর্তমান বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের একটি আধুনিক প্রক্রিয়া হল দূরসন্ধান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিমান বা মহাকাশযানের মতো দূরবর্তী স্থান থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, মাটি, গাছপালা ও নানাবিধ খনিজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দূরসন্ধান পদ্ধতি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহই চিহ্নিত করে না, অধিকন্তু এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্পদগুলির ভূগর্ভে সঞ্চিত পরিমাণ ও গুণগত মান সম্পর্কেও আমরা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি।

দূরসন্ধানের সরলতম উপায় উড়োজাহাজ থেকে ক্যামেরার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ধারাবাহিক আলোকচিত্র গ্রহণ করা। উপগ্রহে স্থাপিত দূরদর্শন ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত চিত্রাদির মাধ্যমেও জল, মেঘ, বনাঞ্চল ও ভূপৃষ্ঠের উপরের ঘরবাড়ী ও ইমারত সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। উপরের দুইটি পদ্ধতিতেই ক্যামেরায় দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত হওয়ায় এদের দূরসন্ধানের আলোকীয় পদ্ধতি বলা হয়। অন্যদিকে উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে এই তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে কীভাবে প্রতিফলিত ও শোষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। সাধারণত কয়েক সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ এই ধরনের অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের সুবিধা হলো এই যে, ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত এই বেতার তরঙ্গ সহজেই মেঘ ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছায়

এবং ভূপৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মেঘের ভিতর দিয়েই আবার উপগ্রহে ফিরে যায়। অনুরূপভাবে উপগ্রহ থেকে অবলোহিত তরঙ্গের সংকেত পাঠিয়েও ভূপৃষ্ঠে তার প্রতিফলন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিফলকের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

জলসম্পদ ও দূরসন্ধান

সবচেয়ে ছোটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ হল গামারশ্মি। কোনও কোনও মৌলের পরমাণু এই রশ্মি নিঃসরণ করে। ফলে ভূপৃষ্ঠের মাটি থেকে যে গামারশ্মি নিঃসারিত হয় তা মহাকাশযান বা উপগ্রহে স্থাপিত শনাক্তকারক (detector) যন্ত্রে গৃহীত হয়। মাটিতে উপস্থিত জল বা আর্দ্রতা গামা রশ্মির এই নিঃসরণকে প্রভাবিত করে। ফলে অতি সহজেই শনাক্তকরণ যন্ত্রের মাধ্যমে মাটিতে আর্দ্রতা বা জলের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। তাছাড়াও উপগ্রহের মারফত প্রাপ্ত চিত্রে আর্দ্র মাটি এবং শুষ্ক মাটির বাহ্যিক অবস্থার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মাটিতে জল ও আর্দ্রতার প্রভাবে একদিকে যেমন ভূপৃষ্ঠের উষ্মতার দিবাকালীন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিত্রে আর্দ্রমাটিতে গাছপালার আচ্ছাদন ধরা পড়ে। গাছপালার ঘনত্ব, প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে ভূগর্ভস্থ সম্ভাব্য জলভাণ্ডার চিহ্নিত করা সম্ভব। অনুরূপভাবে তাপীয় ও অবলোহিত রশ্মি শনাক্তকারক যন্ত্রের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে উষ্ম জল প্রস্রবণের বলয়সমূহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

উদ্ভিদ আবরণের নিরীক্ষা

মহাকাশযান থেকে প্রাপ্ত চিত্রের সাহায্যে অতি সহজেই পর্ণমোচী বৃক্ষ সমন্বিত অরণ্যাঞ্চল শনাক্ত করা যায়। হেমন্ত ঋতুতে এই সমস্ত বৃক্ষের পাতা ঝরে যায় এবং সেই সময় গাছগুলি বরফ বা তুষারে আবৃত থাকে না। ফলে এই ঋতুই নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত সময়।

উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত চিত্রের সাহায্যে অথবা ভূপৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত অবলোহিত তরঙ্গের পরিমাপে ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বনাঞ্চল জরিপ করা সম্ভব। প্রতি একক বর্গক্ষেত্রে গাছপালার ঘনত্ব, উদ্ভিদের আকার ও আকৃতি, এমনকি পাতার আকার, আকৃতি, অবস্থান ও পুষ্টিগত অবস্থা দূরসন্ধান পদ্ধতির সাহায্যে নিরীক্ষণ করা যায়। পর্ণমোচী বৃক্ষের ঋতু অনুযায়ী বৃদ্ধির ধরন পাইন, দেবদারু প্রভৃতি শাঙ্কব শীর্ষ বৃক্ষগুলি থেকে পৃথক হওয়ায় মহাকাশযান থেকে গৃহীত চিত্রের সাহায্যে সহজেই এদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

উদ্ভিদ পাতার মাধ্যমে সৌরশক্তি শোষণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এইভাবে শোষিত সৌরশক্তির কিয়দংশ পাতা থেকে বিকীর্ণ হয়। ফলে দিনের বেলায় সর্বাধিক রৌদ্রোজ্জ্বল সময়ে পাতার উষ্মতা পারিপার্শ্বিক বায়ুর উষ্মতা অপেক্ষা ১০-১৪° সেলসিয়াস বেশি থাকে। আবার রাতের বেলায় শীতলতম সময়ে পাতার উষ্মতা বায়ুর তুলনায় প্রায় ৫° সেলসিয়াস কম লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং দূরে মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠের উষ্মতা পরিমাপের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গাছপালার উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব।

খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার অনুসন্ধান

ভূপৃষ্ঠের নিরবচ্ছিন্ন শিলাস্তরে কোনোরূপ ফাটল বা ভূপৃষ্ঠে কোনোরকম অস্বাভাবিক গঠন-বৈচিত্র্য বর্তমান থাকলে উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত চিত্রে তা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। যে সমস্ত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, সচরাচর সে অঞ্চলেই ভূগর্ভে নানাবিধ খনিজ বা জল সঞ্চিত থাকে সচরাচর। রেডিও-তরঙ্গ ও চুম্বকীয় পরিমাপনের সাহায্যেও ভূগর্ভে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও তেলের ভাণ্ডার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

১৭.৪.৩ সম্পদ মানচিত্রের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতির ভিত্তিতে নানা ধরনের সম্পদ মানচিত্র তৈরি করা হয়, যেমন :

মৃত্তিকা মানচিত্র : এই মানচিত্রের সাহায্যে মাটির প্রকারভেদ, গঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্যাদি দেখানো হয়।

খনিজ মানচিত্র : এতে ভূত্বকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির সাপেক্ষে নানা ধরনের খনিজের ভাণ্ডারগুলি দেখানো থাকে।

জল অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় মানচিত্র : এই মানচিত্র জলপীঠের (water table) গভীরতার হিসাবে ভূগর্ভে জলবাহী স্তরের, অর্থাৎ উত্তোলনযোগ্য জলসমৃদ্ধ শিলাস্তরের উপস্থিতি নির্দেশ করে (চিত্র ১৭.১)।

তুষার আবরণ সম্বন্ধীয় মানচিত্র : এই মানচিত্রে পর্বতগাত্রে তুষার আবৃত অঞ্চলের বিস্তৃতি বা সীমানা নির্দেশ করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্রাঙ্কন : বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, নানাবিধ খনিজ, বনাঞ্চল, গাছপালা প্রভৃতির অবস্থান নির্দেশের উদ্দেশ্যে নানা পদ্ধতিতে সম্পদ মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই মানচিত্রে একদিকে যেমন ভূ-গঠনের প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি অন্যদিকে ভূমিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কীভাবে করা সম্ভব তা সম্পদ মানচিত্রের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়। গ্রামাঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র থেকে আমরা বনাঞ্চল, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণভূমি ও বনাঞ্চল বিলোপ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। শহরাঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের মানচিত্রে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, আবাসন, খেলাধূলার মাঠ, পার্ক, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিষেবা, যেমন রাস্তাঘাট, চিকিৎসাকেন্দ্র, জলসরবরাহ ও আবর্জনা ও বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ জানা যায়। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে বৃহত্তর উন্নয়নের ক্ষেত্র, যেমন, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ জানা সম্ভব হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, বনাঞ্চল ও খনিসমৃদ্ধ অঞ্চলের জমির পরিমাণ, বাঁধ, জলাধার ও খাল নির্মাণ এবং রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ এই মানচিত্রে প্রকাশ পায়। এছাড়াও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ধস, হিমানী সম্প্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ এলাকাসমূহ এই মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়।

অনুশীলনী—৩

নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি ভুল তা দেখাতে সঠিক উক্তির পাশে (✓) এবং ভুল উক্তির পাশে (×) চিহ্ন বসান।

(ক) দূরসন্ধান পদ্ধতির সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্যামেরায় দৃশ্যমান আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। ( )

(খ) জলসিক্ত মাটিতে উপস্থিত গাছপালার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির ধরনধারণ বিশ্লেষণের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি শনাক্ত করা সম্ভব। ( )

(গ) পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে গাছের পাতা ঝরে পড়ে না। শীতকালে যখন গাছগুলি তুষারে আবৃত থাকে তখন মহাকাশযান থেকে গৃহীত আলোকচিত্রের সাহায্যে এই অরণ্যাঞ্চলসমূহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ( )

(ঘ) যে সমস্ত অঞ্চলে ভূ-ত্বকের নিরবচ্ছিন্ন শিলাস্তরে কোনও রকম ফাটল অথবা অস্বাভাবিক গঠনবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় সেখানে ভূগর্ভে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও জল সঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। ( )

(ঙ) শহরাঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের মানচিত্রের সাহায্যে আমরা বনাঞ্চলের চেহারা, বনাঞ্চল বিলোপ, কৃষিভূমি ও পশুচারণ ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। ( )

১৭.৫ সারাংশ

বর্তমান পরিচ্ছেদের মাধ্যমে আপনারা দুই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে জেনেছেন। সেগুলি হল—

১. পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ যেমন জল, বনাঞ্চল।

২. পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য সম্পদ যেমন, জীবাশ্ম জ্বালানি, খনিজ সম্পদ এবং ভূমি সম্পদ।

- আপনারা জেনেছেন যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার সীমিত এবং এই সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও আপনারা সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পরমাণুশক্তি, সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি ও বায়োগ্যাসের মতো বিকল্প শক্তির উৎস সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন।
- আপনারা জেনেছেন কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায়, বিশেষত দূরসন্ধান পদ্ধতিতে মহাকাশযান ও উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করা সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদের নূতন নূতন ভাণ্ডার শনাক্তকরণ ও বনাঞ্চল বিলোপের উপর নজরদারি করতে এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

বর্তমান পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ মানচিত্রের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হয়েছেন এবং এই সমস্ত মানচিত্রের সাহায্যে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান, গুণগত ও পরিমাণগত মান সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায় সে সম্পর্কেও জেনেছেন।

১৭.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন।

১. পুনর্নবীকরণযোগ্য ও পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে আপনি কী বোঝেন?

২. সমুদ্র থেকে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা সম্ভব?

৩. গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের শক্তির অভাব মেটাতে বায়োগ্যাস কীভাবে সাহায্য করে?

৪. প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

৫. ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ কী উপায়ে অনুসন্ধান করা হয়?

৬. উপগ্রহ মারফত চিত্রায়ণ ও আকাশযান থেকে নেওয়া আলোকচিত্রের সহায়তায় কীভাবে অরণ্যের গুণগত মানের নিরীক্ষা করা হয়?

১৭.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী

(১) (ক) (১) পুনর্নবীকরণযোগ্য, পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য

(২) পুনর্নবীকরণযোগ্য

(৩) জল, অক্সিজেন

(৪) মাটি

(৫) ছাই-ধূসর ও হালকা হলুদাভ বাদামি

(৬) আলু, কলা, আনারস, রবার প্রভৃতি

(খ) (১) বিশ্বের সমগ্র জলসম্পদের মাত্র ২.৭ শতাংশ হল মিষ্টি বা স্বাদুজল যা পানীয় হিসাবে, কৃষিতে, সেচ ব্যবস্থায় ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের উপযোগী।

(২) বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের সরবরাহ হ্রাস পায়, ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটে, নদী ও জলাশয়ের জলে পলি সঞ্চিত হয় এবং বন্যা দেখা দেয়।

(৩) কয়লা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন প্রভৃতি।

(৪) প্রথমত সমুদ্রের তলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ। ম্যাঙ্গানিজ, অক্সাইড এবং তামা, নিকেল, কোবাল্ট ও লোহা প্রভৃতি ধাতুর সালফাইডঘটিত বিভিন্ন আকরিক পিণ্ডের আকারে সমুদ্রের তলদেশে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়ত সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত রয়েছে বিপুল পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সমস্ত সামুদ্রিক সম্পদ অর্থকরীভাবে আহরণ করা হয়।

২. (১) ক, (২) খ, (৩) গ, (৪) গ

৩. (ক) ✓ (খ) ✓ (গ) × (ঘ) ✓ (ঙ) ×

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাকৃতিক নিয়মেই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে অথবা প্রকৃতিতে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব তাদের পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। যেমন, গাছপালা, অরণ্য, তৃণভূমি, বন্যপ্রাণী স্থলচর ও জলজ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ। যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহার করলে চিরতরে হারিয়ে যায় এবং কোনোভাবেই প্রকৃতিতে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয় না তাদের পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। যেমন, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও নানাবিধ খনিজ পদার্থ।

২. সমুদ্র হল প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার। নানাবিধ খনিজ যেমন ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড এবং কোবাল্ট, নিকেল, তামা ও লোহা প্রভৃতি ধাতুর সালফাইড আকরিক নডিউল বা পিণ্ডের আকারে সমুদ্রের তলদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সব খনিজ পদার্থ অর্থকরীভাবে আহরণ করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এছাড়াও সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা হয়।

৩. বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন গবাদি পশুর মল ও জলজ আগাছা গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদি রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে বায়োগ্যাসের ব্যবহার ব্যাপক বিস্তার লাভ করে তবে গ্রামাঞ্চলে শক্তির সঙ্কটজনিত সমস্যা বহুলাংশে দূরীভূত হবে।

৪. অতীতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকভাবেই আবিষ্কৃত হত। কৃষি উৎপাদনের জন্য জমি চাষ করার সময় অথবা গৃহাদি ও জলাধার নির্মাণকাজে মাটি খুঁড়বার সময় মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন

মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পেত। বর্তমান সভ্যতার আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় দূরসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমে জল, মাটি, অরণ্য, গাছপালা ও খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান করা হয়।

৫. ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য যুক্ত এক বিশেষ ধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ মহাকাশযান বা উপগ্রহে স্থাপিত শনাক্তকারক যন্ত্রে গৃহীত হয়। মাটিতে জল বা আর্দ্রতা উপস্থিত থাকলে এই তরঙ্গসংকেত বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে অতি সহজেই মাটিতে ও ভূগর্ভে জলের উপস্থিতি অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

৬. উপগ্রহ থেকে অবলোহিত বেতার তরঙ্গ পৃথিবীতে পাঠানো হয় এবং ভূপৃষ্ঠ দ্বারা এই তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলনের পরিমাপ ও প্রতিফলিত তরঙ্গের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের অরণ্যের চেহারা, সমৃদ্ধি ও অরণ্যস্থিত বিভিন্ন গাছ ও উদ্ভিদের প্রকৃতি ও বৃদ্ধির ধারন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন ঋতুতে এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আলোকচিত্রের সাহায্যেও অরণ্যের নিরীক্ষা করা সম্ভব।

একক ১৮ □ সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

গঠন

১৮.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

১৮.২ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

১৮.৩ ব্যবহৃত ও বর্জিত সম্পদের পুনরাবর্তন

১৮.৪ সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

১৮.৪.১ ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

১৮.৪.২ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

১৮.৪.৩ অরণ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা

১৮.৪.৪ জল সম্পদের ব্যবস্থাপনা

১৮.৫ খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ

১৮.৬ সারাংশ

১৮.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১৮.৮ উত্তরমালা

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৭ এককে আপনারা বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ ও তাদের অনুসন্ধানের প্রণালী সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন। এই এককে আপনারা পাঠ করবেন কীভাবে কিছু কিছু সীমিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ যেমন জল, মৃত্তিকা, অরণ্য, খনিজ ইত্যাদির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়।

সম্পদ সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধেও আপনারা সংক্ষেপে কিছুটা জানতে পারবেন। সীমিত সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সম্পদের পরিকল্পনা প্রয়োজন। আবার জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনাও অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করার পর আপনারা সমর্থ হবেন :

- কীভাবে, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনার সাহায্যে, মানবসমাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক

সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যায় এবং কত ভালোভাবে সীমিত সম্পদের সর্বাধিক প্রয়োগ সম্ভব করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে,

- জল এবং খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দিতে,
- কীভাবে আমাদের অরণ্য ভাণ্ডারের হ্রাস না ঘটিয়ে অরণ্য সম্পদ ব্যবহার করা যায় তার বর্ণনা দিতে,
- পুরসভা কর্তৃক বর্জিত পদার্থ, ধাতুমল, ভস্ম (Fly ash) ইত্যাদি সদ্ব্যবহারের কিছু কিছু পদ্ধতির রূপরেখা দিতে, ইত্যাদি।

১৮.২ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

১৭ এককে আপনি ভূমি, জল, মাটি, খনিজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। আপনি জানেন যে, এই সম্পদগুলি সীমিত ও মূল্যবান। অতএব, এগুলির যথাসম্ভব কার্যকরী ব্যবহার হওয়া উচিত। আমরা এখন আলোচনা করব কীভাবে আমাদের দেশে এই বিভিন্ন সম্পদগুলি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভূমি

ভূমি হল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, কারণ এর থেকে উৎপন্ন বস্তু মানবসমাজ এবং স্থলের অন্যান্য জীবজন্তুকে প্রতিপালন করে। ভারতবর্ষে প্রায় ৪৪% ভূমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে ১১-১৪% অরণ্যাবৃত। এর মধ্যে ভালো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত উভয় প্রকারের অরণ্যই আছে। ৪% ভূমি গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ৮% ব্যবহৃত হয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে, যেমন বাড়িঘর নির্মাণ, বনসৃজন, শিল্পস্থাপন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, জলাধার নির্মাণ ইত্যাদি।

আমাদের ভূমির প্রায় ১৪% অনুর্বর অর্থাৎ কৃষিকার্যের অনুপযোগী। অনুর্বর জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তার উৎপাদনশীলতা হারিয়েছে মৃত্তিকার ক্ষারত্ব কিংবা লবণাক্ততার জন্য এবং জলমগ্ন হওয়ার ফলে। মৃত্তিকার ক্ষয় আমাদের ভূমির উৎপাদনশীলতার পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক, কারণ এই প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার ভাঙ্গন হয়, ফলে তা জলে ধুয়ে চলে যায় অথবা বায়ুতে বাহিত হয়ে যায়। মৃত্তিকাক্ষয় ভূমির অসতর্ক ও বিবেচনাহীন ব্যবহার এবং ভূমিসম্পদের বিষয়ে অব্যবস্থাই সূচিত করে।

বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ২৪% শহরাঞ্চলে বাস করে। নগরায়ণের বৃদ্ধি এবং গ্রাম থেকে শহর এলাকায় জনগণের পরিযানের ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির উদ্ভব হয়। প্রথমত, জনসমাগমের ফলে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাদের আয়তন বাড়ে, কাজেই বাড়িঘর, অফিস ও কারখানা, রাস্তাঘাট এবং সেতু ইত্যাদি নির্মাণের জন্য কৃষিজমির রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, গ্রামীণ জমি স্বল্প ব্যবহৃত থেকে যেতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহর জীবনের মানের প্রায়ই অবনতি ঘটে। জলনিকাশি ও জলসরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপ পড়ে। বেশিসংখ্যক যানবাহনের জন্য দূষণও বেশি হয়। দরিদ্র জনসাধারণ

অস্বাস্থ্যকর বস্তি অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হন। গ্রাম থেকে শহরে জনসমাগম ব্যাহত করার একমাত্র উপায় গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে পরিবহন ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল ও ভালো জলনিকাশি ব্যবস্থার মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করা দরকার। গ্রামীণ শিল্পের স্থাপন গ্রামে আরও বেশি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে, যাতে মানুষকে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে চলে আসতে না হয়।

জল

মাঠে সেচের কাজে বা পানীয় হিসাবে যে জল আমরা ব্যবহার করি তা পাওয়া যায়—নদী, জলপ্রবাহ এবং কূপ থেকে, যা আমাদের ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়। নদীতে প্রবহমান অথবা ভূগর্ভে সঞ্চিত জলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, বেশিরভাগ গ্রামেই আজও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ যথেষ্ট নয়। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল প্রায়ই কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে আনতে হয়। এমনকি সব শহরেও পুরসভা কর্তৃক জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে, প্রচুর জলের অপব্যবহার বা অপচয় হয়। ভূগর্ভস্থ জল সেচের জলের প্রায় ৪৮% জোগায়। প্রায় ক্ষেত্রেই ভূগর্ভস্থ জল স্বল্প-ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি এই জল পাম্পের সাহায্যে উপরে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শক্তি জোগানো যায়, তবে তাতে আমাদের ভূমির অনেকাংশেরই সেচব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে।

অরণ্য-আবরণ

উপগ্রহ প্রেরিত চিত্র ও আকাশযান থেকে গৃহীত আলোকচিত্রের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ১৪% ভূভাগ ছিল গভীর অরণ্য এবং বাকি ৩% ছিল নিম্নমানের বা অনিবিড় অরণ্য (চিত্র ১৭.২)। সমগ্র পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। জলবায়ুর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর সংযুতি রাখতে এই সংখ্যা আরো বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে অরণ্যসম্পদের বেশিরভাগই হয় অরণ্যের মধ্যে নয়তো তার চতুর্দিকে বসবাসকারী মানুষের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অরণ্যের বিপুল পরিমাণ গাছ কাটা হয় কাঠের জন্য এবং ফলের বাক্স ও কাগজ তৈরির কাজে। এছাড়া অরণ্যকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যার গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র হিসাবে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিগত ৩০ বছরে প্রায় ৪৩ লক্ষ হেক্টর অরণ্য কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হয়েছে অথবা বাঁধ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে নষ্ট হয়েছে। মোট ৭.৫ কোটি হেক্টর অরণ্য ভূমির এটি যথেষ্ট বড় অংশ। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী আমাদের দেশ প্রতি বছর ১.৬ লক্ষ হেক্টর হারে অরণ্য হারাচ্ছে। যদি বর্তমান হারে অরণ্য নিধন চলতে থাকে, তবে আগামী একশো বছরে দেশের অনেকটা অংশই তৃণভূমি হয়ে যাবে, ফলে খরা ও বন্যা ভারতে একটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে।

খনিজ

কয়লা, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি খনিজ সবরকম শিল্পে এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত হয়। খনিজ ব্যবহারের হার প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও কিছু কিছু খনিজ যেমন চুনাপাথর এবং লৌহ-আকরিকের মাথাপিছু ব্যবহার অন্য কিছু খনিজ, যেমন বক্সাইট, জিপসাম, কাদামাটি, সিলিকা, গন্ধক, কয়লা

ইত্যাদির থেকে বেশি, আমাদের মাথাপিছু খনিজ ব্যবহার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা জাপানের মতো উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। আমাদের দেশে উৎপন্ন খনিজের একটি বড় অংশ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য কাঁচামাল হিসাবে অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। তবুও বেশ কয়েকটি খনিজ, যেমন ইউরেনিয়াম, হীরা, কয়েকরকম ইস্পাত, তামা, লৌহেতর সংকর ধাতু, অপরিশোধিত তৈল ইত্যাদি কোনো-না-কোনো রূপে আমদানি করা হয়। সম্পদ সদ্ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হল এর বর্জিত অংশের পুনরায় ব্যবহার, যার ফলে প্রয়োজনীয় সম্পদ বের করা যায়। আমরা এখন বর্জ্য পদার্থের পুনরাবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আপনি নীচের অনুশীলনীটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে দেখুন।

অনুশীলনী—১

নীচে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া হল। খ স্তম্ভে দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে ক স্তম্ভে উল্লিখিত সম্পদের সমন্বয় করুন।

ক	খ
ভূমি	(১) সমগ্র পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি। জলবায়ুর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর সংযুতি বজায় রাখতে এই সংখ্যা আরো বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
জল	(২) আমাদের দেশের উৎপাদনের একটি মোটা অংশ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য কাঁচামাল হিসাবে অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়।
অরণ্য-আবরণ	(৩) যদি পাম্পের সাহায্যে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শক্তি জোগানো যায়, তবে তাতে আমাদের ভূমির অনেকাংশেরই সেচব্যবস্থা সুনিশ্চিত হতে পারে।
খনিজ	(৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নাগরিক জীবনের অবস্থার প্রায়ই অবনতি ঘটে। জলনিকাশি ও জলসরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপ পড়ে। বেশিসংখ্যক যানবাহনের জন্য দূষণও বেশি হয়।

১৮.৩ ব্যবহৃত ও বর্জিত সম্পদের পুনরাবর্তন

কিছু কিছু উপাদান আছে যেগুলি একবার ব্যবহার করার পর বর্জন না করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। যে প্রক্রিয়ায় বর্জিত সম্পদকে আবার ব্যবহারযোগ্য করা যায় তাকে পুনরাবর্তন (recycling) বলা হয়।

ধাতুখণ্ড ও ব্যবহৃত ধাতু

কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে ধাতুখণ্ড পাওয়া যায়। পরিত্যক্ত যানবাহন, যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, জাহাজ, বাড়ি, ঘর ইত্যাদি থেকে পুরানো, ব্যবহৃত ধাতু গলিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে পুনরাবর্তন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ,

অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহৃত বাসনপত্র সংগ্রহ করে এবং গলিয়ে নতুন বাসন-কোসন তৈরি করা যায়। তামা, দস্তা, সীসা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধাতুর ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমরা মেটাতে পারি ব্যবহৃত উপাদানের পুনরাবর্তন করে।

বর্জিত জল

গৃহস্থালি এবং পুরসভাকর্তৃক বর্জিত জল জৈবপুষ্টিকারক দ্রব্যে সমৃদ্ধ। এই জল যদি রোগজীবাণু এবং বিষাক্ত পদার্থ থেকে মুক্ত করা হয়, তবে তাকে কৃষিক্ষেত্রে, বাগান ও অন্যান্য গাছগাছড়ার জলসেচের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

জীবাণু ও বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে হলে বর্জিত বা নিকাশি জলকে একটি জলাধারে বা পুকুরে কয়েক দিন রাখা হয়। এর ফলে ভারী বস্তুকণাগুলি আপনাআপনি জলের তলদেশে গিয়ে জমা হয়, আর অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্তুকণাগুলিকে ফটকিরি ও কষ্টিক সোডার যোগে থিতানো হয়। স্বচ্ছ তরলকে তখন ফিলটার অথবা বালি কিংবা মাটির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয় এবং সবশেষে তার মধ্যে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শুধু যে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বর্জিত জলে সাধারণত যে দ্রবীভূত হাইড্রোজেন সালফাইড থাকে তা দূর হয় তাই নয়, পরিস্রুত জলে অক্সিজেন যুক্ত হওয়ার ফলে পরিশোধনে সাহায্যও হয়। উপযুক্ত পরিমাণে ক্লোরিন এই জলে ব্যবহার করা হলে, (যাকে chlorination বলা হয়), সবরকম অনিষ্টকর জীবাণু ধ্বংস হয়, ফলে জল ব্যবহারযোগ্য হয়।

শৈবাল অথবা কচুরিপানা নদী, হ্রদ ইত্যাদিতে ভাসমান জংলি উদ্ভিদ হিসাবে বেড়ে থাকে। এই কচুরিপানা অথবা শৈবালের চাষ করলে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ফসফেট এবং নাইট্রেটের মতো দূষক এই উদ্ভিদগুলিকে পুষ্টি জোগায়। তাই এইসব দূষক থেকে এই জল মুক্ত হয় এবং উদ্ভিদগুলিকে ব্যবহার করা যায় জৈবগ্যাস তৈরির কাজে। এ সম্বন্ধে আপনারা আগেই ১৭নং এককে পড়েছেন।

বর্জিত কঠিন বস্তু

কঠিন বর্জিত বস্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পদ হতে পারে। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জাপানের ইয়াকোহামায় অবস্থিত একটি কারখানা, যেখানে বাজে কাগজকে টয়লেট পেপারে রূপান্তরিত করা হয়। আমাদের দেশে পাটনা শহরের প্রধান রাস্তাটি আলোকিত করা হচ্ছে জৈবগ্যাস দিয়ে যা শহরবাসীদের মল থেকে উৎপন্ন। দিল্লিতে নিষ্কাশিত ময়লা জল পরিশোধনের সঙ্গে রান্নার গ্যাসও তৈরি হয়। গো-মহিষাদির গোবর, মানুষের বিষ্ঠা, আবর্জনা, জলজ আগাছা, শৈবাল, কচুরিপানা প্রভৃতি পচানো হলে তার থেকে তৈরি হয় জৈবগ্যাস যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া ঘটে ২৮° এবং ৪০° উষ্ণতার মধ্যে। উৎপন্ন গ্যাসের প্রধান অংশই মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অল্প পরিমাণে হাইড্রোজেন সালফাইড ও নাইট্রোজেন।

আকরিক থেকে ধাতু বের করার পর যে বর্জিত পদার্থ বা ধাতুমল পড়ে থাকে তাকে গুঁড়ো করে সিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। আর একটি পদার্থ হল গুঁড়ো ছাই (fly ash) যদি দৃঢ়ভাবে সংযোজনের মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উপরের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে বর্জিত কঠিন বস্তু আমাদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ, শক্তি উৎপাদন ও সার তৈরির ব্যাপারে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসাবে কাজে লাগতে পারে। আপনি কতটা শিখলেন তা পরীক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত অনুশীলনীটি করার চেষ্টা করতে পারেন।

অনুশীলনী—২

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন :

১। ধাতুখণ্ড ও পুরানো ব্যবহৃত ধাতু পুনরায় গলিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে .... করা যায়।

২। জলে উপযুক্ত পরিমাণে ক্লোরিন ব্যবহার করা হলে জলের মধ্যস্থ অনিষ্টকর .... ধ্বংস হয়।

৩। গৃহস্থালি এবং পুরসভা কর্তৃক বর্জিত জল .... এর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। যে প্রক্রিয়ায় বর্জিত সম্পদকে আবার ব্যবহারযোগ্য করা যায় তাকে .... বলে।

৫। গুঁড়ো ছাই .... হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬। বর্জিত কঠিন বস্তু আমাদের শিল্পের জন্য .... সরবরাহের একটি প্রয়োজনীয় উৎস হিসাবে কাজে লাগতে পারে।

১৮.৪ সম্পদের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা

আপনারা আগেই জেনেছেন যে আমাদের সম্পদ সীমিত এবং সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতএব আমাদের জানা আবশ্যক কীভাবে সুদক্ষ ও সতর্ক পরিকল্পনার সাহায্যে আমাদের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি।

১৮.৪.১ ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা

লোকে যেহেতু চতুর্দিকেই জমি দেখতে পায়, তাদের এমন ধারণা জন্মায় যে, জমির কোনও অভাব নেই। অধিকন্তু, তারা গ্রাহ্যই করে না কীভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে, যদি না অবশ্য সেটি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়। জনগণ এবং সরকারী প্রতিনিধিদের অনবধানতার ফলে ব্যাপক ভূমিক্ষয়, ভূমির রোগ এবং ভূমিসম্পদের অন্যান্য ক্ষতি হয়েছে। ভূমি হল এমনই একটি সম্পদ যা নিঃশেষিত হতে পারে এবং যা জলবায়ুর পরিবর্তন এবং নানা প্রাকৃতিক ঘটনা, যেমন, বৃষ্টি, সূর্যালোক, গাছপালা, ভূমিক্ষয়, ভূমির ধস ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

উপযোগিতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার করা উচিত। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আপনারা পাঠ করেছেন যে ভূমির উপযোগিতা ও সক্ষমতার মূল্যায়ন করা হয় তার ভারবহন ক্ষমতা ও উর্বরতার নিরিখে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের জন্য যেহেতু অধিকতর চাষের জমি প্রয়োজন, সেহেতু কৃষি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে, যেমন রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘর নির্মাণের জন্য, উর্বর কৃষি-জমির উপর হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্পোন্নয়ন, বাঁধ এবং জলাধার নির্মাণ প্রভৃতির জন্য স্থান নির্বাচন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা দরকার যাতে পরিবেশ এবং ওই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিঘ্নিত না হয়। কেন্দ্রীয় শহর স্থাপনের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করার সময় বাড়িঘর নির্মাণ, জল সরবরাহ, বর্জ্যবস্তু ও আবর্জনা অপসারণ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

পাহাড়ী এলাকা যতদূর সম্ভব অরণ্য আবৃত হওয়া প্রয়োজন কারণ অরণ্য জ্বালানি, পশুখাদ্য ও কাঠের যোগান দেয় (চিত্র ১৮.১)। অধিকন্তু, অরণ্য ভূগর্ভস্থ জল বাড়াতে সাহায্য করে, কারণ তা ভূপৃষ্ঠে জলের মুক্ত প্রবাহকে বাধা দিয়ে মাটিতে জলশোষণের সহায়তা করে থাকে।

এই প্রক্রিয়ায়, ভূমিক্ষয় যথাসম্ভব কমানো যায় এবং বন্যা এড়ানো যায়। অরণ্য বাস্তুতন্ত্রের অর্থাৎ জীবজন্তু, গাছপালা, বায়ু ও জল ইত্যাদির মধ্যে সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

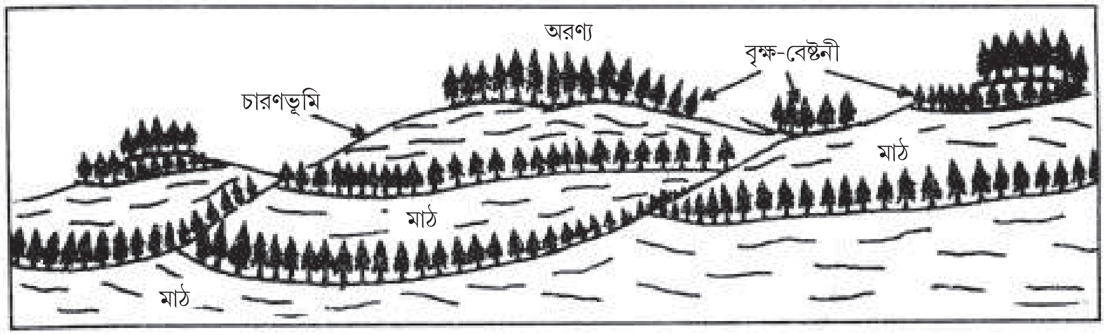

চিত্র ১৮.১ : পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ব্যবহার

এখন আমরা দেখব ভূমি ব্যবস্থাপনার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গগুলি কী কী।

ভূমি ব্যবস্থাপনার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গগুলি

ভূমির ব্যবস্থাপনার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ পাঁচটি :

(ক) ভূমির সক্ষমতা মানচিত্র আঁকা, যার মধ্যে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের ভারবহন ক্ষমতার নির্দেশ থাকবে। এই ধরনের মানচিত্র তৈরি হয় উড়োজাহাজ থেকে নেওয়া আলোকচিত্র এবং উপগ্রহ কর্তৃক প্রেরিত চিত্রের সাহায্যে। এই মানচিত্র শিলা ও মাটির ধর্ম এবং ভূগর্ভস্থ জলের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্বন্ধেও তথ্য দিতে পারে।

(খ) ভূমির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশদ অনুশীলন, যেমন মাটির ধরন, ভূত্বকের ভৌত বৈশিষ্ট্য, জলসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য—তার বণ্টন, সদ্ব্যবহার, পৃষ্ঠপ্রবাহ, পৃষ্ঠ-সঞ্চয়, যেমন, পুকুর এবং ভূগর্ভস্থ জল, এইসব তথ্যের ভিত্তিতে ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে কর্মসূচী নেওয়া যেতে পারে।

(গ) ভূমি-ব্যবহারজনিত পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখা দরকার। এটা করা যেতে পারে দূরসন্ধানের সাহায্যে।

(ঘ) কোনো বিশেষ স্থান বা অঞ্চল যেসব প্রাকৃতিক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে তাদের প্রত্যাশিত প্রাবল্যের অনুসন্ধান এবং হিসাব।

(ঙ) ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মসূচী এবং পরিকল্পনার বিশদ অনুশীলন যার লক্ষ্য হবে ভূমিক্ষয় বা মৃত্তিকার রোগের প্রতিরোধ ও ভূমি সংরক্ষণ।

১৮.৪.২ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

আমরা আগেই বলেছি যে মৃত্তিকা একটি মূল্যবান সম্পদ যা তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লাগে। সেইজন্য মৃত্তিকার যথাযথ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার দুইটি দিক হল (ক) মৃত্তিকার ক্ষয় ন্যূনতম রাখা বা নিবারণ করা এবং (খ) মৃত্তিকার উৎপাদনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা।

মৃত্তিকার ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ

মৃত্তিকার ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে (ক) মৃত্তিকার উপর তৃণ, গুল্ম ও বৃক্ষের সৃজন এবং (খ) জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ যাতে জলের মুক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় (চিত্র ১৮.২ক)। জলের প্রবাহ সরু সরু নালী বা খাতের সৃষ্টি করে এবং তার ফলে গভীর, সংকীর্ণ উপত্যকা গড়ে ওঠে, যা দরি জমির রূপ নেয়। বিখ্যাত চম্বল দরি অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে মৃত্তিকার গভীর ক্ষয়ের ফলে এবং এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় রোধ বাঁধের শ্রেণী নির্মাণ করে, যাতে বহমান জলের প্রবাহ এবং খাতের প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয় (চিত্র ১৮.২ খ, গ)। মহারাষ্ট্র, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল বরাবর পাথরের চওড়া দেওয়াল নির্মাণ সমুদ্রতরঙ্গ এবং প্রবাহজনিত ক্ষয়নিয়ন্ত্রণ

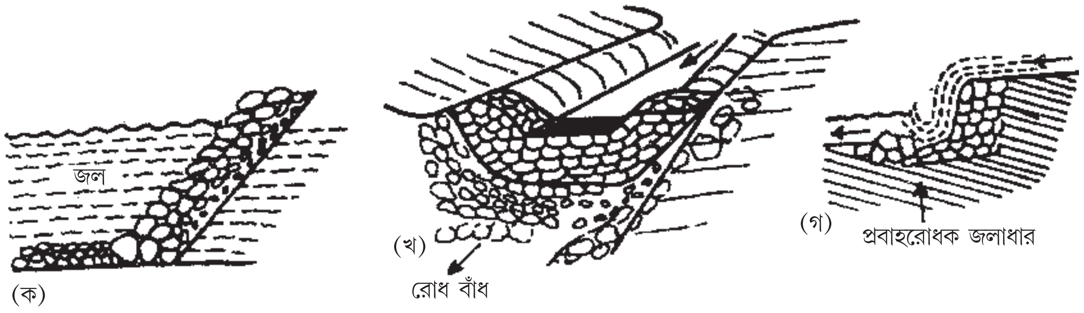

চিত্র ১৮.২ : (ক) জলের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ নিবারণের জন্য জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা।

চিত্র ১৮.২ : (খ), (গ) বহমান জলের প্রবাহ দমন করার জন্য রোধ—বাঁধ।

অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। মরুভূমি এবং বালুকাযুক্ত উপকূলে দমকা হাওয়ার জন্য বালির গতি নিবারণ করা যায় হাওয়ার গতিপথে গাছ এবং গুল্মের অবরোধের সাহায্যে (চিত্র ১৮.৩)।

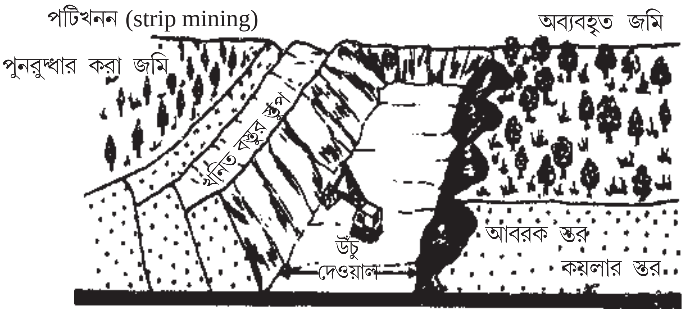

চিত্র ১৮.৩ : বৃক্ষ এবং গুল্মের অবরোধের সাহায্যে দমকা হাওয়ায় বালির গতি নিবারণ।

পর্বতের গায়ে ও পাহাড়ী অঞ্চলে নিজেরাই ছড়িয়ে পড়ে এমন বৃক্ষ এবং গুল্মের গুঁড়ি ও শাখারোপণ শুধু চত্বরের ঢাল শক্তিশালী করে তাই নয় তা কৃষকদের জ্বালানি কাঠ এবং পশুখাদ্যের জোগানও দেয়।

শস্যচাষের ক্ষেত্র আর ঘাস, গুল্ম, ভুট্টা, আখ, তুলা, তামাক এবং ক্ষয়রোধী অন্যান্য গাছপালার ফালিজমি একটির পর অন্যটি পালাক্রমে তৈরি করে পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলে চত্বরের জমির সুস্থিতি আনা যায়।

ভূমির ক্ষয় এবং পাহাড়ে ধস নামার মতো পুঞ্জগতি নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে জলনিকাশি পরিখার জালক নির্মাণ, যার মধ্যে পাথর বা ইটের টুকরো ভর্তি থাকবে যাতে তাদের ভেতর দিয়ে জল বয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের ঢালগুলি স্থায়ী করা যায় তাদের চতুর্দিকে এমন দেওয়াল নির্মাণ করে যা বিনা বাধায় জল যেতে দেয়। চিত্র ১৮.৪-এ এধরনের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। সহজে ক্ষয়যোগ্য ঢালের

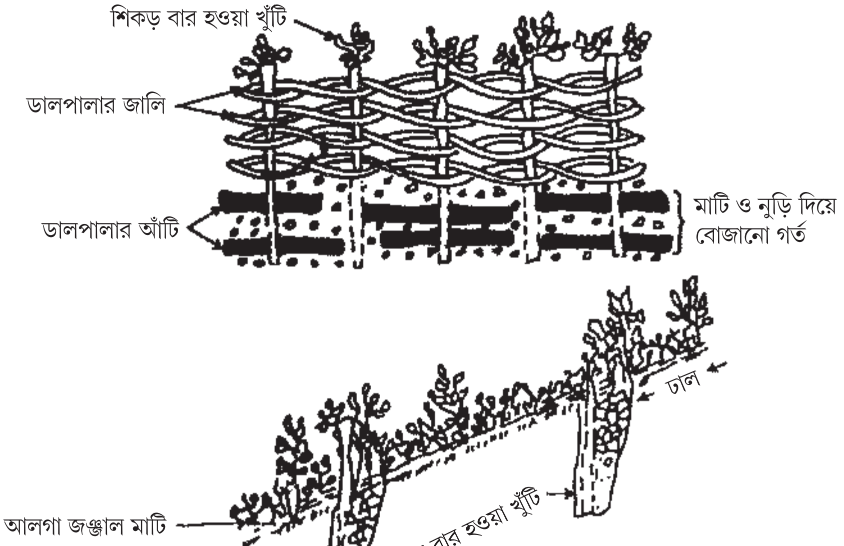

চিত্র ১৮.৪ : পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমি সংস্করণ

উপর উদ্ভিদের আবরণ দেওয়া হয়। প্রথম দিকে ভূমিতে দৃঢ়ভাবে পোঁতা খুঁটিতে আটকানো নারিকেল ছোবড়ার জাল দিয়ে বীজগুলি ঢাকা থাকে। জাল ক্ষয়রোধ করে, মাটির উপাদান ধরে রাখে এবং পুষ্টি জোগায়। তৃণের দ্রুত বৃদ্ধি মৃত্তিকার স্থায়িত্ব আনে।

মৃত্তিকার রোগের চিকিৎসা

বিশ্রাম না দিয়ে অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য মৃত্তিকার মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানের অভাব ঘটে এবং মৃত্তিকা তার উর্বরতা হারায়। এক একবার এক একরকম শস্য এবং মটর, শিম প্রভৃতি সব্জির চাষ মাটিতে পুষ্টিকর উপাদানের অভাব দূর করতে সাহায্য করে। মটর ইত্যাদি উদ্ভিদ মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন যোগান দেয় এবং তার বন্ধনক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধিত করে। ভূমিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গাছগুলির মূল ও প্রশাখাগুলি কিছুদিন মাঠে ফেলে রাখা হয়।

দেখা যায় যে অতিরিক্ত সেচের ফলে মৃত্তিকা সম্পূর্ণ সংপৃক্ত বা জলমগ্ন হয় ফলে তা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কোনও কোনও এলাকায় সেচের জন্য মাটির লবণাক্ততা এবং ক্ষারত্ব বেড়ে যায়, ফলে মাটি রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে। এই ধরনের মাটির রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমেই, খাল, জলাধার, পুকুর-জলাশয়ের সমস্ত ছিদ্রপথে জলের চোয়ানো বন্ধ করতে হবে এবং শুধু প্রয়োজনীয় জলই ব্যবহার করতে হবে। জৈব সারের সঙ্গে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করেও মৃত্তিকার ক্ষারত্ব এবং লবণাক্ততা হ্রাস করা যায়, যেমন জিপসাম (খড়ির মতো পদার্থ, যা থেকে প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরি হয়), ফস্‌কো-জিপসাম (ফস্‌ফেটসহ জিপসাম) এবং পাইরাইট (তামা, লোহা ইত্যাদির সালফাইড)। লবণরোধী কোনো কোনো গাছ, যেমন যব, জোয়ার, সয়াবিন, তুলো, পালং শাক, খেজুর গাছ লাগানো মাটির লবণাক্ততার সমস্যা সমাধানের আর এক উপায়।

১৮.৪.৩ অরণ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা

কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে এবং আমাদের বনসম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝে এখন জ্বালানি, কাগজ, খেলাধুলার সরঞ্জাম, প্যাকিং বাক্স, আসবাবপত্র তৈরির কাঁচামাল এবং ঘরবাড়ির কড়িবরগা হিসাবে কাঠের বিকল্প খোঁজা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিকল্প উৎস সন্ধানের জন্য গবেষণাও চলেছে; কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্লাস্টিক এবং মিশ্রিত উপাদানের বিকাশ হয়েছে, যদিও এখনও সেগুলির ব্যাপক ব্যবহার হয়নি। আর এক উপায় হচ্ছে নিম্নমানের বা পতিত জমি বেছে নিয়ে সেখানে বেশি সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন গাছ ও লতাপাতা জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা। এর ফলে আমরা পেতে পারি পশুখাদ্য, জ্বালানি কাঠ, কাঠ, ফল ও বীজ। যদি অরণ্য ধ্বংস বন্ধ করতে হয়, তবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন :

(ক) অরণ্য ভান্ডার থেকে সবরকম সম্পদ সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন,

(খ) অরণ্যের বৃদ্ধি ও ধ্বংসের হারের উপর লক্ষ্য রাখার একটি পদ্ধতির রূপায়ণ,

(গ) দাবানল প্রতিরোধের কার্যকরী পদ্ধতির সংস্থাপন,

(ঘ) বিনা অনুমতিতে গাছ কাটার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ।

বৃক্ষরোপণ

দ্রুত বৃদ্ধিশীল বৃক্ষ যেমন পপ্লার, ক্যাসুরিনা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ঝাউগাছ বহুল পরিমাণে রোপণ করা উচিত। দেখা গেছে, বৃক্ষের আবাদের উৎপাদনক্ষমতা স্বাভাবিক অরণ্যের থেকে বেশি। সুসেচিত বৃক্ষের আবাদে উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রতি বছর হেক্টর পিছু ৪৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত হতে পারে।

সামাজিক বনসৃজন

কৃষক তার গ্রামের সীমানার মধ্যে চলার পথ, রাস্তা, রেললাইন বা নদী খালের তীরবরাবর মাঠ বা খোলা জমির ধারে লাগানো দ্রুত বৃদ্ধিশীল গাছ থেকেই তাঁর কাঠের প্রয়োজনের কিছুটা মেটাতে পারেন। সামাজিক বনসৃজনের উদ্দেশ্যই হল জ্বালানি, পশুখাদ্য, ফল, কাঠ এবং অন্যান্য দরকারী জিনিসের অভাব মেটায়।

১৮.৪.৪ জলসম্পদের ব্যবস্থাপনা

জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় এমন একটি কর্মসূচী যার সাহায্যে জলের উৎস বা জলাধারের জীবনকালের বিপত্তি না ঘটিয়ে বিভিন্ন রকমের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উত্তম মানের জল পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, যাতে (ক) সবরকম ব্যবহারের উপযুক্ত মানের জল পাওয়া যায় এবং (খ) এই মূল্যবান সম্পদের অপব্যবহার বা অপচয় না হয়, তা দেখাই জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। ভূগর্ভস্থ জলাধারের ক্ষয়পূরণ এবং উদ্বৃত্ত এলাকার জল ঘাটতি এলাকায় চালনা জল-ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ভূগর্ভস্থ জলের পরিপূরণ জলনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। পাহাড়-পর্বতে, জল বিভাজিকাগুলি গাছপালায় ঢাকা থাকে। বনজ জঞ্জালে আবৃত জলবিভাজিকার মাটি চুইয়ে বৃষ্টির জল প্রবেশ করে এবং ভূগর্ভস্থ জলবাহী শিলাস্তরে (aquifer) গিয়ে পৌঁছয়।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে, ঝড়বৃষ্টির জল বা বাড়িঘরের নর্দমার জল গভীর গর্তে, পরিখা বা যে-কোনও নিম্নভূমিতে নিয়ে যাওয়া যায় যাতে তা পরিস্রুত হয়ে ভূগর্ভে যেতে পারে। বন্যার জন্য গভীর গর্তের সারির ভিতর দিয়ে জলবাহী শিলাস্তরে প্রবেশ করানো বা খাদের জালির মধ্য দিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

স্বাভাবিক এবং বন্যার জলের অতিরিক্ত প্রবাহ যেখানে জলের ঘাটতি আছে সেইসব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে শুধু যে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির বিপদ দূর হবে তাই নয়, ঘাটতি এলাকাও উপকৃত হবে।

বসতির এবং পুরসভার বর্জিত জল যথাযথভাবে শোধিত করে বহুসংখ্যক শিল্প এবং কৃষিকার্যের উপযুক্ত সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আগেই পড়েছেন যে বর্জিত জলের পরিশোধন বলতে বোঝায় দূষক পদার্থ, জীবাণু ও বিষাক্ত বস্তুর অপসারণ।

সমুদ্রের জলের লবণ-দূরীকরণ

সৌরশক্তির সাহায্যে সমুদ্রের জল পাতন করে উত্তমমানের মিষ্টি জল পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে গুজরাটের ভবনগর, রাজস্থানের চুরু প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রের জলের লবণ দূরীকরণের এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

জলের অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার এই মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদের এক অমার্জনীয় অপচয়। আমাদের দেশে প্রচুর জলের অপচয় হয়ে থাকে ছিদ্রযুক্ত কল এবং নিম্নমানের জলের নল লাগানোর জন্য। অতিরিক্ত সেচের উপর নিয়ন্ত্রণও আবশ্যক। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সীমিত সম্পদকে সুব্যবস্থিত করার কিছু উপায় আমাদের হাতেই রয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যাওয়ার আগে কতটা শিখলেন তা একবার পরীক্ষা করে নিতে পারেন।

অনুশীলনী—৩

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(১) ভূমি কী ধরনের সম্পদ?

(২) শিল্পোন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, জলাধার ইত্যাদির জন্য স্থান নির্বাচনে আমরা অত্যন্ত সতর্ক হব কেন?

(৩) পাহাড়ী এলাকাকে অরণ্য আবৃত রাখা উচিত কেন?

(৪) জলের প্রবাহ ভূমির উপর কী প্রভাব ফেলে?

(৫) মটর জাতীয় গাছ কীভাবে মাটিকে সাহায্য করে?

(৬) কৃষকের পক্ষে সামজিক বনসৃজন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(৭) ভূগর্ভস্থ জলের পরিপূরণ কীভাবে হয়?

১৮.৫ খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ

পূর্ববর্তী এককে আপনারা পাঠ করেছেন যে খনিজ বস্তু সীমিত পরিমাণে সঞ্চিত আছে এবং সেগুলি নিঃশেষ হতে পারে। বর্তমান হারে খরচ হতে থাকলে এদের অনেকগুলিই বেশিদিন যাবে না। সংরক্ষণের অর্থ হল বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার যাতে অপচয় সবচেয়ে কম হয়। অপচয় সবচেয়ে কম করা বা হ্রাস করার একটা উপায় হল যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধার করা এবং কিছুই অপচয় না হতে দেওয়া।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি ব্যবহৃত ধাতুর ক্ষুদ্র খণ্ড পুনরাবর্তন অর্থাৎ পুনরায় ব্যবহার করা যায়। এর ফলে অনেকগুলি খনিজ সঞ্চয়ের উপর চাহিদার চাপ হ্রাস পাবে। ম্যাগনেশিয়ামের ধাতুসঙ্কর দ্রুত ইস্পাতের স্থান অধিকার করছে এবং তামা, সীসা ও টিন, যাদের সরবরাহ কম, এদের চাহিদাও হ্রাস করছে। পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি ধাতুর এবং এ্যাসবেস্টসের জন্যও পরিবর্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

উপরন্তু, যেসব এলাকা থেকে খনিজ আকরিক সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবনতির হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। যেসব জায়গায় খননকার্য করা হয় সেখানে কোনো পুষ্টিকর উপাদান থাকে না। অতএব, সেই অঞ্চল অনুর্বর থাকে এবং কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে দেয় না। এইরকম পতিত বা ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি নতুন মাটির উপরিস্তর দিয়ে আবৃত করা যেতে পারে (চিত্র ১৮.৫)। সার, নর্দমার জল, গৃহস্থালি বা পুরসভা কর্তৃক বর্জিত দ্রব্য, খামারবাড়ির সার ইত্যাদি ব্যবহার করা হলে এইসব অনুন্নত জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য হবে।

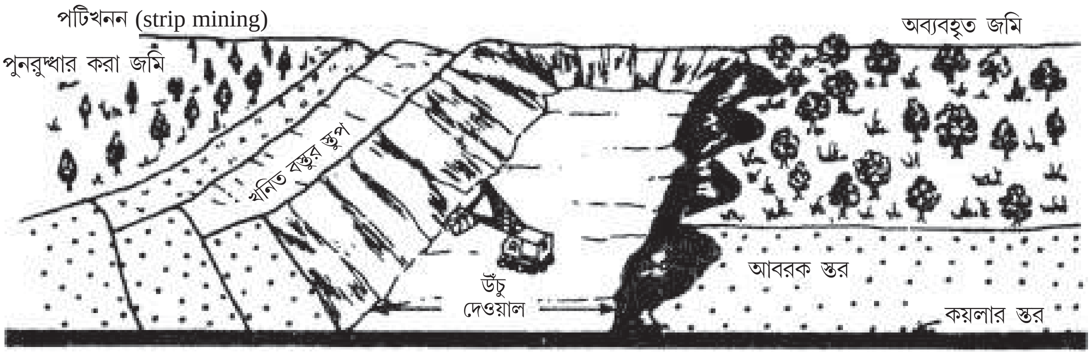

চিত্র ১৮.৫ : মাটির উপরিস্তর তুলে ফেলার পর খনিত অংশ মাটি দিয়ে আবৃত করে অরণ্যে পরিণত করা হয়।

সম্পদ সদ্ব্যবহারের উপর নজরদারী

বিভিন্ন সম্পদের গুণ ও পরিমাণগত পরিবর্তনের তথ্য অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ রাখা সম্পদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আদি সঞ্চয়ের মূল্যায়নের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সম্পদ সদ্ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ দূরসন্ধানের (remote sensing) সাহায্যে সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায়। অরণ্য, মৃত্তিকা, ভূমি, খনিজ সঞ্চয়, জলাজমি এবং তুষারভূমির হ্রাস বা অবনতির প্রকৃতি এবং পরিমাণ সম্বন্ধে অনুশীলন এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, নদীর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের বিপদ দূর বা হ্রাস করতে আমাদের সাহায্য করবে। পর্যবেক্ষণ থেকে এও প্রমাণ হয়েছে যে শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে

অতিরিক্ত জলসেচ মাটির লবণাক্ততা বা ক্ষারত্বের সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত জলসেচের এরকম ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা যায় দক্ষিণ হরিয়ানায় এবং পার্শ্ববর্তী রাজস্থানে।

অনুশীলনী—৪

নীচে কতকগুলি বিবৃতি দেওয়া হল। নির্ভুল বিবৃতির জন্য (স) এবং ভুল বিবৃতির জন্য (ম) লিখুন।

(১) সংরক্ষণের অর্থ হল সম্পদ ব্যবহার না করাই উচিত।

(২) যেসব খনন করা অংশ থেকে খনিজ সংগ্রহ করা হয় সেগুলি পুষ্টিকর পদার্থে পূর্ণ এবং সেইজন্য সেই এলাকাগুলি খুব উর্বর।

(৩) নর্দমার জল, গৃহস্থালি বা পুরসভা কর্তৃক বর্জিত দ্রব্য, খামার বাড়ির সার ইত্যাদির ব্যবহার অনুন্নত জমির উর্বরতা হ্রাস করবে।

(৪) সম্পদ সদ্ব্যবহারের উপর নজরদারী দূরসন্ধানের সাহায্যে সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায়।

(৫) পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করেছে যে শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে অতিরিক্ত জলসেচ মাটির উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

১৮.৬ সারাংশ

বর্তমানে এককে আপনারা পড়েছেন কত ভালোভাবে আমরা আমাদের মাটি, জল, অরণ্য, খনিজ প্রভৃতি সীমিত এবং অপুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার করতে পারি। এবং, যদি আমরা আমাদের সীমিত সম্পদকে দক্ষ ও সতর্ক পরিকল্পনার সঙ্গে ব্যবহার করি, তা হলে সেগুলি আরও দীর্ঘদিন চলবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা পাবে। উদাহরণস্বরূপ :

- ভূমি ব্যবস্থাপনার ব্যাপক কর্মসূচী এবং পরিকল্পনার দ্বারা আমরা ভূমিক্ষয় ও ভূমির রোগের প্রাবল্য হ্রাস বা দমন করে আমাদের ভূমিসম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।
- অরণ্য ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন, অরণ্যের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, দাবানল নিয়ন্ত্রণ এবং নিবারণের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং অরণ্য রক্ষণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করে আমরা আমাদের বন-সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।
- ভূগর্ভস্থ জলসঞ্চয়ের পরিপূরণ, উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় অতিরিক্ত জলের পরিচালন, ব্যবহৃত জলের পুনরাবর্তন এবং সমুদ্রের জলে লবণাক্ততা হ্রাস করে আমরা আমাদের জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালো জল জোগাতে পারি।
- বর্জিত পদার্থের পুনরাবর্তন করে সম্পদের সদ্ব্যবহারের উন্নতি করা যায়, দূষণও হ্রাস করা যায়।

১৮.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১. নর্দমার জল সেচের কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায়?

২. ধাতুর পুনরাবর্তন কী? এটি কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করে?

৩. মাটির রোগ কীভাবে দমন করা যায়?

৪. খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন কেন?

১৮.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী

১. (১) অরণ্য আবরণ (২) খনিজ (৩) জল (৪) ভূমি

২. (১) পুনরাবর্তন (২) জীবাণু (৩) জলসেচ (৪) পুনরাবর্তন (৫) দৃঢ়ভাবে সংযোজনের উপাদান (৬) কাঁচামাল

৩. (১) ভূমি হল একটি অপুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ, যা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

(২) কারণ উর্বর কৃষি ও অরণ্যভূমির কৃষি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশকারী ব্যবহার পরিবেশ ও ওই অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটায়।

(৩) কারণ অরণ্য জ্বালানি, পশুখাদ্য, কাঠ ইত্যাদি সম্পদের জোগান দেয় এবং জীবজন্তুর আশ্রয় দেয়। অরণ্য ভূগর্ভস্থ জলবৃদ্ধি এবং ভূমিক্ষয় দমনেও সাহায্য করে।

(৪) জলের প্রবাহ সরু সরু নালী বা খাতের সৃষ্টি করে এবং গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা গঠন করে যা দরিভূমিতে পরিণত হয়।

(৫) মটরের মতো উদ্ভিদ মাটিতে নাইট্রোজেন জোগায় এবং তার বন্ধন ক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।

(৬) গ্রামের সীমানার মধ্যে বৃক্ষ উৎপাদন কৃষকের জন্য জ্বালানি, পশুখাদ্য, ফল, কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারে।

(৭) উদ্ভিদ ও বৃক্ষরোপণের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের পরিপূরণ করা যায়।

৪. (ক) মি (খ) মি (গ) মি (ঘ) স (ঙ) মি

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১. নর্দমার জল জৈব পুষ্টিকারক পদার্থে সমৃদ্ধ। জীবাণু এবং বিষাক্ত পদার্থ থেকে মুক্ত করে এই জলসেচের কাজে ব্যবহার করা যায়।

২. যে প্রক্রিয়ায় বর্জিত সম্পদ আবার পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয় তাকে পুনরাবর্তন বলে। ধাতুখণ্ড এবং পুরানো ব্যবহৃত ধাতু আবার গলিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে পুনরাবর্তন করা যেতে পারে।

৩. এক একবার মটর ও শিম জাতীয় শস্যের চাষ করে মাটিতে পুষ্টিকর পদার্থের ঘাটতি দূর করা এবং মাটির রোগ রোধ করা যায়। খাল, জলাধার, পুকুর-জলাশয়ের সমস্ত ছিদ্রপথে জলের চোয়ানো বন্ধ করে এবং শুধু প্রয়োজনীয় পরিমাণে জল ব্যবহার করে মৃত্তিকার লবণাক্ততা ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪. খনিজ সঞ্চয় সীমিত পরিমাণে বর্তমান এবং অসতর্কভাবে ব্যবহার করলে তা শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সেইজন্যই খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। সংরক্ষণের অর্থ হল সুবিবেচিত ব্যবহার ও সর্বনিম্ন অপচয়।